লোক সঙ্গীত বিভাকর

প্রথম খণ্ড

সুবোধ গঙ্গোপাধ্যায়



ফার্মা কে-এল-এম প্রাইভেট লিমিটেড

প্রকাশক ঃ
ফার্মা কে-এল-এম প্রাইভেট লিমিটেড
২৫৭বি, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট
কলিকাতা - ৭০০ ০১২

প্রথম প্রকাশ ঃ ১৭ এপ্রিল ১৯৯৮

মুদ্রক ঃ
সনৎ মাইতি
লেজার রাইটার
২১/৪, জি. টি. রোড
হাওড়া - ৭১১ ১০১

স্নেহের পৌত্র সপ্তর্ষি

এবং

দৌহিত্রী শ্রুতিকে দিলাম

সূচীপত্র

প্রথম খণ্ড

বিষয়	পত্রাঙ্ক
সপ্তম পরিচ্ছেদ ঃ	২৯১-৩০৫
আগমনী গান	২৯১
বিজয়ার গান	৩০৪
অষ্টম পরিচ্ছেদ ঃ	৩০৬-৩২৪
গোষ্ঠ গান	৩০৬
গোপাল নাচের গান	৩১০
প্রভাতী গান	৩১২
নিমাই সন্ন্যাসের গান	৩১৯
বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীদের গান	৩২৩
নবম পরিচ্ছেদ ঃ	৩২৫-৩৩৭
কর্মসঙ্গীত ঃ (মাঠের ও বাটের গান - ৩২৫/পুতুল খেলার গান - ৩২৬/ নলকূপ বসানোর, ধান কাটার, ছাদপেটার গান - ৩২৭/পটের গান - ৩৩০/ নৌকা বাইচের ও পাট কাটার গান - ৩৩১/ভুঁই নিড়ানোর, ধান কোটার ও তাঁতে বোনার গান - ৩৩২/পাল্কী বাওয়ার ও চিঁড়া কোটার গান - ৩৩৩/ ধান ভানা ও চাপা কলের গান - ৩৩৪/হাত পুতুল নাচের গান - ৩৩৫/ চরকার ও মাছ ধরার গান - ৩৩৬/মকশী গান - ৩৩৭)	
দশম পরিচ্ছেদ ঃ	৩৩৮-৩৭৮
মৈমনসিংহ গীতিকা	৩৪০
নাথ গীতিকা	৩৬৬
প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা	৩৬৮
রংপুর গীতিকা	৩৭২
একাদশ পরিচ্ছেদ ঃ	৩৭৯-৩৮৮
জীবনী	৩৭৯
গ্রন্থপঞ্জী	৩৮৯
সংগ্রহ সূত্র	৩৯১
স্বরলিপি	৩৯৭-৪৪১

ভূমিকা প্রসঙ্গে দু-একটি কথা

প্রসিদ্ধ সঙ্গীতশিল্পী ও সঙ্গীতশাস্ত্রে অসাধারণ পারদর্শী শ্রীযুক্ত সুবোধ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'লোকসঙ্গীত বিভাকর' শীর্ষক বাংলা ও প্রান্তীয় অঞ্চলের লোকসঙ্গীত - সংগ্রহের জন্য আমাকে ভূমিকা লেখার অনুরোধ করায় আমি অত্যন্ত বিব্রত বোধ করছি। অবশ্য গানের ব্যাকরণ না জানলেও তার রসশিল্প আর সকলের মতো আমাকেও আকর্ষণ করে। কাবুলিওয়ালাও গান গায় দেখে শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত (দ্বিতীয় পর্ব) মন্তব্য করেছিলেন, "শুনিয়াছি, ইংরেজের মহাকবি শেক্সপীয়র নাকি বলিয়াছিলেন, সঙ্গীতে যে না মুগ্ধ হয় সে খুন করিতে পারে, না এমনি কি একটা কথা। কিন্তু মিনিটখানেক শুনিলেই যে মানুষের খুন চাপিয়া যায়, এমন সঙ্গীতের খবর বোধ করি তাঁহার জানা ছিল না। জাহাজের খোল বীণাপাণির পীঠস্থান কিনা জানিনা; না হইলে, কাবুলিয়ালা গান গায় একথা কে ভাবিতে পারে!" কাবুলিওয়ালাও গান গাইতে পারে, তা আমাদের শ্রুতিসুখকর হোক বা না হোক। মনের আনন্দই গানের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়। সে গান কখনো জনমনোরঞ্জক লোকসঙ্গীত, কখনো-বা কলাবতী রাগরাগিণী-সংবলিত মার্গরীতির মার্জিত গান, যাকে আমরা শাস্ত্রীয় সঙ্গীত বলি। পশ্চিম দেশে সমস্ত গানকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে - একটি লোকসঙ্গীত বা 'folk music', আরেকটি মার্জিত সঙ্গীত বা 'art music'। শেষোক্ত সঙ্গীতের রীতি-পদ্ধতি নিয়মাধীন, নানা কলাকৌশলের দ্বারা তা প্রতি পদে নিয়ন্ত্রিত এবং বলাই বাহুল্য, এই রীতি বিশেষ ব্যক্তি বা ঘরানার দ্বারা চিহ্নিত। অপরদিকে লোকসঙ্গীতের কোনো রচনাকার নেই। অন্তত তাঁদের নাম ধাম জানা যায় না। লোকসঙ্গীত গোটা সমাজের সৃষ্টি, কোনো ব্যক্তিবিশেষের রচনা নয়। হয়তো কোনো বিশেষ ব্যক্তি লোকসঙ্গীত রচনা করেছিলেন, কিন্তু কালক্রমে তাঁদের নাম - পরিচয় হারিয়ে গেছে। অবশ্য একালে পুরাতন ধাঁচে কেউ কেউ আধুনিক লোকসঙ্গীত রচনা করেছেন, এবং তাতে আধুনিক সুর লাগিয়ে ভদ্রসমাজে পেশ করছেন। তাই ওদেশে এ ধরণের আধুনিক লোকসঙ্গীতকে যথার্থ "folk song," না বলে, বলেন "fake song" অর্থাৎ লোকসঙ্গীতের আধুনিক নকল, যা কখনোই বিশুদ্ধ লোকসঙ্গীত রূপে পরিগণিত হতে পারে না। তা হলেও আধুনিক লোকসঙ্গীতকে একেবারে ব্রাত্য বলে সঙ্গীতের আসর থেকে বিতাড়িত করা যায় না। এই সমস্ত গ্রামীণ গান গ্রাম্যজীবনের সঙ্গে একীভূত হয়েছিল। গ্রামের জীবনযাত্রা, উৎসব, পূজার্চনা, ব্রতকথা, যাত্রা, পাঁচালী, আর্যাতর্যা—সবই কমবেশী লোকসঙ্গীতের অন্তর্ভুক্ত। অবশ্য লোকসঙ্গীত এলোমেলো বিশৃংখল নয়; টুসু, ভাদু, চটকা, ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালি প্রভৃতি গ্রাম্য গানের পিছনেও নিয়মানুগত্য আছে, পল্লীগানেরও কতকগুলি বাঁধাধরা রেওয়াজ আছে। কেউ কেউ মনে করেন, শাস্ত্রীয় সঙ্গীত বা কলাবতী মার্গের গানের পিছনেও আছে গ্রামীণ মানসিকতা। পাঞ্জাবের উষ্ট্রচালকদের গ্রাম্য গানই পরবর্তী যুগে টপ্পা গানে পরিণত হয়েছে। তাই মনে হচ্ছে লোকসঙ্গীত ও মার্গসঙ্গীতের সংযোগসূত্র হারিয়ে গেছে বলে দুইয়ের আত্মীয়তা সহজে চোখে পড়ে না। এমনকি ক্লাসিক মহাকাব্যও

গ্রাম্য গাথা থেকেই জন্ম লাভ করেছে। গ্রীক মহাকাব্য, স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান 'সাগা', প্রাচীন জার্মানিক ব্যালাড - সব কিছুর মূলে গ্রাম্য মানসিকতা। হোমারের মহাকাব্যও মুখে মুখে চলত। হোমার কাগজে কলমে 'ইলিয়াদ' রচনা করেননি, সবই তাঁর মুখে মুখে ছিল। তাঁর মৃত্যুর বেশ কয়েক শ বছর পরে মৌখিক কাব্য লেখার বন্ধন স্বীকার করে। আমাদের রামায়ণ -মহাভারতও প্রথম দিকে ব্যালাড বা লোকগাথার আকারে প্রচলিত ছিল, এবং এক অঞ্চলের ব্যালাডের সঙ্গে অন্য অঞ্চলের ব্যালাডের রীতিমতো পার্থক্য ছিল, তাই রামায়ণ - মহাভারতে এত প্রক্ষেপ দেখা যায়।

পশ্চিমে অষ্টাদশ শতাব্দী থেকেই লোকসঙ্গীত সংগ্রহের চেষ্টা হয়েছিল। জার্মানির গ্রীম ভ্রাতৃদ্বয় লোকভাষা সংগ্রহ করতে গিয়ে লোকসঙ্গীত সংগ্রহের প্রতি আকৃষ্ট হন। ক্রমে তাঁদের দৃষ্টান্ত থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে ফরাসি, ইংরেজি, স্কচ ও ওয়েলসের ভাষায় লোকসঙ্গীত সংগ্রহের ধুম পড়ে যায়। ওখানে উনিশ শতক থেকেই লোকসঙ্গীত রক্ষার জন্য একাধিক পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়, যাতে গ্রাম্য গান ও গাথা সংগৃহীত হয়েছে। এই সমস্ত লোক-সঙ্গীতের মধ্যে তিনটি প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। ১) সাহিত্যরস, ২) নৃতত্ত্ব এবং ৩) মনোবিজ্ঞান ও মনোবিকলন তত্ত্ব। এই তিনদিক থেকেই লোকসঙ্গীত বিচারের যোগ্য। আসলে নৃতত্ত্ব ও ভাষাতত্ত্ব একালের লোকসঙ্গীত চর্চায় নতুন মাত্রা যোগ করেছে। প্রাগৈতিহাসিক লোকচর্যার পরিচয় পেতে হলে লোকসাহিত্য, শিল্পকলা ও সঙ্গীতের মধ্য দিয়েই তার অনুসন্ধান করতে হবে। বাংলাদেশে আর্যাভিগমনের বহু পূর্ব থেকে যে নরগোষ্ঠী গান করত (অস্ট্রিক বংশোদ্ভূত নিষাদ এবং ভোটচীনীয় বংশোদ্ভূত কিরাত), তাদের স্বভাব ও জীবনচর্যা খ্রীঃ পূঃ শতাব্দীর মধ্যে পরিবর্তিত হতে শুরু করে, তার কারণ আর্যাবর্ত থেকে আগত বৈদিক, বৌদ্ধ, জৈন, পৌরাণিক সংস্কার। আগন্তুক আর্যসভ্যতা অনেকাংশে ছিল যাযাবর ও প্রধর্ষী। হয়তো তারাই সিন্ধু সভ্যতার মূলোচ্ছেদ করেছিল। বেদে যাদের দাস ও দস্যু বলে ঘৃণা করা হয়েছে, হয়তো তারা দ্রাবিড় সম্প্রদায়, অথবা 'কোল্ল - ভীল্ল' (মুণ্ডা ও সাঁওতাল)। আর্যদের সমবেত প্রচেষ্টায় তাদের কিছু কিছু গিরিকান্তারে পলায়ন করে প্রাণ রক্ষা করল, বেশ কিছু মারা পড়ল, কিছু শূদ্র হয়ে অন্য তিন বর্ণের (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য) সেবায় আত্মোৎসর্গ করতে বাধ্য হল। দ্রাবিড় জাতি সভ্যতায় যাযাবর আর্যদের চেয়ে অনেক উন্নত ছিল, কিন্তু আর্যদের সংঘশক্তির দাপটে তারা বিন্ধ্য পর্বতের দাক্ষিণে হটে যেতে বাধ্য হল। তাদের ক্ষুদ্র এক শাখা বেলুচিস্থানে রয়ে গেল। তারা আজও আছে, তাদের উপভাষার নাম 'ব্রাহুই'। অবশ্য তারা সকলেই ইসলামধর্মী। মনে হয়, এই অঞ্চলের প্রাকৃত ভাষার নাম ছিল পৈশাচী প্রাকৃত। গুণাঢ্যের বৃহৎকথা নাকি এই পৈশাচী প্রাকৃতে লেখা হয়েছিল। অবশ্য তার কোনো নিদর্শন পাওয়া যায়নি।

নিষাদ-কিরাত উপজাতি অধ্যুষিত অঙ্গ বঙ্গ - কলিঙ্গ - সুহ্ম - সমতট, রাঢ়, বঙ্গ - বঙ্গাল - প্রাগজ্যোতিষ প্রভৃতি প্রাগৈতিহাসিক জনগোষ্ঠী এক হাজার বছরের মধ্যেই আর্য প্রভাবের ছত্রছায়ায় এসে ক্রমে ক্রমে নিজেদের কুলসংস্কার পরিত্যাগ করে ব্রাহ্মণ্য প্রভাবিত

বৈদিক ও পৌরাণিক সংস্কার গ্রহণ করল। খ্রীষ্টপূর্ব শতাব্দী থেকেই পূর্বভারতে সংস্কৃত ভাষা, সাহিত্য, ব্যাকরণ, অভিধান, স্মৃতি-সংহিতার চর্চা শুরু হয়। ক্রমে এ অঞ্চলে বৈদিক ব্রাহ্মণগণ বাস করতে শুরু করলেন। ঐতরেয় আরণ্যকে পূর্বদেশকে অত্যন্ত ঘৃণা করা হয়েছে। পূর্বদেশে এসে বাস করলে বা এদেশীয় নারীর সঙ্গে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হলে আর্যদের জাতি যেত, তারা 'ব্রাত্য' বা 'বৃষল' অপনামে আর্যমণ্ডল থেকে বহিষ্কৃত হত; অবশ্য তারপরে প্রায়শ্চিত্ত ('ব্রাত্য স্তোম' নামক যজ্ঞ) করলে আবার আর্যমণ্ডলে সপরিবারে স্থান পেত। সে যাই হোক, আর্য প্রভাবের সর্বগ্রাসী আক্রমণ সত্ত্বেও বাংলাদেশের লোক-সঙ্গীত, ব্রতকৃত্য, মেয়েলি আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে এখনও অন্- আর্য বৈদিক ভাব - ভাবনা রয়ে গেছে। এ বিষয়ে নৈকষ্য কুলীন ব্রাহ্মণ ও অস্পৃশ্য সংকীর্ণ শূদ্রের মধ্যে বিশেষ কোনো নৃতত্ত্বগত পার্থক্য নেই। পুরুষরা যত সহজে নিজ নিজ কুলধর্ম পরিত্যাগ করে বহিরাগত আচার অবলম্বন করেছিল, অন্তঃপুরের স্ত্রী সমাজ কিন্তু অত সহজে নিজেদের আচার-বিচার ছাড়তে পারেনি। তাই বাংলা লোকসঙ্গীতের একটা বড়ো অংশ স্ত্রীসমাজকে কেন্দ্র করেই এখনও জীবিত আছে। শ্রীযুক্ত সুবোধ গঙ্গোপাধ্যায় সারা বাংলাদেশ ও প্রান্তীয় অঞ্চল থেকে লোকসঙ্গীত সংগ্রহ করেছেন, কিছু-বা মুদ্রিত গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত করেছেন। বোধহয় দীনেশচন্দ্র সেন সর্বপ্রথম লোকগাথার দিকে আকৃষ্ট হন, তাঁর সম্পাদিত মৈমনসিংহ গীতিকা ও পূর্ববঙ্গ গীতিকাই তার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। রবীন্দ্রনাথও লোকসাহিত্য ও লোকসঙ্গীতকে অবহেলা থেকে উদ্ধার করেন। তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে অনেকে এই শাখার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে গ্রাম্য গান সংগ্রহে প্রবৃত্ত হন। তাঁদের সেই সংগ্রহ উনিশ শতকের গোড়া থেকেই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে। অনেক পরে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য বহু পরিশ্রম করে লোকসঙ্গীতের বৃহত্তম সংকলন প্রকাশ করেন। এখন ও-পার বাংলাতেও লোকসঙ্গীত সংগ্রহের বিপুল চেষ্টা চলেছে। মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন সংগৃহীত 'হারামণি'র অনেকগুলি খণ্ডে লোকসঙ্গীতের বহু মূল্যবান দৃষ্টান্ত রয়ে গেছে।

শ্রীযুক্ত সুবোধ গঙ্গোপাধ্যায়ের সব চেয়ে বড়ো কৃতিত্ব, তিনি সংগৃহীত গানের স্বরলিপি প্রস্তুত করেছেন। এই সমস্ত গান বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি নৃতত্ত্ব ও ইতিহাসেরও সাহায্য নিয়েছেন। এ বিষয়ে তাঁর দক্ষতা অসাধারণ।

আর একটি প্রসঙ্গ উত্থাপন করে আলোচনায় ছেদ টানি। এদেশে লোকসঙ্গীত সংগ্রহের বৈজ্ঞানিক রীতিপদ্ধতি কতটা অনুসৃত হয়েছে তাতে বিশেষ সন্দেহ আছে। সেকালে টেপ-রেকর্ডার ছিল না, ডিক্টাফোনও ছিল না, লোকের মুখ থেকে শুনে লিখে নেওয়া হত। ফলে লোকসঙ্গীতের মধ্যে মার্জিত ভাব প্রবেশ করত। কোথাও কোথাও সংগ্রাহকেরা পল্লীসঙ্গীতকে কলকাতার সভ্যসমাজে পেশ করবার সময়ে সংগৃহীত গানের অমার্জিত ভাষাভাব অনেকটা ঢেকে ঢুকে রাখতেন। চন্দ্রকুমার দে যখন ময়মনসিংহ থেকে লোকসঙ্গীত সংগ্রহ করতেন, তখন তার গ্রাম্য বিশুদ্ধির দিকে তাঁর বিশেষ দৃষ্টি থাকত না। তাঁর গানগুলি দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের কাছে প্রেরিত হলে, তিনি তাতে কিছু হস্তক্ষেপ

করতেন. তারপর বেতনভুক লেখকেরাও তার কিছু অদলবদল করতেন, কারণ তাঁদের মধ্যে অন্তত দু'জন (কবি জসিমউদ্দীন ও কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র) কবিপ্রতিভার অধিকারী ছিলেন, সুতরাং কবিত্বের আমেজে ভর করে তাঁরাও পূর্ববঙ্গের অনেক শব্দ বদলে ফেলতেন। ইত্যাদি কারণে এই সমস্ত গানের গ্রাম্য স্বরূপ অনেকটা হারিয়ে গেছে। সে যাই হোক, সুবোধ গঙ্গোপাধ্যায়ের এই গানের সংকলন, বর্গীকরণ, আলোচনা ও বিচারপদ্ধতি বিশেষভাবে প্রশংসার যোগ্য। যাঁরা এই পথের পথিক ও এই রসের রসিক, তাঁরাই এর মূল্য বুঝবেন। তাঁদের পক্ষ থেকে আমি সুবোধ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়কে অভিনন্দন জানাই।

১৫.১.১৯৮৮ — অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

নিবেদন

গ্রন্থটির নামকরণ করা হয়েছে 'লোকসঙ্গীত বিভাকর'। এই নামকরণের মধ্য দিয়ে বোঝানো হয়েছে যে, সূর্য্য যেমন এ ভূমণ্ডলের সমস্ত প্রাণী, উদ্ভিদ অর্থাৎ বিশ্বপ্রকৃতিকে তার কিরণ দিয়ে পুষ্ট করে, ঠিক তেমনি সমস্ত সঙ্গীতের মূলে আছে লোকসঙ্গীত। অন্যদিকে 'বিভাকর' নামটি আমি অনেক ক্ষেত্রেই ব্যবহার করেছি। যেমন পরিষদের অভিজ্ঞানপত্রে 'সঙ্গীত বিভাকর', ত্রৈমাসিক পত্রিকা - 'আজকের সংবাদ বিভাকর', পরিষদ প্রদত্ত গুণীজন সম্বর্ধনায় - 'বিভাকর পুরস্কার' ইত্যাদি। আবার মৎপ্রণীত পূর্বোক্ত গ্রন্থগুলি যথাক্রমে 'সঙ্গীত বিভাকর' ও 'রবীন্দ্র-নজরুল বিভাকর' (১ম ভাগ, ২য় ভাগ)। এই হল গ্রন্থটির নামকরণের কারণ।

বাংলা লোক সাহিত্য ও সঙ্গীত বিষয়ক অনেক গবেষণা গ্রন্থ রচিত হয়েছে বা হচ্ছে। এই বিষয়ে থিসিস জমা দিয়ে অনেকেই ডক্টরেট উপাধিও পাচ্ছেন। বাজারের লোকসাহিত্য ও লোকসঙ্গীত বিষয়ক যে সব গ্রন্থ পাওয়া যায় তা এক একটি অঞ্চল ভিত্তিক, এক এক ধরণের লোকসঙ্গীত ও সাহিত্যকে নিয়েই রচিত। একটি গ্রন্থে সব জিনিস পাওয়ার উপায় নেই।

তবে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য্য মহাশয় এ ব্যাপারে কাজটা অনেকখানিই এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছেন। কিন্তু কোন গ্রন্থেই লোকসঙ্গীতের সুর নিয়ে তেমন কোন আলোচনা হয়নি।

এ ব্যাপারে আমার মনে হয় গ্রন্থকারদের মধ্যে অনেকেই লোকসঙ্গীত গান না, আর যাঁদের সে যোগ্যতা আছে তাঁরাও বিষয়টি পাশ কাটিয়ে গেছেন এবং শুধু লোকসাহিত্যের বিশ্লেষণ করেই দায়িত্ব শেষ করেছেন। আমার গ্রন্থটি লেখার যুক্তি এইখানে, ঐ শূন্যতা পূরণ, এবং লোকসঙ্গীতের সাঙ্গীতিক তত্ত্বের বিশ্লেষণ করাই আমার অভিলাষ। তাই বিভিন্ন ধরণের ভারতীয় লোকসঙ্গীতের কথা, সুর, আঞ্চলিকতা, জল, মাটি ও হাওয়ায় পুষ্ট হবার কারণগুলি বিশ্লেষণ করতে সক্ষম হয়েছি, প্রয়োজনে স্বরলিপির মাধ্যমে সুর ধরে রেখে আগামী প্রজন্মের সামনে ভারতীয় প্রাচীন লোকসুরের একটা ছক বা form তৈরী করে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। যদিও জানি যে, লোকসঙ্গীত বা যে কোন সঙ্গীত স্বরলিপির ছকে সুর বেঁধে রাখা বা ধরে রাখা যায় না। কারণ লোকসঙ্গীত কালোত্তীর্ণ, যুগোত্তীর্ণ সর্বত্রগামী। সময়ের সঙ্গে পা মিলিয়ে লোকসঙ্গীতও এগিয়ে চলে। তবুও অতীত বা পরম্পরার ঐতিহ্যকে মনে রাখতেই হয়। তাই এই প্রচেষ্টা। গ্রন্থটির প্রণয়ণ সার্থক হবে যদি এর মাধ্যমে মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকসঙ্গীত শিক্ষার্থীদের কোন উপকার হয় এবং তার সঙ্গে লোকসঙ্গীতপ্রেমী মানুষজনের যদি এই গ্রন্থের দ্বারা কোনোরকম সহায়তা হয়।

শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের সঙ্গে অন্যান্য গানের যেমন গবেষণা ও প্রচার - প্রসার ঘটেছে লোকসঙ্গীতের ক্ষেত্রে তা কিন্তু হয়নি। বর্তমানে লোকসঙ্গীত চর্চা বেড়েছে, মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোকসঙ্গীত শিল্পীর উদ্ভব হয়েছে। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে লোকসঙ্গীতের প্রচার হচ্ছে, শিল্পীরা স্বদেশে, বিদেশে ঘুরে ঘুরে 'লোকসঙ্গীত পরিবেশন করে নাম কিনছেন, পাচ্ছেন অর্থ, মান ও যশ। তাঁরা লোকসঙ্গীতের আসল রূপটি কি পরিবেশন করছেন বা শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দিচ্ছেন? না। আসল ভেঙ্গে শহুরে পিচ, কংক্রীটের ও শহুরে বাতাসের সঙ্গে মিশিয়ে শহুরে লোকসঙ্গীতের প্রতি লোকসমাজকে তথা আগামী প্রজন্মকে আকৃষ্ট করে সস্তায় বাজিমাৎ করতে ও বাহবা কুড়োতে চাইছেন। যার ফলে, লোকসঙ্গীতের আসল রূপটি হারিয়ে যেতে বসেছে। সেটার সন্ধান দেবার জন্যই, তাকে ধরে রাখার জন্যই আমার এ প্রচেষ্টা। জানি না কতখানি তা সফল হবে। তবে এ কথা ঠিক যে, লোকসঙ্গীত চর্চার কোন ব্যবস্থাই আজ পর্যন্ত হয়নি।

বঙ্গীয় সঙ্গীত পরিষদের তত্ত্বাবধানে গ্রামে গঞ্জে দু-চারটি লোকসঙ্গীত শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করতে পেরেছি। আর্থিক অনটনের জন্য হয়ত পূর্ণাঙ্গ রূপ দিতে পারিনি। আর্থিক সাহায্য পেলে ভবিষ্যতে জেলায় জেলায় লোকসঙ্গীত চর্চার কেন্দ্র পূর্ণাঙ্গরূপে কার্যাকরী করার ইচ্ছে আছে।

১৭৮৪ তে এশিয়াটিক সোসাইটিতে লোক-সংস্কৃতি চর্চা শুরু হয়েছিল প্রাচ্য বিদ্যাচর্চার অঙ্গ হিসাবে। পরবর্তীকালে স্বাধীনতা উত্তরকালে লোক-সংস্কৃতি চর্চার জাতীয় স্তরে বিদ্যায়তনিক প্রয়াস চলে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে লোকসাহিত্য, পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করে এবং পরবর্তী সময়ে ঐ প্রয়াস প্রসার লাভ করে। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় লোকসাহিত্য - লোকসংস্কৃতি বিশেষ পত্ররূপে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত হয় ও তা পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা চালু হয়

লোকসংস্কৃতির বিশাল ক্ষেত্রের পক্ষে এইটুকু যথেষ্ট নয়। আরো পরিব্যাপ্তির প্রয়োজন থেকেই যাচ্ছে।

সাম্প্রতিক কালে লোকসঙ্গীত চর্চায় বিদ্যায়তনিক শিক্ষাগত প্রশিক্ষণের গুরুত্ব সর্বাধিক, যা ভবিষ্যতে বাংলা তথা ভারতীয় লোকসংস্কৃতি চর্চাকে বিশ্ব লোকসংস্কৃতি চর্চার আন্দোলনের সঙ্গে আরো ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত করতে পারবে। আগামী প্রজন্মের কাজ হবে নূতন তথ্যের আবিষ্কার ও পুনরাবিষ্কারের প্রয়াস। প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতির ধারাটি লক্ষ্য করার মতন কারণ তা আমাদের বারবার স্মরণ করিয়ে দেয় বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতির বা সংস্কৃতির নিটোল কাঠামো বা রূপ রেখাটি। এ বিষয়ে আমরা কিন্তু তাঁদের থেকে অনেকটাই পিছনে পড়ে রয়েছি।

সমগ্র লোকসমাজই লোকসঙ্গীতের রচয়িতা। কোন বিশেষ ব্যক্তি লোকসঙ্গীতের রচয়িতা নন। কথাটা অনেকের মুখেই শোনা যায়। অবশ্য বর্তমানে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিই

লোকসঙ্গীত রচনা করে চলেছেন। অর্থাৎ লোকসঙ্গীত শিক্ষিত সমাজের মধ্যে প্রবেশ করেছে। ফলে তার গঠন প্রণালীর পরিবর্তন দেখা দিয়েছে, সুরের কাঠামোতেও কিঞ্চিৎ আধুনিক সুরের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। তা হলেও ব্যক্তি লোকসমাজেরই লোক হয়ে এক্ষেত্রে উপস্থিত। এর আভাস অনেক গানের মধ্যেই লক্ষ্য করা যায়। গানের ভাষা বা কথা ও সুর শুনলে বোঝা যায় যে, লোকসঙ্গীত তার স্বকীয়তা হারায়নি, রূপ কিছুটা পরিবর্তিত হয়েছে মাত্র। আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে, লোকসঙ্গীত কখনো, এক জায়গায় পড়ে থাকে না। তার গতি পরিবর্তন হতেই পারে। এজন্যে চীৎকার শুরু করার কোন হেতু আছে বলে মনে হয় না।

লোকসঙ্গীত বিভাকর গ্রন্থটির সূচনা থেকে প্রকাশনা পর্য্যন্ত সমস্ত কাজে আমি অনেক গুণীজনের সাহায্য ও সৎপরামর্শ পেয়েছি। তাঁদের সান্নিধ্যে এসে কিছু শিক্ষালাভও হয়েছে। তখন বুঝিনি জীবনের শেষ বয়সে এসে এ গ্রন্থটি লিখবো। এঁদের মধ্যে পরিচিত, অপরিচিত অনেক মানুষজনের কথা আজ মনে পড়ছে। আজ বাইশ বছর পরে এঁদের সকলের নামও ঠিক স্মরণ করতে পারছি না। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ হয়ত জীবিত আছেন, আর অনেকেই স্বর্গত হয়েছেন। তাঁদের সকলের উদ্দেশ্যে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা, প্রণাম, প্রীতি ও ভালোবাসা জানালাম।

তবুও কয়েকজনের নাম উল্লেখ করতেই হয়. তাঁরা হলেন স্বর্গত সুধীর সরকার, নরনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, পরেশ দেব ও নির্মলেন্দু চৌধুরী মহাশয়। এঁদের কাছ থেকে অনেক লোকসঙ্গীত সংগ্রহ করেছি বিভিন্ন লোকসঙ্গীত নিয়ে আলোচনা করেছি, সংগ্রহের কাজে এঁরা স্বেচ্ছায় আমাকে অনেক সাহায্য করেছেন। তাঁদের কাছে আমি আন্তরিক ভাবে কৃতজ্ঞ।

এই গ্রন্থ আমার প্রকাশ করা হতো না যদি শ্রদ্ধেয় ও বন্ধুস্থানীয় সুধীবর্গের প্রেরণা না পেতাম। এঁরা হলেন ডঃ অনিমেষ কান্তি পাল, ডঃ মৃগাঙ্ক শেখর চক্রবর্তী, ডঃ রবীন্দ্রনাথ গুপ্ত, শ্রী বুদ্ধদেব রায়, শ্রী বিষ্ণুপদ দাস প্রমুখ। নানাবিধ ব্যস্ততার মধ্যে থেকেও এঁরা সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছেন ও পরামর্শ দিয়েছেন। অনেক বন্ধুবর আছেন যাঁরা গানগুলি শুনিয়েছেন, ক্যাসেটে ভরে পাঠিয়েছেন। এঁদের সকলের কাছেই আমি কৃতজ্ঞ। স্নেহভাজন শ্রী বাবলু নাথের সহযোগিতার জন্য তার কাছেও কৃতজ্ঞ। বিভিন্ন জেলার কয়েকজন লোকসঙ্গীত গবেষকেরও সহযোগিতা পেয়েছি, তাঁদের কাছেও আমি ঋণী। তাঁরা হলেন শ্রী পুলকেন্দু সিংহ, শ্রী মোহিত রায় প্রমুখ।

এই জাতীয় গ্রন্থ রচনা আমার প্রথম। নিজে লোকসঙ্গীত চর্চা করি, শেখাই, আকাশবাণী ও দূরদর্শনের গ্রেডেড শিল্পী হিসাবে নিয়মিত লোকসঙ্গীত পরিবেশন করে আসছি দীর্ঘ তিরিশ বছর।

আমার সাধনা শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের। আজ-ও তারই সাধনায় মগ্ন আছি। তবুও কোন

এক সময় লোকসঙ্গীতের স্বাদ, রূপ, রস, গন্ধ কখন যে, আমার মনকে উদ্বেলিত করে শরীরের ধমনীতে মিশে গেছে, তা জানতেও পারিনি। এখন তাই না পারি শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের রেওয়াজ ছাড়তে, না পারি লোকসঙ্গীতকে ত্যাগ করতে। ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত যেন সমভাবে শাস্ত্রীয়সঙ্গীত ও লোকসঙ্গীতের চর্চায় অতিবাহিত হয়। বয়সের ভারে এখন দৃষ্টিভঙ্গী পাল্টাচ্ছে তবু পুরাতনকে আঁকড়ে ধরে রাখার প্রয়াসে আমি বদ্ধপরিকর। সেই পুরাতনকেই এ গ্রন্থে স্থান দিয়েছি সযতনে। ভুল ভ্রান্তি হতেই পারে, পাঠকবর্গ সেদিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করালে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ থাকবো। আর যদি কারো কারো এই বই ভালো লাগে, তবে নিজেকে ধন্য মনে করবো।

বঙ্গীয় সঙ্গীত পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক হিসাবে দীর্ঘ বাইশ বছর ধরে সঙ্গীতের প্রচার ও প্রসারের কাজে নিজেকে যুক্ত রেখেছি। এজন্য পশ্চিমবঙ্গের সব জেলাতেই আমার প্রবেশ ও অবস্থান ঘটেছে। এই অবস্থানকালে সেইসব জেলার বহু লোকসঙ্গীত শুনেছি, সেখানকার লোকসঙ্গীত শিল্পীদের সঙ্গে পরিচয় ঘটেছে, সামান্য কিছু লোকসঙ্গীত তাঁদের কাছ থেকে সংগ্রহ করেও আমার ডালি ভরেছি, এবং তা শুধু আকাশবাণী ও দূরদর্শনে গাইবার উপযোগী লোকসঙ্গীত সম্পদ হিসাবেই আহরণ করেছি মাত্র। তখন কিন্তু আমার ঐ সংগ্রহের দিকে অতটা ঝোঁক বা আগ্রহ ছিল না বা দিতে পারিনি। সংস্থার প্রচার প্রসারই তখন মুখ্য ছিল আর সংগ্রহটা ছিল গৌণ। তখন বুঝিনি যে ভবিষ্যতে এর প্রয়োজনটা আমার কাছে অনেক বেশী করে দেখা দেবে। এখন এই গ্রন্থ রচনার সময় সেই সংগ্রহের প্রয়োজন ও গুরুত্বটা বেশ অনুভব করতে পারছি। তবে প্রতিটি লোকসঙ্গীতের উৎসস্থলগুলি এর মধ্যেই আমার চেনা হয়ে গিয়েছিল। তাই এখন সেইসব জেলায় জেলায় গিয়ে বা লোক পাঠিয়ে আবার নতুন করে লোকসঙ্গীত ও লৌকসাহিত্য, সংস্কৃতির ধারার উৎস সন্ধান ও সংগ্রহের কাজে নেমে পড়েছি। এই সংগ্রহের কাজ করতে নেমে, সংগ্রহ হয়েছে প্রচুর, তার সবটা একটি খণ্ডে প্রকাশ করা সম্ভব হবে না। তাই পরিকল্পনা নিয়েছি অন্ততঃ চারটি খণ্ডে প্রকাশ করার। জানিনা আদৌ তা সম্ভব হবে কিনা। পরিষদের প্রতিটি জেলার সদস্য এই সংগ্রহের কাজে অনেক সাহায্য করেছেন। তাদের নামের তালিকা এ গ্রন্থের শেষে দিলাম। কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে।

শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, সারা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে আমার যাতায়াত। সেই একই কারণে - পরিষদের পরিকল্পনা অনুযায়ী সঙ্গীতের প্রসারের কাজে ব্রতী হয়ে। ত্রিপুরা, আসাম, মেঘালয়, বিহার, ওড়িষ্যা, উত্তর প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, অরুণাচলপ্রদেশ, নাগাল্যাণ্ড, আন্দামান পর্য্যন্ত পরিক্রমা করেছি। ঐ সব অঞ্চলের বেশ কিছু লোকসঙ্গীত সংগ্রহ করে ক্যাসেটে ধরে নিয়ে এসেছি। বর্তমানে এই সংগ্রহ কাজটা নেশার মতো পেয়ে বসেছে। সত্যিই আজও বুঝিনি এর আসল মর্ম। হাওড়া জেলার মাজু অঞ্চলের সন্তোষবাটী গ্রামে আমার জন্ম। বাল্য, কৈশোর, যৌবন কেটেছে ঐ গ্রামেই। নানান জাতের লোকই ঐ অঞ্চলে বসবাস করত। তাই তাদের

সঙ্গী হিসাবে পেয়েছি কখনো পাঠশালায়, পড়ার স্কুলে বা কলেজের ক্লাস রুমে। কোথাও বা খেলার মাঠে বা নদীর ঘাটে স্নান করার ও সঁতার কাটার সময়। কখনো বা পেয়েছি চড়ুই ভাতির দলে। স্বাভাবিক কারণেই সব জাতের মানুষ জনের সঙ্গেই মেলা মেশা, তাদের আচার ব্যবহারের সঙ্গে পরিচয় ঘটেই গেছে। আর সঙ্গীতের আকর্ষণ বংশ ধারাতেই প্রবাহিত হয়েছে। গ্রামের যাত্রা, মেলা, কবিগান, তরজাগান, কৃষ্ণযাত্রা ইত্যাদির আসরে সব সময়েই উপস্থিত হয়েছি। এ নিয়ে বাবা-মার কোনো অভিযোগ ছিল না। এক কথায় স্বাধীনতা ছিল অবাধ। তবে লেখা পড়া নষ্ট করে ঐসব গান বাজনার আসরে উপস্থিত থাকার ব্যাপারেই তাঁদের ঘোরতর আপত্তি। ঠাকুমা, পিসিমার সঙ্গে পাঁচালী ও রামায়ণ গান শুনতে গেছি গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। ঘেঁটুর দল নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় বাড়ি বাড়ি ঘুরেছি। কৃষ্ণ যাত্রার দলে দোহার গিরিও করেছি। তাই লোকসুরের সঙ্গে সেই ছোটবেলা থেকেই আমার নিবিড় সম্পর্ক, যা আজো রয়ে গেছে। যদিও নিয়মিত এখন আর গ্রামে যেতে পারিনা, তবু সপ্তাহে একদিন করে কাটিয়ে আসতেই হয় গ্রামে জন্মস্থানের টানে, বংশ মর্যাদার জের টেনে। গ্রাম আমায় টানে, গ্রাম্য সঙ্গীত আমাকে আজো প্রেরণা দেয়। অবচেতন মনে কখন যে তাকে ভালোবেসেছি, তা বলতে পারবো না। যেমন বলতে পারবো না মাকে ভালোবাসতে শিখেছি কোন দিনটি থেকে।

যাই হোক, আবার ফিরে আসি গ্রন্থের কথায়। গ্রন্থটির ১ম খণ্ডে বাঙালী সমাজ নিয়ে আলোচনা শুরু করে মেয়েলী ব্রত, ছড়া, কর্ম্মসঙ্গীত, মঙ্গল গান, বিয়ের গান, আগমনী প্রভৃতি থেকে পালাগানে (গীতিকা) শেষ করেছি। আমাদের সমাজে মেয়েরা এখনো সবচেয়ে বেশি নির্যাতিত। তবু তারাই লোক সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি সৃজনশীল। এই কাজ করতে গিয়ে অনেক গ্রন্থের সাহায্য নিতে হয়েছে, আলোচনার অংশ, প্রসঙ্গ ইত্যাদির জন্য। ঐসব গ্রন্থের লোকসঙ্গীতগুলি প্রত্যাখ্যান করেছি, কারণ যে লোকসঙ্গীতগুলি শুনিনি বা সুরের ছক আমার জানা নেই, তা আহরণ করিনি। শুধু আহরণ করেছি, যে সঙ্গীতগুলি শুনেছি বা কণ্ঠে পরিবেশন করেছি বা করতে পারি। সেগুলিকেই গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেছি মাত্র। আজও পথ চলার অন্ত নেই। বুঝেছি লোকসঙ্গীতের ক্ষেত্র হল বিশাল লোকসমাজ। সমুদ্রের তরঙ্গের মতন লোক সঙ্গীতের ভাব তরঙ্গ ওঠে, সেটাই তার ঘরানা। আর লোকসমাজই হ'ল লোকসঙ্গীতের গুরু।

নগর কিংবা যান্ত্রিক সভ্যতা ও শিল্প বিজ্ঞানের অগ্রগতি, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি গ্রামীণ লোক জীবনকে কিছুটা নগর কেন্দ্রিক করে তুলেছে আজ। তাই সেই গ্রাম বাংলা আজ আর খুঁজে পাওয়া শক্ত। গ্রাম বাংলার বিরাট ঐতিহ্যবাহী লোকসঙ্গীত তথা লোকসংস্কৃতি আজ ধীরে ধীরে অবলুপ্তির পথ ধরেছে।

সমাজ বিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতেই গ্রাম্য সঙ্গীত ও সংস্কৃতির এই বর্তমান চেহারা, তা নিঃসন্দেহেই বলা চলে।

এই সীমাহীন লোকসঙ্গীতের যাতে লোপ না হয়, তার শুদ্ধতা, অকৃত্রিমতা যাতে রক্ষা করা যায় সেইজন্যেই এই সামান্য প্রয়াস। ঐ কারণেই আমার এ গ্রন্থ লেখা বা লোকসঙ্গীতের সুর সম্পদ ক্যাসেটে ধরে রাখার প্রচেষ্টা। বাংলার লোকসঙ্গীত শুধু বাংলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, তার ব্যাপ্তি এখন সারা ভারতে এবং বিশ্বের দরবারেও তার ডাক পড়ে। আমার বইটি পড়ে ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় একটি মুখবন্ধ রচনা করে দিয়েছেন। তাতে আমি বিশেষভাবে উৎসাহিত হয়েছি। এখানে তাঁকে আমার কৃতজ্ঞতা ও সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই।

পরিশেষে ফার্মা কে-এল-এম-র স্বত্ত্বাধিকারী শ্রীরথীন মুখোপাধ্যায়কে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই এই গ্রন্থটির প্রকাশনার দায়িত্বভার গ্রহণ করার জন্য। এছাড়া গ্রন্থটির প্রকাশনায় যাঁরা আমাকে উৎসাহ ও প্রেরণা দিয়েছেন তাঁরা হলেন আমার সহধর্মিনী শ্রীমতি মীরা গঙ্গোপাধ্যায়, পরিষদের কর্মীবৃন্দ ও অনেক সহৃদয় বন্ধু। তাঁদের সকলকে আমার অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

২৮শে জানুয়ারী, ১৯৯৮
২/১/১/১, পঞ্চাননতলা রোড
হাওড়া - ৭১১ ১০১

ইতি

বিনীত

সুবোধ গঙ্গোপাধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

বাঙ্গালীর সমাজ প্রকৃতি

লোক সঙ্গীতকে বলা যায় বাঙ্গলার সমাজ জীবনের দর্পণ। এতে প্রতিফলিত হয় প্রাচীন থেকে প্রাচীনতর সমাজের সুস্পষ্ট প্রতিবিম্ব, কারণ এ সঙ্গীত তুলে ধরে লৌকিক জীবনচর্যা, সামাজিক দর্শন, সাংস্কৃতিক সম্ভার আর ধর্মীয় আচরণের ডালি। একই সাথে প্রতীত হয় বিশ্বমানবসত্বার এক অপূর্ব আনন্দময় জীবনের চরম উপলব্ধি। সঙ্গীত স্বভাবতই জীবন কেন্দ্রিক কারণ মানব জীবনের সুখ দুঃখ, লাভ অলাভ, জয় পরাজয়ের আনন্দ ও গ্লানি অত্যন্ত সার্থক রূপে তুলে ধরে গ্রাম গঞ্জের মানুষের এই অনবদ্য নান্দনিক সৃষ্টি। যাদের লৌকিক জীবন থেকে সঙ্গীত সৃষ্টি হয়েছে তাদের জীবনকেই আবার ধরে রেখেছে সেই সঙ্গীত। কোন বহিরাগত বীজ বপনের সূত্রে এ সঙ্গীত জন্মলাভ কবে নি, মাটির উর্বরা শক্তিতেই এর স্বাভাবিক উৎস। হয়ত প্রাচীনকালে এঁকে সঙ্গীত বলা হত না. বলা হত ভাটের বর্ণন, বন্দির বন্দন, চারণের গ্রন্থন বা কথকের কথন। তারই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মাটির হতাশা, শ্রমিকের উদ্যম, কৃষকের আনন্দ, পূজকের পাঁচালি, বিরহীব বিষাদ আব দরিদ্রের প্রার্থনা। স্তরে স্তরে সমাজ যত বিন্যস্ত হয়েছে তত পরিব্যাপ্ত হয়েছে গ্রামীণ সঙ্গীতের কলেবর। রূপ থেকে রূপান্তর. ভাব থেকে ভাবান্তর, ভাষা থেকে ভাষান্তরও সৃষ্টি হয়েছে। সৃষ্টি হয়েছে একটি বাঙ্ময় মাধুর্যের অনন্ত সম্ভার. তারই জোয়ার আজও চলছে, চলবেও অনন্তকাল। তাই এই সঙ্গীতের ধারা অনুশীলন করতে গেলে প্রথমেই জেনে নেওয়া দরকার বাঙ্গালী কারা. বাঙ্গলার সমাজ কি এবং তার দর্শনই বা কি?

বাঙ্গলার প্রাচীনতম অধিবাসী কারা? এর উত্তরে বেশীর ভাগ নৃতত্ত্ববিদের মত হল এরা সম্ভবত ছিলেন 'অষ্ট্রিক' গোষ্ঠীর অস্ট্রো-এশিয়াটিক জাতির মানুষ; এরা ব্রহ্মদেশ, শ্যামদেশের মোন এবং কম্বোজের খ্মের শাখার মানুষদেরই বংশধর। আদি পর্যায়ে এঁদের বলা হ'ত 'নিষাদ' অথবা 'নাগ'; পরবর্তীকালে এঁরাই হলেন 'কোল্ল'. 'ভিল্ল' ইত্যাদি। এদের ভাষাও ছিল অষ্ট্রিক গোষ্ঠীর মোন ও খ্মের শাখার ভাষাব মতোই, যাব প্রভাব এখনও দেখা যায় কোল, মুণ্ডা, সাঁওতাল প্রভৃতি আদিবাসীদেব ভাষায়। আবার দক্ষিন ভাবতের দ্রাবিড় গোষ্ঠীর বিভিন্ন শাখার কিছু লোকও এলেন এই বাঙ্গলায়. যাদের অস্তিত্ব পাওয়া যায় 'ওরাওঁ' গোষ্ঠীতে। তা ছাড়া বিভিন্ন সময় এসেছিলেন 'মঙ্গোলীয়' বা 'ভোট-চীনা' গোষ্ঠীর - নানা জাতি - উপজাতি যেমন 'গারো'. 'বোড়ো'. 'কোচ'. 'মেচ', 'কাছারি', 'টিপ্‌রাই' 'চাক্‌মা' ইত্যাদি। এঁদেরই বলা হত 'কিরাত জাতি। তাই. প্রথম অবস্থায় এ দেশটি ছিল নানা জাতি উপজাতির বাসভূমি।

তাম্রলিপ্ত বা তমলুক ঐতিহাসিক যুগেব পূর্ব থেকেই একটি শ্রেষ্ঠ সাগর তীর্থ বা বন্দর বলে প্রাচ্য দেশের সর্বত্র পরিচিত ছিল। সব বিদেশী জাহাজ এসে এখানেই ভিড়ত। আবার এখান থেকেই সব জাহাজ ছাড়ত। বালী-লম্বক, সুমাত্রা. জাভা প্রভৃতি দ্বীপ এবং ব্রহ্ম, শ্যাম, কোচীন, আন্নাম, কম্বোডিয়া প্রভৃতি স্থান থেকে বহু মানুষ এদেশে এসে বসতি করেছেন। আবার বহু ভারতবাসী ঐসব দেশেও উপনিবেশ স্থাপন করেছেন। তাম্রলিপ্তই ছিল

এই যাতায়াতের দ্বার স্বরূপ। যারাই প্রাচ্য দেশ থেকে ব্যবসা বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে অথবা বিদ্যা বা ধর্ম ও সংস্কৃতি শিক্ষার উদ্দেশ্যে ভারতে আসতেন তাঁরা আবশ্যকীয় ভাবেই কিছুদিন বাংলায় অবস্থান করতেন। আর এই তাম্রলিপ্তের কল্যাণে বৌদ্ধ যুগে সকল সভ্য দেশের জ্ঞান, বিদ্যা, সভ্যতা, মানবতা ইত্যাদি সর্বাগ্রে এই বাংলায় এসে সঞ্চিত হ'ত। এজন্যই পরবর্তী কালেও বাঙ্গালীর একটা বিশিষ্টতা সৃষ্টি হয়েছে, তা এখনও আছে সূক্ষ্মভাবে আমাদের প্রকৃতির মধ্যেই।

প্রথমদিককার বাঙ্গলায় ছিল জাতির মিশ্রণ আবার তার সঙ্গে ছিল বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব। ফলত জাতি বিচার, বর্ণ বিচার তেমন প্রচলিত ছিল না। এদেশে বৌদ্ধপন্থা অবলম্বন করে জাতি ও বর্ণের একাকার সাধন করা হয়েছিল। বাঙ্গলার "বশিষ্ঠ পদ্ধতি" অনুসারে 'পীত মঙ্গোল' জাতির সঙ্গে বাঙ্গলার আদিম দ্রাবিড় জাতির এবং মুষ্টিমেয় আর্য জাতির বৈবাহিক আদান প্রদান শুরু হয়। কারো কারো মতে বশিষ্ঠ নিজে ছিলেন একজন তান্ত্রিক সাধক আবার বজ্রযানী বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের একজন নেতা। তাঁরই ব্যবস্থায় যে কোন ভারতবাসী স্বচ্ছন্দে চীনা, ভূটিয়া, অহম প্রভৃতি জাতির যুবতীকে শক্তিরূপে গ্রহণ করতে পারত এবং শৈব বিবাহও চলতো। এই পদ্ধতি ইংরাজ আমলের পূর্বে প্রায় দেড় হাজার বৎসর প্রচলিত ছিল। এই সব মগ, আরাকানী, মণিপুরী, অহম, ভূটিয়া জাতির স্ত্রীবর্গের পুত্রকন্যা হ'লে তাদেরও সমপদ্ধতিতে বিবাহাদি হ'ত। তাই বাঙ্গলা দেশে নানাবিধ রক্তের মেলা মেশা হয়েছিল। তখনকার বাঙ্গলার পণ্ডিতবর্গও তিব্বত, ভুটান, চীন ইত্যাদি দেশের রমণীকে বিবাহ করতেন। মহারাজ নন্দকুমার বিবাহ করেছিলেন এক পাঠান রমণীকে। তবে নারীদের স্থান ছিল বড়ই নীচে। আর এই বিবাহ সম্বন্ধও ছিল খুবই ভঙ্গুর। বজ্রযানী সম্প্রদায়ের কল্যাণে বিবাহ বন্ধন কিছুটা সুদৃঢ় হ'ল। তাই মহিলাগণ প্রচ্ছন্নভাবে বৌদ্ধ পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন, তাঁদের ব্রত, নিয়ম, পূজা, পাঠ, উৎসব আনন্দ, সংস্কার ইত্যাদিতে। এই বৌদ্ধ প্রভাবের জন্যই বাঙ্গলায় সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে জাতি সমন্বয় ঘটেছিল। যেহেতু বাঙ্গলার সমাজে মিশ্রজাতির উদ্ভব হয়েছিল এবং সেই জাতিগুলির মধ্যে কোন বৈদিক আচরণই ছিল না, ছিল না কোন বিশেষ ধর্মনিষ্ঠা, সেহেতু আদিশূর বাঙ্গলার সমাজকে নূতন রূপ দেওয়ার জন্য কনৌজ থেকে কিছু ব্রাহ্মণ আনয়ন করে বাঙ্গলায় বসতি করালেন অর্থাৎ বৈদিক সংস্কারের কিছু প্রভাব এসে বিশেষভাবে যুক্ত হ'ল।

'বাঙ্গালী' নামটি বর্তমানে বঙ্গদেশবাসীকেই বুঝায়। কিন্তু এর প্রয়োগ মোগল আমলের পূর্বে কোনো কাগজ পত্র বা পুঁথিতে তেমন স্পষ্টভাবে পাওয়া যায় নি। বৌদ্ধ সহজমতের তিনটি পন্থা আছে। এগুলির নাম হ'ল-, 'অবধূতী', 'চণ্ডালী' এবং 'ডোমবী' বা 'বাঙ্গালী'। এই 'বাঙ্গালী' শব্দটি কোথাও 'বঙ্গালী' বলেও উক্ত। চর্যাপদে ভুসুক পাদের একটি পদে আছে —

"আজি ভুসুকু বঙ্গালী ভইলী।
নিঅ ঘরিনী চণ্ডালী লেলী।"

তখন যারাই 'ডোম্বী' বা 'বঙ্গালী' পন্থায় ভজন করতেন তাদেরই বলা হ'ত 'বঙ্গালী' বা বাঙ্গালী'। এ নামটি ছিল সাধক সম্প্রদায়ের তাই ভারতের যে কোন প্রদেশের যে কোন অধিবাসীই তখন 'বঙ্গালী' বা 'বাঙ্গালী' নাম গ্রহণ করতে পারতেন। অবশ্য সে সময় বৌদ্ধ সহজমত সবচেয়ে বেশী প্রচলিত ছিল, এই বাঙ্গলায়। স্বভাবতই 'বাঙ্গলার' অধিবাসীগণ

'বাঙ্গালী' বলে পরিচিত হলেন। কেবল সিদ্ধাচার্যগণের প্রচার এবং শিক্ষা প্রভাবে বাঙ্গলা একটি দেশ বিশেষ এবং 'বাঙ্গালী' একটি জাতি বিশেষ বলে পরিচিত হয়েছে। অবশ্য এই সিদ্ধাচার্যগণের প্রভাবেই আবার বাঙ্গলার জনগণের, ভারতের অন্য সকল প্রদেশের লোকেদের তুলনায় স্বতন্ত্রতা এবং বিশিষ্টতা ফুটে উঠেছে। আদিশূর ব্রাহ্মণ এনেছিলেন এবং কিছুটা বৈদিক আচার-আচরণের প্রভাব সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু তা সমাজের সর্বস্তর পর্যন্ত যথারীতি পৌছুতে পারে নি। বাঙ্গলায় মহিলাদের ব্রত পার্বণ বিশ্লেষণ করলে এর সত্যতা আজও বোঝা যায়। এই সব ব্রত পার্বণের অনেকগুলিই বৈদিক বা মূল তান্ত্রিকী ক্রিয়া নয়। এগুলি হয় বৌদ্ধ নয় জৈন ব্রত। তাল নবমী, দুর্বাষ্টমী, অনন্ত চতুর্দশী, ঘৃত সংক্রান্তি ইত্যাদি ব্রতগুলি বৈদিক যুগের ব্রত নয়। তখনকার চণ্ডী উপাসক মাত্রই 'বজ্রযানী' ছিলেন। চণ্ডীর ঘট স্থাপনে কোন ব্রাহ্মণের প্রয়োজন ছিল না। মহিলাগণই ঘট স্থাপন করে মঙ্গলচণ্ডী, জয়চণ্ডী, ওলাইচণ্ডী ইত্যাদি পূজা ও ব্রতকথা পাঠ করেন। বৌদ্ধ ধর্মের প্রবল প্রভাব থাকার দরুণই বাঙ্গলার লোকাচার, দেশাচার, লোক সংস্কৃতি ইত্যাদি পৃথক রূপ নিয়েছে।

বাঙ্গালী সমাজ ঃ

সমাজ বলতে আমরা বুঝি একটি সুবৃহৎ জনসমষ্টি যা পরিবার ভিত্তিক একসূত্রে কর্মের জন্য পরস্পরের কাছে দায়ী এবং পরস্পরের সহাবস্থান ও সহায়তার মাধ্যমে একটি সামগ্রিক ঐক্য রক্ষা করে সমষ্টির সকলের সুনির্দিষ্ট কল্যাণ সাধন করে। এ বিষয়ে বিভিন্ন সমাজতাত্ত্বিকের মত বিভিন্ন, তবে গিডিংস-এর মতে - "Society is the union itself, the organisation, the sum of formal relations in which associating individuals are bound together." অর্থাৎ সমাজ হ'ল একটি সুবিশাল সংগঠন। A. W. Green এর ভাষায় "A society is the largest group to which any individual belongs." বৃহত্তম সংগঠন হলেও 'সমাজ' চোখে দেখা যায় না। কেবল সমাজের ক্রিয়া কর্মগুলি দেখে সমাজকে চিনে নিতে হয়। ব্যক্তি সমন্বয় হলেও সমাজ হ'ল একটি নৈর্ব্যক্তিক বিষয়। ল্যাপিয়ারের উক্তি এ বিষয়ে অনুধাবনযোগ্য। তিনি বলেছেন - "Society does not refer to group of people but only to the complex pattern of norms of interaction arising among them." সুতরাং নির্দিষ্ট কতগুলি প্রথা এবং সামাজিক জীব সমূহের পারস্পরিক সামঞ্জস্যমূলক ক্রিয়াকলাপই সমাজকে চিহ্নিত করে। নির্দিষ্ট কতিপয় প্রথা, রীতিনীতি, আচার, গ্রহণ ও বর্জনের দৃষ্টিভঙ্গী, খাদ্য, পোষাক, সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকর্ম ইত্যাদির সূত্রে সমাজের ব্যক্তিবর্গ বংশ পরম্পরায় একটি সুদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ হয়। এ প্রসঙ্গে প্রসিদ্ধ সমাজ বিজ্ঞানী ম্যাকআইভারের উক্তি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন - "Society is the system of usages and procedures, of authority and mutual aid, of many groupings and divisions and of controls of human behaviours and liberties." অর্থাৎ নির্দিষ্ট কতগুলি প্রথা এবং জীবনচর্যার ভঙ্গী দিয়েই একটি সমাজকে চেনা যায়। আবার প্রথাগত পার্থক্য বিচার করেই বিভিন্ন সমাজের পার্থক্য বুঝা যায়।

বাঙ্গালী সমাজের ক্ষেত্রেও একই ধারণা প্রয়োজ্য। মৌলিক বিচারে বাঙ্গালার যে সমাজ গড়ে উঠেছিল তা ছিল মিশ্র সমাজ। কারণ, এই বাসভূমি এককালে সকলকে সমভাবে আহ্বান করেছে শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিনিময়ের জন্য এবং ব্যবসাদি করার জন্য। সকলের মধ্যে

পারস্পরিক সমন্বয় হ'তে সময় লেগেছে। এই সমন্বয়ের ফলে প্রথাগত মিশ্রণ এবং আচরণের সংমিশ্রণ ঘটেছে। ব্যক্তিগত আচরণ সমাজে প্রতিফলিত হয়ে সামাজিক আচরণে পর্যবসিত হয়ে সামাজিক আচার নামে পরিচিত হয়েছে। তাই বাঙ্গালী সমাজের একটি স্বাতন্ত্র্য এবং বিশিষ্টতা ফুটে উঠেছে। আহারে বিহারে এই স্বাতন্ত্র্য খুবই সুস্পষ্ট। তাছাড়া বৈদিক আচরণ বা উপসনাদি ক্ষেত্রেও প্রায় এক হাজার বছর আগে থেকেই ভারতের অন্যান্য সমাজের থেকে বাঙ্গালী একটু পৃথক সত্ত্বা গ্রহণ করেছে। যেমন, বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড বা যজ্ঞাদি বিষয়ে বাঙ্গালী আর্য পদ্ধতিকারকে গ্রাহ্য না করে কেবলমাত্র আচার্য ভবদেবের পদ্ধতি পালন করে। জীমূতবাহনের দায়ভাগ বাঙ্গালার হিন্দুয়ানীকে অনেকটা দেশগত ও জাতিগত রূপ দিয়েছে। বাঙ্গালার তন্ত্রশাস্ত্র পৃথক বৈশিষ্ট্য নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে। 'যত্র জীব, তত্র শিব' - এ সত্যবাক্য প্রথম বাঙ্গালাতেই ধ্বনিত হয়। "ব্রহ্মাণ্ডে যে গুণাঃ সন্তি তে তিষ্ঠন্তি কলেবরে" - তাই দেহভাণ্ডকে বুঝতে পারলে ব্রহ্মাণ্ডকে বুঝা যায়। দেহতত্ত্বের এমন মহাবাক্য বাঙ্গালার তন্ত্রসারেরই উক্তি।

"আত্মস্থাং দেবতাং ত্যক্বেব বহির্দ্দেবং বিচিন্বতে।-
করস্থং কৌস্তভং ত্যক্বেব ভ্রমতে কাচ তৃষ্ণয়া ॥"

এমন সব সিদ্ধান্তই বাঙ্গলার দেহতত্ত্ব চিন্তার উৎকর্ষ বৃদ্ধি করেছে। জীমূতবাহনের দায়ভাগ, রঘুনন্দনের নব্যস্মৃতি, শ্রীচৈতন্য দেবের গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম ইত্যাদির জন্য বাঙ্গালী সমাজের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হয়েছে। এই বৈশিষ্ট্যগুলিকে আরও বিশেষ করে ফুটিয়ে তুলেছেন নূতন রূপ দিয়ে কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ, ব্রহ্মানন্দ গিরি প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ, যারা 'শৈব বিবাহ' পদ্ধতি প্রচলন করে বাঙ্গলার লোক চরিত্রে অনেক কিছু সংযোজন করেছেন। বিক্রমপুরের নাস্তিক ভট্টাচার্যের পুত্র দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান ভুটান, তিব্বতে, চীন প্রভৃতি দেশে বাঙ্গালীর সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য প্রচার করেছিলেন। দেবীবরের মেলবন্ধন এবং কৌলীন্যের নব প্রতিষ্ঠা বাঙ্গালীর ব্যক্তিত্বের একটি বড় পরিচয়। তারই সঙ্গে শিল্পকলায়, গানে, নাচে, চিকিৎসাশাস্ত্রে, চিকিৎসা পদ্ধতিতে, লাঠি খেলায়, ক্ষুরপা - রণপা চালনায়, নৌশিল্পে, কথকতার ব্যাখ্যায়, বয়ন শিল্পে, গজদন্তের কারুকার্যে, স্বর্ণ ও রৌপ্যের অলঙ্কার প্রস্তুতে বাঙ্গলা চিরন্তন অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। তাছাড়া বাঙ্গলার কুসুম শিল্প এতই উল্লেখযোগ্য যে আওরঙ্গজেবের পুত্র যুবরাজ মহম্মদ একবার পিতাকে পত্র লিখে জানিয়েছিলেন—"কি আর মণিমুক্তা, চুনি, পান্নার লোভ দেখাও পিতা; বাঙ্গালার কুসুমাভরণ দিল্লীর জড়োয়া অলঙ্কারসকলকে হেলায় পরাজয় করে। এমনটি তুমি দেখ নাই।"

বৈদিক যুগ থেকে বাঙ্গলায় একটি স্বতন্ত্র সভ্যতা ও মনুষ্য সমাজ বিদ্যমান ছিল। এবং প্রাচ্যের এ সভ্যতা ছিল বৈদিক সভ্যতার প্রতিদ্বন্দ্বী। বহুবার পশ্চিম দেশ থেকে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি জাতিকে বাঙ্গলায় এনেও যাগযজ্ঞাদির তেমন প্রচলন করা সম্ভব হয় নি। বাঙ্গালী আর্যাবর্তের সূত্রে অনেক কিছু সংগ্রহ করলেও সেগুলিকে বাঙ্গলার কোমল পেলব পলি মাটির আবরণ দিয়ে মধুর, স্নিগ্ধ এবং রসাল করে রেখেছে। তাই এদেশে বৈদিক আচারের থেকে লোকাচারের পরিব্যাপ্তিই অনেক বেশী। সমাজ পুরুষ শাসিত হলেও ধর্ম হ'ল প্রধানতঃ নারী জাতির অবলম্বন।

বাঙ্গলায় ব্যবসাগত জাতিবিচার ঃ

যদিও জাতি বিভাজনের মূল সূত্রটি বেদের যুগ থেকেই পাওয়া যায়, এবং সে জাতি

ছিল মূলতঃ বৃত্তিভিত্তিক। জাতি ছিল চারটি - ১। যাজন কর্ম ও পৌরোহিত্যের জন্য ব্রাহ্মণ, ২। যুদ্ধবিদ্যা ও শক্তি প্রয়োগের ক্রিয়াকলাপে নিপুণ হ'ল ক্ষত্রিয় জাতি; ৩। অর্থ নৈতিক ক্রিয়া কলাপ ও ব্যবসায় প্রাজ্ঞ হিসাবে বৈশ্য; এবং ৪। সমস্ত ক্রিয়া কর্মে সহায়ক ও আজ্ঞাবাহী হিসাবে শূদ্র জাতি। কিন্তু বাঙ্গলা দেশের সমাজ ব্যবস্থা খুব বেদানুগ ছিল না, বিষয়টি আগেই আলোচনা হয়েছে, তাই এখানকার জাতি বিভাজন হিন্দু, বৌদ্ধ, ইত্যাদি নানা সম্প্রদায়ের প্রভাবেই গড়ে উঠেছে। বৌদ্ধ যুগের সময় থেকে নব ব্রাহ্মণ্য অভ্যুত্থানের কাল পর্যন্ত প্রায় দেড় হাজার বৎসর বাঙ্গলা দেশে, মগধে, উৎকলে এবং ভারতের আরও কিছু অঞ্চলে বৈদিক চতুর্বর্ণ লোপ পেয়েছিল। যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা পরায়ণ ব্রাহ্মণ ছাড়া বর্ণ ব্রাহ্মণেরা বৌদ্ধ সমাজের অন্তর্ভূক্ত হয়েছিল। তাই রঘুনন্দন বলেছিলেন - "বৌদ্ধ প্রভাবের সময় হইতে ভারতবর্ষের সমাজ দ্বিবর্ণে পরিণত হইয়াছিল। ব্রাহ্মণ ও শূদ্র ছাড়া অন্য বর্ণ নাই এবং থাকিবেও না।" তখনকার বৌদ্ধ মন্দির রক্ষণাবেক্ষণের জন্যও পৌরোহিত্যে থাকতেন ব্রাহ্মণগণ; যেখানে খাঁটি ব্রাহ্মণ পাওয়া যেত সেখানে শ্রমণ নিয়োগ করা হ'ত না। অশোকের সময়েও ব্রাহ্মণের একটা স্বতন্ত্র সত্তা ছিল। অপরদিকে শক, হুন, অহীর, ইরাণী প্রভৃতি রণদুর্মদ জাতি ভারতে এসে ক্ষাত্র শক্তির প্রভাব দেখিয়ে ক্ষত্রিয় পদবাচ্য হন। বৌদ্ধ যুগে তারাই বৌদ্ধ ধর্ম অবলম্বন করে ক্ষাত্র বর্ণের বিশিষ্টতা নষ্ট করে দেন। (History of Brahmanical culture — Radha Kumud Mukherjee.) তাছাড়া, শ্রেষ্ঠী বণিক জাতিরাও পূর্বের থেকেই জৈনপ্রভাবে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল এবং পরে বৌদ্ধ একাকারের কালে তাঁরাও একই শ্রেণীতে পর্যবসিত হয়ে যায় এবং বৈশ্য ও শূদ্র এক বর্ণে পরিণত হয়। বৌদ্ধগণ পুরুষানুক্রমিক ব্যবসা পদ্ধতিতে আস্থাবান ছিলেন। তাই যখন যে সম্প্রদায় যে বৃত্তি অবলম্বন করেছে, সে বৃত্তি সে সম্প্রদায়কে পুরুষানুক্রমে ধরে থাকতে হ'ত। ফলে ক্রমে ক্রমে সমাজের মধ্যে নূতন ধরনের বৃত্তিগত জাতির সৃষ্টি হয়েছে। এই হ'ল বাংলায় 'প্রফেসন্ কাস্ট' সৃষ্টির মূল' - লিখেছেন পণ্ডিত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়। তাছাড়া বাৎসায়নের কামসূত্রের সামাজিক অংশটি ভাল করে বিশ্লেষণ করলে বৃত্তিগত জাতি সৃষ্টির মূল সন্ধান পাওয়া যায়। বৃত্তি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর জাতি পরিবর্তন হ'ত এমন উল্লেখ বহু আছে। তাই বৃত্তিগত জাতি বিচারে 'rigidity of caste' অর্থাৎ জাতি ভেদের অলঙ্ঘ্য গণ্ডী ছিল না এবং বর্তমানেও তা নেই। পুরানো কুলজি, পাৎড়া ইত্যাদি আলোচনা করলে পাওয়া যায় যে গন্ধবণিক, তিলি, তাম্বুলী ইত্যাদি জাতিগুলিতে অনেক জৈন এবং বৌদ্ধ শ্রেষ্ঠীর দল হিন্দু প্রভাবে পরে যুক্ত হয়েছে। কায়স্থদের বাহাত্তর ঘর আছে। সেই পরিচয় বিশ্লেষণ করলেও জানা যায় যে, বৌদ্ধ যুগের অনেক বৃত্তিগত জাতি কায়স্থদলভূক্ত হয়েছে, অনেক শ্রেষ্ঠী এবং বণিকও কায়স্থ আখ্যা লাভ করেছে। 'নবশাখ' শব্দটি থেকেই বুঝা যায় যে বর্তমান বৃত্তিগত জাতি মূলতঃ বৌদ্ধ বুনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত। 'নব শাখ' শব্দের অর্থ হ'ল 'নূতন কাণ্ড' বা জাতি পর্বে অধুনা সংযুক্ত 'নবশাখা'। এই 'অধুনা সংযুক্তি' অর্থই জাতি থেকে জাত্যান্তর এবং এই জাত্যান্তর হয় কেবল বৃত্তিগত পরিবর্তনের সূত্রেই।

প্রথা :

সমাজ বলতে যে নির্দিষ্ট জনসমষ্টিকে বুঝায় তা গড়ে উঠে কতকগুলি মৌলিক প্রয়োজনের ভিত্তিতে। মৌলিক প্রয়োজনগুলির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রয়োজনই হ'ল আত্মরক্ষার প্রয়োজন। এই প্রয়োজনেই হয় মানুষের শক্তির আকর্ষণ ও জ্ঞানের আকর্ষণ। শক্তির আকর্ষণ

থেকে অভাববোধ হয় খাদ্যের, বাসস্থানের এবং শারীরিক বৃত্তির। এর থেকেই বিকাশ লাভ করে আত্মিক চেতনা, পরমাত্মিক অনুভূতি, প্রকৃতিতে আস্থা এবং বিশ্বমানবতার সঙ্গে সহমননতা। অন্যদিকে জ্ঞানের আকর্ষণ থেকে হয় বোধের বিকাশ সেই সঙ্গে মানুষ বোধ করে শিক্ষার অভাব, প্রস্তুতির অভাব। এ জন্য প্রয়োজন হয় পরামর্শ, পুরোহিতের সহায়তা, ভ্রমণ, অভিজ্ঞতা ও প্রকৃত তত্ত্বের সন্ধান। দু'টি মূল প্রয়োজনের অতিরিক্ত আরও কিছু প্রয়োজন বোধ হয়। এর সঙ্গে শ্রেষ্ঠ প্রয়োজনই হ'ল আনন্দের প্রয়োজন তথা শান্তির প্রয়োজন। এই আনন্দানুভূতি বিষয়ী সাপেক্ষ হলেও আনন্দের কতগুলি স্তর আছে। প্রাথমিক পর্যায়ে আনন্দের উপলব্ধি হ'ত দৈহিক সুখ বা ঐন্দ্রেয়িক সুখে। দর্শনের বিস্তৃতি লাভ করার ফলে এ আনন্দের পরিধি ভূমাতীত স্তর পর্যন্ত চলে যায় এবং জাগতিক আনন্দ তখন তুরীয় আনন্দে পর্যবসিত হয়। এই সব প্রয়োজনের জটিলতা জীবনচর্যাকে নিয়ন্ত্রিত করে। শুরু হয় পূজা, পাঠ, ব্রত, পার্বণ, যজন, যাজন ইত্যাদি। তা ছাড়া সকল কর্মবৃত্তিই নির্ধারিত কতগুলি অনুশাসনের অধীন হয়ে যায়। এর থেকেই সৃষ্টি হয় প্রথা, সপ্রথা, প্রথানুগপ্রথা ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণের কতগুলি পদ্ধতি। এই প্রথার ভিত্তিতেই যেমন সমাজ গড়ে ওঠে তেমন আবার এই সব প্রথাই সমাজকে পরিচালিত করে। প্রসঙ্গতঃ সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক আইভারের উক্তিটি অনুধাবন যোগ্য। তিনি বলেছেন—"Society with all the traditions, the institutions, the equipment, provides a great changeful order of social life arising from physical as well as mental needs of the individual."

প্রথাগুলি সৃষ্টি হয় কতগুলি সামাজিক বিষয়ের সূত্র ধরে। এই সূত্রগুলি হ'ল ব্যক্তি, গোষ্ঠী, সম্প্রদায়, সমাজ ও জাতি এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক, নীতিবোধ, জীবনযাত্রা, ধর্ম, সংস্কৃতি, অর্থনীতি এবং রাজনীতি। প্রথা আকস্মিক সূত্রে জন্মলাভ করলেও কিছু কিছু প্রথা সার্বিক বিবেচনায় স্থায়ী হয়ে যায় এবং এমন গুরুত্ব লাভ করে যে সেগুলি পরবর্তীকালে আইনে পরিণত করার প্রয়োজন বোধ করে সমাজের লোকেরা। ইংল্যাণ্ডে কোন লিখিত শাসনতন্ত্র নেই। কেবলমাত্র প্রচলিত প্রথার অনুশাসনেই এমন উন্নত দেশটি চলছে। ইংল্যাণ্ডের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সম্পূর্ণ প্রথা ভিত্তিক, সেখানকার পার্লামেন্টের নিয়মকানুন, প্রধানমন্ত্রী নির্বাচন থেকে শুরু করে ক্রিমিন্যাল প্রসিডিওর পর্যন্ত সবই 'কনভেন্‌শন্‌ রিড্‌ন্‌' অর্থাৎ প্রথা চালিত। পৃথিবীর অনেক দেশেই বিশেষতঃ মিশর, আরব, চীন, ইন্দোনেশিয়া, ফ্রান্স, সুইজারল্যাণ্ড ইত্যাদি দেশগুলিতে দেশের আইন অপেক্ষাও প্রথার উপর বেশী নির্ভর করা হয়। এ ছাড়া সব দেশেই এমন প্রথাগুলিই মানুষের জীবনযাত্রাকে নিয়ন্ত্রিত করে যার ফলে সামাজিক বোধ মানুষের তীব্র হয়।

সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক আইভার বলেছেন "Socially accredited ways of acting are the customs of society." প্রথার জন্ম সম্পর্কে একই ভাবে সুর মিলিয়ে বলেছেন আরেক সমাজ বিজ্ঞানী গিন্স্‌বার্গ—"Custom is not merely a prevailing habit but also a rule or norm of action." প্রথা সম্পর্কে উভয়ের সংজ্ঞা বিচাব করলে বুঝা যায় যে গোষ্ঠীভুক্ত মানুষের জীবন যাত্রার পদ্ধতি অবলম্বন করেই সমাজে প্রথার উৎপত্তি হয়েছে। প্রথাগুলি ভিত্তি করেই সৃষ্টি হয় কতগুলি লোকাচার বা 'ফোকওয়েজ'। সমাজে বা গোষ্ঠীতে বাস করতে অভ্যস্ত লোকেদের মধ্যে কতগুলি বিশেষ ধরণের আচরণ গড়ে ওঠে। এগুলি বিশেষ অনুশাসনের সূত্রে জন্মলাভ করে না, অনেকটা অজ্ঞাতসারেই এগুলি আচরণে সংযুক্ত

হয়। এই আচরণগুলিকেই বলা হয় 'লোকাচার'। এ বিষয়ে অধ্যাপক গিলিনের মন্তব্য - "Folkways are the behaviour patterns of everyday life which generally arise unconsciousiy in a group.।" অনুরূপ সংজ্ঞা দিয়েছেন সমাজ বিজ্ঞানী লুণ্ডবার্গ। তিনি বলেছেন - "Folkways are those uniformities in the behaviour of a group which develop relatively spontaneously and even unconsciously in adapting to common life conditions and which become established through repetation and general recurrences.", আবশ্যিক ভাবে বারবার যে ক্রিয়াগুলি সাধন করতে হয় সেগুলিই ক্রমশঃ আচারে পরিণত হয়। এই আচার একই গোষ্ঠীর সকলের মধ্যে বংশ পরম্পরায় চলতে থাকে। এগুলি হ'ল লৌকিক আচার বা 'লোকাচার'।

কিছু কিছু লোকাচার আছে যেগুলি ব্যক্তিগত ভাবে পালন করা হলেও সেগুলি গোষ্ঠীর প্রয়োজনে বা জাতির মর্যাদা রক্ষার প্রয়োজনে আবশ্যকীয়। এই লোকাচারগুলি সামাজিক বিধি' বা 'মোর', হিসাবে গণ্য করা হয়। এমন 'মোরের' সংজ্ঞা দিয়েছেন অধ্যাপক গিলিন্— "Mores are those customs and group routines which are thought by the members of society to be necessary to the group for its continued existence." এই সব সামাজিক বিধির সূত্রেই সৃষ্টি হয়েছে পূজা অর্চনা, কর্মবিভাগ, শ্রেণীপ্রকরণ, সহাবস্থান, ভ্রাতৃত্ববোধ ইত্যাদি। ম্যাকআইভারও অনুরূপ সংজ্ঞা দিয়ে বলেছেন— "We should not think of mores as something different from the folkways. They are the folkways in their capacity as instrument of control." সুতরাং লোকাচারই বিধি সম্মত হয়ে সামাজিক বিধিতে পর্যবসিত হয়। লোকাচার এবং সামাজিক বিধির সঙ্গে তুলনা করতে গেলে বলতে হয় —প্রথমতঃ, গোষ্ঠীর সামাজিক জীবনের বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয় লোকাচারের মধ্যে। আর সামাজিক বিধিই নির্দিষ্টভাবে গোষ্ঠী জীবনকে পরিচালনা করে। দ্বিতীয়তঃ, লোকাচার পরিবর্তিত হয় সমাজের প্রকৃতি পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে, কিন্তু সামাজিক বিধি নির্দিষ্ট ও স্থির। এর পরিবর্তন হয় না।

লোকাচারগুলি বিভিন্ন গোষ্ঠী বা জাতির সঙ্গে যখন নির্দিষ্ট হয়ে ব্যবহৃত হয় তখন সেগুলি নির্দিষ্ট গোষ্ঠী বা জাতির কূলাচার বলে গণ্য। আবার কিছু কিছু লোকাচার এক অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। সেগুলিকে বলা হয় 'দেশাচার'।

এই 'লোকাচার' ও 'দেশাচারের' কিছু কিছু আছে যেগুলি কেবল স্ত্রীলোক দ্বারা সম্পাদিত হয়। সে গুলিকে বলা হয় 'স্ত্রী আচার'। এই স্ত্রী আচারের আবার বিভিন্নতা আছে। কিছু আচার কুমারীদের জন্য, কিছু সধবাদের জন্য আবার কিছু বিধবাদের জন্য।

এই সব ক্ষেত্রে কতগুলি নির্দিষ্ট 'বিধিনিষেধ' থাকে। এই নিষেধগুলি এতই দৃঢ় যে, এগুলিও বিধির পর্যায়ভূক্ত এবং এই সব ধর্মীয় আচরণের নিষেধাজ্ঞা অবশ্য প্রতিপালনীয় এবং এগুলিকে বলা হয় 'টাবু'। এমন নিষেধাজ্ঞার মধ্যে আছে জুতো পায়ে মন্দিরে প্রবেশ নিষেধ, অশৌচ অবস্থায় ক্ষৌরকর্ম নিষেধ, মহিলাদের পক্ষে নারায়ণ পূজা নিষেধ ইত্যাদি। এমন বহুবিধ শৃঙ্খলার সূত্রেই সমাজ তার নিজের পরিচয় নিয়ে বেঁচে থাকে।

মানুষ গোষ্ঠীবদ্ধ জীব। প্রথমাবস্থায় সে পরিবারিক সংগঠনে আবদ্ধ হয়। পরিবারের একে অপরের মঙ্গল কামনায় ক্রিয়া কর্মাদি করে থাকে। এই পারিবারিক সংগঠন থেকেই প্রথার উদ্ভব হয়। যেমন পিতা-মাতাকে বা বর্ষীয়ানদের সম্মান করতে হয় এটি হল একটি

প্রথা। সম্মান আচরণের মাধ্যমে প্রদর্শন করলে পিতামাতার সন্তুষ্টিজনিত আশীর্বাদ লাভ করা যায়। তাই আচার হিসাবে শুরু হল প্রণাম। পরিবারে ভ্রাতা ও ভগ্নীর মধ্যে পারস্পরিক মঙ্গলাচরণ বিনিময় শুরু হ'ল নানাবিধ আচরণের মাধ্যমে। প্রথমাবস্থায় পরিবারগুলি ছিল 'অরণ্যচারী', তারা স্থানে স্থানে ঘুরে বেড়াত। সুবিশাল প্রান্তরে খাদ্য, বনজফল এবং জল পেলে তাঁরা বসবাস করতে শুরু করত। জমির পরিমাণ অসীম। আত্মরক্ষা ছাড়া অন্য কোন সমস্যা ছিলনা। ক্রমশঃ একই স্থানে আরও পরিবার বাস করতে শুরু করল। শুরু হ'ল গোষ্ঠীভূক্ত জীবনযাত্রা। বিভিন্ন পরিবারের মধ্যে পারস্পরিক আদান প্রদান পদ্ধতি নির্ধারিত হয়ে সেগুলি ক্রমশঃ প্রথায় পর্যবসিত হ'ল। গোষ্ঠীর সুরক্ষার প্রয়োজনে একজন নেতা প্রয়োজন হ'ল। প্রতি গোষ্ঠীতে হয়ে উঠলেন একজন করে 'গোষ্ঠীপতি'। এই গোষ্ঠীপতিই পরে হলেন 'জমিদার' বা 'রাজা'। রাজার বৈশিষ্ট্য রক্ষার তাগিদে সৃষ্টি হ'ল অনেকগুলি 'রাজন্যপ্রথা'। যেমন 'রাজ্যাভিষেক প্রথা', 'প্রজাবরণ প্রথা' 'জমিবিলি প্রথা', 'করদান প্রথা' ইত্যাদি। ভূমি অধিকারের লোভে এক রাজা অপর রাজ্যকে আক্রমণ করে নিজের বল প্রতিষ্ঠা করার জন্য শুরু হল 'যুদ্ধ প্রথা' এর থেকেই আচারের সৃষ্টি হ'ল অস্ত্রশিক্ষা, কূটনীতি শিক্ষা। জমিই হ'ল একমাত্র প্রাকৃতিক সম্পদ। তা কাজে লাগিয়ে প্রয়োজন মিটানো এবং গোষ্ঠী কল্যাণের অভিপ্রায়ে সৃষ্টি হ'ল 'কৃষিপ্রথা'। কর্মের প্রকৃতির বিভিন্নতার সূত্রে সৃষ্টি হ'ল 'কর্ম বন্ধন প্রথা' এবং বংশ পরম্পরায় একই কর্ম সাধনের সূত্রে প্রবর্তিত হল 'কূলাচার'।

পরিবারের সংরক্ষণ ও বিস্তৃতির অভিপ্রায়ে বংশ বৃদ্ধির প্রয়োজনে নর ও নারীর যৌন মিলনের প্রয়োজন হ'ল। এটিকে নিয়ম সূত্রে আবদ্ধ করার জন্য সৃষ্টি হ'ল মেলবন্ধন প্রথা। জন্মসূত্রে পারিবারিক পরিচয় ক্ষেত্রে উর্ধ্বতন পুরুষ যে মুনি তাঁরই নাম অনুসারে শুরু হ'ল 'গোত্র প্রথা'। 'মেল বন্ধনের' সূত্রে অনিয়ম ও বিশৃঙ্খলা থাকায় কিছু সামাজিক অসুবিধা দেখা দিল। তাই প্রবর্তিত হল শৈব বিবাহ প্রথা। গোত্র সূত্রে বিভিন্ন কূল সৃষ্টি হ'ল, কূলের উচ্চ নীচ মর্যাদা রক্ষার প্রয়োজনে সৃষ্টি হ'ল কৌলীন্য প্রথা'। বিবাহ সম্পর্কিত মর্যাদাবৃদ্ধির জন্য সৃষ্টি হ'ল 'পণপ্রথা'। পিতার মৃত্যুর পর সম্পত্তি রক্ষার দায়িত্ব স্বাভাবিক ভাবেই উপযুক্ত পুত্রের হাতে ন্যস্ত হওয়াই উচিত। তাই শুরু হ'ল 'উত্তরাধিকার প্রথা'। ইহ জীবনকে শান্তি ও সুখময় করে তুলে পরলোকের শান্তি নিশ্চিত করতে মানুষ প্রয়োজন বোধ করল ধর্মের। তাই ধর্ম পালনের মধ্যে সৃষ্টি হ'ল 'ধর্মীয় প্রথা।' এভাবে সমগ্র মানব জীবনে সময় থেকে সময়ান্তরে প্রয়োজন বোধে সৃষ্টি হ'ল অসংখ্য প্রথা।

ব্রাহ্মণ তার পুত্রসন্তানকে উপযুক্ত বয়সে বেদানুসারী জীবন যাত্রায় প্রবৃত্ত করতে শুরু করে 'উপনয়ন বিধি'। গোপবালকদের নির্দিষ্ট অষ্টমী তিথিতে গো দোহন ভাণ্ড দিয়ে শুরু হয় 'গোপাষ্টমী বিধি'। কর্মের প্রেরণায় ও সমাজের কল্যাণ কামনায় শুরু হয় 'শিক্ষা বিধি'। আত্মা অবিনশ্বর, মৃত্যুর পরেও তা অন্যত্র বিরাজ করে তাই তার তৃপ্তি ও সংগতির জন্য শুরু হয় 'শ্রাদ্ধ বিধি'। সেই সব পারলৌকিক আত্মাকে তিল ও জল দানের সংকল্পে শুরু হয় 'তর্পণবিধি'। তা' ছাড়া শিশুর জন্মের নির্দিষ্ট সময়ের পর তাঁর 'নামকরণ বিধি', 'অন্নারম্ভ বিধি' ইত্যাদি সকলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এই ভাবে বহু মৌলিক প্রথা ও সামাজিক বিধি প্রচলিত হয়েছে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে। এই প্রথা ও বিধির সূত্র ধরেই সৃষ্টি হয়েছে অসংখ্য আচার। বাঙলার সমাজে যে সব লক্ষণীয় আচার খুবই সুস্পষ্ট সেগুলি নিয়েই আমার মূল আলোচনা।

বাঙ্গালার আচারগুলি সৃষ্টি হয়েছে পরস্পর সামাজিক মেলামেশার ও সামাজিক বিধি পালনের সূত্রে। সৃষ্টি হয়েছে কতগুলি সাধারণ আচার। যে ক্ষেত্রে নারী পুরুষের প্রভেদ নেই, ছোট বড় প্রভেদ নেই সকলেই এই আচার স্বাভাবিকভাবে পালন করে থাকেন। আবার কিছু আছে শুধু পুরুষের কৃত্য আরও কিছু আছে শুধু নারীর করণীয়। এ আচার পালন না করলে কোন শাস্তি হয় না, কিন্তু অনাচারী বা দুরাচারী অন্তর্দহন থেকে কখনও মুক্তি পায় না। বঙ্গ বাসীর অনন্ত নিষ্ঠা হ'ল আচারে তাই কানাডায় গিয়েও বাঙ্গালী গঙ্গাজলের সন্ধান করে আর লণ্ডনে গিয়েও খোঁজে তুলসী পাতা।

ভারতবর্ষের এককালের সমস্যাই ছিল সকল প্রদেশের হিন্দুদের এক সাম্যের ভাবে সঙ্ঘবদ্ধ রাখা। এ জন্য একদিকে যেমন ধর্মীয় উৎসবে, মেলায়, তীর্থক্ষেত্র পর্যটনের মাধ্যমে সাধুগণ সাম্যের ভাব ছড়িয়ে দিতেন তেমন গৃহস্থগণ আচার, বিচার ও সাধনার প্রভাবে এই ভাবকে প্রগাঢ়তর করতে চেষ্টা করতেন। আচরণকে প্রধানত তিনটি শ্রেণীতে পূর্বেই ভাগ করে নিয়েছি। এ'গুলি হ'ল দেশাচার, লোকাচার, এবং স্ত্রী আচার বা গার্হস্থ্য আচার। এই আচারের এক অংশ হ'ল স্বাস্থ্যরক্ষার বিধি নিষেধ; যেমন — দন্তধাবন, তৈলমর্দন, প্রাতঃ স্নান, পুষ্পচয়ন, পূজা, একাদশীর উপবাস, মহিলাদের কেশ বিন্যাস, পুরুষের শ্মশ্রু কর্তন ইত্যাদি। এই আচারগত সাম্য ভারতের সকল প্রদেশেই কম বা বেশী বিদ্যমান। শাস্ত্রের একটি উক্তি আছে 'শরীরমাদ্যম্ খলু ধর্ম সাধনম্' — নীরোগ দেহ ভিন্ন ধর্মসাধনা সম্ভব নয়, এই জন্য নীরোগ থাকার উদ্দেশ্যে আচার ধর্ম পালন করা হয়।

বিভিন্ন আঞ্চলের জল বায়ু অনুসারে, নৈসর্গিক অবস্থা অনুসারে কিছু কিছু বিধি নিষেধ, আচার ব্যবহার গজিয়ে উঠে তাকেই বলা হয় দেশাচার। এই দেশাচারের জন্য বিভিন্ন প্রদেশের হিন্দুর মধ্যেই আচরণের পার্থক্য ফুটে উঠে। বাঙ্গলায় প্রবাদ আছে মাছে ভাতে বাঙালী। এক্ষেত্রে দক্ষিণ দেশে মাছের চল নেই, কিন্তু পিয়াজ ব্যবহারে আপত্তি নেই। বাঙ্গলায় পিয়াজ, মুসুরী ডাল ইত্যাদি আমিষ বলে গণ্য উত্তরপ্রদেশ বা মহারাষ্ট্রে ঐগুলিও নিরামিষ। পূর্ববঙ্গে লক্ষ্মীপূজা হয় আশ্বিন মাসের পূর্ণিমায়, পশ্চিমবঙ্গে একই পূজা হয় ভাদ্রমাসের অমাবস্যায়। পূর্ববঙ্গের নিয়মে বিবাহের পরদিন বাসি বিয়ে হয় দুপুরবেলা এবং নবদম্পতি বাড়ী যায় সন্ধ্যাবেলা। পশ্চিমবঙ্গে বাসি বিয়ে নেই এবং বিয়ের পরদিন সকাল বেলায়ই নবদম্পতি বাড়ী ফিরে যায়। পূর্ববঙ্গে বিবাহের তত্ত্ব দেবার বিশেষ প্রচলন নেই, পশ্চিমবঙ্গে বিয়ের তত্ত্ব একটি আবশ্যকীয় ব্যপার। পূর্ববঙ্গে বিবাহের স্থল স্থির ক্ষেত্রে পাতিপত্র লেখা হয়। পশ্চিমবঙ্গে হয় পাকা দেখা। এই দেশাচার পার্থক্য আছে জেলায় জেলায় এমনকি অঞ্চলে অঞ্চলে তা দেখা যায়। ময়মনসিংহের লোকেরা আগে মাছ খেয়ে পরে ডাল খায়, ঢাকার লোকেরা ঠিক উল্টো; ময়মনসিংহ, রাজশাহী, বগুড়া ইত্যাদি অঞ্চলে 'পান খিলন' একটি বিশেষ অনুষ্ঠান, যা অন্য কোন জেলায় নেই। বাঙ্গলা ভিন্ন অন্য প্রদেশে পুত্র মস্তক মুণ্ডন করে পিতার শবাধার নিয়ে শ্মশানে যায় আর বাঙ্গলায় অশৌচান্তের দিনে মস্তক মুণ্ডন করে। ঢাকা জেলায় পৌষ সংক্রান্তিতে খায় দই চিড়া, বরিশালে খায় পিঠে। সরস্বতী পূজার দিন জোড়া ইলিশ খাওয়া শুরু, দশমী দিনে ইলিশ খাওয়া শেষ হয় পদ্মার নিকটবর্তী অঞ্চলে।

আচার সকল সম্প্রদায়েরই আছে কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে আচার সম্পূর্ণ বিপরীত যেমন হিন্দুগণ পূর্বমুখে বসে পূজা করেন, মুসলমানগণ পশ্চিমমুখো বসে নমাজ পড়েন। হিন্দুগণ ত্রিকচ্ছ হয়ে পূজায় বসেন, মুসলমানগণ লুঙ্গি পরে নামাজ-পড়েন। হিন্দুগণ কলাপাতার সোজা

দিকে ভাত খান। মুসলমানগণ ঠিক বিপরীত। হিন্দুরা পুজা করেন মাথার কাপড় নামিয়ে মুসলমানগণ নমাজ পড়েন মাথায় টুপি দিয়ে। এগুলি হ'ল আচারের সম্প্রদায়গত পার্থক্য।

স্ত্রীআচার বা গার্হস্থ্য আচার কেবলমাত্র মহিলাগণই পালন করেন, কিন্তু একটি লক্ষণীয় বিষয় হ'ল এই, যে প্রায় সব অঞ্চলের হিন্দু নারীর আচার এবং নিয়মের মধ্যে একটি অপূর্ব সাম্য লক্ষ্য করা যায়। এমন অপূর্বতার বিষয় হ'ল — গুজরাট বা মেবারের স্ত্রীআচার আর রাঢ়ের ও পূর্ববঙ্গের নারীর আচার, ব্রত নিয়ম প্রায় একই রকমের। বাঙ্গলার কুলীন ব্রাহ্মণের আচার আর কান্যকুব্জের আচার প্রায় একই রকমের কেন হয়, তা বুঝতে পারা যায়, কিন্তু গুজরাট ও রাজপুতনার স্ত্রীজাতির ব্রতনিয়ম, ধর্মকর্ম, আচার ব্যবহারের সঙ্গে বাঙ্গলার ও মিথিলার এত সাম্য খুবই বিস্ময়জনক। সত্য বটে, স্ত্রীজাতি খুবই স্থিতিশীল, হাজার বছর আগেকার নিয়ম এখনও তাদের মধ্যে প্রচলিত আছে। কিন্তু গুজরাট ও মেবারের সঙ্গে বাঙ্গলার এতটা মিল কেন — তা প্রকৃতই সন্ধানের বিষয়। মনে হয় প্রথম পাঠান উপদ্রবের কালে, গজনীর সুলতান মামুদের উপদ্রবের সময় গুজরাট, মালব, পাঞ্জাব থেকে অনেকে বাঙ্গলায় এসে বাস করেছিলেন। সেই সূত্রেই হয়ত এই সাম্য সৃষ্টি হয়েছে। আর কেবল আচার ধর্ম বিশ্লেষণ করলে ভারতবর্ষের সকল রাজ্যের হিন্দুর মৌলিক সাম্যের তথ্য অনেকটাই খুঁজে পাওয়া যাবে।

বাঙ্গলা দেশে প্রচলিত প্রবাদ বাক্যে আছে 'বিচারে পণ্ডিত, আচারে লক্ষ্মী।' এর থেকেই বুঝা যায় আচার ধর্ম কেবল মহিলাগণই রক্ষা করে রাখেন। তাঁরা নিজের বস্তুকে পুণ্যময় মনে করেন; অন্যের বস্তু থেকে পাপ জন্মে — এর থেকেই তাঁদের আচারগত গোঁড়ামির সৃষ্টি হয়। তাঁরা ভাল মন্দ বোঝেন না, সুন্দর কুৎসিত বোঝেন না, কেবল বোঝেন তাঁদের যা অবলম্বন তা-ই পুণ্যময় এবং ইহকাল ও পরকালের পোষক ও রক্ষক। অপরের বস্তু-ভোগে আয়ুক্ষয়, বংশনাশ এমনকি সর্বনাশও-হতে পারে। তাঁরাই তাঁদের 'কমঠ' ব্রতের সূত্রে স্থির করেন যে সেলাই করা জামা পরতে নেই, পোলাও কোর্মা, কাবাব ইত্যাদি খেতে নেই, জুতো পরতে নেই; ইজার পায়জামা, মোজা ইত্যাদি ব্যবহার করতে নেই, মাটির পাত্র ছাড়া রান্না করে খেতে নেই। এই সব সিদ্ধান্ত থেকে তাঁরা নিত্যসংযমী, তিতিক্ষা পরায়ণ হয়ে গাড়ু গামছা সার করে আচার অনুশীলন করেছেন। নিজেকে পরাজিত অনুভব করে আত্মরক্ষার হিসাবে, বংশ রক্ষার সাধে, ও জাতিগত বৈশিষ্ট্য রক্ষার বাসনায় তাঁরাই প্রথম 'কমঠব্রত' অবলম্বন করেন। তাঁদের মূল ধারণা সম্পর্কে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেছেন — "পৃথিবীর সকল দেশ, আর সকল জাতি আমার পক্ষে নাই বলিলেও চলে; আমি কাহারও কিছু গ্রহণ করিতে চাহি না; গ্রহণ করিয়া করিবই বা কি রাখিবই বা কোথায় কোন দেশে, কোন স্থানে?" স্ত্রীজাতিরই অনুভব হল যে তাঁর ঘর নেই, দুয়ার নেই, দেশ নেই, সমাজও নেই — বলবার মত কোথাও কিছু নেই। আছে শুধু দেহযষ্ঠি। এটিকেই নিত্যশুদ্ধ এবং পৈতৃক ধারা অনুযায়ী পবিত্র রাখার জন্যই নারী জাতি ব্যস্ত। এর স্থায়িত্ব ঠিক থাকলে এর সূত্র ধরেই শুভদিনের উদয় হতে পারে, আবার শুভ অবসর এলে অপহৃত সর্বস্ব হয়ত উত্তরসূরীগণ ফিরে পেতে পারেন তাই তাঁরা ভবিষ্যৎ মঙ্গলের আশায় আচারধর্ম, ব্রতপার্বণাদি অতি সনিষ্ঠ পদ্ধতিতে পালন করে থাকেন। এই সব ধারণা থেকেই সৃষ্টি হ'ল নারীকুলের আচার ধর্ম, এমনকি রঘুনন্দনের স্মৃতি শাস্ত্রে শুদ্ধি তত্ত্বের ফিলজফি। এরই ভাণ্ডার আছে রামানুজ, শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীজীব গোস্বামী প্রমুখের দর্শনে; কবীরের ও তুলসীদাসের দোহায়। এই সব

তত্ত্বই হ'ল ভারতবর্ষের সকল রাজ্যের সকল জাতির উপধর্ম ও নব সমাজ বিন্যাসের গোড়ার কথা।

বাঙ্গলার নারী সমাজ তাই শ্রেষ্ঠ। এই নারীত্বের একটি রূপ আছে অনুভব করে কবি দ্বিজেন্দ্রলাল সহজ ভাষায় বলেছেন — "নারীর রূপ যা ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ দান ; নারীর রূপ — যা ইন্দ্রধনুর মত সেই অনাদি শুভ্র রূপকে রঞ্জিত করে; নারীর রূপ — যাহার মহিমায় পৃথিবী মদভরে মাথা উঁচু করে স্বর্গকে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে আহ্বান করেছে, যেন বলছে — দেখাও দেখি, এর মত তোমার কি আছে? নারীর রূপ যার পদতলে সমস্ত বিশ্ব সৌন্দর্য এসে লুটিয়ে পড়ে ; যার দিকে চেয়ে শব্দ সঙ্গীত হয়ে বেজে উঠে, ভাষা ছন্দে গেয়ে উঠে। জ্ঞান উন্মাদ হয়, ভক্তি নতজানু হয়ে নুয়ে পড়ে, যে সৌন্দর্যের করস্পর্শে পশুও বশ হয় — সেই নারীর রূপ।" বাঙ্গলার নারী সমাজের এমন উৎকর্ষ স্থাপিত হয়েছে তাঁদের মঙ্গলাচার পালনের সূত্রেই। তাই এই নারীরূপেই ভগবৎ শক্তিকে বাঙ্গালী আরাধনা করেন। এমনকি যে ভগবতী সবচেয়ে বড় যোদ্ধা তাঁকেও নারীর বেশে বাঙ্গালী দুর্গামূর্তির রূপ দিয়েছেন। তাঁদের বরেণ্য অন্য মূর্তিগুলিও হ'ল — লক্ষ্মী, সরস্বতী, কালী, শীতলা, মনসা এবং চণ্ডীর শতরূপ। এই স্ত্রীজাতির আচার কর্তব্য পালনের সূত্রেই বেদবহির্ভূত নিগম শাস্ত্রাদির ধর্মপন্থা আজও বাঙ্গলার মাটিতে বিধৃত আছে।

আচার সম্পৃক্ত বাঙ্গালী মহিলাদের অসংখ্য আচার বিধি। তার সামগ্রিক পরিচয় তুলে ধরা সম্ভব নয়। তবে যা বহুল পরিমাণে দেখা যায় এবং দীর্ঘকালীন সংস্কার হিসাবে প্রচলিত তার কিছুটা উল্লেখ সম্ভব। আয়স্থ অর্থাৎ বিবাহিত সধবা মহিলাদের সিঁথায় সিন্দুর, হাতে শাঁখা, মাথায় ঘোমটা ইত্যাদি হ'ল প্রাথমিক আচার। পাতিব্রত্য ধর্মাচার অনুযায়ী পতির পদধৌত করণ, তাঁরই জন্য পাকস্পর্শ, অন্ন পরিবেশন ইত্যাদি। এরপর পুং সেবন, গর্ভাধান, সাধভক্ষণ ইত্যাদি। গর্ভবতী মহিলার অষ্টম মাস থেকে কোন যানে চলাচল করা উচিত নয়, পূর্ণমাসে ভগবৎ চিন্তা করতে হয়, সন্তান হলে ষষ্ঠ দিনে গুরুজনবর্গের পদধুলি সমন্বিত নুতন গামছা সন্তানের মস্তকে ছুয়ে ষষ্ঠীব্রত করতে হয়। সন্তানের নবম মাসে অন্নারম্ভ করতে হয়। প্রথমান্ন মাতুল মুখে তুলে দেন। তা ছাড়া বিবাহ পদ্ধতি অবলম্বন করে বহু স্ত্রীআচার অঞ্চল ভেদে সৃষ্টি হয়েছে — যেমন - বৃদ্ধির ধান কুটা, গায়ে হলুদ, কমলার স্নান, আংটি খেলা, বাসর শয্যা তোলা, অষ্টমঙ্গলা বা দশমঙ্গলার গাঁঠ খোলা ইত্যাদি বিবাহ সম্পর্কে স্ত্রীআচার। প্রাতঃকালে গৃহ সংস্কার, গোময় গোলা জল দিয়ে বাড়ী উঠোন ইত্যাদি প্রলেপন, সন্ধ্যা বেলায় তুলসী মঞ্চে ভক্তি সহকারে ধূপ দীপ প্রদান এবং উলুধ্বনি করা এগুলি সবই স্ত্রীলোকের কর্ম। অবিবাহিত মেয়ের বিবাহের পূর্বে অব্যূঢ়ান্ন দান, সময়ে কর্ণবেধ, সীমন্তোন্নয়ন ইত্যাদি অতি প্রচলিত আচার। এ ভিন্ন শনি, সত্যনারায়ণের উপবাস, মঙ্গলবারের উপবাস, পূর্ণিমায় উপবাস, ইত্যাদি নিয়মিত পালন করা। নির্দিষ্ট দিনে অরন্ধন, নবান্নে অতিরন্ধন ও আত্মীয় ভোজন ইত্যাদি। বাঙ্গালীর বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানেই আত্মীয় বন্ধু বান্ধব এবং পরিচিত জনকে ভোজন করানো একটি বিশেষ সংস্কার। বিবাহ, উপনয়ন, অন্নপ্রাশন, শ্রাদ্ধ, নিয়মভঙ্গ ইত্যাদি অনুষ্ঠানে সকলকে খাওয়ানো একটি বিশেষ আচার। চৈত্র সংক্রান্তিতে দই চিড়া খাওয়া এবং ছাতু ও ছাই মিলিয়ে রাস্তার তে-মাথায় দাড়িয়ে মুঠোকরে বা পায়ের তলা দিয়ে তিনবার উড়াতে হয় উত্তর মুখে। একে বলা হয় 'শত্রু উড়ানো। আশ্বিন মাসের সংক্রান্তিতে রাঁধা ভাত পরের দিন সকলে অল্প করে খেতে হয় আর বলতে হয় 'আশ্বিনে রাঁধে কার্তিকে খায়,

যেই বর মাগে সেই বর পায়'। কার্তিক মাসের সংক্রান্তিতে কোন কোন অঞ্চলে সন্ধ্যাবেলা একটি কুশ পুত্তলিকা বানানো হয়। ওই পুত্তলিকার হাতে মশা, মাছি, চিংড়ি, ফরিং, চুনো মাছ ইত্যাদি পুটলি করে বেধে দিতে হয়। পুত্তলিকায় আগুন লাগিয়ে ডালা, কুলো, কাঁশর, ঘন্টা সব বাজিয়ে পাড়ার চারদিকে ঘুরতে হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে গান করতে হয় — "ভাল আসে বুরা যায়, মশা মাছি দুরে যায়" ইত্যাদি। এটিকে বলা হয় 'ভালো বুড়া পোড়ানো'। গরু বাচ্ছা দিলে একুশ দিনে ক্ষীরের নাড়ু করে তুলসীতলায় সকলে জড় হয়ে গান করে এবং নাড়ু খায়। এটিকে বলা হয় 'গোর্খার নাড়ু'। গলায় দড়ি সমেত গরু মারা গেলে গৃহকর্তা গলায় দড়ি নিয়ে 'গোবধ' সাজেন। নষ্টপুত্রা মহিলার প্রথম সন্তান মৃত হলে দ্বিতীয় সন্তানটি হয় মল্লিকের সন্তান, তাঁর একটি কান ফুটিয়ে দিতে হয়। সন্তান রুগ্ন হলে ঘিয়ে কড়ি গলায় ঝুলিয়ে বা 'পড়া হরিতকি' খণ্ড হাতে বাঁধা হয়। মানতের আচার স্ত্রী সমাজে খুবই প্রচলিত। এই মানতের জন্য বিশেষ পূজা, হরিলুট, ওজনের হরিলুট ইত্যাদি মানত করা হয়। তা'ছাড়া বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষ বৃক্ষ দেবতা থাকে, সেই বৃক্ষে মানত করে পাথর বাঁধতে হয়। একে বলে 'আটকে বাঁধা'। প্রতিটি অঞ্চলে বিশেষ কোন লৌকিক দেবতার মন্দির থাকে, গাছে ফলা প্রথম ফল ইত্যাদি তাকে দিতে হয়। শত শত সংস্কার বাঙ্গালী মেয়েদের জীবনকে অতীব মহিমান্বিত করে রেখেছে।

এই আচরণ রক্ষা করার সঙ্গে সঙ্গে বহুবিধ নিষেধাজ্ঞাও মেনে চলতে হয়। সন্তানহীনা বা বিধবা রমণীগণ কোন শুভ কাজে অংশ নিতে পারে না। কাল - অশৌচে শুভ কর্মাদিতে যোগদান নিষিদ্ধ। অশ্লেষা, এয়োস্পর্শ ইত্যাদিতে যাত্রা ও শুভকার্য আরম্ভ নিষেধ। বিধবার মাথায় চুল রাখতে নেই। রাত্রিতে অন্নগ্রহণ করতে নেই, একাদশী তিথিতে অন্নগ্রহণ করতে নেই। এর মধ্যে আছে 'শয়ন উত্থান পাশমোড়া/তার মধ্যে ভীমা ছোঁড়া'। এছাড়া আহার ক্ষেত্রেও নিষেধাজ্ঞা আছে যেমন একাদশীতে শিম, দ্বাদশীতে বার্তাকু অর্থাৎ বেগুন, ত্রয়োদশীতে লাউ, অমাবস্যায় কুষ্মাণ্ড অর্থাৎ কুমড়ো, প্রতিপদে বহতী অর্থাৎ ছোট বেগুন, দ্বিতীয়ায় পটল, ষষ্ঠীতে নিমপাতা, তাল ইত্যাদি, অষ্টমীতে নারিকেল, অলাবু অর্থাৎ লাউ এছাড়া দশমীতে কল্মী শাক এবং শিম ভক্ষণ নিষেধ।

এমন সব নিষ্ঠার মধ্য দিয়ে যে আচারগুলি বাঙ্গলার মাটিতে গড়ে উঠেছে তারই সঙ্গে সঙ্গে গড়ে উঠেছে বাঙ্গালীর বিশেষ লোকগাথা ও লোকগীতি।

সংস্কৃতি

শিল্প ও সংস্কৃতি কথাটির উল্লেখ প্রায়ই শোনা যায়। শিল্প কথাটির তাৎপর্য বুঝি। নাচ-গান-অভিনয় বা চিত্র এমন কি আবৃত্তি এ সবই তো শিল্প—তবে সংস্কৃতি কি? এই প্রশ্নের উত্তরে বলবো ধর্ম নিয়ে ভাগ হয়েছে আমাদের পরাধীন ভারতবর্ষ। তার ফলে স্বাধীনতার সময়ে পূর্বের বাংলা দেশ দু-ভাগে ভাগ হয়ে নতুন নাম নিয়েছিল পূর্ব-পাকিস্থান ও পশ্চিমবঙ্গ কিন্তু ভাগ হয়নি রবীন্দ্রনাথ ভাগ হয়নি নজরুল। তাই সংস্কৃতির প্রেক্ষাপটে দুই বাংলার লোক পরস্পরের মধ্যে ভাবের আদান প্রদান করেছি। সংস্কৃতির সূত্রই আমাদের মধ্যে সেতু বন্ধন ঘটিয়েছে। এক মানুষ আর এক মানুষের পাশে দাঁড়াতে পারে নিঃসঙ্কোচে। এ বিষয়টি বাংলা দেশের মানুষ মোতাহার হোসেন চৌধুরী তাঁর 'সংস্কৃতি কথা' গ্রন্থে চমৎকারভাবে বর্ণনা করেছেন।

এ প্রসঙ্গে একটা কথা উল্লেখ করলে বিষয়টি হয়তো আরও সহজ হতে পারে। আমরা শুনেছি যে ইসলাম গ্রহণকারীরা গান-বাজনা চর্চা থেকে বিরত থাকবেন। কিন্তু ভারতবর্ষের ইতিহাসে দেখা যায় ইসলাম ধর্মাবলম্বী হলেও বেশীরভাগ সুলতান বা বাদশাহ তাদের রাজসভায় গান বাজনার চর্চা করতেন। এক্ষেত্রে বিচার করলে দেখা যায় আগে তারা শাসক, বাদশাহ বা সুলতান পরে তারা ইসলাম ধর্মী মানুষ। এটি যদি হৃদয়ঙ্গম করা যায় তাহলে সংস্কৃতি কথার অর্ন্তনিহিত ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায়।

আরও একটু বিশ্লেষণ করে বলি ভারতের গৌরব তাজমহল। শিল্প-স্থাপত্যের অপরূপকীর্তি যা শুধু এদেশীয় নয় বিদেশীয়দেরও মুগ্ধ করেছে। এই তাজমহলের প্রধান স্থপতি ছিলেন পারস্য দেশ থেকে আগত ব্যক্তি। কিন্তু তিনি গভীর ধ্যাননেত্রে দেখেছিলেন যে তার সৃষ্টিকে কালের উর্ধে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে এদেশের শিল্প স্থাপত্যের যে পরিচিতি আছে তা গ্রহণ করতে হবে। তাই দেখা যায় তাজমহলের মিনারের চারটি স্তম্ভে কলসী উল্টা অবস্থায় এবং পদ্মফুল। হিন্দুদের দ্বার কলসী মঙ্গলসূচক এবং পদ্মফুলও জীবনের বিকাশের চিহ্ন। তাই বহিরাগত হলেও স্থপতি এ বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম করেই নক্সা তৈরী করেন এবং সেভাবেই স্মৃতি-সৌধটি নির্মাণ করেন। তাহলে অনুসন্ধানে দেখা যায় সংস্কৃতির একটা মূল বা ভিত্তি আছে।

ইংরাজী 'কালচার' শব্দটির উপযুক্ত বাংলা প্রতিশব্দ কি হতে পারে তা নিয়ে একাধিকবার চিন্তা করেছেন রবীন্দ্রনাথ যিনি ভারতীয় তথা বিশ্ব সংস্কৃতির অন্যতম ধারক ও বাহক ছিলেন। 'কালচার' শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ 'কৃষ্টি' গ্রহণ করা হয়েছিল। কালচারের বাংলা কৃষ্টি শব্দকে তিনি প্রয়োগও করেছিলেন। কিন্তু এই প্রতিশব্দটির প্রয়োগ নিয়ে সেযুগে এক কাকতলীয় পর্ব শুরু হয়ে গিয়েছিল। শেষে সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের অভিমতে 'কালচার' অর্থে সংস্কৃতি শব্দটির প্রয়োগ করতে সম্মত হন। রবীন্দ্র স্নেহধন্য আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী; সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি ক্লাসিক্যাল সংস্কৃত ভাষায় সংস্কৃতি শব্দটির যে অর্থে প্রয়োগ ছিল তার একটি রচনায় তার সুচারু বিকাশ দেখিয়েছিলেন। লব্ধপ্রতিষ্ঠ অধ্যাপক নীহাররঞ্জন রায় কৃষ্টি অপেক্ষা সংস্কৃতি প্রয়োগ অধিকতর সমীচীন বলে তার অভিমত প্রকাশ করেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথ সংস্কৃতি শব্দটি গ্রহণ করেন।

আবার 'Culture' শব্দটি জার্মান ভাষায় 'কুলটর', রাশিয়ানে 'কুলতুরা' রূপে প্রচলিত আছে। এই শব্দগুলি ল্যাটিন 'কুলতুর' শব্দ থেকে উদ্ভুত। ল্যাটিন শব্দটির অর্থ কর্ষণ — যা চাষ করার অর্থবোধক। বিশেষ কোন উদ্ভিদজাত বা প্রাণীজাত পণ্যদ্রব্য উৎপাদন ক্ষেত্রেও এ প্রয়োগ করা হয় যেমন এগ্রিকালচার, হর্টি-কালচার, পিসিকালচার, সেরিকালচার ইত্যাদি শব্দে তা লক্ষ্য করা যায়। তবে ল্যাটিন ভাষায় 'কুলতুর' শব্দটির আদি অর্থ থেকে আরও অর্থ বিস্তার বা সম্প্রসারণ ঘটেছে। ভাষা তো ভাবপ্রকাশের উপায়। তাই দেখা যায় প্রথম প্রথম মানুষ তার নিজস্ব অভিব্যক্তিকে অপরের কাছে প্রকাশ করতে যে ভাষা ব্যবহার করেছে তার পরবর্তী যুগে সেই জনসমাজেই সেই অভিব্যক্তি আরও সুন্দর ও সুললিত ভাষায় মানুষ ব্যক্ত করেছে। সেক্ষেত্রে জনগোষ্ঠীতে একযুগের ভাষার সঙ্গে তার পরবর্তীযুগের জনগোষ্ঠীতে সম অভিব্যক্তি প্রকাশে ভাষার অর্থাৎ শব্দের ব্যাপ্তি ঘটেছে, লালিত্য ফুটেছে। ভাষার সঙ্গে

জনগোষ্ঠীর ওতঃপ্রোত সম্পর্ক রয়েছে। তাই 'কালচার' কথার বিবর্তন লক্ষ্য করলে দেখা যাবে চর্চা করা, অধ্যয়ন করা, কোন বিষয়ের উপর উৎকর্ষ সাধনের চেষ্টা করা অর্থে 'কালচার' শব্দের প্রয়োগ করা হয়। এর একদিকে আছে সামাজিক নৃতত্ত্ব বিজ্ঞান অপর একদিকে আছে নান্দনিক অনুভূতির বিকাশ। তাই যে বিশেষ অর্থে রবীন্দ্রনাথ, সুনীতিকুমার এবং ক্ষিতিমোহন সংস্কৃতি শব্দটিকে ব্যবহার করা শুরু করেন তার বিশেষ একটা গুরুত্ব ছিল।

আধুনিককালে নৃ-তাত্ত্বিক আলোচনা বিষয় প্রসঙ্গে দেখা যায় যে কোন এক সমাজবদ্ধ জনগোষ্ঠীতে কলাবিদ্যা ও বিজ্ঞানের বিকাশের সামগ্রিক ফলস্বরূপ যে উন্নয়ন ঘটেছে তাই 'কালচার' শব্দের অর্থবোধক। তবে রীতিনীতি, আচার ব্যবহার, সৌজন্য, শিষ্টতা, ভদ্রতা, শোভনতা ইংরাজীতে 'কালচার' শব্দের দ্বারা বোঝান হয়ে থাকে। তাই দেখা যায় একই ভূখণ্ড সীমানায় জনগোষ্ঠী ভেদে 'কালচার' বা সংস্কৃতি ভেদ। এটা কেন? — এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় পৃথিবীতে সকল দেশেই বিভিন্ন কারণে যে আদি মানব গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়েছিল পরবর্তীকালে হয় তার রূপান্তর ঘটেছে নয় তা লোপ পেয়েছে নয় বিবর্তিত হয়ে অন্যের সঙ্গে মিশে গেছে। এই বিবর্তন বা মিশে গেলেও তার চিহ্ন কিন্তু একালের নৃতত্ত্ববিদরা খুঁজে পান। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় বর্তমানে কানাডা একটা সুপরিচিত স্থান। ভূগোল শাস্ত্রে উত্তর আমেরিকার উত্তর অংশে। এই স্থানের নাম 'কানাডা' কেন হোল এ জিজ্ঞাসা স্বাভাবিক।

ইতিহাস অনুসরণ করলে দেখা যায় যে পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত পৃথিবীর মানচিত্র সম্পর্কে সাধারণের ধারণা খুবই কম ছিল। 'ইউরেশীয়' অর্থাৎ ইউরোপ ও এশিয়াই ছিল সাধারণের কাছে পৃথিবীর সামগ্রিক পরিচয়। তাই 'ইউরোপের নাবিকদের মনে ফল্গুধারার মতই সঞ্চারমান ছিল এশিয়ার ভূখণ্ডের সঙ্গে সংযোগ প্রচেষ্টা। ইউরোপ ভূখণ্ডে তখন নবজাগরণের প্লাবন সমাজ জীবনের বিভিন্ন স্তরে আলোড়ন সৃষ্টি করে সকল প্রকার ধর্মীয় বন্ধন থেকে মুক্ত ব্যক্তি মানুষের অনুসন্ধিৎসাকে স্বীকৃতি জানায়। তাই দেখা যায় নবজাগরণের স্রোত যে সব পথ দিয়ে এসেছিল তাতে ইউরোপ ভূখণ্ডের নাবিকদের স্বীকৃতি বা সমাদর অবশ্যই প্রাপ্য। কলম্বাস স্পেন রাজের আনুকূল্যে আমেরিকা আবিষ্কার করেন। এই নতুন দেশে সর্বপ্রথমে স্পেনের প্রভাব ও আধিপত্য গড়ে উঠেছিল। তাই এক নাবিক এই নতুন দেশে এসেছিল ভাগ্যসন্ধানে। তখন সেই বিস্তীর্ণ নিরালয় ভূখণ্ড দেখে বলেছিল 'কা - না - ডা' অর্থাৎ বিস্তীর্ণ এক বরফের ভূমি। — এখানে ভাগ্যানুসন্ধানে এসে কোন লাভ নেই। সেই নাবিকের হতাশা সেখানকার আদিম বাসিন্দাদের (রেড ইণ্ডিয়ানদের) কাছে স্বীকৃতি পেল 'কানাডা' রূপে। কানাডা কথার অর্থ স্পেনীয় ভাষায় বিস্তীর্ণ বরফের ভূমি। কি উত্তর আমেরিকা কি দক্ষিণ আমেরিকা উভয় মহাদেশেই স্পেনীয়, পর্তুগাল, ফরাসী ও ইংরেজদের প্রভাব কোন না কোনভাবে থেকে গেছে। দৈনন্দিন জীবনের ভাষায় বা খাদ্য ও পরিধেয়ের মধ্যে নয়তো জীবন চর্যায় ধর্ম বা নান্দনিক অনুসন্ধিৎসায় তার সূত্র খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। আজকের দিনে স্পেন দেশের জীবনধারা আর উত্তর আমেরিকার জীবনধারা এক নয়। কিন্তু ইউরোপের স্পেনীয় জীবনচর্চার প্রভাব যে কানাডার জীবন ধারায় পাওয়া সম্ভব তা নৃ-তাত্ত্বিক বিজ্ঞানীদের অনুসন্ধানে জানা যায়।

এই কালচার বা সংস্কৃতি শব্দটির ব্যবহার সচরাচর এভাবেই হয় — কালচার্ড, আনকালচার্ড, বা 'কালচারল ফাংশন' প্রভৃতি কথা আমরা বলে থাকি। মানুষ কালে কালে যে জীবনধারার পরিবর্তন করে বর্তমান অবস্থায় এসেছে তাই মানুষের সভ্যতা। এই সভ্যতার ইতিহাসে দেখা যায় প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষ বা ইতিহাসের ঊষাকালের মানুষ আর বিশশতকের মানুষ সময়ের পার্থক্যে এক মানুষও নয়। পিরামিড সৃষ্টি করেছে প্রাচীন মানুষ আর মধ্যযুগের শেষের দিকের মানুষ তাজমহল সৃষ্টি করেছে। উভয়েরই নির্মাণ কাজ হয়েছে পাথর দিয়ে। একটির সৃষ্টি বড় পাথরের চাঁই দিয়ে তৈরি আর অপরটি সূক্ষ্ম ও সুন্দর করে পাথরের শ্লেট দিয়ে তৈরি।

এছাড়াও আরও একটি উদাহরণ দিই। গঙ্গাজল আর চরণামৃত দিয়ে। গঙ্গাজল স্বাভাবিক ও সহজলভ্য এবং জলধারার আদি উৎস আর চরণামৃত গঙ্গাজল দিয়েই তৈরী হয়। পুরোহিত মন্ত্র পাঠ করার পর গঙ্গাজল চরণামৃত হয়। আর চরণামৃতে পরিণতি ঘটলে তখন তাকে বিশেষভাবে সংরক্ষণ বা গুরুত্ব দেওয়া হয়, স্বাভাবিক জলের ব্যবহারের মতো তা আর ব্যবহৃত হয় না। একথা স্পষ্টভাবে বলা যাবে যে সংস্কৃতির অনুসন্ধান করতে গেলে আমাদের মূলে যেতে হবে।

সভ্যতার সঙ্গে সংস্কৃতির সম্পর্ক তাপ ও আলোর মতো। সভ্যতা ফুল সংস্কৃতি তার সৌরভ। রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা' গ্রন্থে অমিত বলেছে — হীরে পাথরটা হলো সভ্যতা, আর ওর থেকে যে আলো ঠিকরে পড়ে তাকেই বলে কালচার। সভ্যতার ভার আছে আর কালচারের আছে দীপ্তি।

সভ্যতার সৃষ্টি স্মরণাতীত কাল থেকে। প্রাগৈতিহাসিক মানুষ নিজের প্রয়োজনেই খাদ্য - বাসস্থান - জীবনের নিরাপত্তা - অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা উন্নত মানের ব্যবহারিক জীবনধারার জন্য যে সব ব্যবস্থা বা উপায় গ্রহণ করেছিল সেই উপায়স্বরূপটাই সভ্যতা। সভ্যতার উদ্ভব সংস্কৃত শব্দের 'সভা' থেকে। যখন মানুষ গোষ্ঠীবদ্ধভাবে বসবাস করতে শিখেছে তখনই জীবনধারায় শৃঙ্খলা আনার জন্যে সৃষ্টি করেছে নানা বিধি ও বিধান। সেই বৈদিক যুগেই 'সভা' 'সমিতি' প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন। তাই সভ্যতার যে সব চিহ্নের উল্লেখ আমরা পাই যেমন — মানুষ বসতি করেছে। পরিবেশ গড়ার একটা রূপরেখা প্রথমে করে পরে সেই অনুসারে বাড়ীঘর তৈরির প্যাটার্ন করেছে আরও পরে দেবালয় সৃষ্টিতে উৎসাহী হয়েছে। শুধু উৎসাহী নয় তা কতো মনোরঞ্জক হতে পারে তার জন্যে সচেষ্ট হয়েছে। প্রথমে পাহাড় কেটে মন্দির গড়েছে নয় মাটির দো-চালা মন্দির হয়েছে। পরে দো-চালা থেকে চার-চালা, আরও পরে আট চালা মন্দির সৃষ্টি হয়েছে। এই যে বাড়ী-ঘর করার নক্সা বা তাকে কারুকার্যে সজ্জিত করার সূক্ষ্মতা বিষয়ে নৈপুণ্য এসেছে, বিভিন্ন মূর্তিতে দেব-দেবীর রূপ, যে বিভিন্ন ভঙ্গীতে প্রকাশ করা হয়েছে এবং তাদের পূজা পদ্ধতির যে প্রক্রিয়া সকল — ও সব কিছুই সংস্কৃতি কথাটির অন্তর্গত।

প্রথমে লোক সংস্কৃতি আন্দোলন যখন পাশ্চাত্যে শুরু হয়েছিল তখন শুধুই 'নন-মেটিরিয়াল ফোকলোর' নিয়েই তার যাত্রা শুরু হয়েছিল। শেষে অনেক তর্ক বিতর্কে 'মেটিরিয়াল ফোকলোর' 'ফোকলোর' পরিধির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হলো।

লোক সংস্কৃতি

'ফোকলোর' শব্দটি বাংলা প্রতিশব্দরূপে অধিকাংশের মতে 'লোক সংস্কৃতি' বলে স্বীকৃত হয়েছে। যদিও অনেকে এই শব্দটিকে প্রকৃত গুণগত অর্থে সংস্কৃতির অর্থগত ব্যাখ্যায় গ্রহণ করতে স্বীকৃত নন। সংস্কৃতি অর্থে যা সংস্কার হয়ে যে রূপে এখন বর্তমান। কিন্তু লোক সংস্কৃতির বিষয় শুধু তার উৎপত্তি যেখানে সেখানেই তার সত্তাকে খুঁজে পাওয়া যাবে সেখানের লোক সাধারণের মাধ্যমে তা শুধু নয় — লোকসংস্কৃতির বিষয় এক দেশ থেকে অন্য দেশে সম্প্রচারিত হতে পারে এবং তার যে কিরূপ রূপান্তর ঘটেছে তারও সন্ধান দেয়। আমরা জানি পূর্বে 'ফোক' এবং 'লোর' দুটি শব্দ দিয়ে একটি পত্রিকার শিরোনাম হয়েছিল এবং পরবর্তীকালে দুটি শব্দকে একত্র করে একটি শব্দে পরিণত করা হলো। যেমন সুকুমার রায়ের বিখ্যাত 'আবোল তাবোল' গ্রন্থে এরূপ অনেক শব্দ আছে। যেমন প্রাণীজগতের হাঁস ও সজারু দুটি পৃথক প্রাণীকে একটি প্রাণীর অবয়বে তাঁকে মূর্ত করেছেন হাঁসজারুরূপে হাস্যরসিক শিল্পী সুকুমার রায়। দুটি প্রাণী সত্তা জানা থাকলে নবপ্রাণীটির চিত্রার্পিত অবয়ব অনুভবে আনা সম্ভব, তা না হলে শুধু হাসির খোরাক জোগায়। আর একটি উদাহরণ তুলে ধরা যায়। এক সময় আলিপুর চিড়িয়াখানায় ব্যাঘ্র ও সিংহের মিলিত শাবক হয়েছিল। তখন শঙ্কর প্রাণীটির নাম কি দেওয়া হবে — 'সিংঘ্র' না 'ব্যাঘ্রহ' এ নিয়ে বেশ কিছু পত্রলেখক সংবাদপত্র মারফৎ মতামত প্রকাশ করেন। সেই রকম 'ফোক' এবং 'লোর' শব্দ দুটির মিলিত সত্তা বিষয়ের গুরুত্ব বা গূঢ়ার্থ প্রকাশে সক্ষম হবে বলে স্বীকৃতি পায়। সুতরাং এই নবোদ্ভূত শব্দ ইওরোপ ভূখণ্ডে একটি নতুন বিষয় ইংরেজীতে যাকে 'ডিসিপ্লিন' বলা হয় তার ভাব প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত হতে থাকে।

সাধারণভাবে 'ফোক' শব্দটি 'কমিউনিটি' শব্দের মতই অর্থবোধক ছিল। তবে আলোচিত বিষয়ে ব্যবহৃত হবার সময় ঐ ফোক শব্দটি শুধুই কমিউনিটির অর্থবোধক হলো না আরও যুক্ত হলো বর্তমান থেকে অতীত সম্ভাব্যতা —কখন - কোথায় - কিরূপে এই প্রশ্ন নিয়ে। 'লোর' শব্দটি ইংরেজী 'টেল'-এর সমার্থবোধক। কিন্তু লোর তার প্রকৃত সত্তা হারিয়েছে। যেমন সিংহ ও ব্যাঘ্র সম্মিলিত শাবকটির দৈহিক রূপান্তর ঘটে সেইরকম লোরের রূপান্তর ঘটেছে একটি বিশেষ অর্থ দ্যোতনা উদ্দীপিত করার জন্য। বর্তমানে 'ফোকলোর' কিন্তু 'অ্যান্টিকুইটি' কথার শুধু প্রতিশব্দ নয় — অ্যান্টিকুইটি তার একটি পর্যায়। প্রাচীন যা কিছু তার সঙ্গে মানুষের চিন্তা ভাবনার সংমিশ্রণ বর্তমান মানুষ জানতে আগ্রহী কেন না প্রাচীন কালের অনেক আচার আচরণ বর্তমানকালের মানুষের মধ্যে প্রচলিত রয়েছে। সভ্যতার বিবর্তনে তা লুপ্ত হয়ে যায়নি। যেমন স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে মানুষের আদিরূপ 'হোমো স্যাপিয়েন্স' গোষ্ঠীর প্রাণী। তারই বিবর্তন পথে 'নিয়ানডারথেল ম্যান' বা প্রাগৈতিহাসিক মানুষ — এটাই স্বাভাবিক বিবর্তন বলে স্বীকার করা হয়েছে অধিকাংশের মতে। কিন্তু প্রকৃত কোন প্রাণী থেকে মানুষের সৃষ্টি তা এখনও পণ্ডিত সমাজে সর্বসম্মত নয়। তেমনি ফোকলোরের বিষয় এবং আলোচনায় ব্যক্তিভেদে পার্থক্য হতে পারে।

লোক সংস্কৃতিকে প্রচলিত বলার সার্থকতা দুটি দিক থেকে (১) একাধিকবার বলা হলেও প্রতিবার আপেক্ষিকরূপ সীমাবদ্ধ অর্থাৎ একাধিক ব্যক্তি একই বিষয় মৌখিকরূপে বলার সময় তার আকারগত কোন না কোন পরিবর্তন খুঁজে পাওয়া যায়; (২) তবে সাধারণ

মান তাতে বজায় থাকে। সহজে বলা যায়, লোকসংস্কৃতির বিষয়বস্তুতে একটি থেকে আর একটিতে পার্থক্য থাকলেও তার মূলগত কোন পার্থক্য নেই। যাকে আমরা পাঠভেদ বলি তা লোক সংস্কৃতির অঙ্গ বলেই স্বীকার্য।

'ফোকলোর'-এর বিষয়বস্তুকে ইদানীংকালে দু-ভাগে ভাগ করা হয়েছে। (১) 'মেটিরিয়াল ফোকলোর; (২) 'নন মেটিরিয়াল ফোকলোর'। ফোকলোর আন্দোলনের সূচনা পর্বে 'নন মেটিরিয়াল ফোকলোর' নিয়ে — আন্দোলন যাত্রা সুরু করে। পরে এই আন্দোলন পৃথিবীব্যাপী ছাড়িয়ে পড়লে তখন আবার 'মেটিরিয়াল ফোকলোর'-কে স্বীকার করে নেওয়া হয়। কারণ 'মেটিরিয়াল ফোকলোরে' প্রধানতঃ খেলা, খেলনা, গৃহনির্মাণ পদ্ধতি, তৈজস, সূচীশিল্প ইত্যাদি বিষয়গুলিকে স্বীকার করা হয়েছে। কোন মানব সমাজে বর্তমান অবস্থায় যেরূপে কোন বস্তু টিকে আছে; সভ্যতার বিবর্তন পথে তা হয়তো আজ হাসির বস্তুতে পরিণত। কিন্তু এক সময় এখনকার হাসির খেলনা বস্তুটিই প্রাণ রক্ষার কাজে ব্যবহৃত হতো। যেমন তীর-ধনুক এখন ছোটদের খেলনা বলেই ধরা হয়। অনুন্নত আদিবাসী সমাজে তা শিকারের অস্ত্র। রামায়ণ - মহাভারতে তীর ধনুক নিয়ে যুদ্ধ করার কথা জানা যায়। রামায়ণে হরধনুভঙ্গ করার পর, পরশুরাম তার ধনু নিয়ে গর্বের সঙ্গে বলেছিলেন যে এই ধনু নিয়ে তিনি একুশবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করেছেন। তাই সেই ধনু ভাঙ্গার জন্য রামকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করছেন। রাম যখন সেই ধনু ভেঙ্গে দিলেন তখন প্রাজ্ঞ ব্রাহ্মণ পরশুরামের গর্ব ক্ষত্রিয় কিশোর রাজকুমারের কাছে তুচ্ছতায় পরিণত হলো। এ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে মহাকাব্যের যুগে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের দ্বন্দ্ব ছিল।

মানবগোষ্ঠীর উষাকালে যারা কোন রকমে তৈরি করে নেওয়া অমসৃণ পাথরের আয়ুধ ব্যবহার করত তাদের বলা হয় প্রত্নপ্রস্তর সংস্কৃতির মানুষ। ভোগ্য বস্তু উৎপাদনে এদের ক্ষমতা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল, জীবনযাত্রার মানও ছিল নিতান্ত নিম্নস্তরের। কাজেই এদের সংস্কৃতি অত্যন্ত নিম্নস্তরের। এই রকমভাবে ক্ষেত্র বিশেষে নৃ-তত্ত্ববিজ্ঞানীরা Culture শব্দটি প্রয়োগ করে আলোচনা করেন। যে কোন আলোচনাতেই তাই ইংরেজি Culture শব্দটি প্রযুক্ত হতে দেখা যায়।

নৃতত্ত্ব বিজ্ঞানীর ধারণার সঙ্গে লোকসংস্কৃতিবিদের ধারণার মূলগত কোন প্রভেদ নেই। দু-পক্ষের ধারণাকেই একে অন্যের পরিপূরক বলে ধরা যেতে পারে। সুনীতিকুমার এবং পরবর্তীকালে নীহার রঞ্জন রায়, গোপাল হালদার এবং বিনয় ঘোষ প্রমুখ পণ্ডিতেরা বাংলা ভাষায় সংস্কৃতি শব্দটিকে তার ব্যাপকতম অর্থেই প্রয়োগ করেছেন।

লোকসংস্কৃতি ঐতিহ্যের ওপর নির্ভরশীল — নক্‌শি কাঁথা, আলপনা প্রভৃতি মায়ের কাছ থেকে মেয়ে শিখে নেয়, ধারাবাহিকতার সূত্রে। হাজার হাজার বছর ধরে একই জিনিস প্রচলিত হয়ে চলেছে। সময়ে কিছুই বদলায়নি, যেন গোটা জিনিসটাই timeless বা কালচিহ্নহীন।

বাঙালীর লৌকিক সংস্কৃতি

বৈদিক সাহিত্য থেকে জানা যায় যে আর্যরা পঞ্চনদের উপত্যকায় প্রথমে বসবাস শুরু করেন। পরবর্তী কালে তাদের অগ্রগতি মিথিলা অতিক্রম করে বঙ্গদেশ পর্যন্ত প্রসারিত হয়। সেখানে বসবাসকারী লোকদের তারা ঘৃণা করতেন এবং তাদের ব্রাত্য বলতেন। এই

ব্রাত্যরাই হ'ল বাংলাদেশের আদিম অধিবাসী। ব্রাত্যদের সঙ্গে বৈদিক আর্যদের ক্রিয়াকর্মের ভিন্নতা ছিল। স্বতন্ত্র ছিল আচার-ব্যবহার, পূজা - পদ্ধতি ইত্যাদি।

সম্ভবতঃ গুপ্তযুগে ব্রাহ্মণরা বাংলায় আসেন। তাদের অনুপ্রবেশের পূর্বে বাংলার আদিম অধিবাসীদের ধ্যান ধারণায় পারলৌকিক বিশ্বাস, মৃত ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন, দৈব শক্তি বা জাদুশক্তি, ঝাড়-ফুক প্রয়োগ, প্রকৃতিকে মাতৃরূপে আরাধনা, লিঙ্গপূজা, কুমারী পূজা, নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত, বৃক্ষ-অরণ্য, ভূমির নিহিত শক্তির পূজা, ভূত-প্রেত বিশ্বাস ইত্যাদি নিয়েই ছিল বাঙলার আদিম অধিবাসীদের ধর্ম। কালের বিবর্তনে অনেক বিষয়কে বৈদিক আর্যগণ গ্রহণ করেছিলেন এবং পরবর্তী কালে সেগুলি হিন্দু ধর্মকর্মের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে গিয়েছে। বস্তুতঃ ব্রাহ্মণ্য ধর্মে পূজা-পার্বণের যে সকল বিধি আজও চলে আসছে, তা অনেক বিষয়ে ও পরিমাণে আদিম অধিবাসীদের কাছ থেকেই নেওয়া। এ ছাড়া লৌকিক দেব-দেবীর পূজা, বৃক্ষের পূজা, বৃষকাষ্ঠ, দোলযাত্রা, স্নান যাত্রা, ঝুলন যাত্রা, রথযাত্রা, চড়ক, গাজন, ধর্মঠাকুর, চণ্ডী, মনসা, শীতলা প্রভৃতি পূজাই প্রাক আর্য জনগণের কাছ থেকেই পাওয়া।

বাঙালীর সামাজিক জীবনে বিবাহ ক্রিয়াটি হল শ্রেষ্ঠ আনুষ্ঠানিক সংস্কার। খুব খুঁটিয়ে দেখে পাত্র-পাত্রীর কোষ্ঠী-ঠিকুজীর বিচাব, বিবাহের জন্য মাস বা দিন নির্ধারণ করা হয়। সব মাসে বিবাহ হয় না। বার মাসের মধ্যে সাত মাস অর্থাৎ বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, অঘ্রাণ, মাঘ ও ফাল্গুন মাসে পাঁজীর মতে বিবাহের দিন স্থির হয়। বাকি পাঁচমাস হিন্দু বাঙালীদের প্রচলিত বিবাহ অনুষ্ঠান হয় না যেমন - ভাদ্র, আশ্বিন, কার্তিক. পৌষ ও চৈত্রে। আবার জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিবাহ জ্যৈষ্ঠ মাসে হয় না। বিবাহের পরে পঞ্জিকা দেখে দ্বিরাগমনের দিন-ক্ষণ স্থির করা হয়। কালবেলা, বারবেলা ও কাল-রাত্রি ইত্যাদি পঞ্জিকা দেখেই স্থির হয়। এ ছাড়া উপনয়ন, অন্নপ্রাশন, নামকরণ. হাতে খড়ি, দীক্ষা, চূড়াকরণ, কান বেঁধানো ইত্যাদি ক্রিয়াকর্মও পঞ্জিকার নির্দেশ মতন চলে আসছে।

বাঙালীর অন্যান্য ক্রিয়াকর্মে ও জীবনে জ্যোতিষের প্রভাবও পড়েছে। যেমন ঃ গৃহনির্মাণ আরম্ভ, গৃহপ্রবেশ, নূতন বস্ত্র পরিধান, মন্দির স্থাপন, পুষ্করিণী খনন ও প্রতিষ্ঠা, নৌকা তৈরী, নৌকাযাত্রা, ঔষধ সেবন, গ্রহ পূজা, শান্তি-স্বস্ত্যয়ন, হল-কর্ষণ, বৃক্ষরোপন, বীজবপন, ধান্যছেদন ধান্য সংরক্ষণ, নবান্ন ইত্যাদি। যদিও এই প্রভাব বাঙালী সমাজে দিন দিন কমে যাচ্ছে তবুও কিছু লোক তো দিনক্ষণ মেনে আজও চলেন। তাঁদের কাছে পঞ্জিকার মূল্য যথার্থই আছে। তবে এ কথা পরিষ্কার যে, প্রায় দেড়শো বছর পূর্বে বাঙালী লৌকিক জীবনে দিনক্ষণের বিষয়টির যথেষ্ট গুরুত্ব ছিল।

এখনও বাঙালীর খাদ্যাখাদ্য গ্রহণ ও উপবাস সম্বন্ধে অনেক জ্যোতিষ শাস্ত্রীয় নিয়ম পদ্ধতি সুপ্রচলিত। উপবাস প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য নিম্নলিখিত ছড়াটি —

শোয়া ওঠা পাশ মোড়া
তার অর্ধেক ভীমে ছোঁড়া।
খ্যাপার চৌদ্দ, খেপীর আট,
এ নিয়েই কাল কাট ॥

ব্যাখ্যা সূত্র ঃ- আষাঢ় মাসের শুক্ল পক্ষের একাদশীকে শয়ন একাদশী বলে। মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের একাদশীকে বলে ভীম একাদশী, কার্তিক মাসের শুক্লপক্ষের একাদশীকে উত্থান একাদশী, ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশীকে শিবরাত্রি ও আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষে অষ্টমী

তিথি দুর্গাষ্টমী। এইগুলিই উপবাসের দিন হিসাবে স্বীকৃতি পেয়ে আসছে।

সধবা নারীরা এই কয়েকটি নির্দিষ্ট দিনে মাছ খায় না। যেমন - জামাইষষ্ঠীর দিন। জ্যৈষ্ঠমাসের প্রতি মঙ্গলবার জয় মঙ্গলবার দিন। অঘ্রাণ মাসে রবিবার ইতুপূজার দিন। শ্রীপঞ্চমীর দিন পশ্চিমবঙ্গের মানুষ সাধারণতঃ মাছ খায় না। দশহরার দিন অরন্ধন পালন এবং ফলার (আম বা রসাল, ভিজান চিড়া চিনি সহযোগে) ভক্ষণের বিধান আছে। আবার ঠাণ্ডা খাদ্য গ্রহণের দিনক্ষণও নির্দিষ্ট আছে। যেমন ঃ ভাদ্রমাসের শেষ দিন অরন্ধন ব্রত, মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের দিন শীতল ষষ্ঠী। কোজাগরী লক্ষ্মী পূজার দিন চিঁড়ে, নারকেল ও তাল আঁটি খাওয়ার প্রচলন আছে। এ ছাড়া জ্যৈষ্ঠ মাসে লাউ, মাঘ মাসে মূলা খাওয়া নিষিদ্ধ, এ ব্যাপারটা বাঙালী হিন্দু পরিবার প্রায় সর্বত্র পালন করে আসছে। বর্তমান প্রজন্ম পঞ্জিকার এই নিষিদ্ধ খাদ্যবিধিকে কুসংস্কার বলে আর গুরুত্ব দেয় না। এর পরেও আরো আছে যা পঞ্জিকায় নিষিদ্ধ বলে গণ্য হয়েছে, তা হল ঃ প্রতিপদে কুমড়া, দ্বিতীয়াতে ছোট বেগুন, তৃতীয়ায় পটল, চতুর্থীতে মূলা, পঞ্চমীতে বেল, ষষ্ঠীতে নিম, সপ্তমীতে তাল, অষ্টমীতে নারিকেল, নবমীতে লাউ, দশমীতে কলমী শাক, একাদশীতে শিম, দ্বাদশীতে পুঁইশাক এবং ত্রয়োদশীতে মাষকলাই। উপরোক্ত তালিকা থেকে বাঙালীর খাদ্যে সব্জি ব্যবহারের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

বাঙালীর লৌকিক সংস্কৃতিতে পারিবারিক জীবনে মেয়েদের প্রাধান্য লক্ষ্য করার মতো। মেয়েদের জীবন সুরু হয় যেমন পুতুল খেলার মধ্য দিয়ে তেমনি কতকগুলি ব্রত পালনের মধ্য দিয়ে। যেমন পাঁচ বছর বয়স থেকে কুমারী মেয়েরা শিব ব্রত, পুণ্যি পুকুর, কুলকুলুতি, সোদর, মাঘমণ্ডল ইত্যাদি ব্রতের আবর্তনে বদ্ধ থাকে। আর সধবা মেয়েদের বার-মাসই একটা না একটা ব্রত লেগেই থাকে। বিধবাদের জন্য বৈশাখ মাসে কলসী উৎসর্গ ব্রত প্রচলিত আছে।

বাঙালী মেয়েরা বিবাহ সম্পর্কিত স্ত্রী আচারগুলির প্রতি অধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকে। এই স্ত্রী আচারে আঞ্চলিক ভেদে কিছু পার্থক্য থাকলেও মূলত একই ধারা অনুসরণ করে।

লৌকিক এই আচারগুলি হচ্ছে — আই বুড়োভাত, দধিমঙ্গল, গায়ে হলুদ, বর বা কনের স্নান, ছাদ্‌না তলার ক্রিয়াকর্ম, গাঁটছড়া বাঁধা, দুধ-আলতা অনুষ্ঠান, কড়িখেলা বা গুটি খেলা, কাল রাত্রি মেনে চলা, ফুলশয্যা ইত্যাদি। বিয়ের পরে ছেলেদের জাঁতি ও মেয়েদের কাজললতা সঙ্গে রাখার বিধি প্রাক্ আর্য যুগের লৌকিক সংস্কৃতির চিহ্ন স্বরূপ।

লৌকিক আচার অনুযায়ী বিয়ের কিছুদিন পরে 'দ্বিরাগমন' প্রথাটি এখনো প্রচলিত আছে। কম বয়সে মেয়ের বিবাহ হওয়ার পর মেয়ে বাপের বাড়ীতেই থাকতো। তাকে দ্বিতীয় বার স্বামী গৃহে ফিরে যাবার অনুষ্ঠান ক্রিয়াই হ'ল দ্বিরাগমন। শাস্ত্রের মতে বারো বৎসরে মেয়ের বিবাহ হলে 'দ্বিরাগমনের' প্রয়োজন হয় না। যদিও আগের দিনের সধবা স্ত্রী লোকের অনেক আচারই বর্তমানে লুপ্ত হয়েছে, তবুও লৌকিক অনুষ্ঠানগুলি নিষ্ঠার সঙ্গে এখনও মেয়েরা মেনে চলছে। মেয়েরাই ব্রত পালন করে। পুরুষরা এর অধিকারী নয়। সাধারণ ব্রতগুলিতে পুরোহিতের প্রয়োজন হয় না। মেয়েরাই পুরোহিত। ছড়া বলে ব্রতের কাজ সম্পন্ন করে।

বাঙ্গালী সমাজে পৌষ, চৈত্র ও ভাদ্রমাসে লক্ষ্মী পূজা হয়, এবং তা পুরোহিতের মাধ্যমেই হয়। একে বলে 'খন্দ' লক্ষ্মী পূজা। এই খন্দ শব্দটি আদিম খন্দ জাতির কথা মনে করিয়ে দেয় কিন্তু অভিধানগত অর্থ "ফসলাদি"। সে যাই হোক একথা স্পষ্ট যে আদিম সমাজ থেকেই লক্ষ্মীপূজা ব্রাহ্মণ্য ধর্মে অনুপ্রবেশ করেছে, লক্ষ্মীর ঝাঁপির উপকরণের দিকে

তাকালেই তা বোঝা যায়। লক্ষ্মীপূজা বছরে যে কটি হয় সেই পূজোতে পুরোহিতের প্রয়োজন থাকলেও প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় লক্ষ্মীপূজা ও লক্ষ্মীর পাঁচালী পাঠ মেয়েরাই করে আসছে।

ষষ্ঠী বুড়ী স্ত্রী জাতির কাছে পরম আরাধ্যা দেবী। নবজাত পুত্রের কল্যাণ কামনায় বিভিন্ন সময়ে মেয়েরা ষষ্ঠী দেবীর পূজা করেন। নবজাত সন্তানের জন্মের ছয় দিনে 'ষেঠেরা পূজা'। এ রীতি প্রাচীন কাল থেকেই প্রবহমান। এ ছাড়া বিশেষ মাসে ষষ্ঠী পূজা যেমন - বৈশাখ মাসে চান্দনী ষষ্ঠী, জ্যৈষ্ঠমাসে অরণ্যষষ্ঠী, আষাঢ় মাসে কার্দমী ষষ্ঠী, শ্রাবণ মাসে নোটন ষষ্ঠী, ভাদ্রমাসে চাপড়া ষষ্ঠী, আশ্বিন মাসে দুর্গাষষ্ঠী, কার্তিক মাসে নাড়ি ষষ্ঠী, অগ্রাণ মাসে মূলাষষ্ঠী, পৌষমাসে গুহষষ্ঠী, মাঘমাসে শীতল ষষ্ঠী, ফাল্গুন মাসে গো-ষষ্ঠী ও চৈত্রমাসে অশোক ষষ্ঠী। আবার অগ্রাণ মাসে শুক্ল প্রতিপদে হরিষষ্ঠী, চৈত্র সংক্রান্তিতে নীলষষ্ঠী। নীল ষষ্ঠীর দিন মেয়েরা সারাদিন উপবাসে থেকে সন্ধ্যায় শিবের পূজা দিয়ে তবেই উপবাস ভঙ্গ করে। ঠিক এই প্রক্রিয়ায় মেয়েরা শিবের জন্মমাস হিসাবে শ্রাবণ মাসের যে কোন একটি সোমবার শিবের উপবাস করে।

এর পরে আসছি জামাই ষষ্ঠী ও ভাই ফোঁটা প্রসঙ্গে। এ দুটি দেশাচার অনুষ্ঠান বাঙালীর প্রধান সামাজিক উৎসব বলা যায়। শাশুড়ী জামাইকে ঐ দিন নিমন্ত্রণ করেন। জামাই শ্বশুর বাড়ী এলে শাশুড়ী তার হাতে 'বাটা' তুলে দেন - যত্ন করে প্রীতিভোজের আয়োজন করেন। ভোজনের শেষে সৌহার্দ্যের চিহ্ন স্বরূপ কিছু দেওয়া হয়। জামাই ষষ্ঠী জ্যৈষ্ঠ মাসেই হয়। বিপরীত ভাবে কার্তিক মাসে জামাই তার শ্যালকদের নিজগৃহে আমন্ত্রণ জানায় এবং তাদের যত্ন করে ভোজন করায়। বোন ভাইয়ের কপালে ফোঁটা দেয়, বলে — 'ভায়ের কপালে দিলাম ফোঁটা, যমের দুয়ারে পড়ল কাঁটা।' জামাইকে বাটা দান ও ভাইয়ের কপালে ফোঁটা — সব বারে এই শুভ কাজ হয় না যেমন শনি ও মঙ্গল বারে বাটা ও ফোঁটার রীতি নেই। এ ক্ষেত্রে মেয়েরাই পুরোহিতের কাজ করেন। পৃথকভাবে পুরোহিতের আবশ্যক হয় না। তেমনি অগ্রাণ মাসে ইতু পূজার ক্ষেত্রেও একই ব্যবস্থা। হিন্দু বিধবাদের ক্ষেত্রে 'অম্বুবাচী' ছাড়া পালনীয় আর কোন ব্রত নেই। আষাঢ় মাসের সাত তারিখ থেকে তিন দিন অম্বুবাচীর কাল মানা হয়। এই তিনদিন কোন বিধবাই পাক করা কোন খাদ্যই খান না। ফলমূল মিষ্টান্ন অন্য শুকনো খাবার খাওয়ার রীতি চলে আসছে। অম্বুবাচী শব্দের অর্থ বর্ষার সূচনা। বাঙ্গালী কৃষিজীবীরা নববর্ষাকে অভিনন্দন জানায় এবং মনে বিশ্বাস করে যে ওই তিনদিন পৃথিবী রজঃস্বলা হয়। সেই কারণেই মাঠে হাল চাষ বন্ধ থাকে।

ভাদ্র মাসের শেষ দিন অরন্ধন ও পৌষ মাসের শেষ দিন পৌষপার্বণ বাঙলার তথা বাঙ্গালীর এক প্রীতিময় হার্দিক উৎসব। দুটি উৎসবে বাঙ্গালী মেয়েদের রন্ধন ক্রিয়া-নৈপুণ্য প্রকাশ পায়। আত্মীয় কুটুম্ব, পরিবার পরিজনদের নিমন্ত্রণ ক'রে পান্তা ভাত সহ নানা প্রকার ব্যঞ্জনের পরিবেশনে অভ্যাগতদের পরিতৃপ্ত করায়। কচু শাক, ইলিশ মাছ তো থাকেই। তা ছাড়া নানাবিধ ভাজা - সব্জীর রান্না রসনা তৃপ্ত করে। তেমনি পৌষমাসে পিঠে পার্বণে মেয়েরা তাদের পিঠে তৈরীর শিল্প-চাতুর্যের নিদর্শন রাখেন। আতপ চালের গুঁড়িতে পরিমাণ মত দুধ, ক্ষীর, নারকেল আর খেঁজুরের গুড় দিয়ে তৈরী নানা স্বাদের ও বিচিত্র পদ্ধতিতে পিঠে তৈরী প্রচলিত। বর্তমান কালে মেয়েরা রন্ধন ক্রিয়া ও পিঠে তৈরীর নৈপুণ্য হারিয়ে ফেলছে যা এক সময় বাঙলীর একটা বিশেষ ঐতিহ্য ছিল।

নদীবহুল ও পলিমাটির এই বাংলা দেশে কৃষিই মানুষের প্রধান উপজীব্য। সকল

শ্রেণীর লোক চাষের কাজে লিপ্ত। প্রধান চাষ ধান। এই পলিমাটিতে প্রচুর পরিমাণে ধান উৎপাদন হয়। অবশ্য ধান চাষ অষ্ট্রিক গোষ্ঠীভুক্ত জাতির কাছ থেকেই শেখা। বাঙ্গালীর প্রধান খাদ্য তাই ভাত, মুড়ি, খই, চিঁড়ে প্রভৃতি। কলা ও আখের চাষও করা হয়। আখ মেড়ে জ্বাল দিয়ে গুড় তৈরী এ দেশেই হয়। বাঙালীর গুড় খাওয়ার রীতি আছে। দেব-দেবীকেও চাল কলার নৈবেদ্য দেওয়ার রীতি চলে আসছে। কৃষির উপযোগী যন্ত্রপাতিও যে এ দেশেই তৈরি হ্ত তা বলার দরকার নেই। তাম্রাশ্ম যুগে কৃষি কাজের যন্ত্রাদি তামা বা পাথর দিয়েই তৈরী হ্ত। পরবর্তীকালে লোহার ব্যবহার দেখা যায়। রাঢ় দেশের অরণ্য অঞ্চলে লোহা উৎপাদন হ্ত; লোহার খনিও ছিল। বস্তুতঃ মোগল ও ইংরাজ রাজত্বে লোহার কামান তৈরী, বর্ধমান ও বীরভূম জেলায় উৎপাদিত লৌহ থেকেই। প্রমাণ স্বরূপ বলা চলে বিষ্ণুপুরের দল মাদল কামানটির কথা। ধাতু শিল্পে বাঙালীর দক্ষতা কম ছিল না। নিদর্শন হিসাবে তুলে ধরা যায় ঢোকরাদের ধাতু শিল্পের নৈপুণ্য, স্বর্ণ ও রৌপ্যকারদের তৈরী সোনা-রূপার গহ্না, উপরন্তু ধাতু শিল্পীদের তৈরী গৃহস্থলীর প্রয়োজনীয় বাসন পত্র ও আরও কিছু জিনিস পত্র।

বাঙালীদের তৈরী কার্পাস ও রেশম জাতীয় বস্ত্রাদি আর একটি ঐতিহ্যের নিদর্শন। নিজের ঘরে বসে সুতা কাটা, মাটির পুতুল তৈরী করা ইত্যাদির কথা সবাই জানেন। মৃৎ শিল্পীদের অসামান্য কারু নৈপুণ্য মাটির প্রতিমা, পোড়ামাটির কাজ, যার মধ্যে প্রতিভাত হ'য়েছে পৌরাণিক কাহিনী ও সামাজিক চিত্র। এই প্রসঙ্গেই বলা চলে যে পটচিত্র ও লক্ষ্মীর সরা ছৌ-নাচের মুখোশ তৈরী লোক-সংস্কৃতির আর এক নিদর্শন। শাঁখের ও হাতীর দাঁতের অলঙ্কার, সোলার কাজ, কাঠ খোদাই করা, আসবাব পত্র, গালার কাজ আরো অনেক শিল্প রয়েছে বা ছিল যার মাধ্যমে বাঙালীর নান্দনিক মননশীলতা প্রকাশ পেয়েছে। মেয়েদের আলপনায়, কাঁথা - নক্সা, বিবাহ উৎসবে স্ত্রী আচারে শ্রী - গঠন, চুল বাঁধা ইত্যাদিতে লৌকিক শিল্প সৌন্দর্যবোধের স্বাক্ষর।

বাঙালীর লৌকিক জীবনে জাদু বিদ্যার নানা রূপে প্রয়োগ দেখা যায়। লোক বিশ্বাস থেকেই এ জিনিস চলে আসছে, তাই এখনো রাস্তার মোড়ে জবা ফুল সহ সরা বসানো দেখলে তাকে সমীহ করেই পথচারী রাস্তা পার হয়। কোন বাঙালী অন্তঃসত্ত্বা মেয়ে ছেলে কোলে নিয়ে নিম বা বেল গাছের তলায় যায় না - অপদেবতা ভর করার ভয়েই। গ্রামের মানুষ এখনো 'নিশির ডাক' বিশ্বাস করে। গভীর রাতে তিন বারের বেশী না ডাকলে নাম ডাকা ব্যক্তি উত্তর দেয় না। বৃষ্টি বাদলায় যে ছেলে জন্মায় তাকে বলা হয় বাদুলে ছেলে, তার বিবাহের দিন বৃষ্টি হবেই এ বিশ্বাস আছে। বৃষ্টি না হবার জন্য বাটনা বাটা শিল উলটে রাখা, উঠানে বটী পুঁতে রাখা ইত্যাদি ক্রিয়া কর্মের প্রচলন আছে। ধারনা, এগুলি করলে বৃষ্টি হবে না। গ্রামাঞ্চলের মেয়েরা বিশ্বাস করে 'নজরলাগা'। তাই ঝাড়-ফুঁক, জল পড়া, নুন-পড়া খাওয়ানো, ভূতে ধরা বা ভূতে পাওয়া বিশ্বাস করা। ভূত তাড়ানোর জন্য বা সাপে কাটলে বিষ তোলার জন্য রোজা ডাকার ব্যবস্থা আজো আছে। এক সময় বাঙালীর লৌকিক জীবনে রোজা, গুণীন, ডাইনি-দের প্রাধান্য বা দাপট বেশ জোরদারই ছিল। গৃহস্থালীর কোনো কিছু সামগ্রী চুরি গেলে চাল পড়া, নলচালা, বাটী চালা, নখদর্পণে দেখা প্রক্রিয়ায় তার সন্ধান করা হ্ত। বাটি আপনি চলতে চলতে যে চুরি করেছে তার বাড়ী হাজির হয়। নল চালা কাজে যে চোর তার গলায় নল জোড়া গিয়ে চেপে ধরে। চাল পড়া খেলে যে চুরি করেছে

তার মুখ দিয়ে রক্ত ওঠে। নখদর্পণ হল বুড়ো আঙ্গুলে কালি মাখানো থাকে সেই নখটির মধ্য অপরাধীকে দেখা যায়।

গ্রাম বাঙলার মানুষ, বিশেষ করে মেয়েরা বশীকরণ প্রক্রিয়ায় বিশ্বাসী। বশ করার জন্য জলপড়া বিশেষ কার্যকরী। যাকে বশ করতে হবে তার গায়ে ছিটিয়ে দেওয়া বা তার খাদ্যের সঙ্গে গোপনে মিশিয়ে দেওয়াই রেওয়াজ। যদিও এখন তা অনেক কমে গেছে। গ্রহ-শান্তির জন্য স্বস্ত্যয়নক্রিয়া। গাছের মূল, ধাতু ও রত্ন ব্যবহার তো আছেই। কারো সঙ্গে শত্রুতা থাকলে তাকে মারার জন্য একটি মাটির পুত্তলিকা তৈরী করে তার বুকে একটি কাঁটা বেঁধানো হয় এই বিশ্বাসে যে অচিরেই শত্রু নিধন হবে। ঠিক এমনি ভাবে কোন সধবা মহিলা কারো শত্রু হলে গোপনে তার শাড়ীর খুঁট বা তার শিশুকে শোয়ান কাঁথার ছোট একটি টুকরো সংগ্রহ করে তার ওপর ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়া আরোপ করলে তার অনিষ্ট হবেই —এই বিশ্বাস প্রচলিত আছে।

বাঙালীর লৌকিক সমাজে তুলসী গাছ অত্যন্ত পবিত্র। প্রায় প্রতি গৃহস্থেরই বাড়ীতে একটি তুলসী গাছ থাকে। সকালে তুলসী মঞ্চ পরিষ্কার করা ও সন্ধ্যায় প্রদীপ জ্বেলে দেবার রীতি আছে। নিত্য পূজায়, শ্রাদ্ধাদিকাজে, মৃত ব্যক্তির দোষপ্রাপ্তি কাটাতে তুলসী পাতা অপরিহার্য। বৈষ্ণবরা আবার তুলসী কাঠের মালা কণ্ঠে ধারণ করেন। বাঙালীদের বিশ্বাস যেখানে তুলসী গাছ সেখানেই হরির (কৃষ্ণের) আবির্ভাব। চন্দ্র বা সূর্যগ্রহণে খাদ্যদ্রব্যে গোবর সহ তুলসী পাতা ব্যবহার চলে আসছে। এর ফলে গ্রহণ লাগা খাদ্য খাওয়া যায়।

ভাদ্র মাসে চতুর্থী তিথির রাতে চন্দ্র দেখা নিষিদ্ধ। ঐ দিনের তিথিকে বলে 'নষ্টচন্দ্র" অর্থাৎ পৌরাণিক কাহিনী অনুসারে ঐ দিন চন্দ্র তার গুরু পত্নীকে ধর্ষণ করেছিলেন। ঐ দিনটিতে চুরি করার প্রথা আছে। গ্রামের ছেলেরা গৃহস্থ বাড়ী থেকে ফলমূল, আনাজপত্র যা হোক ছোটখাট কিছু চুরি করেই। এ জন্য কেউ দোষ দেয় না সবাই এটা মেনে নিয়েই থাকে।

কার্তিক মাসে আকাশ প্রদীপ ও সংক্রান্তিতে ধানগাছের সাধ খাওয়ানো, চৈত্র সংক্রান্তিতে যবের ছাতু খাওয়ার নিয়ম আজো বহাল আছে। দেওয়ালীতে "আঁজি-পুঁজি" পৌষ সংক্রান্তিতে "বাউনি" বাঁধা প্রথা আছে। তবে পুরানো সংস্কৃতি অবলুপ্তির পথ ধরেছে বলা যেতে পারে।

এবার লৌকিক দেবদেবীর প্রসঙ্গে আসা যাক। ভাদু, টুসু, গাজী, বনবিবি, বাস্তুঠাকুর দক্ষিণ রায় প্রভৃতি লৌকিক দেবদেবী যে আদিম সমাজের ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়ার প্রতিফলন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

বাঙালী জীবনের সঙ্গে আমোদ প্রমোদ, খেলা ধূলা ইত্যাদি অঙ্গাঙ্গীভাবে মিশে রয়েছে। ঘরের মধ্য খেলা যেমন দাবা, পাশা, লুডো, গুটি খেলা, দশ-পঁচিশ, কড়ি-খেলা, ও তাস খেলা। ঘরের বাইরে - কুস্তি, কবাডি, লাঠিখেলা সাঁতার ও নৌকা বাইচ। মেয়েদের ক্ষেত্রে লুকোচুরি, কানামাছি, এক্কাদোক্কা ইত্যাদি। বাঙালীর লৌকিক জীবনটাই ছিল সঙ্গীত মুখর - যাত্রা, পুতুল নাচ, ভোজবাজী তো ছিলই তার সঙ্গে রামায়ণ গান, কথকতা ইত্যাদি। মায়ের ঘুম পাড়ানি গানের সুরে শিশু ঘুমিয়ে পড়তো। বিবাহ অনুষ্ঠানে আছে লৌকিক গান, শ্মশান যাত্রীকে সংকীর্তন গান গেয়ে দাহ করতে নিয়ে যাওয়া হয়, পরে শ্রাদ্ধ বাসরেও কীর্তন গান পরিবেশন হত।

বাঙালীর জীবনে গানের খুবই আদর ছিল। এক সময়ে পালাগান খুবই সমৃদ্ধ ছিল। যেমন - মনসা, ধর্মঠাকুর, শিব, গম্ভীরা, শীতলা, রামায়ণ, মহাভারত, কৃষ্ণলীলা উল্লেখযোগ্য। পালাগান ছাড়াও পাঁচালী গানেরও প্রচলন ছিল। এ সব গান গ্রামবাসীরা আন্তরিকভাবে জীবনে গ্রহণ করেছিলেন। কথক ঠাকুরের পৌরাণিক কাহিনী মূলক গান শুনতে গ্রাম বাসীরা খুবই পছন্দ করতেন। বলতে দ্বিধা নেই যে নিরক্ষর গ্রাম্য মানুষজন এই সব গান মুগ্ধ হয়ে শুনতেন এবং এরই মধ্যে তারা প্রাচীন ঐতিহ্য খুঁজে পেতেন।

অষ্টাদশ শতকের কবিগানের কথা না বললেই নয়। কবিগান খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। অনেক কবিয়াল এই বাংলায় জন্মেছেন। তাদের মধ্যে হরু ঠাকুর, বলাই বৈষ্ণব, এন্টনী ফিরিঙ্গি, ভোলা ময়রা প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। তরজা গানের প্রচলনও ঐ সময় উল্লেখ যোগ্য। ১৮৩২ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ "হাফ আখড়াই' গানের প্রচলন হতে শুরু করে। ফলে কবি ও তরজা গানে খানিকটা ভাঁটা পড়ে।

যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা ছিল। আখ্যানের মধ্য থাকতো সংলাপ ও গান। এ জন্য মঞ্চ প্রয়োজন হত না। মাটিতে কাপড় বিছিয়ে আসর তৈরী হোত। কলকাতায় থিয়েটার এলে - যাত্রাভিনয় শহর থেকে গ্রামে আস্তানা গাড়ল। গ্রামের জমিদার ও বিত্তবান মানুষই এর পৃষ্ঠপোষকতা করতে লাগলেন। জমিদারী প্রথা বিলোপের পর গ্রামে যাত্রার প্রচলন কমে গেছে। প্রাচীন যাত্রায় পুরুষরাই মেয়ে সেজে অভিনয় করতেন। বর্তমানে অবশ্য যাত্রার রূপ অনেক পাল্টে গেছে। পুরুষদের চরিত্রে পুরুষেরা মহিলা চরিত্রে মেয়েরাই অভিনয় করছেন। মঞ্চ সজ্জার বাহুল্য চোখে লাগার মতন অর্থাৎ যাত্রার গতিপথ বাঁক নিয়েছে, পথ পরিবর্তন করেছে। আরও বেশী জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

মৌখিক সাহিত্যের প্রচলন ছিল লোকের মুখে মুখে পরম্পরের ভাব বিনিময়ে। এই সাহিত্যের দুটি অঙ্গ। (১) জ্যোতিষিক ছড়া অর্থাৎ খনা ও ডাকের বচন। (২) দেবদেবীর মাহাত্ম্য কাহিনী। লক্ষ্মীর কাহিনী, মঙ্গলচণ্ডীর কাহিনী, অরণ্য ষষ্ঠীর কাহিনী, ইতু পূজার কাহিনী, শিবরাত্রির কাহিনী। অঞ্চল ভেদে এ কাহিনীর বিষয়বস্তুর পরিবর্তন ঘটেছে। এছাড়া পরবর্তী কালে নতুন কাহিনী সংযোজিত হয়েছে, ফলে প্রাচীন কাহিনী প্রসারিত হয়েছে। বিশেষ করে গন্ধেশ্বরী পূজার কাহিনী। বাঙালী হিন্দুরা এসব কাহিনী বিশ্বাস করতেন তাই নৈতিক মানও উন্নত ছিল। কালের গতিতে যান্ত্রিক যুগে বাঙালী হিন্দুরা সেসব বিশ্বাস হারাতে বসেছেন সেই কারণে নৈতিক মানও নেমে পড়েছে।

বাংলার লোকসঙ্গীত ও পালাপার্বণ

যুগে যুগে যে সব সঙ্গীত স্রষ্টা ভারতবর্ষের বুকে আবির্ভূত হয়েছেন, তাঁদের গায়নশৈলী নিয়েই ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস রচিত হয়েছে। শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের ধারাকে তাঁরা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমেই প্রবাহিত রেখেছেন। যদিও বলা হয় যে, শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের উৎস লোকসঙ্গীত তবু তা সঙ্গীতের ইতিহাসে দেশী সঙ্গীত রূপে দেখানো হয়। দেশী সঙ্গীতকে লোকসঙ্গীত বলে মেনে নিলে বলতেই হয় যে লোকসঙ্গীত এবং শাস্ত্রীয় সঙ্গীত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে।

ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের ক্ষেত্রে পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে ইতিহাস রচিত হয়েছে কিন্তু ভারতীয় লোকসঙ্গীতের ক্ষেত্রে তা হয়নি। কারণ লোকসঙ্গীত পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিষয়বস্তু

নয়। লোকের মুখে মুখে বংশ পরম্পরায় লোকসঙ্গীত প্রবহমান। তাই তার কোনো ইতিহাস রচনার সুযোগ নেই।

একথা নিঃসন্দেহেই বলা যায় যে, সমাজ জীবনের প্রয়োজনেই লোকসঙ্গীত সৃষ্টি হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে গ্রামীণ সমাজের নিরক্ষর মানুষই লোকসঙ্গীতের ধারক ও বাহক। স্বতঃস্ফূর্ত আবেগই লোকসঙ্গীতের আন্তরগুণ, তার সারল্য নিত্য সহচর, স্বকীয় প্রাণশক্তির গুণেই যুগে যুগে, কালে কালে তার প্রকাশ অকৃত্রিম। এক কথায় যা একটিমাত্র ভাব অবলম্বন করে গীত হওয়ার উদ্দেশ্যে রচিত, কোন লোক ও সমাজ কর্তৃক মৌখিকভাবে প্রচারিত, তাকেই লোকসঙ্গীত বা 'ফোক্‌সঙ' বলা হয়। [লোকসাহিত্য, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য্য] অর্থাৎ যে সঙ্গীত গ্রামের লোকের মুখে মুখে ফেরে যা বংশ পরম্পরায় ক্রম অনুসারী, যার লিখিত কোন নথীপত্র নেই, যা কার রচনা বা কার সুর ইত্যাদি জানা যায় না, যা নিজস্ব ভঙ্গীতে প্রবহমান, তাই-ই লোক সঙ্গীত। অর্থাৎ লোকসঙ্গীত সাধারণ গ্রাম্য মানুষের আটপৌরে জীবনের গান :

লোক শব্দটির অর্থ মানব গোষ্ঠী। আধুনিককালে সাহিত্য, সংস্কৃতি, সঙ্গীত ও নৃত্যের সঙ্গে লোক শব্দটি প্রচলিত হয়ে আসছে বিংশ শতাব্দীর পঞ্চম দশক থেকে। প্রাচীন কাল থেকে নয়। অবশ্য, সাহিত্যিক ও প্রাবন্ধিক দীনেশ চন্দ্র সেনের গ্রন্থেও 'লোক' শব্দটির প্রয়োগ দেখা যায়। পাশ্চাত্য দেশে 'ফোক্' শব্দটির প্রচলন সুপ্রাচীন এবং ফোকের হাত ধরেই 'লোক' শব্দটির শিল্প-সাহিত্যে অনুপ্রবেশ ঘটেছে।

পল্লীগীতি তার প্রাচীন রূপ বদলে নিয়ে লোকসঙ্গীত আখ্যায় সাহিত্যে লোক সাহিত্য, এবং গ্রামীণ সংস্কৃতিতে, লোক সংস্কৃতিতে আলোচিত হয়েছে। সুতরাং সাধারণ ভাবেই মনে হয় যে শিল্প-সংস্কৃতি-সাহিত্যের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য প্রস্ফুটিত করার জন্যেই যেন লোক শব্দটির আবির্ভাব ঘটেছে। অন্যদিকে ভরতের নাট্য-শাস্ত্রে ভরত বলেছেন — 'ন স লৌকিকিঃ কালাঃ'। অর্থাৎ সঙ্গীতের কাল ও লৌকিক কাল সমার্থক নয়। ঋগ্বেদে দেবতাদের মধ্যে 'লোক দেবতা' বলে একটি শ্রেণী করা হয়েছে। নারদ রচিত সঙ্গীত মকরন্দে 'লোক মহেশ্বর' শব্দটির প্রয়োগ আছে। এছাড়া পঞ্চদশ শতকে রঘুনন্দন বিরচিত স্মৃতিশাস্ত্র গ্রন্থে লোকাচার কথাটির উল্লেখ আছে। সর্বত্রই লোক শব্দটির ব্যবহারে এটাই স্পষ্ট যে সকলেই এর দ্বারা এক বিশিষ্ট 'মানব গোষ্ঠির' ক্রিয়াকলাপকেই বোঝাতে চেয়েছেন।

বৈদিক সূত্র ধরেই গ্রাম শব্দটির নামকরণ। গ্রাম অর্থে নির্দিষ্ট জনবসতি বোঝায়। বর্তমানে যেমন শহর ও গ্রাম, প্রাচীনকালে ছিল গ্রাম ও অরণ্য। এই গ্রামের মানুষজনের জীবন ও জীবিকা কৃষি কাজের উপব নির্ভরশীল ছিল। সমাজ জীবনের আচার, পালা পার্বণগুলির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক ছিল নিবিড়। জীবনের খুঁটিনাটি সব বিষয়, সংস্কার, রীতিনীতি, এইসব কিছুই হলো লোক সঙ্গীতের বিষয় বস্তু। মানুষের আচরণে যেমন পার্থক্য, ঠিক তেমনি আচার ভেদ লোকসঙ্গীতের মধ্যেও লক্ষ্যণীয়। যেমন নারী সমাজের সঙ্গে জড়িত লোকসঙ্গীতগুলি পুরুষেরা গায় না।

প্রাচীনকাল থেকে নারী সংসারের উন্নতি ও মঙ্গল কামনায় নিজেদের উৎসর্গ করে এসেছেন স্নেহ, মায়া ও মমতা দিয়ে। তাই এত কথা নারী জীবনের চিরসঙ্গী। নারী তাদের জীবনের প্রয়োজনেই লৌকিক দেবদেবীকে উপস্থিত করেছেন নানা পালা-পার্বণ ও ব্রতকথার মধ্যে। কয়েকটি ব্রতকথা, পালা-পার্বণ এখানে তুলে ধরার চেষ্টা করা হল। এগুলির মধ্যে

কোনো কোনো ব্রতকথা পাঁচালী সুরে পাঠের রীতি। আবার কোনো কোনো ব্রতে সঙ্গীত ও নৃত্য উভয়ই বিদ্যমান।

বাংলার ব্রতকথা বা ব্রতগান বাঙালী মহিলা সমাজে আজো তার স্বকীয় স্থানে সুপ্রতিষ্ঠিত। প্রবাসী বাঙালী, পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তেই থাকুন না কেন, ব্রত, পালাপার্বণ অর্থাৎ বঙ্গ সংস্কৃতির কিছু না কিছু মেনেই চলেন। যেমন বিজয়া দশমীর কোলাকুলি বা ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায় ভাই ফোঁটা ইত্যাদি। আর সমগ্র বাংলার মহিলাদের কাছে বাংলার ব্রত, পালাপার্বণ ইত্যাদি আচার অনুষ্ঠানগুলি নিত্যসঙ্গী হয়ে অঙ্গাঙ্গীভাবে আজও জড়িয়ে আছে সমাজের আনুষ্ঠানিক সকল কাজে। গার্হস্থ্য জীবনের মঙ্গল কামনায় মহিলারা লৌকিক দেবদেবীর কাছে প্রার্থনা জানান বিভিন্ন ব্রতের মাধ্যমে। ব্রতকথা, ব্রতের গান ও ছড়াগানগুলি মহিলারাই মুখে মুখে রচনা করেন। পরিপাটি করে গৃহে আল্পনা দিয়ে গৃহ সুসজ্জিত করেন। এই ব্রতের মাধ্যমেই বাংলার মহিলাদের একদিকে যেমন ফুটে ওঠে শিল্প চেতনাবোধ, অন্যদিকে তেমনি কাব্য প্রতিভাও।

॥ বারো মাসে তেরোপার্বণের গান ॥

বারমাস্যা

আশ্বিনে আনন্দময়ী পূজার বড় ঘটা
কার্ত্তিকে কালিকা পূজা ভাই দ্বিতীয়ার ফোঁটা।
অঘ্রাণে নতুন ধান্য নবান্ন ঘরে ঘরে
পৌষ মাসে পিঠে পার্বণ সব হিন্দুতে করে ॥
মাঘ মাসে শ্রীপঞ্চমী ছেলের হাতে খড়ি
ফাগুন মাসে দোল যাত্রা ফাগের ছড়াছড়ি ॥
চৈত্র মাসে চড়ক উৎসব গাজনে বাঁধে ভারা
বৈশাখ মাস পূণ্যের মাস তুলসীর মাথায় ঝারা ॥
জৈষ্ঠ্য মাসে জামাই ষষ্ঠী জামাই হয় জড়
আষাঢ় মাসে রথ যাত্রায় লোক হয় বড় ॥
শ্রাবণ মাসে হেলা ফেলা খয়ের ছড়াছড়ি
ভাদ্র মাসে পান্তা ভাত খান মনসা বুড়ি ॥

উত্তরবঙ্গের ফুল বারোমাসী

মানষির দেহটা সদায় এক মতন হায়রে আহে না।
মরিম বলি' করি ক্ষ্যাত বাঁচিলে কিবা খাই।
আগে পাছে যাইতে হোবে এড়ান কারো নাই ॥
ফাগুন মাসে কৃষির আশে জমিন চাষায়।
চৈত্র মাসে দুফরের ওউদে ভিরাত আগুন লাগায় ॥
বৈশাখ মাসে মনের সুখে জমিত ফেলায় ধান।
জ্যাঠ মাস আবাদের বাদে হয়া যায় রে বান ॥
আষাঢ় মাসে গাড়ে ওয়া শাওণে ভরখর।
ভাদর মাসে হয় রে গ্যাদর আশ্বিনে গাছ থরথর ॥
কার্ত্তিকে কৃষি দেখিয়া কৃষক করে গান।

অঘ্রাণ মাসে পড়িলে জমিনত পাকে ধান ॥
পোষ মাসতে কাটে ধান মাঘতে হয় নাড়া।
ওই মতন মান্‌ষির দেহা হয়া যায় রে সারা ॥

স্বামী বিহনে নারীর আকুতি ফুটেছে উত্তরবঙ্গের কোচবিহার অঞ্চলে প্রচলিত এই বারোমাস্যা গানটিতে।

আইসো সাধু বৈসো খাও মন্দিরে
পাষাণ বইন্দাছো সাধু বৈদেশে ॥
জৈষ্ঠ মাস মিষ্ট ফল
আষাঢ় মাসে বাইস্যার জল
শ্রাবণ মাস গেলগো নারীর সায়রে সায়রে ॥
ভাদ্রমাসে তালের পিঠা
আশ্বিন মাসে শশা মিঠা
দ্বিতীয়র চাঁদ উদয় হইল কাত্তিকে কাত্তিকে ॥
অঘ্রাণ মাসে নয়া ধান
পৌষ মাসে দহে প্রাণ
মাঘ মাসে শীত নারীর বুকেতে বুকেতে ॥
ফাগুন মাসে রোদের জ্বালা
চৈত্রমাসে শরীর কালা।
আইলো নারীর দ্বিগুণ জ্বালা বৈশাখে বৈশাখে ॥ স্ব - লি-১

পূর্ববাংলার রংপুর জেলার একটি বারমাস্য গান তুলে ধরা হল। গানটিতে বারো মাসের চাষের বিবরণই পাওয়া যায়। এটিকে ভুঁই নিরোন গানও বলে থাকেন কেউ কেউ।

আয়লো তরা ভুঁই নিড়াইতে যাই
ভুঁই আমাগো মাতা পিতা, ভুঁই আমাগো পুত
ভুঁইর দৌলতে মাগো আশী কোঠা সুখ।
পৌষমাসে দেলাম পূজা বাস্তু দেবতার পায়
মাঘ মাসে বসুমতীর চরণ ছোঁয়ায়।
ফাগুন মাসে দেলাম লাঙ্গল চৈত্র মাসে বীজ
বৈশাখ মাসে চিকচিহ্নী জ্যৈষ্ঠ ধানের শীষ।
আষাঢ় মাসে সোনার ধান সোনার ফসল ফলে,
ছেরাবনে আউষ ধান গেরহস্তে তোলে।
ভাদ্র গেল, আশ্বিন গেল, কার্তিক দেয় সাড়া
অঘ্রানের ক্ষেতের পরে দেখবে আমন ছড়া ॥

॥ শ্রীরাধিকার বারমাস্যা ॥

(১)

মাঘে মথুরায় গেছেন শ্রীমধুসূদন।
দশদিক শূণ্য নেহারি নব বৃন্দাবন ॥
ফাল্গুনে দ্বিগুণ আগুন চিত্তে ওঠে রোল।

গোকুলে গোবিন্দ নাই মোর কে করিবে দোল ॥
কে করিবে রাসলীলা কে সাজাইবে দান।
কে আর বাজাবে বংশী কে ভাঙ্গিবে মান ॥
চৈত্রে কোকিল পাখী ডাকে কুহু কুহু।
নীলকণ্ঠে না দেখিয়ে নিকুঞ্জ কঠোর।
বৈশাখ মাসেতে কৃষ্ণ হলেন গুণমন্ত।
সেই অবধি শ্রীরাধিকার দুঃখের নাই অন্ত ॥
জ্যৈষ্ঠেতে যমুনার জল খেলিতেন বনমালী।
শ্যাম অঙ্গে দিতাম জল অঞ্জলি অঞ্জলি ॥
আষাঢ়ে কালিয়া মেঘ ভ্রমরে গুঞ্জরে,
কৃষ্ণ বরণ মেঘ দেখে প্রিয়া মনে পড়ে ॥
শ্রাবণে পূর্ণিমা তিথি ঝুলন খেলিতে।
আসিবে গোকুলে কৃষ্ণ সাধ ছিল চিতে ॥
ভাদ্রে ভরিল নদী অকুল পাথার,
কেমনে আসিবেন প্রভু না জানেন সাঁতার ॥
আশ্বিনে অম্বিকা পূজা প্রতি ঘরে ঘরে।
অবশ্যই আসিবেন প্রভু অষ্টমীর ছলে ॥
কার্তিকে করিলেন কৃষ্ণ কালিয়দমন
সর্বসখি গাঁথি হার অঙ্গের ভূষণ ॥
অগ্রাণে শুনেছিলাম অপরূপ কথা
মথুরায় পেয়েছেন প্রভু নব ভাণ্ডার ছাতা ॥
পৌষে পাঠালাম পত্র প্রিয় সখির হাতে
না চিনে মথুরার পথ কে বা যাবে সাথে ॥
কেবা যাবে মোর সাথে কে বা আছে আর,
মথুরায় যেয়ে কৃষ্ণ ভুলেছে আমায় ॥ —ঝাড়গ্রাম

(২)

বোশেখে দেখ না, মাগো খরা তালু পুড়া;
বিল থাইক্যা পানি আনি কাঙ্কে লইয়া ঘড়া।
(তোমার) অভাগী কন্যারে মাগো, নাইওর নিলা না।
আম পাকে কাঠাল পাকে, জেঠ মাসের রোদে:
সোনা ভাইরে খাইতে দিও, রস করা দুধে।
(তোমার) অভাগী কন্যারে মাগো, নাইওর নিলা না।
মাগো মা আষাঢ়ে আইল মেঘ, কান্দি রাত্রি দিন,
নাও লইয়া সোনা ভাইর আইবার নাইকো চিন।
(তোমার) অভাগী কন্যারে, মাগো, নাইওর নিলা না।
আশ্বিনেতে আইলা, মাগো, আইলা নিজের দেশে,
এই অভাগীর কপাল পোড়া, রইল পরবাসে।

(তোমার)   অভাগী কন্যারে মাগো, নাইওর নিলা না।
(মাগো)   কার্তিক মাসে কার্তিক পূজা কর কারে লইয়া?
তোমার কন্যার দিন যে যায় কান্দিয়া কান্দিয়া।
(তোমার)   আভাগী কন্যারে মাগো, নাইওর নিলানা।
আঘন মাসে নতুন ধান মরাই এতে ভরে,
নতুন চাউলের পিঠাপুলি পৌষ মাসেতে করে।
(তোমার)   অভাগী কন্যারে মাগো, নাইওর নিলা না।
মাঘ মাসের জাড় মাগো, বুক ভাঙ্গিয়া যায়,
ফাল্গুন মাসের আগুন, মাগো, কুলায় না কাঁথায়।
(তোমার)   অভাগী কন্যারে মাগো, নাইওর নিলা না।
চৈত্ মাসের খরায় মাগো, পুড়্যা করলো ছাই—
তোমার বুকে মাথা রাখ্যা কেম্‌নে প্রাণ জুড়াই?
(তোমার)   অভাগী কন্যারে, মাগো, নাইওর নিলা না।   —কাছাড়

আসামের বারমাহী গীতগুলি বাংলা ও উড়িষ্যার 'বারমাসা বা বারমাস্যা' গীত ও বিহারের 'চৌমাসা' গীতের মতনই। ঋতু পরিবর্তনের সুন্দর চিত্র এই সকল বারমাহী গীতের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়। ঋতু পরিবর্তনের পটভূমিতে বিরহিনীর মনের ভাবান্তর ঘটে। নির্বাসনে একাকিনী সীতার বিলাপ সুন্দর ভাবে ফুটেছে এই বারমাহী গীতটিতে ঃ-

সীতা বারমাহী

আঘোণর মাহতে বাপু শালিরে বতর।
দূরর পরা রামচন্দ্রকে করিছোঁ কাতর ॥
পুহর মাহতে বাপু অতি বড় শীত।
মই অভাগিনী সীতার নাই থান থিত ॥
মাঘর মাহতে বাপু ধরমর থিতি।
বনবাসে দিলা মোক গরভে সহিতি ॥
ফাগুণর মাহতে বাপু পছোয়া মেলে বায়।
মই সীতা অভাগিনীর নাই বাপ মায় ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ-

অগ্রাণ মাসে দেখি শালি ধান ফলে,
দূর হতে কান্দি আমি, রামচন্দ্র বলে।
পৌষের শীতে সীতা কাতর সতত,
কোথা নাই ঠাই মাথা গুঁজিবার মতো।
শুনি ধর্ম স্থিতিলাভ করে মাঘ মাসে,
কোন পাপে সগর্ভারে দিল বনবাসে।
ফাগুন মাসে হাওয়া পশ্চিমে বহে
পিতৃমাতৃহীন সীতা অভাগিনী কহে ॥

ফুলবতী কন্যা শান্তির বারমাহী গীত ঃ-

■ পুহর মাহতে শান্তি আতি বরি কুঁয়া।
প্রাণনাথে জীউনাথে খেলে পাশা জুয়া ॥
পাশা খেলে জুয়া পাশাই নেদে ঢাল।
কৈক এরি গৈলা প্রভু বিনন্দ গোপাল ॥
ফাগুণর মাহতে শান্তি দেউল যাতরা।
দেউলর ওপরে আছে মঠ যে মগরা ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ
পৌষমাসে চারিদিকে ভরা কুয়াশা,
প্রাণজীবন নাথ খেলে জুয়া পাশা।
ছকে ফেলে পাশা আর ছকে ফেলে কড়ি,
আমারে ছাড়িয়া কোথা গিয়েছে হরি।
ফাল্গুন মাসে শান্তি যায় দেবালয়,
মন্দিরে মকর চূড়া নেহারি বিস্ময়।

■ মঠ নোহে মগর নোহে জগতরে হরি।
আলানি-বিলানি কান্দে ধরনীতে পরি ॥
বৈহাগর মাহতে শান্তি দেবতার গর্জনি।
দেয়তার গর্জনি শুনি মাছে দেই উজনি ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ
মন্দির রহুক পড়ে. চাই যে শ্রীহরি,
ইনায়ে বিনায়ে কাঁন্দে ধরণীতে পড়ি।
বৈশাখ মাসে দেব ঘন গরজায়,
ডিম্ব দিতে মৎস্য যত নদীতে উজায়।

■ শিশু মাছে উজান দেই বছরে একবার।
আমি অভাগিনী নারী, সেই পটন্টব ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ
বৎসরান্তে একবার ডিম্ব ছাড়ে মীন,
আমি নারী অভাগিনী তারো চেয়ে হীন।

■ জেঠর মাহতে শান্তি জেঠুয়া বরি খর।
বনর হরিণাবাছু সিও চাপে ঘর ॥
যাকে দেখো আদোন আপোন সিও হয়ে পর।
বিচুধিয়া সাউদর কোয়'র ফিরি নাহে ঘর ॥

বঙ্গানুবাদ :

জ্যৈষ্ঠ মাসে খরা ভারি, হয়ে আথান্তর,
বনের হরিণ সেও নাহি ছাড়ে ঘর।
যাহারে আপন ভাবি সেও হয় পর.
অবোধ সাউধ পুত্র ফেরে নাকো ঘর।

■ আহারর মাহতে শান্তি রোয়ানর দিন।
যিটো নারীর পুরুষ নাই সকলোতকৈ হীন ॥
আকাশত চন্দ্র নাই নিজিলিকে তারা।
যিটো নারীর পুরুষ নাই জীবন্ততে মরা ॥

বঙ্গানুবাদ :

আষাঢ় মাসেতে বীজ বপনের দিন,
পুরুষ বিহীন নারী সবা চেয়ে হীন।
আকাশেতে চন্দ্র নাই না ঝলকে তারা,
পুরুষ বিহীন নারী, জীবন্তেই মরা।

■ ভাদর মাহাতে শান্তি ভৈলা খর খর।
নদী শুকাল নালা শুকাল পরিল বালির চর ॥
কাইমে রায়ে কোয়াই রায়ে রায়ে রাজ হাঁহ।
হাহিতে খেলিতে গৈল বরিবা ছ' মাহ ॥

বঙ্গানুবাদ :

ভাদ্র মাসে খরা এল শ্রাবণের পর,
নদী নালা শুকাইয়া হল বালুচর।
কাক পক্ষী ডেকে যায়, ডাকে রাজ হাঁস,
হাসিয়া খেলিয়া গেল বরিষা ছ' মাস।

■ অহ্নির মাহতে শান্তি দেবী পূজা খায়।
হাঁহ পরে ছাগল পরে পারর লেখা নাই ॥
হাঁহ পরে ছাগল পরে পারয়া জাকে জাক।
যৈতে আছা সাউদর কোয়'র তৈতে ভালে থাক ॥

বঙ্গানুবাদ :

আশ্বিন মাসে শান্তি দেবী পূজা রত,
হাঁস বলি, পাঁঠা বলি, পায়রা কত শত।
বলি হয়, হাঁস ছাগল পায়রা ঝাঁকে ঝাঁকে,
যেথা আছে সাউধ পুত্র সেথা সুখে থাকো॥

কাঁথি মহকুমার পশ্চিম দিগের দোভাষী কথায়

বারমেস্যা

বার মাসর কথা শুন হে প্রাণেশ্বর (পয়ার)
বৈশাখ মাসরে কান্ত চড়া খরা লাগে।
কান্ত বিনে কা সংপরে এই কথা জাগে।।
জৈষ্ঠ্য মাসে জলহীন গড়িয়া পুখুরী। (পুকুর)
মন বড় একা একা কা সংগরে আড়ি।।
আষাঢ় মাসরে কান্ত ঝরে জলধারা।
তুম বিনু মো আঁখিরু যে বহিব ধরা।।
শ্রাবণ মাসরে আগো (সম্বোধন) সবু জল থেই।
তুম বিন প্রাণ কান্ত মনে ন রহিব খেই।।
ভাদ্র মাসে পাকা তাল তা সংগরে পিঠা।
মু করিলে কে খাইব সে কাকরা পিঠা।।
অশ্বিন মাসরে স্বামী তুমে নাহি ঘর।
কা সংগরে যিবি মুহি মেলা ঘুরিবার।।
কার্ত্তিক মাসরে ঘর নাহি ভাত ভুজা। (মুড়ী)
কে আনিব কুহ প্রভু মেলারু সে খজা।।
মগসির (অগ্রহায়ণ) মাসরে নাথ লক্ষী ঘরে অছি।
কি করি পূজিবি কান্ত পানিফল দেই।।
পুষ মাসর মনেই পিঠা কে বসি খাইব।
কান্ত আমি পাশে বসি কে কথা কহিব।।
মাঘর যে বাঘ শীত তুমে পাশে নাহি।
কা সঙ্গে করিবি গেইল মন উছলই।।
ফগুন মাসরে কান্ত কোকিল বসন্ত।
এ দেহ দেবি বা কাকু দেহের বসন্ত।
চৈত্র মাসে পাকে বেল বেলপনা করি।
কাকু দেমি (দিব) কুহ কান্ত মন ঘরিতড়ি।।
আসিব মাসর মধ্য রখিব মনর।
ফেরি আস মো কোতিকু (কাছে) মাস শেষ ঘর। **স্বঃ লিঃ - ২**

কাঁথি মহকুমার পশ্চিম দিগের দোভাষী কথায়

গর্ভীণী গান

উপকরণ ঃ নলগাছ, আতপচাল, (খুদ) বুনোওল, অনসুরসা, ঝোট্‌কাঠী, শসা ডগা, শুক্তোপাতা, ডাকজল, (শিশির জল) আড়াই মুঠী ঘাস, দুপুরে ওলের ঘন্ট।

গান

নলরাজার পূজা হয় এইত লুয়া (নতুন) কথা।
বন উষুদুর পুক ঘরে এইটা মোট কথা।।
চাউল, উল, অনসুরসা, ঝোট্‌কাঠী, কাকুড়ী লাড়ি। (ডগা)
এই কেইটিয়ার, পুকরজম আগে দিনর বুলি।।
নল পুতা হয় পুকর জন্য ঈশান কনর পুতে।
চড়েই বসি পুক খায় জমির চারিধারে।।
ডাকজল সেদিন ঘর সমিস্তে (সকলে) খায়।
সেই জলর পূজা হয় সমিস্তেই খায়।।
নল মারতে বিলকু যায় মহাদেবর দোহাই দেই।
ঘাস আনে অড়েই হেলা গরুকু দিয়ে খুয়েই।।
গভীনী সংক্রান্তি এই কেইটীয়া নিয়ম হয়।
বার মাসর তেরো পার্বণ এরই ভিতর হয়।। স্বঃ লিঃ - ৩

বাংলার মেয়েলী ব্রত

বাংলার মেয়েলী ব্রতগুলি প্রবর্তিত হয়েছে বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন কল্পে। বাংলার সমাজ চিরকালই পিতৃতান্ত্রিক। তাই পুরুষের প্রাধান্য এ সমাজে চিরন্তন স্বীকৃত। মহিলা হ'ল এই সমাজ ব্যবস্থায় পুরুষের অর্দ্ধাঙ্গ অর্থাৎ সমাজের যা কিছু সৃষ্টি হয়েছে 'অর্দ্ধেক তার দানিয়াছে নারী, অর্দ্ধেক তার নর।' মহিলাগণ মাতৃধর্মী স্বভাবতই কল্যাণময়ী। তাদের কল্যাণকামনা সহজে ফলপ্রসূ হয় বলে মঙ্গলার্থক সমস্ত ব্রত পার্বণের দায়িত্ব তাঁরাই গ্রহণ করে থাকেন। ইতিহাসের প্রাচীনতম যুগ থেকেই দেখা যায় পুরুষ যখন আহারের সন্ধানে বন থেকে বনান্তরে ঘুরে বেড়ায় মহিলা তখন স্বামীর তুষ্টি সাধন কল্পে গৃহচর্চায় ব্যস্ত থাকেন। ক্লান্ত পুরুষকে বিনোদনের সঙ্কল্পে মহিলাগণ নৃত্য গীতাদি করে থাকেন। দুর দেশ যাত্রা কালে মঙ্গলধ্বনি করেন, তিলক দান করেন মহিলাগণ। তাঁদের এই মঙ্গল কামনা কোন এক কল্পিত দেব বিগ্রহের সমক্ষেই সাধারণত করে থাকেন। যথা বিহিত নিয়মে বংশ পরম্পরায় এগুলি সম্পাদন করা হয় বলেই এগুলিকে বলা হয় 'ব্রত'। এ ক্ষেত্রে যে লৌকিক দেবতাদের রূপ কল্পনা করা হয় অতি সাধারণভাবে তাদের একটি প্রতিনিধিত্বমূলক স্বকৃত সহজ রূপায়ণ তাঁরা নিজেরাই করে নেন। কখনও মাটি দিয়ে, কখনও ফুল দিয়ে, কখনও চিত্র করে আবার কখনও গাছপালা কাঠ ইত্যাদি দিয়ে। বাংলার বারো মাসে তেরো পার্বণ প্রবাদটি এই সব ব্রতাদি সম্বন্ধে প্রযোজ্য। বৈশাখ মাসের ব্রতের মধ্যে আছে অক্ষয় তৃতীয়া, জহ্নু সপ্তমী, রামনবমী, জিরস্‌ ব্রত ইত্যাদি। জ্যৈষ্ঠ মাসে করা হয় - অরণ্য ষষ্ঠী বা জামাইষষ্ঠী, নৃসিংহ চতুর্দশী, ফলহারিণী ব্রত, পিপীতকী দ্বাদশী ব্রত,রম্ভা তৃতীয়া ব্রত, রুক্মিণী দ্বাদশী ব্রত, সাবিত্রী ব্রত, সীতানবমী ব্রত, জয়মঙ্গলচন্ডী ইত্যাদি। আষাঢ় মাসে করণীয় ব্রতের মধ্যে আছে - অম্বুবাচী, চতুর্মাস্য ব্রতারম্ভ, বিপত্তারিণী ব্রত, বিবস্বৎ সপ্তমী, মনোরথ দ্বিতীয়া ব্রত, হোরা পঞ্চমী ব্রত ইত্যাদি। শ্রাবণ মাসের ব্রতের

মধ্যে আছে অশূন্যশয়না দ্বিতীয়া ব্রত, নাগ পঞ্চমী, লুণ্ঠন ষষ্ঠীব্রত, ইত্যাদি। ভাদ্র মাসে হয় - অঘোর চতুর্দশী ব্রত, অনন্ত চতুর্দশী ব্রত, অলোকামাবস্যা ব্রত, কুক্কুটি ব্রত, জন্মাষ্টমী ব্রত, দুর্গাষ্টমী ব্রত, বরদা চতুর্থী ব্রত, দুর্বাষ্টমী ব্রত, রক্ষাপঞ্চমী ব্রত, রাখী পূর্ণিমা, ললিতা সপ্তমী, ষট্ পঞ্চমী ব্রত, সৌভাগ্য চতুর্থী ব্রত, ইলতলির ব্রত ইত্যাদি। আশ্বিন মাসে করণীয় ব্রত হ'ল - কার্তিকী ব্রত, দুর্গাষষ্ঠী, ধারাষ্টমী ব্রত, কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা ইত্যাদি। কার্তিক মাসে করা হয় - ইতুপূজা, কাত্যায়নী ব্রত, গোষ্ঠাষ্টমী ব্রত, গৌরী ব্রত, দশরথ ব্রত, বৈকুণ্ঠ চতুর্দশী ব্রত, ভ্রাতৃদ্বিতীয়া, ইত্যাদি। অগ্রহায়ণ মাসে করণীয় হ'ল - অখন্ড দান দ্বাদশী ব্রত। গুহ ষষ্ঠী ব্রত, পাষাণ চতুর্দশী ব্রত, হরিষষ্ঠী ব্রত, নাটাই মঙ্গল চণ্ডী ব্রত, ইত্যাদি। পৌষ মাসে করণীয় হ'ল - দধি সংক্রান্তি ব্রত, পৌষ-পার্বণ, ইত্যাদি। মাঘ মাসে করণীয় ব্রত হ'ল - আরোগ্য সপ্তমী ব্রত, মাঘ মন্ডলের ব্রত, ইত্যাদি। ফাল্গুন মাসের ব্রত হ'ল - আমলকী ব্রত, তারা ব্রত, শিবরাত্রি ব্রত, ইত্যাদি। চৈত্র মাসের ব্রত হ'ল - অশোকাষ্টমী ব্রত, অশোক ষষ্ঠী ব্রত, স্কন্ধষষ্ঠী ব্রত ইত্যাদি। এ ছাড়া ব্রাহ্মণের বিধবাদের জন্য প্রতি মাসে দুটি করে একাদশী ব্রত, সধবাদের জন্য প্রতি বৃহস্পতিবার লক্ষ্মীব্রত, পূর্ণিমার ব্রত, সকলের জন্য প্রতি শুক্রবার সন্তোষী মায়ের ব্রত ইত্যাদি তো আছেই।

এই ব্রতগুলি মহিলাদের সংস্কার। জননী চান সন্তানের কল্যাণ, স্ত্রী চান স্বামীর কল্যাণ, কুমারী চায় সুপতি লাভ, বিধবা চান পরলোকগত স্বামীর আত্মার তৃপ্তি। প্রতিটি ব্রতেরই একটি করে কথা থাকে যা বয়োবৃদ্ধা মহিলা গল্পাকারে বলে থাকেন। আবার যে সব ব্রত পৌরাণিক উপাখ্যান অবলম্বনে সৃষ্টি হয়েছে সেগুলির জন্য থাকে পয়ারে ও ত্রিপদীতে কবিতার মত 'পাঁচালী'। ব্রতের দিনগুলিতে ব্রতীদের উপবাস করতে হয় অথবা অন্ন ভিন্ন মিতাহার করতে হয়। অর্থাৎ সংযমই সব ব্রতের মূল আচার। দেবতাদির ঘটস্থাপন, আবাহন, অর্ঘদান ইত্যাদি সবই মহিলাগণ নিজেরাই করে থাকেন। ব্রতকথাগুলির মধ্যে জন্মাষ্টমী ব্রত কথা রচিত হয়েছে ভবিষ্য পুরাণের বশিষ্ঠ - দিলীপ সংবাদের সূত্রে। শিবরাত্রি ব্রতকথা রচিত হয়েছে জ্ঞানসংহিতার উপাখ্যান সূত্রে, রামনবমী ব্রতকথা রচিত হয়েছে - 'ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে'র ব্রহ্মা সনক সংবাদের সূত্র ধরে, সত্যনারায়ণ ব্রতকথা রচিত হয়েছে হরিবংশ পুরাণের সূত্র ধরে, বিপত্তারিণী ব্রতকথা রচিত হয়েছে চণ্ডীসূত্র অনুসারে, শনির ব্রতকথা সৃষ্টি হয়েছে সাধু সঙ্কলিনী তন্ত্রের হরপার্বতী সংবাদের সূত্রানুসারে, ষট্ পঞ্চমী ব্রতকথা রচিত হয়েছে ভবিষ্য পুরাণের সূত্র অনুসারে, শীতলার কথা সৃষ্টি হয়েছে স্কন্দপুরাণ অনুসারে, সূর্যব্রতের কথা রচিত হয়েছে ব্যাসদেব রচিত নবগ্রহ স্তোত্রানুসারে, নৃসিংহ - ব্রত কথা রচিত হয়েছে ব্রহ্ম সংহিতার ত্রৈলোক্য বিজয় উপাখ্যান অনুসারে, অক্ষয় ব্রতের কথা সৃষ্টি হয়েছে গ্রহযামল গ্রন্থের উত্তর খণ্ডের উপাখ্যান অনুসারে, দুর্গা ষষ্ঠীর কথা রচিত হয়েছে কুব্জিকাতন্ত্র অনুসারে, সূর্য ব্রতের কথা ব্রহ্মযামলের ত্রৈলোক্য মঙ্গল অনুসারে, জয়-মঙ্গল চণ্ডীর ব্রতকথা রচিত হয়েছে সাধু সঙ্কলিনী তন্ত্রের হরপার্বতী সংবাদ থেকে। এই ব্রতগুলি এসেছে প্রধানতঃ হিন্দু সংস্কার থেকেই তবে প্রথাগত বিষয় অনুধাবন করলে এর মধ্যে কিছু বৌদ্ধ এবং জৈন সংস্কারও পাওয়া যায়।

মেয়েলী ব্রতের তালিকা ঃ

অক্ষয় তৃতীয়া ব্রত	বৈশাখ	শুক্লপক্ষ	তৃতীয়া
অখন্ড দ্বাদশী ব্রত	অগ্রহায়ণ	শুক্লপক্ষ	দ্বাদশী
অঘোর চতুর্দশী ব্রত	ভাদ্র	কৃষ্ণপক্ষ	চতুর্দশী
অনন্ত চতুর্দশী ব্রত	ভাদ্র	শুক্লপক্ষ	চতুর্দশী
অম্বুবাচী ব্রত	আষাঢ়	কৃষ্ণপক্ষ	দ্বিতীয়া থেকে পঞ্চমী
অরণ্য ষষ্ঠী	জ্যৈষ্ঠ	শুক্লপক্ষ	ষষ্ঠী
অশূন্যশয়না দ্বিতীয়া ব্রত	শ্রাবণ	কৃষ্ণপক্ষ	দ্বিতীয়া.
অশোকষষ্ঠী ব্রত	চৈত্র	শুক্লপক্ষ	ষষ্ঠী
অশোকাষ্টমী ব্রত	চৈত্র	শুক্লপক্ষ	অষ্টমী
অলোকামাবস্যা ব্রত	ভাদ্র		অমাবস্যা
আমলকী ব্রত	ফাল্গুন	শুক্লপক্ষ	একাদশী
ইতুপূজা	কার্তিক	কৃষ্ণপক্ষ	দ্বিতীয়া
কাত্যায়নী ব্রত	কার্তিক	কৃষ্ণপক্ষ	প্রতিপদ
কার্তিকী ব্রত	আশ্বিন	সংক্রান্তি	
কেশব ব্রত	বৈশাখ	সংক্রান্তি	
কুক্কুটি ব্রত	ভাদ্র	শুক্লপক্ষ	সপ্তমী
গুহ ষষ্ঠী ব্রত	অগ্রহায়ণ	শুক্লপক্ষ	ষষ্ঠী
গোষ্ঠাষ্টমী ব্রত	কার্তিক	শুক্লপক্ষ	অষ্টমী
গৌরীব্রত	কার্তিক	শুক্লপক্ষ	নবমী
চাতুর্মাস্য ব্রত	আষাঢ়	সংক্রান্তিতে শুরু	
জন্মাষ্টমী ব্রত	ভাদ্র	কৃষ্ণপক্ষ	সপ্তমী
জামাই ষষ্ঠী	জ্যৈষ্ঠ	শুক্লপক্ষ	ষষ্ঠী
দশরথ ব্রত	কার্তিক	কৃষ্ণপক্ষ	চতুর্থী
দধি সংক্রান্তি ব্রত	পৌষ	কৃষ্ণপক্ষ	দ্বিতীয়া
দুর্গা ষষ্ঠী	আশ্বিন	শুক্লপক্ষ	ষষ্ঠী
দুর্গাষ্টমী ব্রত	ভাদ্র	শুক্লপক্ষ	অষ্টমী
নাগ পঞ্চমী ব্রত	শ্রাবণ	শুক্লপক্ষ	পঞ্চমী
নৃসিংহ চতুর্দশী ব্রত	জ্যৈষ্ঠ	শুক্লপক্ষ	চতুর্দশী
পাষাণ চতুর্দশী	অগ্রহায়ণ	কৃষ্ণপক্ষ	চতুর্দশী
পিপীতকী দ্বাদশী ব্রত	জ্যৈষ্ঠ	শুক্লপক্ষ	দ্বাদশী
পৌষ পার্বণ	পৌষ	সংক্রান্তি	(দধি সংক্রান্তি ব্রত)
ফলহারিণী ব্রত	জ্যৈষ্ঠ		অমাবস্যা
বরদা চতুর্থী ব্রত.	ভাদ্র	শুক্লপক্ষ	চতুর্থী(সৌভাগ্য চতুর্থী)
আরোগ্য সপ্তমী ব্রত	মাঘ	শুক্লপক্ষ	সপ্তমী
বিপত্তারিণী ব্রত	আষাঢ়	শুক্লপক্ষ	চতুর্থী
বিবস্বৎ সপ্তমী ব্রত	আষাঢ়	শুক্লপক্ষ	সপ্তমী

সূর্য ব্রত	আষাঢ়	শুক্লপক্ষ	সপ্তমী
বীরাষ্টমী ব্রত	আশ্বিন	শুক্লপক্ষ	অষ্টমী
বৈকুণ্ঠ চতুর্দশী ব্রত	কার্তিক	শুক্লপক্ষ	চতুর্দশী
মাঘ মন্ডলের ব্রত	মাঘ	প্রথম দিন থেকে	
ভ্রাতৃদ্বিতীয়া	কার্তিক	শুক্লপক্ষ	দ্বিতীয়া
চপলা ষষ্ঠী ব্রত	ভাদ্র	শুক্লপক্ষ	ষষ্ঠী
মনোরথ দ্বিতীয়া ব্রত	আষাঢ়	শুক্লপক্ষ	দ্বিতীয়া
রম্ভাতৃতীয়া ব্রত	জ্যৈষ্ঠ	শুক্লপক্ষ	তৃতীয়া
রক্ষা পঞ্চমী ব্রত	ভাদ্র	শুক্লপক্ষ	পঞ্চমী
তারা ব্রত	মাঘ সংক্রান্তি থেকে ফাল্গুন সংক্রান্তি পর্যন্ত		
রাখী পূর্ণিমা	ভাদ্র		পূর্ণিমা
রামনবমী ব্রত	বৈশাখ	শুক্লপক্ষ	নবমী
রুক্মিণী দ্বাদশী ব্রত.	জ্যৈষ্ঠ	শুক্লপক্ষ	দ্বাদশী
লক্ষ্মী পূজা কোজাগরী	আশ্বিন		পূর্ণিমা
ললিতা সপ্তমী	ভাদ্র	শুক্লপক্ষ	সপ্তমী
লুণ্ঠন ষষ্ঠী ব্রত	শ্রাবণ	শুক্লপক্ষ	সপ্তমী
শীতলাষ্টমী ব্রত		শুক্লপক্ষ	ষষ্ঠী
শিবরাত্রি ব্রত	ফাল্গুন	কৃষ্ণপক্ষ	চতুর্দশী
ষট্‌পঞ্চমী ব্রত	ভাদ্র	শুক্লপক্ষ	পঞ্চমী (অরন্ধন)
সাবিত্রী ব্রত	জ্যৈষ্ঠ	কৃষ্ণপক্ষ	ত্রয়োদশী
সীতা নবমী ব্রত	জ্যৈষ্ঠ	শুক্লপক্ষ	নবমী
সৌভাগ্য চতুর্থী ব্রত	ভাদ্র	শুক্লপক্ষ	চতুর্থী (বরদা চতুর্থী)
স্কন্ধ ষষ্ঠী ব্রত	চৈত্র	কৃষ্ণপক্ষ	ষষ্ঠী
হরিষষ্ঠী ব্রত	অগ্রহায়ণ	শুক্লপক্ষ	প্রতিপদ (কাঁচাঘট পূজা)
হোরাপঞ্চমী ব্রত	আষাঢ়	শুক্লপক্ষ	পঞ্চমী
নাটাই মঙ্গলচণ্ডী ব্রত	অগ্রহায়ণ (মঙ্গলবার চারদিন)		
ওলাই চণ্ডীর ব্রত			
জিরস্ ব্রত	বৈশাখ	শুক্লপক্ষ	প্রতিপদ
ইলতলির ব্রত	ভাদ্র	কৃষ্ণপক্ষ	পঞ্চমী
সত্যনারায়ণ ব্রত	ভাদ্র		পূর্ণিমা

বাংলার মেয়েলী ব্রত দুটি ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগ: পাঁচ থেকে আট বৎসরের মেয়েরা যে যে ব্রতগুলি করে তা হল "কুমারী ব্রত" আর দ্বিতীয় ভাগটি "নারী ব্রত"। অর্থাৎ বিয়ের পরে মেয়েরা এই ব্রত করতে সুরু করে। কুমারী ব্রতগুলি নিম্নরূপ :-

শিব ব্রত, পুণ্যিপুকুর, দশপুত্তল, হরির চরণ, অশ্বত্থপাতা, গোকুল ব্রত, পৃথিবী ব্রত, যমপুকুর ব্রত, সেঁজুতি ব্রত, তুঁষ তুঁষলী ব্রত, সহেলা ব্রত, মেঘরাণীর ব্রত, তোষলা ব্রত, অষ্টক গান, ভাদু, টুসু, সূর্য্যব্রত, কুলকুলুতী, মাঘমণ্ডলের ব্রত, পুণ্যিপুকুর ইত্যাদি।

দ্বিতীয় ভাগ নারী ব্রত বা সধবা ব্রতগুলি এই রকম ঃ এয়ো সংক্রান্তি, ফল গাছানো, গুপ্ত ধন, সন্ধ্যামণি, অক্ষয় ফল, অক্ষয় সিঁদুর, ইতুর ব্রত, হুদুমা ব্রত, তারা ব্রত, ষাইটোল ব্রত, সানঝা ব্রত, কার্ত্তিক ব্রত, নীলের ব্রত।

ব্রতকথা ও পালা পার্বণ

মহিলাদের (সধবা/বিধবা) বারব্রতকথা, পাঁচালী, মেয়েলী ছড়া প্রভৃতি, নিয়ে যৎসামান্য আলোচনা ঃ

তুলসী দেবীর স্নান

সকল পূজা, পার্বণ, বারব্রতের উপকরণ হ'ল তুলসী। প্রতিদিন মেয়েরা স্নান করে তুলসী গাছে জল দেন এবং তিনবার এই ছড়াটি বলেন।

তুলসী তুমি নারায়ণ তুলসী তুমি বৃন্দাবন
তোমার মাথে ঢালি জল অন্তিমে পদে দিও স্থল।

খন্দ-লক্ষ্মী ব্রত

ভাদ্র, কার্ত্তিক, পৌষ ও চৈত্র মাসে বাঙালী হিন্দু সমাজে লক্ষ্মীপূজার প্রচলন চলে আসছে যুগ যুগ ধরে। এছাড়া বহু গৃহে প্রতি বৃহস্পতিবার লক্ষ্মীর আবাহন ও পাঁচালী পাঠের প্রথা আজও প্রচলিত।

লক্ষ্মীর আবাহন
এসো মাগো মহালক্ষ্মী করি আবাহন
কৃপা কর কৃপাময়ী দিয়ে শ্রীচরণ।
সৌভাগ্যদায়িনী তুমি সর্ব দুঃখ হরা
দুঃখ নাশ কর মোর গৃহে আসি ত্বরা।

ইতু গান

এ পূজার আয়োজন মেয়েরাই করেন। অগ্রহায়ণ মাসে প্রতি রবিবার ইতু পূজা করার নিয়ম। অগ্রহায়ণ সংক্রান্তির দিন ইতুকে পিঠে, পায়েস খাইয়ে বিসর্জন দিতে হয়। এই ব্রত করলে রমণীর সুখ সম্পদ বৃদ্ধি পায়।

অষ্ট চাল, অষ্ট দূর্বা কলস পাত্রে থুয়ে,
শোনরে ইতুর কথা এক মন প্রাণ হয়ে ॥
ইঁতু দেন বর,
ধনধান্যে পুত্রে বাড়ুক তাদের ঘর ॥

হুদুমা ব্রত গান

হুদুমা বৃষ্টির দেবতা। অনাবৃষ্টির সময় কৃষক মেয়েরা নৃত্য সহযোগে গান গেয়ে হুদুমা দেবতাকে তুষ্ট করেন। উত্তর বঙ্গের জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, দার্জিলিং এবং আসামের গোয়ালপাড়া অঞ্চলে হুদুমা দেবতার পূজা প্রচলিত আছে। এ পূজার কোনো নিয়ম নেই, অনাবৃষ্টি হলেই উপজাতি মেয়েরা দলবদ্ধভাবে বিবস্ত্র হয়ে এলো চুলে খোলা মাঠে যায় আর মুখে "ও ও ও" ধ্বনি তোলে। এ উৎসবে পুরুষদের যোগ দেবার কোন অধিকারই নেই। রাজবংশী মেয়েরাই এ ব্রত উদ্‌যাপন করেন নৃত্যগীত সহযোগে।

হিল হিলাছে কমরটা মোর
শির শিরাছে গাও।
কোণ্ঠে কেনা গেলে এলা
হুদুমা দেখা পাও।
পাটানি খানি পড়িছে খসিয়া
হুদুমা দেখা দেও গে আসিয়া
আইসক্ রে হুদুমা দেওয়া
রসিয়া রসিয়া।
তোর পদে মুঁই আছে বসিয়া।
ডিংসালি ডিংসালি কমরটা
তাতেও নাই মোর ভাতারটা
কত কি মুঁই কায় বা কয়
কোণ্ঠে গেলে দেখা হয়
দেখা হলে দেহটা জুড়ায় ॥ **স্বঃ লিঃ - ৪**

সহেলা গান

এ গানের প্রচলন বাংলাদেশের চট্টগ্রাম অঞ্চলে। মেয়েদের কান ফুটো করার সময় নাপিতের উদ্দেশ্যে মহিলারা গায়। নাপিতকে সন্তুষ্ট করার জন্যেই।

সোনার নাপিতারে আঁ আরো বাড়িত যাইবা,
সোনার নরৈং সোনার বাড়ি হোঁ আরে
করি নিবা ॥

মেঘরাণীর ব্রতগান

বৈশাখের প্রখর তাপে ধরিত্রী বিদীর্ণ হচ্ছে। আকাশে বৃষ্টি নাই, নাই কোন সম্ভাবনা। সেই সময় কৃষক মেয়েদের ও অল্প বয়সী বৌ-দের "মেঘরাণীর কুলো" নামাতে দেখা যায়। তারা দলবদ্ধভাবে কুলো ও জলের পাত্র নিয়ে গান গাইতে গাইতে গৃহস্থের বাড়ী বাড়ী, পাড়ায় পাড়ায় ফেরে। গৃহস্থের বাড়ী গিয়ে উঠানে জল ঢেলে দেয় বৃষ্টির প্রতীক মনে করে। বিনিময়ে গৃহস্থ চাল, তেল ও পয়সা দেয়। প্রথমে গৃহস্থের উঠানে একটি জলচৌকী বা পিঁড়ে পেতে তার উপর কুলো ও জলের পাত্র রাখা হয়। কেউ বা সাতদিন কেউ বা তিন দিন এই কুলো নামানো অনুষ্ঠান করে। এক মায়ের এক ঝি (মেয়ে) যে সেই কুলো নামায়।

হাদে লো বুন ম্যাঘারাণী
হাত পাও ধুইয়া ফেলাও পানি
ছোট ভুঁইতে চিন চিনানি
বড় ভুঁইতে হাটু পানি।
ম্যাঘারাণীর ঘর খানি পাথরের মাঝে
হেই বৃষ্টি নামল ঝাঁকে ঝাঁকে।
কাইল্যা ম্যাঘা ধইল্যা ম্যাঘা বাড়ী আছনি?
গোলায় আছে বীজ ধান বুনাইতে পারনি? **স্বঃ লিঃ - ৫**

তোষলা ব্রত গান

বর্ধমান, বাঁকুড়া ইত্যাদি অঞ্চলে বহুল প্রচলিত। টুসুরই অনুরূপ ব্রত অনুষ্ঠান এইটি। পৌষ মাসে কুমারী মেয়েরা এই ব্রত পালন করে। তুষ তুষলী বা তোষলা হ'ল শস্যের দেবী। স্বামী পুত্র ও ধনে - ধানে ভরে উঠুক ব্রতীর ঘর, তোষলার কাছে এই হ'ল ব্রতের কামনা। ব্রত উদ্‌যাপনের রীতি নীতি অনেকটাই টুসু পূজোর মত।

তুষলী গেল ভেসে
আমার, বাপ, ভাই এল হেসে।
তুষলী গেল ভেসে
আমার শ্বশুর শ্বাশুড়ী
স্বামী পুত্র এল হেসে।
তুষলী গেল ভেসে
ধন দৌলত টাকা-কড়ি এল হেসে।

তারা ব্রত গান (পূর্ব বঙ্গের)

সৌর জগতের বন্দনা করাই তারা ব্রতের উদ্দেশ্য। এ ব্রত মাঘ সংক্রান্তিতে শুরু হয়, সমাপ্তি ঘটে ফাল্গুন সংক্রান্তির দিন। প্রতিদিন মেয়েরা উঠানে বসে একটি বড় মাপের চৌকোনা ঘর কাটে তার মধ্যে আবার ষোলটি চৌকোনা ঘর থাকে। প্রত্যেক ঘরে একটি করে তারকা এঁকে তারই এক পাশে বসে হাতে ফুল ও দূর্বা নিয়ে শুরু করে ব্রত কথা পাঠ। চার বৎসরে এই ব্রত উদ্‌যাপন করতে হয়। ব্রতীকে নূতন বস্ত্র পরে সারাদিন উপবাসে থেকে পূজো করতে হয়। একশো ষোল বার এই ব্রত কথা বলে তারকা আঁকা ঘরে ফুল দিতে হয়। উপকরণ - নিত্যপূজার উপকরণ ছাড়া দই, খই, মুড়ি ইত্যাদি লাগে। ব্রতী অসমর্থ হলে তার হয়ে অন্য কেউ উপবাসে থাকতে পারে।

খোল খোল তারা মুকুটের ঝারা
তোমরা হলে সাক্ষী
ঘৃত দিয়ে করি আমরা পঞ্চগ্রাসী।
শিব জিজ্ঞাসা করে,
গৌরী এত রাতে মেয়েরা
কি ব্রত করে।
গৌরী বলে মেয়েরা সব
তারার ব্রত করে।
এ ব্রত করলে কি হয়
শিব জিজ্ঞাসা করে—
গৌরী বলে এ ব্রত করলে
শিব সম স্বামী আসে ঘরে ॥ ইত্যাদি

ব্রতকথা শেষে খই ভর্তি ছোট ছোট সরাগুলি উপস্থিত ছোট ছোট বালক বালিকাদের মধ্যে বিতরণ করে দেওয়াই রীতি।

অষ্টক গান

অষ্ট সখির নাচ গানকে বলা হয় "অষ্টক গান"। পূর্ব বাংলার যশোহর, খুলনা, ফরিদপুর, রাজশাহী, পাবনা ও কুষ্ঠিয়া জেলায় 'অষ্টক গানের' প্রচলন। বর্তমানে এ গান প্রসারলাভ করেছে পশ্চিমবঙ্গের ২৪ পরগণা ও নদীয়া জেলার গ্রামে। সারা চৈত্র মাস ধরে অষ্টকের দল গ্রামে গ্রামে গান গেয়ে ফেরে। মূলতঃ কৃষক সম্প্রদায়ের কিশোর কিশোরীরা দলবদ্ধভাবে এ গান গায় ছোট ছোট আকারে। পৌরাণিক, ধর্মীয় ও সমাজ জীবনের কাহিনীকে পালাবদ্ধ করে এ গান গাওয়া হয়। "বস্ত্র হরণ" পালার দ্রৌপদীর আকুতি পদটি নমুনা স্বরূপ তুলে ধরা হল।

"বসন দাও হে ওগো দয়াময় গৃহে গমন করি
মন প্রাণ নিলে হরি, আরো করলে বসন চুরি
আমরা কেবল ঐ দুঃখেতে মরি।" ইত্যাদি

ষাইটোল্ ব্রত

যাইটোল - উত্তর বঙ্গের একটি বিশেষ ধরণের মেয়েলী ব্রত। এ ব্রতের ছড়া শুধু কথা প্রধান নয় তার সঙ্গে সুরেরও যোগ আছে। পুত্র সন্তান ও স্বামীকে ফিরে পাওয়ার কামনা বাসনা লোকসঙ্গীতের মধ্যে ফুটে উঠেছে। গৃহকর্ত্রী গাদালীকে (গায়িকা) আমন্ত্রণ জানান. তিনি এসে পূজার সব দায়িত্ব পালন করেন। পূজার সময় ঢাক বাজে, গানের ফাঁকে ফাঁকে চলে নাচ।

কাঙাল মেয়েরা গরীব মেয়েরা
তোমার বাড়ী কিসের নিমন্ত্রণ।
নয় কোড়া কড়ি দ্যাও
বাইরার খেলান আমাকে ছাড়ি দ্যাও।
করমো এ না রংয়ের পূজা রে।

এই ভাবে ষাইটোলের প্রসঙ্গে জন্ম, আমন্ত্রণ, সিন্দুর ধুপ সিঞ্চন ইত্যাদি গানের মধ্যেই ব্যক্ত হয় - যা পুরোপুরি তুলে ধরা সম্ভব হল না।

সানঝার পাঁচালী গান

সান্ঝা অর্থ সাঁঝ। সহজ ভাষায় সন্ধ্যা বেলা। অর্থাৎ সন্ধ্যা বেলাকে দেবী রূপে কল্পনা করে মেয়েরা পূজার আয়োজন করে। পাঁচালী পাঠও হয়। সারা বৈশাখ মাস ধরে চলে এ অনুষ্ঠান। মুর্শিদাবাদ ও মালদা জেলার গ্রামে সানঝা গানের প্রচলন।

রঙ্গের বাজনা বাজারে।
আরে, বাজারে শঙ্খধ্বনি,
আরে আরে বাজেরে উলুধ্বনি,
ছাওয়াল সান্ঝার বিয়া দিব রে,
ওরে বাজা রঙ্গের বাজনা বাজারে ॥

টুসু গান

মেয়েরা মকর সংক্রান্তিতে ফসল ঘরে এনে টুসু উৎসবে মাতে। মেয়েরা ব্রত পালন করে এবং ছড়ার সুরে টুসু গান গায়।

মকর চান করিতে
চলো দিদি যাব গো রাজবান্দেতে।
কেচেন দাদা মেতে খাও
জানমল ঘুমেতে
মেলা বান্ধে মন মানে না
চল যাবো কেচেন বান্দে।
পাড়ায় পাড়ায় শুনে আইলাম
সবাই টুসু গান রচে,
শুনে সে গান আনন্দে প্রাণ
বুক যেন ভরে ওঠে।
নূতন বসন এসেন্ট সাবান
চলো যাবো কেচেন বান্দে।
সবাই রসে মন রসাবো
সই পাতাবো ঘাটেতে
এ বছরে সবাই ওগো
বসে ঘরে মকর পিঠে
আর বছরে কি ঘটে
কি বা না ঘটে ॥

ভাদুগান

ভাদ্র মাসে পুরুলিয়া অঞ্চলের মেয়েরা: রাজকন্যা 'ভাদু' -কে দেবী রূপে প্রতিষ্ঠা করে নিষ্ঠাচারে পূজা করেন। গান গেয়ে ঢাক বাজিয়ে বিসর্জনও দেন। সারা ভাদ্র মাস ধরেই এই উৎসব ঘরে ঘরে উদ্‌যাপিত হয়। কুমারী মেয়েরা ঢাকের তালে তালে এই আখ্যান গীত গেয়ে থাকেন। কালক্রমে ভাদু পূজা ছড়িয়ে পড়ে বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, বর্ধমান ও বীরভূম জেলায়।

(১)

আমার ঘরকে ভাদু এলো
কুথায় বসাব,
পিয়াল গাছের তলায় বেদী
আসন সাজাব।
আ - না - না - না
আমার সোনার ভাদু
কোলে তুলে নাচাব
ভাদু খাবেন কড়-কড়া।
মতির দাঁতে আওয়াজ দেবে

কুটুর মুটুর মড়-মড়া ॥

(২)

ভাদুকে বাঁশি বাজালে
যমুনারি বাঁধা ঘাটে।
আমার ভাদু দখিন যাবে গো
খুঁটে বাঁধা আধুলি,
আমার তরে এনো ভাদু
কদমা কাটা মাদুলী।
গাড়ী এলো ঝম্ ঝমা- ঝম্ গো
ঢুকলো বৃন্দের বাগানে,
বিন্দের ঘরে চাবি মারা
বিন্দে গেইছে চালানে ॥

(৩)

আমার ভাদু মণি সোনার খনি
যাবেক শ্বশুর বাড়ী।
তোরা আছিস কে রে দেরে জুইড়ে
ত্বরা জুড়ি গাড়ি ॥
দেখবে আমার ভাদু মণি
সতী লক্ষ্মী শিরোমণি গো
আজ সাইড্যাছেন রাজেন্দ্রাণী
বরের করটো ধরি। **স্বঃ লিঃ - ৬**

কাতি বা কার্তিক পূজার ব্রত

কার্তিক মাসে সংক্রান্তিতে মহিলারা এই পূজার ব্রত পালন করেন। সারাদিন উপবাস থেকে রাতে চার প্রহরে চারবার পূজার আয়োজন করা রীতি। কার্তিকের মূর্তিও স্থাপনা করা হয়। পুত্রকামী মহিলারা গানের মাধ্যমে কার্তিক ঠাকুরকে আরাধনা করেন। কখনো কখনো গানের সঙ্গে নাচও চলে। প্রার্থনায় সন্তুষ্ট হলে যে মহিলা কাতি ব্রত করেন তাঁর শরীরে দেবকী ভর করেন। পূর্ব ও উত্তরবঙ্গে এ রীতি, পশ্চিমবঙ্গে গান ও নাচের তেমন কোন ধারা পূজার মধ্যে লক্ষ্য করা যায় না। গানের নমুনা ঃ

কাতি পূজার ব্রতগান বা কার্তিক পূজার ব্রতগানে কাতিকের মূর্তির কথা প্রসঙ্গে গান

যায় যায় নারদ ভাগিনী পণ্ডিতের বাড়ী
কি নমো নারায়ণ।
কি বা করেন পণ্ডিত ঠাকুর নিশ্চিন্তে বসিয়া
কি নমো নারায়ণ।
নূতন পঞ্জিকা দেখ পুরাণ থুইয়া
কি নমো নারায়ণ।
কিবা করিস মামা তুই - নিশ্চিন্তে বসিয়া

কি নমো নারায়ণ।
কাতিরে তোর মুণ্ড বানাইছে কোন জনে
ছয় মাস ভরমিয়ারে তপইস্যা করিয়া রে।
মুণ্ড বানাইছে বাসুদেবে ॥
কাতিরে, তোর চোখ বানাইছে কোন জনে
ছয় মাস ভরমিয়ারে .... বাসুদেবে ॥
কাতিরে তোর পেট বানাইছে কোন জনে
অনু জনমেরে নারিকল বিলাইছে রে
পেট বানাইছে বাসুদেবে ॥

নীলের ব্রত গান

নীল অর্থে নীলকণ্ঠ অর্থাৎ মহাদেব শিবের বিয়েকে কেন্দ্র করে সধবা/বিধবা মহিলাদের এই উৎসব। পশ্চিম বঙ্গে চৈত্র সংক্রান্তির আগের দিন অর্থাৎ ২৯শে চৈত্র নীলের পূজা হয়। সারাদিন উপবাসের পর সন্ধ্যায় শিবের মন্দিরে গিয়ে শিবের মাথায় বেলপাতা, আকন্দ ফুল, কলকে ফুল, জল বা দুধ ঢেলে তারপর উপবাস ভঙ্গ করেন। প্রদীপ বা বাতিও জ্বেলে দেওয়া হয়। "নীলের ঘরে দিয়ে বাতি, জল খাও পুত্রবতী।"

পূর্ববঙ্গে এই উৎসব অন্যতম প্রধান উৎসব। সেখানে নীলের মূর্তি তৈরী করা হয় নিম অথবা বেল কাঠের। মস্তক ছাড়া সারা অঙ্গ লাল শালু কাপড়ে জড়ানো হয়। আর মাথায় তেল ও সিঁদুর মাখানো হয়। গৃহস্থ একটি মণ্ডপ তৈরী করে শিবকে সারাবছর ধরে সেখানেই রাখার ব্যবস্থা করেন। নীলকে যেদিন মণ্ডপ থেকে নামিয়ে নদীতে বা পুষ্করিণীতে গঙ্গাপূজা দিয়ে স্নান করিয়ে নতুন শালু বস্ত্র পরিয়ে দেওয়া হয়, সেদিনই নীলকে সাত বাড়ী ঘোরানো হয়। গৃহস্থের বাড়ী নীল গেলে তার মাথায় তেল সিন্দুর মাখানো হয়। চাল ও পয়সা দেওয়া হয় গাজনের সন্ন্যাসীদের। এই উৎসবে নীলের গান গাওয়া হয়। গানের সঙ্গে সঙেরও আয়োজন থাকে। শিবের বিয়েকে ঘিরে গাজনের সন্ন্যাসীরা চৈত্রমাসে গৃহস্থের বাড়ী গিয়ে শিবের বিয়ের গান গায়। এই গানগুলিকে বলে **অষ্টক গান**। পূর্ববঙ্গের গানটি নিচে দেওয়া হল ঃ

শুন সবে মন দিয়ে
অইবে শিবের বিয়ে
কৈলাসেতে হবে অধিবাস
তাতে নারদ করে আনাগোনা,
কৈলাসে বিয়ার ঘটনা.
বাজে কাঁসী বাঁশি মোহন বাঁশরী।

পূজার দিনে বাজনা বাজিয়ে নীলকে স্নান করিয়ে আনা হয়। পূজার আয়োজন হয় মাঝরাতে। গান শোনা যায় সন্ন্যাসীদের কণ্ঠে ঃ

ঢোল বাজে কাড়া বাজে
বিহা করতে শিব চইল্যাছে
দেব সেনা দৈত্য সেনা

তার সাথে মিল্যাছে।
বাঘছাল পইর্‌য়া কইলক্যা লইয়া
দামড়ার উপর চইড়্যাছে
সাপের মালা গলায় দিয়া বর সাইজ্যাছে ॥ **স্বঃ লিঃ - ৬ (ক)**

এইভাবে প্রতিদিন সন্ধ্যায় গৃহস্থ নীলের সামনে ধূপ ধুনা দিয়ে চলে সারা বৎসর ধরে।

তুষ তুষলী ব্রত

এই ব্রত করলে মেয়েদের শ্বশুরকুল ও পিতৃকুলের কোন অভাব অনটন থাকে না। অঘ্রাণ মাসের সংক্রান্তির দিন থেকে শুরু হয়ে সারা পৌষ মাস এই ব্রত পালন চলে। উপকরণ ঃ আতপ চালের তুষ, কালো গাই, গোবর, সরষে ও মূলা ফুল এবং দূর্বা। গোবরের সঙ্গে তুষ মিশিয়ে ১৪৪ টি নাড়ু পাকাতে হয়। ৪/৫টি নাড়ু হাতে নিয়ে সরষে ও মূলা ফুল নিয়ে ছড়া পড়তে হয়। পূজার শেষে নাড়ু কটি আলাদা পাত্রে রাখতে হয়। এইভাবে নিত্য পূজা চলে। নিত্য কয়েকটি করে নাড়ু নৈবেদ্য আকারে সাজিয়ে দেওয়া হয়।

তুষ তুষুলার কাঁধে ছাতি
বাপ মায়ের ধন লাতিপাতি।
ভাই-এর ধন লালপাস
স্বামীর ধন টগর বগর
পুত্রের ধন অতি ঝগর ॥

সূর্য্য ব্রত

পূর্ববঙ্গের ঢাকা, বিক্রমপুর, মৈমনসিংহ ইত্যাদি অঞ্চলে এই ব্রত বহুল প্রচলিত। এই ব্রতের আর একটি নাম হল মাঘ - মণ্ডল। মাঘ মাসে সূর্য্য পূজো উপলক্ষে এই ব্রত পালিত হয়। কুমারী মেয়েরাই এই ব্রত পালন করে। সূর্য্য দেবের স্ত্রী পুত্র কল্পনায় অতি ঘরোয়া কথার মধ্যে দিয়ে ব্রতের আখ্যান রচিত।

ঐ ঐ দেখা যায় বড় বড় বাড়ী
ঐ দেখা যায় বুঝি সূয্যি গো বাড়ী।
কি কর গো সূয্যি বৌ বইস্যা দুয়ারে
তোমার সূয্যি আইবেন ঘোড়ায় সোয়ারে।
আইলেন ধুইলেন গঙ্গার ঘাটে।
খাইলেন সূয্যি সুবর্ণের থালে
আঁচাইলেন পিচাইলেন গাডুর নালে ॥ **স্বঃ লিঃ - ৭**

কুলকুলুতি ব্রত

বাপ, শ্বশুর ও মামার বংশ রক্ষার প্রয়োজনেই মেয়েরা এই ব্রত পালন করে। আশ্বিন সংক্রান্তি থেকে কার্তিক সংক্রান্তি পর্যন্ত নিত্য তুলসী তলায় একটি করে মাটির প্রদীপ জ্বেলে ৭টি কুলপাতা ও ৭টি প্যাটারী ফুল দিয়ে এই ছড়া পাঠে পূজা করতে হয়।

কুল কুলুতি কুলবতী
তোমার পায়ে দিচ্ছি বাতি।
বাপ মা আর শ্বশুর কুল,
অক্ষয় অমর হোক এ তিন কুল।

সন্ধ্যামণির ব্রত

এই ব্রত কুমারী মেয়েদের। ব্রতের ফলে তারা সকল বিপদ থেকে মুক্ত হয়, জন্ম সুখী হয়ে সংসার করতে পারে। চৈত্র সংক্রান্তি দিন থেকে সারা বৈশাখ মাস প্রতিদিন সন্ধ্যায় এই ব্রত পালন করতে হয়। প্রত্যেক ব্রতের একটি কাহিনী থাকে তাকে বলে "ব্রত কথা"। নিত্য কর্ম শেষে যিনি ব্রতী তিনি 'ব্রত কথা' পাঠ করে উপস্থিত মহিলাদের শোনান। প্রত্যেক এয়োত্রী হাতে দূর্বা, ফুল নিয়ে জোড় হাত করে বসে ব্রতকথা শোনেন।

ব্রতের ছড়া ঃ

সন্ধ্যামণি কনকতারা, সন্ধ্যামণি জলের ধারা।
সন্ধ্যামণি করি কে? সাত ভাইয়ের বোন যে।
আলো ধানের কাল পুতে, জন্ম যায় যেন এয়োতে।

সন্ধ্যামণি সন্ধ্যামণি মাগি বর
হোক্ সুখ শান্তি কৈলাস ঘর।
শান্তি জল শান্তি জল
সাত সাগরের শান্তি জল।
কে যায়রে কে যায়রে ডালিমতলা দিয়ে?
সন্ধ্যামণি বাড়ী যাচ্ছেন গামছা মাথায় দিয়ে ॥

মাঘ মণ্ডলের ব্রত গান

মাঘ মাসে প্রভাতকালে সূর্য ওঠার মুখে ছোট ছোট বালিকারা পুকুর পাড়ে বসে 'মাঘ মণ্ডলের' ব্রত করে। তাদের হাতে ফুল ও দূর্বা থাকে আর গান গায় ছড়ার সুরে ঃ

মালিনী গো সই
মাঘমণ্ডলের বর্ত করুম্ লাউল পামু কৈ।
আছে আছে রে লাউল ঘোষ পাড়ার টিপি
আন গিয়া ধইর‍্যা তারে ফুলের মালা সঁপি।
লাউল পাইলাম ফুল পাইলাম. ঘাট পামু কৈ?
দত্ত পড়ার ঘাটে দেখি বইস্যা আছে সই ॥

পরে আরো গায় ঃ

আম কাঁঠালের পিঁড়ি খানি
গঙ্গা জলে ভাসে,
তার মধ্যে আমার ভাই
মুরারী ব'সে ॥

যম পুকুর ব্রত গান

এটি হ'ল কুমারী মেয়েদের ব্রত। আশ্বিন সংক্রান্তি থেকে শুরু করে কার্তিক সংক্রান্তি পর্যন্ত প্রতিদিন সন্ধ্যায় এই ব্রত পালন করা হয়। বাড়ীর ভিতরে উঠোনের এক পাশে একটি ছোট পুকুর আকারে গর্ত খুঁড়তে হয়। ঐ পুকুরে কচু, হলুদ, কলমী, শুশনি ও উচ্ছে গাছ পুঁততে হয়। পুকুরের দক্ষিণ পাড়ে মাটির-গড়া যমরাজ, যমরাণী, যমের পিসির মূর্তি, উত্তর পাড়ে মেছো ও মেছুনী, পূর্ব পাড়ে ধোপা ও ধোপানী এবং পশ্চিম পাড়ে কাক, বক, চিল, কুমীর, কচ্ছপ মূর্তি বসাতে হয়। চার পাড়ে হলুদ, সুপারী ও কড়ি পুঁতে দিতে হয়। এ ব্রতের ফল হয় মৃত্যুর পরে মেয়েরা নরক যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পায়। পুকুরে জল ঢেলে ছড়া পড়তে হয় ঃ

কালো কচু সাদা কচু ল ল করে
রাজার বেটী পক্ষী মারে।
খিল খুলতে লাগল ছড়
আমার বাপ ভাই হোক লক্ষেশ্বর।
লক্ষে লক্ষে দিলে বর
ধনে পুত্রে বাড়ুক ঘর ॥

পুণ্যি পুকুর ব্রত

কুমারী মেয়েরা এই ব্রত করলে দেব দুর্লভ স্বামী ও ধনসম্পত্তির অধিকারিণী হয় আর সধবা মহিলারা করলে শ্বশুর কুল ও পিতৃকুলের সৌভাগ্য ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পায়। চৈত্র সংক্রান্তি থেকে বৈশাখ সংক্রান্তি পর্যন্ত সারা বৈশাখ মাস ধরে নিত্য এই ব্রত পালন করতে হয়। বাড়ীর ভিতরে বা দেবালয়ের সামনে একহাত দৈর্ঘ্য ও এক হাত প্রস্থ বিশিষ্ট পুকুর আকারে গর্ত খুঁড়তে হয়। পুকুরের মাঝখানে একটি তুলসী গাছ পুঁতে দিতে হয়। পুকুরের চার পাড়ে চারটি ঘাট তৈরী করতে হয়। এক ঘটি জল নিয়ে ব্রতের মন্ত্রপাঠ করতে হয়। পরে তুলসী গাছে ঘটি ভর্তি জল ঢেলে দিতে হয়।

কুমারী ব্রতের মন্ত্র

পুণ্যি পুকুর পুষ্পমালা
কে পূজেরে সকাল বেলা?
আমি সত্যি ভাগ্যবতি
সাত ভাইয়ের বোন লীলাবতী ॥
পূজি চন্দন দূর্বা ফুলে
বাড়ুক লক্ষ্মী বাপের কুলে ॥
পুণ্যি পুকুরে ঢালি জল
বাপ ভাইয়ের হোক অশেষ মঙ্গল ॥

সধবাদের ব্রতের মন্ত্র

পুণ্যি পুকুর পুষ্পমালা
কে পূজেরে দুপুর বেলা?
আমি সতী ভাগ্যবতি

সাত ভাইয়ের বোন লীলাবতি ॥
জল ঢালি তুলসী মূলে
শ্বশুর কুল ভরুক ফলে ফুলে ॥
পুণ্যি পুকুরে ঢালি জল
বাপ শ্বশুরের হোক মঙ্গল ॥

সেঁজুতি ব্রত

কার্তিক সংক্রান্তি থেকে শুরু করে সারা অগ্রহায়ণ মাস বৈকালে পূজা করতে হয়। উঠানে বা দালানে পিটুলির আলাপনা দিয়ে সেঁজুতির ছবি আঁকতে হয়। মাঝখানে এক ঘটি জল বসাতে হয়। তারপর বিভিন্ন চিত্র সহ ষোলটি ঘর আঁকতে হয়। এ ব্রত কুমারী মেয়েদের।

ব্রতের ছড়া ঃ

দোলায় আসি দোলায় যাই সোনার দর্পণে মুখ চাই ॥
বাপের বাড়ীর দোলাখানি শ্বশুর বাড়ী যায়।
আসতে যেতে দোলাখানি ঘৃত মধু খায় ॥

পূজার মন্ত্র ঃ

(প্রদীপ জ্বেলে হাতে দূর্বা নিয়ে মন্ত্র পাঠ করতে হবে)
সাঁজ পূজন সেঁজুতি
ষোল ঘরে ষোল ব্রতী।
তার এক ঘরে আমি ব্রতী
ব্রতী হয়ে মাগি বর
ধনে পুত্রে বাড়ুক বাপ মার ঘর।
এই রকম আরো অনেক ছড়া আছে।

শিব ব্রত

কুমারী মেয়েরা চৈত্র সংক্রান্তির দিন থেকে সারা বৈশাখ মাস ধরে এই ব্রত করেন। প্রতিদিন একটি করে শিব মূর্তি গড়ে তাকে আকন্দফুল, কলকে ফুল, ধুতুরা ফুল, বেলপাতা, দূর্বা, শ্বেত চন্দন দিয়ে পূজা করতে হয়। নৈবেদ্যরও আয়োজন থাকে। আল্পনা দিয়ে তার উপর তামার টাট পাত্র রেখে টাটের মধ্যে শিবকে বসিয়ে পূজা করতে হয়। বেলের খোলা করে তিনবার জল দিয়ে মন্ত্র পড়তে হয়।

শিল শিলাটন, শিলে বাটন, শিল অঝ্ ঝরে ঝরে।
স্বর্গ হতে বলেন, গৌরী! কি ব্রত করে?
নড়ে আশ, নড়ে পাশ, নড়ে সিংহাসন
হর গৌরীকোলে করে গৌরী আরাধন।

অশ্বত্থ পাতা ব্রত

চৈত্র সংক্রান্তির দিন থেকে সারা বৈশাখ মাস ধরে এই ব্রত করতে হয়। ৫টি অশ্বত্থ পাতা - কচি, কাঁচা, পাকা, শুকনো ও ঝুরঝুরে নিতে হয়। সকালে স্নান করার সময় পাতাগুলি

মাথায় চেপে ধরে পাঁচবার ডুব দিতে হয়। প্রতি বারের ডুব দেবার কালে মন্ত্র পাঠ করতে হয় এক একটি পাতা মাথায় রেখে।

১। পাকা পাতাটি মাথায় দিলে
পাকা চুলে সিঁদুর পরে।
২। কাঁচা পাতাটি মাথায় দিলে
কাঞ্চন মূর্ত্তি হয়।
৩। কচি পাতাটি মাথায় দিলে
নব কুমার কোলে হয়।
৪। শুকনো পাতা মাথায় দিলে
সুখ ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি পায়
৫। ঝুরঝুরে পাতা মাথায় দিলে
হীরা মুক্তোর ঝুরি হয়।

গো-ক্ষুর ব্রত

গো-ক্ষুর ব্রতকে কোন কোন জায়গায় বলে 'গরুর ব্রত'। পৌষ মাসের শুক্লা তৃতীয়াতে বাড়ীর গৃহিণী ভোর বেলায় গোয়ালে গিয়ে গোয়াল ঘর নিকোয়। গরুর শিং-এ তেল, মাথায় ও কপালে সিঁদুর টিপ চন্দন ও কুম্‌কুমের ফোঁটা দেয়। গলায় সোলার মালা বা ফুলের মালা পরিয়ে গরুর পা ধুইয়ে দেয়। পাড়ার সকল এয়োতীরা মিলে এই ব্রত করে। নৈবেদ্যর আতপ-চাল ফলমূল গরুর মুখের কাছে ধরে গরুকে খাইয়ে দেয়। এয়োতীরা ধূপ ধূনা জ্বেলে, গলায় আঁচল দিয়ে বলে ঃ

গো গোবিন্দ সুরধুনী-
চার খুরে দিয়া পানি।
মাথায় নৈবেদ্য, মুখে ঘাস,
বর্ত্তীরা গেল স্বর্গ বাস।

ঐ দিন গরু ছাড়া থাকে, বাঁধা হয় না। সন্ধ্যায় গরুকে গোয়ালে পুরে ধূপ ধূনো জ্বেলে এক আঁটি ঘাস খেতে দেওয়া হয়।

হরির-চরণ ব্রত

এটি হ'ল কুমারী মেয়েদের ব্রত। বৈশাখ মাসের প্রথমদিন থেকেই এই ব্রত করতে হয়। একটি তামার টাট পাত্রে শ্বেত চন্দন মাখিয়ে আঙ্গুল দিয়ে ছোট ছোট দুটি পা আঁকতে হয়। ফুল, দুর্বা, ধান টাটের মধ্যে রেখে তার উপরে মাঝের আঙ্গুল ও বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে চেপে ধরে ব্রতের মন্ত্র বলতে হয় ঃ -

হরির চরণ হরির পা, হরি বলেন ওগো মা।
আজ কেন মা পাটি শীতল, কোন রমণী পূজছে মা বল।
সে যুবতী কি চায়, বর চায় বুঝি, তার মনোমত বর।
রামের মত স্বামী পাবে, লক্ষ্মণের মত দেবর হবে।
কৌশল্যার মত শ্বাশুড়ী চায়, আর কি চায় না, আর কি চায়।
দরবার জোড়া বেটা চায়, সবার সেরা জামাই চায়।

আলনায় কাপড় দল্‌দল্‌ করে, সিঁথির সিঁদুর ঝলমল করে।
পায়ের আলতা টলমল করে, ঘটী বাটী সব ঝক্‌ঝক্‌ করে।
গোয়ালে গরু খামারে ধান, যুগ যুগ যেন বাড়ে মান।
বছর বছর পুত্র হোক্‌, জনম এয়ো-স্ত্রী হয়ে রোক্‌।
এক গলা গঙ্গার জলে, মরণ হবে স্বামী পুত্রের কোলে ॥

দশ-পুত্তুল ব্রত

এই ব্রতও কুমারী মেয়েদের। চৈত্র সংক্রান্তি থেকে বৈশাখ সংক্রান্তি পর্যন্ত একমাস করতে হয়। পিটুলি দিয়ে দশটি পুতুল এঁকে তাকে ফুল কিংবা দূর্বা দিয়ে ব্রতের মন্ত্র উচ্চারণ করে প্রার্থনা করতে হয়। প্রতিদিন বিকেল বেলায় এই ব্রত করার নিয়ম।

১। এবার মরে মানুষ হব, রামের মত পতি পাব।
২। এবার মরে মানুষ হব, সীতার মত সতী হব ॥
৩। এবার মরে মানুষ হব, লক্ষ্মণের মত দেবর পাব।
৪। এবার মরে মানুষ হব দশরথের মত শ্বশুর পাব ॥
৫। এবার মরে মানুষ হব কৌশল্যার মত শ্বাশুড়ী পাব।
৬। এবার মরে মানুষ হব কুন্তীর মত পুত্রবতী হব ॥
৭। এবার মরে মানুষ হব দ্রৌপদীর মত রাঁধুনী হব।
৮। এবার মরে মানুষ হব দুর্গার মত সোহাগী হব ॥
৯। এবার মরে মানুষ হব পৃথিবীর মত ভার সব।
১০। এবার মরে মানুষ হব ষষ্ঠীর মত জেওজ হব ॥

অলক্ষ্মী ব্রত

পশ্চিমবঙ্গের কোন কোন অঞ্চলে সম্ভ্রান্ত পরিবারে কালী পূজোর অমাবস্যার রাতে লক্ষ্মী পূজোর সঙ্গেই অলক্ষ্মী ঠাকুরাণীর ব্রত বা পূজার আয়োজন হয়। সকাল বেলায় বাসী কাপড়ে বাড়ীর গৃহিণীরা একতাল গোবর নিয়ে বাঁ হাত দিয়ে একটি পুতুল তৈরী করেন। কড়ি দিয়ে চোখ, মাথার ছেঁড়া চুল দিয়ে তার মাথার চুল তৈরী করা হয়। সারা অঙ্গে তুলোর বিচি ছড়িয়ে দেওয়া হয়। পরে কলা পেটোর মধ্যে শুইয়ে দিয়ে ঘরের বাইরে (পেটো সমেত) গোবরের অলক্ষ্মী পুতুল মূর্ত্তিটি বসিয়ে রাখা হয়। যে ঘরে মা লক্ষ্মীর পূজা হবে সেই ঘরের বাইরেই বসে থাকবে অলক্ষ্মী ঠাকুরাণী। সন্ধ্যায় লক্ষ্মী পূজা করতে ব্রাহ্মণ এলে তিনি প্রথমেই বাঁ-হাতে কালকাসুন্দে ফুল নিয়ে অলক্ষ্মীর দিকে না চেয়েই মন্ত্র পড়ে ফুল ছুঁড়ে দেন।

মন্ত্র ঃ

ওঁ অলক্ষ্মী ত্বং কু-রূপসি কুৎসিতস্থানবাসিনী
সুখরাত্রৌ ময়া দত্তাং গৃহ্ন পূজার্ঘ্যং শাশ্বতিম্‌!

ব্রাহ্মণের পূজার পর বাড়ীর ছেলেরা বাদ্যি কুলোর পিঠে আঘাতে অলক্ষ্মী ঠাকুরাণীকে ভিটের বাইরে কোন স্থানে রেখে আসে। বিসর্জন পর্ব এখানেই শেষ। ঐ সময় অর্থাৎ বিসর্জন কালে বলতে থাকে ঃ-

অলক্ষ্মী কাটাতে যাচ্ছি
মা লক্ষ্মী ঘরে আসুন।

এরপর পুরোহিত মশাই লক্ষ্মীপূজা করতে বসেন।

অলক্ষ্মী গেল বনে বনে।

লক্ষ্মী এল॥

কালীপুজোর অমাবস্যা রাতে অলক্ষ্মী বিসর্জনের পরে লক্ষ্মী পূজার আয়োজন হয়। বাড়ীর গৃহিণীরা আতপ চাল বেটে পিণ্ড তৈরী করেন। পিটুলী বাটা দিয়ে লক্ষ্মী ও নারায়ণের পুতুল তৈরী হয়। পিটুলির সঙ্গে কাঠকয়লা মিশিয়ে কালো রঙ, হলুদ মিশিয়ে হলুদ রঙ করা হয়। এ দিয়ে নারায়ণের মূর্ত্তি এরং সীমপাতা বেটে পিটুলির সঙ্গে মিশিয়ে লক্ষ্মীর মূর্ত্তি গড়া হয়। নানা অলংকার বস্ত্র ইত্যাদি দিয়ে নারায়ণকে সাজানো হয়। ঐ পিটুলি বাটা দিয়েই বস্ত্র, নারায়ণের পৈতা, লক্ষ্মীর অলংকার গড়া হয়। তারপর কলার পেটোর মধ্যে তাদের শুইয়ে রাখা হয়। তারপর লক্ষ্মীকে পূজার ঘরে স্থানান্তরিত করা হয়।

ঐ সঙ্গে পিটুলি বাটা দিয়ে একটি কড়ি বসিয়ে কুবেরের ভাণ্ডার করতে হয়। শুধু সাদা পিটুলি বাটা দিয়ে। এর অন্য কোন রং হয় না। লক্ষ্মীর গায়ের রং চুণে-হলুদ-লাল, নারায়ণের গায়ের রং হলুদ এবং কুবেরের গায়ের রং সবুজ, কালো দিয়ে চোখ, অলংকার গড়া হয়।

চোদ্দ প্রদীপ পিটুলি দিয়ে তৈরী করে থালায় বসানো হয়। সন্ধ্যায় পূজার পর আরতি করা হয়।

পিটুলি দিয়ে চার কোনা প্রদীপ তৈরী করতে হয়। তার দুপাশে দুটি নৌকোর মতন দুমুখো প্রদীপ তৈরী করে বসাতে হয়। তাকে বলে সুখী ও দুখী। তার চার পাশে চোদ্দটি পিটুলীর প্রদীপ বসাতে হয়। লক্ষ্মী পূজার সময় দীপাবলীতে সব কটি প্রদীপ জ্বালাতে হয়।

নৈবেদ্য - চিঁড়ে, মুড়কী, তাল-আঁটি, নারকেল-সন্দেশ ভোগ দিতে হয়।

ভোরবেলা গৃহিণীকে, উঠে একঘটি জল, কলার ছড়া, আখ একটুকরো বরণডালায় নিয়ে শুকতারা যেদিকে উঠবে সেদিক চেয়ে পৃথিবীকে উদ্দেশ করে জল, তেল, হলুদ, সিঁদুর দিয়ে বরণ করতে হয়।

সুখ সুখ সুখ আমার দুখটা নাও

তোমার সুখটা আমায় দাও।

শুকতারাকে বরণ করার পর গোয়াল ঘরে গিয়ে গোয়াল পূজো করতে হয়। গরুর পা ধুইয়ে, পাখার বাতাস করে পূজো করতে হয়।

পরে সুখের পিটুলীর ফোঁটা বাড়ীর ছেলে মেয়েদের কপালে গৃহিণী এঁকে দেন।

ভাই ফোঁটা

ভাইয়ের মঙ্গল কামনা করে বোনেরা ভাইয়ের কপালে ফোঁটা দেয় তাই থেকে "ভাই ফোঁটা" — বাঙ্গালী সমাজে প্রচলিত একটি আচার। এ সম্পর্কে সকলেরই জানা আছে ।

কার্ত্তিক মাসের শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিকে ভ্রাতৃদ্বিতীয়া কিংবা ভাই দ্বিতীয়া বলে। ঐ দিন সকালে বোন উপবাস করে ভাইকে পিঁড়ি কিংবা আসনে বসিয়ে তার সামনে প্রদীপ জ্বেলে ভাইয়ের মাথায় ধান দূর্বা এবং বাঁ হাতের কড়ে আঙ্গুল দিয়ে কপালে তিনবার চন্দনের ফোঁটা দেয় আর মুখে উচ্চারণ করে ছড়া বলে।

যমুনা দেয় ভাইকে ফোঁটা
আমি দিই আমার ভাইয়ের কপালে ফোঁটা।
ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা
যমের দুয়ারে পড়লো কাঁটা।

কোন কোন অঞ্চলে বোনেরা সন্ধ্যায় ভাইয়ের কপালে ফোঁটা দেয়। বিবাহিত বোনেরা ভাইকে নতুন বস্ত্র উপহার দেয় সেই বস্ত্র পরেই ভাই ফোঁটা নিতে বসে। ফোঁটা দেওয়ার শেষে বোন ভাইকে মিষ্টি মুখ করায়। কোথাও কোথাও ফোঁটা দেবার ছড়া এই রকমও পাওয়া যায়।

প্রতিপদে দিয়ে ফোঁটা, দ্বিতীয়াতে নিতে
আজ হতে ভাই আমার, যমের ঘরে —
নিমের অধিক তিতে।
ঢাক বাজে, ঢোল বাজে আরো বাজে কাড়া
বোনের ফোঁটা না নিয়ে ভাই
না যেও যম-পাড়া।
না যেও যমের ঘর
আজ হতে ভাই আমার রাজ রাজেশ্বর।

ষষ্ঠী

'ষষ্ঠী ব্রত' বঙ্গ নারীর একটি আদর্শ ব্রত। বিভিন্ন মাসে এই ব্রত পালন করার রীতি প্রচলিত। নিচে সেই প্রসঙ্গে আলোচনা করা হল।

জ্যৈষ্ঠ মাসে ঃ

অরণ্য ষষ্ঠী বা জামাই ষষ্ঠী আবার কোন কোন অঞ্চলে আম ষষ্ঠীও বলা হয়। জ্যৈষ্ঠ মাসে শুক্লপক্ষের ষষ্ঠী তিথিতে এই ব্রত করতে হয়। পিটুলি বাটা দিয়ে একটি কালো বিড়াল এঁকে পিটুলির কঙ্কন গড়তে হবে। **উপকরণ** হিসাবে—ফুল, ৬টি করে গোটা পান ও সুপারি, বাঁশপাতা, হলুদ জলে ছোপানো নাকড়া, ৬টি সাট সুতো, তেল, হলুদ, চিঁড়ে, দই ও খই। এই ব্রত পালন করে পূণ্যবতী নারী সন্তানদের মঙ্গল কামনায় ব্রতী হন।

শ্রাবণ মাসে ঃ

লোটন ষষ্ঠী অর্থাৎ লুণ্ঠন ষষ্ঠী। শ্রাবণ মাসের শুক্লপক্ষর ষষ্ঠী তিথিতে মায়েরা তাদের পুত্র-কন্যার মঙ্গল কামনায় এই ব্রত করে থাকে। পুরোহিত এই ব্রতের মাঙ্গলিক ক্রিয়া করে থাকেন। ব্রতের দিনে চাল জাতীয় কোন জিনিস খাওয়া নিষিদ্ধ। এ ছাড়া অন্য যে কোন শুকনো খাবার খেতে পারে। **উপকরণ**—ঘৃত, নিরামিষ তরকারী, ইক্ষুগুড়, ফল, ডাব ও মিষ্টান্ন।

ভাদ্র মাসে ঃ

মন্থন ষষ্ঠী অর্থাৎ চাপড়া ষষ্ঠী। ভাদ্রমাসে ষষ্ঠীর দিন এই ব্রত পালন করার রীতি। পিটুলির পুঁতুল গড়ে সেই চাপড়া তৈরী করে পুকুরে ভাসাতে হয়। পুত্রবতী নারীরা আঁচলে কলা বেঁধে ও কোলে পুত্র-কন্যাদের নিয়ে ব্রত কথা শোনেন। এ দিন ভাত নিষিদ্ধ, লুচি বা পরোটাই খেতে হয়। ব্রতের **উপকরণ** —পিটুলি বাটা, কাঁঠালী কলা সম্পূর্ণ, তাল, ঝিঙে, হাত পাখা। সংসারের ও পুত্র-কন্যার মঙ্গল কামনায় এই ব্রত পালন করা হয়।

আশ্বিন মাসে ঃ

দুর্গা ষষ্ঠী বা বোধন ষষ্ঠী। আশ্বিন মাসে দুর্গা ষষ্ঠীর দিনে এই ব্রত করতে হয়। পূণ্যবতী নারীরা দিনের বেলা উপবাস থেকে এই ব্রত পালন করে। ষষ্ঠীতলায় পূজো দিয়ে প্রসাদ ভক্ষণের পর ঐ দিন দিনের বেলা ভাত না খেয়ে লুচি, পরোটা খেতে হয়, রাতে ফলমূল আহার। আহারের পূর্বেই ব্রতের কথা শোনার বিধি। ব্রতের **উপকরণ** হিসাবে—ফল, দূর্বা, ধূপ, দীপ, আতপ চালের নৈবেদ্য, ফল ও মিষ্টান্ন। এই ব্রত পালনে নারী সন্তান লাভ করেন এবং তাদের মঙ্গল সাধিত হয়।

অগ্রহায়ণ মাসে ঃ

মূলা ষষ্ঠী। অগ্রহায়ণ মাসে শুক্ল-ষষ্ঠীতে স্ত্রীলোকেরা উপবাসী হয়ে এই ব্রত পালন করেন। এই ব্রতের ফল — ব্রতী সহ তার পুত্র-কন্যা সুস্থ দেহ, দীর্ঘ পরমায়ু লাভ করে থাকে। এ দিন মাছ মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ। রাতে রুটি ও মূলোর তরকারী খাওয়ার নিয়ম। **উপকরণ**—মূলা, পান, সুপারী, কলা ও ময়দা।

পৌষ মাসে ঃ

পাটাই ষষ্ঠী। পৌষ মাসে শুক্লা ষষ্ঠীর দিন বাড়ীর মধ্যে উঠানে একটি পুকুর কেটে বেনা গাছ পুঁতে এই ব্রত পালন করতে হয়। পূজা অন্তে ব্রতী, ব্রতকথা শুনে ফলার, ভিজান চিড়েতে দই মিশিয়ে পরিমাণ মত মিষ্টি খাওয়া নিয়ম। **উপকরণ**— ৫ টি আতপ চালের নৈবেদ্য, তার মধ্যে একটি নৈবেদ্য ধোপা-বৌকে দিতে হয়। নৈবেদ্যে ফল ও মিষ্টান্ন দিতে হয়। একটি নৈবেদ্য ঘরে রেখে বাকি তিনটি নৈবেদ্য এয়োদের মধ্যে বন্টন করতে হয়। এই ব্রত পালনে পরিবার-পরিজন, পুত্র-কন্যা অকাল মৃত্যুর হাত থেকে মুক্তি পায়।

মাঘ মাসে ঃ

শীতল ষষ্ঠী বা শেতল ষষ্ঠী। মাঘ মাসের শুক্লা-ষষ্ঠীর দিন এই ব্রত করতে হয়। দই ও বাটা বা গুঁড়ো হলুদে সাদা সুতো ছুপিয়ে বাড়ীর ছেলে মেয়েদের হাতে কব্জীতে অর্থাৎ ডুরী বেঁধে দিতে হয়। ব্রতের পূর্ব দিনে ভাত তরকারী রান্না করে ব্রতের দিন ব্রতের কাজ সমাপ্ত করে সেই বাসি-ভাত, তরকারী খেতে হয়। ওই দিন গৃহস্থ উনুন জ্বালেন না। **উপকরণ**—দই, হলুদ, কলাই, ফল ও মিষ্টান্ন। এই ব্রত পালনে সংসারের শোকতাপ থেকে সকলে রক্ষা পায়।

চৈত্র মাসে ঃ

অশোক ষষ্ঠী। চৈত্র মাসের শুক্ল-পক্ষের ষষ্ঠী তিথিতে এই ব্রতপালন করতে হয়। ব্রত পূজার শেষে ৬টি মুগ কলাই ও অশোক ফুলের কুঁড়ি দই দিয়ে মেখে খেতে হয়। এই দিন ভাত খাওয়া নিষেধ। ব্রত শেষ হলে লুচি, পরোটা, ফল ইত্যাদি খেতে হয়। **উপকরণ**— অশোক ফুল, মুগ-কলাই ও দই। এই ব্রত পালনে পুত্র কন্যা দীর্ঘায়ু হয়।

নীল ষষ্ঠী ঃ

চৈত্র মাসের সংক্রান্তি তিথিতে মেয়েরা সারাদিন উপবাস থেকে সন্ধ্যায় শিবমন্দিরে গিয়ে শিবের মাথায় ডাবের জল ঢেলে তাঁকে প্রণাম করে তার পর জল পান করে থাকেন। **উপকরণ**—বিল্বপত্র, ডাব, বেল, শশা, আতপচাল ও বিবিধ ফল। পুত্রবতী নারীরা এই ব্রত পালনে তাদের সন্তানগণ নীরোগ দেহী ও দীর্ঘায়ু হয়।

মঙ্গল চণ্ডী

বারোমেসে মঙ্গলচণ্ডী ঃ

প্রতি শুক্লপক্ষে বারমেসে মঙ্গল চণ্ডীর ব্রত পালন করার বিধি আছে। গৃহে মঙ্গলচণ্ডীর ঘট স্থাপনা করে যথা নিয়মে পূজা করতে হয়। সেদিন ভাত খাওয়া নিষিদ্ধ। চিঁড়ে, মুড়কী, দই, ফল ইত্যাদি সহযোগে ফলার ভক্ষণ করতে হয়। এই ব্রত পালন করলে সংসারে শ্রীবৃদ্ধি ঘটে ও বিপদ মুক্তি হয়।

হরিষ মঙ্গল চণ্ডী ঃ

বৈশাখ মাসের প্রথম মঙ্গলবার এই ব্রত পালনের বিধি। তারপর প্রত্যেক মাসের মঙ্গলবারে এই ব্রত করতে হয়। ব্রতের নিয়ম — ঘটস্থাপন করে পূজা। **উপকরণ**—ফুল, তুলসীপাতা, আতপচাল, কাঁঠালী কলার নৈবেদ্য। ভক্তি ভরে এই ব্রত পালন করলে ব্রতীর ও পরিবারের কাউকে অমঙ্গল ছুঁতে পারে না।

জয় মঙ্গল চণ্ডী ঃ

জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রতি মঙ্গলবার এই ব্রত পালন করতে হয়। এই ব্রতের ক্রিয়া পুরোহিতেই করেন। পূজার শেষে পুরোহিতকে অর্ধেক ফলার ভক্ষণ করিয়ে বাকী অংশ ব্রতী ভক্ষণ করে থাকে। **উপকরণ**—সতেরোটি সুপারি, ধান দূর্বা, পাকা আম, কাঁঠাল ও পৈতা ইত্যাদি। যে রমণী এই ব্রত করেন তিনি জলে ডুবে মরা, অগ্নিতে দগ্ধ হয়ে পুড়ে মরা, অস্ত্রাঘাত প্রভৃতি থেকে রক্ষা পান।

কুলুই মঙ্গল চণ্ডী ঃ

অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লপক্ষের মঙ্গলবার এই ব্রত পালন করতে হয়। এই মাসের চার মঙ্গলবারই উঠানে আল্পনা দিয়ে ঘট পেতে কুলগাছের ডাল পুঁতে এই ব্রত করার বিধি। পাঁচজন এয়ো ঘটের কাছে বসে আকুলী-সুকুলীর ব্রতকথা শুনে সেখানে বসে ফলার খাবার রীতি। **উপকরণ**—ঘট, জোড়া কলা, জোড়াকুল, চিঁড়ে, পাটালি ইত্যাদি। নৈবেদ্য সাজিয়ে পুজো দিতে হয়। এই ব্রত পালনে পরিবারে কখনো কলঙ্কের দাগ পড়ে না। নিচের ছড়াটি আগে পাঠ করে পরে ফলার খাবার নিয়ম। —

সোনার মঙ্গলচণ্ডী রুপোর বালা
কেন মা মঙ্গলচণ্ডী এত বেলা?
হাসতে খেলতে পাটের শাড়ি পরতে,

সোনার দোলায় দুলতে, শাঁখা শাড়ি পরতে,
তেল হলুদ মাখতে, আঘাটায় ঘাট করতে
অপথ — পথ করতে, অরাজকে রাজ্য দিতে
আইবুড়োর বিয়ে দিতে, হা-পুতির পুত দিতে,
নির্ধনের ধন দিতে, চোরের বন্ধন ঘোচাতে
কানার চক্ষু দিতে, অন্ধের নড়ি দিতে
তাই এত বেলা।

সঙ্কট মঙ্গলচণ্ডী ঃ

অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লপক্ষে মঙ্গলবারে সঙ্কট মঙ্গলচণ্ডীর পূজা করতে হয়। ব্রতের উপকরণ—আটটি দূর্বা-গোছা, আটটি আতপ চাল, রেশমী কাপড়ের এক-টুকরা এবং উপযুক্ত নৈবেদ্য। হারানো সম্পদ ফিরে পাবার জন্যই এই ব্রতের প্রচলন।

সঙ্কটা মঙ্গলচণ্ডী ঃ

যে কোন মাসের যে কোন শুক্রবার এই ব্রত পালনকরতে হয়।

লাটাই মঙ্গলচণ্ডী ঃ

অগ্রহায়ণ মাসে প্রতি রবিবার সন্ধ্যায় ধূপ, প্রদীপ জ্বেলে, ষোড়শউপচারে এই ব্রত উদযাপন করতে হয়। সারাদিন উপোসে থেকে রাতে ব্রত কথা শুনে দুধ, মিষ্টি, ফল খাওয়া রীতি। এই ব্রত করলে চিরদিন সুখ শান্তিতে জীবন কাটে।

সোনার সংক্রান্তি ঃ

পৌষ মাসে মকর সংক্রান্তির দিন এই ব্রত করতে হয়। কলা পোটার ডিঙ্গি, গাঁদা ফুল, জোড়া কলা, জোড়া পান, সুপারি, পৈতা, কড়ি আঁটা ভাঁড় ইত্যাদি দিয়ে ডিঙ্গি সাজিয়ে ঐ দিন উপবাসী থেকে ব্রত শেষে ডিঙ্গিতে ঘৃতের প্রদীপ জ্বালিয়ে নদীতে বা পুকুরে ভাসিয়ে দিতে হয়। এই ব্রতের ফল পরিবারের সকলের ন্যায় পথে মতি হয়।

মঙ্গল সংক্রান্তি ঃ

যে মাসের ৩০ তারিখ শুক্লপক্ষের, মঙ্গলবার যে সংক্রান্তি হবে সেই দিন মঙ্গল সংক্রান্তি ব্রত করতে হয়। ব্রতের উপকরণ—ফুল, দূর্বা, আলতাপাতা, সুপারি, চিঁড়ে, দুগ্ধ, মুড়কী, মিষ্টান্ন। ব্রতের ফল—সর্ববিধ রোগ থেকে মুক্ত হওয়া যায়।



দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ছড়া

বাংলা সাহিত্যের আদি পর্বে সাহিত্য ও সঙ্গীতকে সমৃদ্ধ করেছে ছড়া। সাহিত্য যখন লেখা সাহিত্য রূপে অন্তরাল থেকে উকি ঝুকি দিচ্ছে মাত্র, তখন সমকালীন কতিপয় সুবিজ্ঞ ব্যক্তি বিশেষ প্রচারের উদ্দেশ্যে জনবহুল স্থানগুলিতে স্বরচিত ভাষায় সরল ছন্দ আরোপ করে আবৃত্তি করতেন বা গেয়ে বেড়াতেন। তাঁরাই ছিলেন সেকালের চারণ কবি। সাহিত্যকে যদি জগৎ বলি তবে, "ছড়ার জগৎ হ'ল জগতের টুকরো বা টুকরোর জগৎ"— এমন উক্তি করেছেন গোপাল হালদার মহোদয়। "যাহা অস্ফুট ও অতীন্দ্রীয় তাহা নহে, যাহা প্রাকৃত ও প্রত্যক্ষ বাঙ্গালীর সেই রসজীবনই এই ছড়াগুলিতে রূপান্তরিত হয়েছে" — বলেছেন ড সুশীল কুমার দে তাঁর বাঙলা প্রবাদ গ্রন্থে। বস্তুবাদী, রসিকতাপ্রিয় বাঙালীর পরিচয়, তাদের জীবনের বাস্তব চিত্র এই ছড়াগুলিতে প্রকাশিত হ'ত। ছড়া হ'ল স্বভাব কবিদের উক্তি। পদান্ত মিল রেখে সরল ছন্দে অনর্গল বলে যাবার নাম হ'ল ছড়া। এগুলিই মূলতঃ সাহিত্যের বুনিয়াদ কিন্তু যে সংকীর্ণ ঝর্ণাধারাগুলির সংমিশ্রণে একটি স্রোতস্বিনী রূপ ধারণ করে, নদী সুবিশাল হয়ে যখন স্বাতন্ত্র্য খুঁজে পায় তখন সে ঝর্ণা ধারাগুলির উপযোগ থাকে না তাই মিলিয়ে যায়, ঠিক তেমনি সাহিত্য যখন সাগরের রূপ নিয়েছে ঝর্ণা-রূপী ছড়া তখন আপনা থেকেই শুকিয়ে গেছে। আবার আধুনিককালে যখন কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর গভীর সরস বিচারে ছড়ার গুরুত্ব মেনে নিয়েছেন তখন বাঙলা ছড়াকে আর সাহিত্য ক্ষেত্রে কারও অপাংক্তেয় করার সাধ্য নেই। সাহিত্যের গতিপথ ছেড়ে ছড়া তখন সঙ্গীতের গতিপথ নিয়েছে।

ছড়া কবে সৃষ্টি হয়েছিল সঠিক করে তা বলা যায়না, তবে আমরা যাকে অনার্য সভ্যতা বলি, তার সূত্রও ছড়ার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়। প্রাচীনকালের আয়ার্ল্যাণ্ডের চারণ কবিরা ছিলেন মুগ্ধ ছড়াকার। ইউরোপ থেকে শুরু করে চীন দেশ, ইন্দোনেশিয়া ব্রহ্মদেশ হয়ে ভারতবর্ষ পর্যন্ত এই ছড়ার বিস্তৃতি প্রায় সমসাময়িককালেই ঘটে। আবার মধ্যযুগেই ভারতের সূত্রে নেপাল, তিব্বত ইত্যাদি স্থানে এই ছড়া সংস্কৃতি কিছুটা বিস্তৃত হয় বিশেষত মানুষের যাতায়াত ও সামাজিক মেলামেশার সূত্র ধরে। কোন একটি বিশেষ ঘটনা, তার কারণ এবং ফলাফল সুন্দরভাবে বর্ণনা করে ছড়াগুলি তৈরী হ'ত। তা ঐতিহাসিক; পৌরাণিক বা দেশাত্মবোধক যে কোনও রকমই হতে পারত। ঘটনার বিষয়গুলিকে সম্প্রচার করার জন্যই মেলা, উৎসব, হাট, বাজার, খেয়াঘাট ইত্যাদি স্থানে একক ভাবে ছড়াগুলি শোনানো হ'ত। লোকেরা শুনত আর প্রভাবিত হ'ত। বাঙলার বর্গীর হাঙ্গামার বিবরণ, আলিবর্দ্দীর পরাভব, ভাস্কর পণ্ডিতের নিধন ইত্যাদি বিষয়গুলি ছড়াকারে বর্ণনা করেছেন নড়াইলের গঙ্গারাম দত্ত। পরে গ্রন্থ আকারে এটিই 'মহারাষ্ট্র পুরাণ' বলে পরিচিত হয়েছে। সম্প্রচার বা ছড়ানোর উদ্দেশ্যে ব্যবহার হত বলেই মনে হয় এগুলিকে বলা হ'ত ছড়া। এমন অনেক ছড়ার নিদর্শন পাওয়া যায় ত্রিপুরার 'রাজমালা' নামক ঐতিহাসিক কাব্যে। তা ছাড়া অনেক বাস্তব ঘটনা নিয়ে ছড়া তৈরী করেছেন রাইকৃষ্ণ দাস। তাঁর ছড়াগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল 'বানের ছড়া', 'রাস্তার ছড়া', 'সাওতাল হাঙ্গামার ছড়া' ইত্যাদি। দশশালা বন্দোবস্তের আগে 'নয় আনার' জমিদার প্রজাশক্তির সহায়তায়

তাঁর জমিদারী উদ্ধার করেন। সে প্রসঙ্গটি নিয়ে প্রসিদ্ধ 'নয় আনার ছড়া' বলে ছড়া রচনা করেছেন কৃষ্ণ হরিদাস, রংপুরের একজন স্বভাব কবি। এ ছাড়া দেবী সিংহের অত্যাচারের বিষয় বর্ণনা করে ছড়া রচনা করেছেন উত্তর বঙ্গের শ্রী রতি রায়। প্রচলিত ছিল মজনু ফকিরের ছড়া, মানিক পীরের ছড়া, এগুলির নিদর্শন পাওয়া গেছে। তা ছাড়া কবি জয়দেবর যুগে চারণ কবি উমাপতি, ধোয়ী, পরাশর প্রমুখের ছড়া ছিল বলে জানা যায়।

ছড়ার বিভিন্ন ধরণের প্রয়োগ ছিল। দুই জন চারণ কবি মুখোমুখী হয়ে পৌরাণিক বা সামাজিক বিষয় নিয়ে ছড়ার লড়াই করতেন। তার থেকেই সৃষ্টি হয় পরবর্তীকালে কবিগান। এই ছড়ার ভঙ্গীকে আশ্রয় করেই সৃষ্টি হয় পাঁচালী গান, মঙ্গলগান, তরজা গান ইত্যাদি। চৈতন্যযুগে এই ছড়ার পদ্ধতি অনুসারেই রচিত হয় লোচন দাসের চৈতন্য মঙ্গল, গোবিন্দের কড়চা ইত্যাদি গান ও সাহিত্যের উপকরণ। বিংশ শতকের প্রথমদিক পর্যন্ত কিছু কিছু ছড়া গানে পর্যবসিত হয়েছিল আবার কিছু পাঠ্যরূপে পাঁচালী আকারে বেঁচে ছিল। আধুনিক যুগে পাশ্চাত্য 'রাইমের' আদর্শে শিশুদের উপযুক্ত বহু ছড়া রচনা করে এই ছড়ার একটি নূতন মোড় এনেছেন শিশু সাহিত্যিক সুকুমার রায়। রবীন্দ্রনাথও উন্নত মানের কিছু ছড়া রচনা করেছেন। তবে তাঁরা কেবল শিশু পাঠকদের উদ্দেশ্যেই এগুলিই রচনা করেছিলেন। কিন্তু প্রাচীনকালে এই ছড়া ছিল গণশিক্ষার একটি বিশেষ মাধ্যম। বর্তমানে প্রচলিত কয়েকটি ছড়া ও ছড়াগানের উদাহরণ দেওয়া হ'ল।

বিবাহ বাসরে নাপিতের ছড়া

শুভদৃষ্টির পূর্ব মুহূর্তে ছাঁদনা তলায় নাপিতের ছড়া বলার রীতি সমগ্র বাংলাদেশেই প্রচলিত। তার পরই শুভদৃষ্টি। ছড়ার মধ্যে শ্লেষ, বিদ্রূপ, ব্যাঙ্গ, হাসি ঠাট্টা ও অশ্লীল ভাষারও প্রচলন দেখা যায়। এরকম দু'টি ছড়া এখানে তুলে ধরা হ'ল। দু'টি ছড়াই পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে বিবাহ অনুষ্ঠানে নাপিতের কণ্ঠে শোনা যায়। এই সব ছড়ায় কোন সুর থাকে না কবিতার মতই পাঠ হয়। আবার অনেক সময়েই পংক্তি পাঠ সুরেলা হয়ে ওঠে।

শুনুন শুনুন সর্বজন করি নিবেদন,
বিবাহের বৃত্তান্ত কথা করিবেন শ্রবণ।
কন্যা কর্তা সীতার পিতা এমনি অভিপ্রায়
বর কর্তা দশরথ রামের পিতা হয়।
বর লয়ে বরযাত্রী অযোধ্যা নিবাসী,
উপস্থিত হইলেন জনকালয়ে আসি।
কি শোভা হয়েছে হেরী জুড়োয় অন্তর
উদয় আলোয় যেন উদয় শশধর।

এই ধরণের আর একটি ছড়া। একে কোনো কোনো অঞ্চলে বলে ছাউনী নাড়া ছড়া।

শুনুন শুনুন সবে ছাউনী নাড়ার কথা,
দৈবযোগে গিয়াছিলাম শহর কলিকাতা।
বাহান্ন নম্বর বাজার আর তেপান্ন নম্বর বাড়ী,
তার ভিতরে ছাউনী নাড়ার দেখলাম হুড়োহুড়ি।
রাম সীতা সম সেথা হচ্ছিল মিলন

শুনুন সবে কর্ণ খুলে তারি বিবরণ।
এক রমণী এলো ছুটে করবে বলে মন্দ
পা পিছলে গেল পড়ে লাগল বিষম দ্বন্দ্ব।
ভাংলো ঠ্যাং যন্ত্রণায় যায় গড়াগড়ি
লুচি মন্ডা কিছুই খাওয়া হলোনাকো তারি।
লজ্জা পেয়ে পালিয়ে গেল আপনারি বাড়ী।
ঐ ধরণের নারী কেহ হেথায় যদি থাকে,
সে যেন তার নিজ স্বামীর মরা মুখ দেখে।
যদি না শোন আমার বাণী
ধরবে তবে চোখে ছানি।
গলায় হবে গড়গরন্দ পিঠে পৃষ্ঠব্রণ
যদি না কেউ আমার কথা শোন।
তার নাকেতে হবে নাসা
ফিঙে পাখি করবে বাসা।
আমার কথা হল শেষ
আহা তবে বেশ বেশ।
তাইরে নাইরে না
দু'জনে চেয়ে দেখ না।। — মাজু, হাওড়া।

ছড়া অনেকরকমের হয়। তবে সবরকমের ছড়া নিয়ে এখানে আলোচনার অবসর নেই। যে সব ছড়া আওড়ানোর সময় সুরেলা হয়ে উঠে এখানে তেমনি কয়েকটি ছড়া তুলে ধরা হলো মাত্র।

মেয়েলী ছড়া

(শাক সবজী নিয়ে হাওড়া জেলার একটি মেয়েলী ছড়া।)
শুশনী শাকের বোঁটার ওপর দিকে পাতা।
বৌ-ঝিয়েরা তুলতে এসে কয় দুঃখের কথা।।
হিংচে সাক তুলতে গেলে কেউ করেনা মানা।
পুঁই বলে ফোক্লা ফোক্লা দাঁতে করি আনাগোনা।।
কুমড়ো শাক বলে আমার গা খড়খড়ি।
রান্না করে খাবে ঝিঙে আর বড়ি।।
কলমি শাক বলে আমায় কেউ তো বাধা দেয় না।
লাউ শাক বলে শোন
আমার গলায় কোপ (চোপ্) দিতে
সবাই করে মানা।
নটে শাক বলে আমি টাপুর টুপুর।
আমাকে খাবে সবে উচ্ছেরি উপুর।।

গিমে শাক বলে রই মাটির ওপর বসে।
টানাটানি করে আমায় খাবার থালায় বোসে।।
পালঙ্ শাক বলে আমার লম্বা লম্বা শিষ।
পাড়া পড়শী বলে আমায় দুঝাড় দিস্।।
সজনে শাক বলে আমি সকল শাকের হেলা।
খোঁজে আমায় বৌ ঝিয়েরা টানাটানির বেলা।।

— পুরাস, হাওড়া।

এই ধরণের লৌকিক ছড়া-গান বালক বালিকাদের মুখে শোনা যায় বৃষ্টি ঝরার সময়ে। এগুলি গ্রামের মানুষরাই রচনা করেছিলেন। এগুলি যুগে যুগে মানুষের মুখে মুখে ঘুরে ফিরছে। এমন একটি ছড়াগানের নমুনা তুলে ধরা হ'ল ঃ —

বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর
নদে এল বান,
শিব ঠাকুরের বিয়ে হলো
তিন কন্যে দান।
এক কন্যে রাঁধেন বাড়েন
আর এক কন্যে খান,
আর এক কন্যে গোঁসা করে
বাপের বাড়ী যান।।
বাপের বাড়ীর তেল-সিন্দুর মালীদের ফুল
এমন খোঁপা বেঁধে দেবো - হাজার টাকা মূল।।

একটি গরীব মেছুনী মেয়ে গ্রাম থেকে শহরে এসে ঝি-এর কাজ করে। তারই মনের বাসনা কামনা এই ছড়া গানে প্রকাশ পেয়েছে —

ঢাল নেই চুলো নেই
নেই কোন দাম,
কিনে দিতে হবে আমায়
একটি রাঙা পান।
রাঙা পান খেয়ে আমি মুখ রাঙাবো
রোজ দু'বেলা বাবুর বাড়ী কাজে মন পাবো।
মা যে আমার মাছ কুড়ানী
মরলো ওলাউঠায়
বাপ গেল বাঘের পেটে
সুন্দর বনের নায়।।

কয়েকটি প্রবাদোপম মেয়েলী ছড়া -

(১) ও শাশুড়ী পায়ে পড়ি
দিওনা আর গঞ্জনা,

আমি যে কুলের বঁধু
কুল মজাতে পারি না। —স্বঃ লিঃ - ৭(ক)

(২) ছোট সরাটি ভেঙ্গে গেছে
বড় সরাটি আছে,
নাচন কোদন কর কি বৌ —
আমার, হাতের আট্‌কান আছে।

(৩) কত যে বড় মানুষের ঝি
কাঁচ্‌কলা কোটাতে আমি
বুঝতে পেরেছি।

বহু বিবাহ প্রথা সংক্রান্ত ছড়াটিতে সতীনের জ্বালা অসহ্য হয়েছে তারই প্রতিফলন ঃ—

অশথ তলায় বসত করি।
সতীন কেটে আলতা পরি।।
সাত সতীনের সাত কৌটো।
তার মাঝে আমার এক অভ্রের কৌটো।।
অভ্রের কৌটো নাড়িচারী।
সাত সতীনকে পুড়িয়ে মারি।।

নিচের ছড়াটিতে মেয়েকে শ্বশুর বাড়ী পাঠাতে মা-এর মর্ম বেদনা ফুটেছে ঃ-

আজ দুর্গার অধিবাস, কাল দুর্গার বিয়ে।
দুর্গা যাবেন শ্বশুর বাড়ী সংসার কাঁদায়ে।।
মা কাঁদেন মা কাঁদেন ধূলায় লুটায়ে
সেই-যে মা পালাকাটি দিয়েছেন গলা সাজায়ে।।
বাপ কাঁদেন বাপ কাঁদেন দরবারে বসিয়ে
সেই-যে বাপ টাকা দিয়েছেন সিন্দুক সাজিয়ে।।

একটি মেয়েলী ছড়া যার মধ্যে নারীর সামান্য চাহিদাটুকু মেটানোর কথা রয়েছে ঃ-

নাক ছাবি গহনা
কবে দেবে বলনা
যদি বল কাল দেবো
ভোরে উঠে চলে যাবো
বলে যাব না।

ঘুমপাড়ানী ছড়া

(১)

আয়রে পাখি লেজ ঝোলা,
খোকন নিয়ে কর খেলা।
খাবি-দাবি কলকলাবি
খোকাকে মোর ঘুম পাড়াবি।।

(২)

আয় ঘুম আয়
বাগদি পাড়া দিয়ে,
বাগদিদের ছেলে ঘুমোয়
জাল মুড়ি দিয়ে।।

(৩)

ঘুমপাড়ানি মাসী পিসি মোদের বাড়ী এস,
খাট নাই পালঙ নাই চোখ পেতে বস।
বাটা ভরা পান দেবো গাল পুরে খাও
খোকার চোখে ঘুম নাই ঘুম দিয়ে যাও।

(৪)

ছেলে ঘুমুল পাড়া জুড়ুল
বর্গি এলো দেশে,
বুলবুলিতে ধান খেয়ে যায়
খাজনা দেবো কিসে?
ধান ফুরুল পান ফুরুল
খাজনার উপায় কি?
আর ক'টা দিন সবুর কর
রসুন বুনেছি।
কিসের মাসি কিসের পিসি
কিসের বৃন্দাবন,
মরা গাছে ফুল ফুটেছে
মা বড় ধন।।

(৫)

ঘুম পাড়ানি মাসি পিসি মোদের বাড়ী যেয়ো।
বাটা ভরা পান দেব গাল ভরে খেয়ো।।
শান-বাঁধানো ঘাট দেব বেসম মেখে নিয়ো।
শীতল পাটি পেড়ে দেব পড়ে ঘুম যেয়ো।।
আম কাঁঠালের বাগান দেব ছায়ায় ছায়ায় যাবে।
চার চার বেহারা দেব কাঁধে করে নেবে।।

(৬)

আয় আয় চাঁদ মামা টী দিয়ে যা
চাঁদের কপালে চাঁদ টী দিয়ে যা।।
মাছ কুটলে মুড়ো দেবো,
ধান ভাঙলে কুঁড়ো দেবো,
কালো গরুর দুধ দেবো,
দুধ খাবার বাটি দেবো,

সোনার থালে ভাত দেবো
রাজার মেয়ে বিয়ে দেবো
চাঁদের কপালে চাঁদ টী দিয়ে যা।
সোনার কপালে আমার টী দিয়ে যা।।

খেলার ছড়া

ছড়া গান ঃ ছড়া আওড়ানোর সময় এক সাদামাটা গোছের সুর এসে যায়। ছন্দতো থাকেই, লয়েরও পরিবর্তন ঘটতে দেখা যায়। সুর, ছন্দ, লয় এই তিনের সমন্বয়েই তো গান গড়ে ওঠে। তাই এখানে ছড়াকে বলা হচ্ছে ছড়াগান।

গ্রামের বালক বালিকারা সন্ধ্যায় একসঙ্গে বসে ছড়া বলতে বলতে খেলা করে। কখনো হাঁটুতে হাঁটুতে চাপড় মেরে তারা ছেলে ভুলানো ছড়া গানের মধ্যে ফুটিয়ে তোলে গ্রামের এক সরল সমাজ চিত্র।

জনপ্রিয় একটি ছড়াগান হল —
আগডোম্ বাগডোম্ ঘোড়াডোম্ সাজে
ঢাক ঢোলক কাঁসর বাজে।।
বাজতে বাজতে চলল ডুলি
ডুলি গেল সেই কমলাপুলি।।
কমলা পুলির টিয়েটা
সুয্যি মামার বিয়েটা।।
আর রঙ্গ হাটে যাই
গুয়া পান কিনে খাই।।
একটি পান ফোপরা
মায়ে ঝিয়ে ঝগড়া।।

●

তাই তাই তাই
মামার বাড়ী যাই
মামার বাড়ী ভারি মজা
কিল চড় নাই।

●

আমরা দুটি ভাই
শিবের গাজন গাই,
ঠাকমা গেছেন গয়াকাশী
ডুগডুগি বাজাই।

●

আয রে আয় টিয়ে
নায়ে ভরা দিয়ে
না' নিয়ে গেল বোয়াল মাছে

তাই না দেখে ভোঁদড় নাচে
ওরে ভোঁদড় ফিরে চা'—
খোকার নাচন দেখে যা।।

আর একটি ছড়া যা শিশুরা ঘরের মেঝেতে দলগতভাবে বসে হাত মেঝেয় রেখে আঙুল স্পর্শ করে বলে। ছড়া পাঠের মধ্যেই তাদের খেলা। ছড়া পড়া যেখানে শেষ অর্থাৎ যে আঙ্গুলে যার হাতে শেষ হবে তাকে সেই আঙ্গুল মুড়ে ফেলতে হবে। এই ভাবে দলের সবার আঙ্গুল মোড়া হলে এক পর্ব খেলা শেষ হয়। প্রথমে একজন ছড়া বলে তার বলার মধ্য দিয়ে সকল আঙ্গুল মোড়া হলে আবার বলা শুরু করে। এই ভাবেই চলে ছড়ার মাধ্যমে খেলা যতক্ষণ না প্রতিটি আঙুল মোড়া হয়। গ্রাম্য ছড়াটি এই ঃ —

ইকিড় মিকিড় চাম চিকিড়
চামে কাটা মজুমদার
ধেয়ে এল বরের বাপ
বরের বাপের হাঁড়ি কুড়ি
গোয়ালে বসে চাল কুঁড়ি,
চাল কুটতে গেল বেলা
ভাত খাবি আয় জামাই শালা,
ভাতে পড়লো মাছি
কোদাল দিয়ে চাঁচি,
কোদাল হল ভোঁতা
খা কামারের মাথা।।

আরো একটি ছড়ার নমুনা দেওয়া হল মাঠে বা বিদ্যালয়ে খেলার ঃ-

আম পাতা জোড়া জোড়া
মারবো চাবুক চড়বো ঘোড়া
ওরে বিবি, সরে দাঁড়া
আসছে আমার পাগলা ঘোড়া
পাগলা ঘোড়া খেপেছে
বন্দুক ছুঁড়ে মেরেছে।
অল রাইট ভেরী গুড
মেম্ খায় চা-বিস্কুট।।

বালক বালিকাদের এইসব খেলার ছড়া এখন অপ্রচলিত ঃ-

আইকম্ ভাইকম্ তাড়াতাড়ি,
যদু মাষ্টার শ্বশুর বাড়ী।
রেলকম্ ঝমাঝম্,
পা পিছলে আলুর দম্।।

●

বলে গেছেন ডাক্তারবাবু
জল সাবু পাতিলেবু।

ইস্টিসানের মিষ্টি কুল
শখের বাদাম গোলাপফুল
রাম দুই সাড়ে তিন
অমাবস্যা ঘোড়ার ডিম্।।

●

দোল দোল দোলুনী,
রাঙা মাথায় চিরুনী।
বর আসবে এক্‌খুনি,
নিয়ে যাবে তক্‌খুনি।

বালক বালিকার খেলার ছড়া ঃ-

অবর ডবর চালতা চবর
চালতা দিয়ে ডাল মুশুরি
ধরতো মুচির কানটা।
কান দোল ঝিঙের দোল।
বারো মাসে তের দোল।
কান দোল দোল দোলানী, বর আসবে এক্ষনি
নিয়ে যাবে তক্ষুনি।

নিচের এই খেলার ছড়াগুলির চিত্র সৌন্দর্য মনকে নাড়াদেয়

যমুনাবতী সরস্বতী কাল যমুনার বিয়ে।
যমুনা যাবেন শ্বশুর বাড়ী কাজিতলা দিয়ে।
কাজিফুল কুড়তে গিয়ে পেলুম মালা।
হাত-ঝুম্‌ঝুম্ পা-ঝুম্‌ঝুম্ সীতারামের খেলা।
নাচো তো সীতারাম কাঁকাল বেঁকিয়ে।
আলো চাল দেব টাপাল ভরিয়ে।।
আলো চাল খেতে খেতে গলা হল কাঠ।
হেথায় তো জল নেই ত্রিপূর্ণির ঘাট।।
ত্রিপূর্ণির ঘাটে দুটো মাছ ভেসেছে।
একটি নিলেন গুরুঠাকুর, একটি নিলেন কে।।
তার বোনকে বিয়ে করি ওড়ফুল দিয়ে।।

●

আয়রে আয় ছেলের পাল মাছ ধরতে যাই।
মাছের কাঁটা পায়ে ফুটল দোলায় চেপে যাই।।
দোলায় আছে ছ'পণ কড়ি গুনতে গুনতে যাই।।
এ নদীর জলটুকু টলমল করে।
এ নদীর ধারে রে ভাই বালি ঝুর্‌ঝুর্ করে।।
চাঁদ মুখেতে রোদ লেগেছে রক্ত ফুটে পড়ে।।

আদুড় বাদুড় চালতা বাদুড়
কলা বাদুড়ের বে' —
টোপর মাথায় দে'।
দেখতে যাবে কে?
চামচিকেতে বাজনা বাজায়
খ্যাংরা কাঠি দে'।।



পানকৌড়ী, পানকৌড়ী, ডাঙ্গায় ওঠো না।
তোমার শাশুড়ী বলে গেছে বেগুন কোট না।।
ও বেগুনটা কুটো না, বীজ রেখেছে,
ও দুয়ারে যেও না, বধু এসেছে।
আজ বধুর গায়ে হলুদ কাল বধুর বিয়ে।
বধুকে যে নিয়ে গেল বকুলতলা দিয়ে।
বকুল ফুল কুড়াতে গিয়ে পেয়ে গেলাম মালা,
রাম শালিকের বাদ্যি বাজে, তুলারামের খেলা।

ছেলে ভুলানো ছড়া

চাঁদ উঠেছে ফুল ফুটেছে কদম তলায় কে
হাতি নাচছে ঘোড়া নাচছে সোনামণির বিয়ে।
আয় চাঁদ আলো করে দিঘীর জল কালো করে
মাছ কাটলে মুড়ো দেবো
ধান ভাঙলে কুঁড়ো দেবো
কালো গরুর দুধ দেবো
দুধ খাবার বাটী দেবো
চন্দ্রচূড় হার দেবো
সোনার কপালে চাঁদ টী দিয়ে যা।



খোকা যাবে শ্বশুর বাড়ী, সঙ্গে যাবে কে?
ঘরে আছে হুলো বেড়াল কোমর বেঁধেছে।
আম কাঁঠালের বাগান দেব ছায়ায় ছায়ায় যেতে
শান-বাঁধান ঘাট দেব পথে জল খেতে।
ঝাড় লণ্ঠন জ্বেলে দেব আলোয় আলোয় যেতে
উড়কি ধানের মুড়কি দেব শাশুড়ী ভুলাতে।



আটুল বাঁটুল শ্যামলা সাঁটুল, শ্যামলা গেল হাটে;
শ্যামলাদের মেয়ে দুটি পথে বসে কাঁদে।

আর কেঁদোনা আর কেঁদোনা, ছোলা ভাজা দেবো
আবার যদি কাঁদো, তবে ঝোলায় ভরে নেবো।

●

আমার কথাটি ফুরলো
নটে গাছটি মুড়লো।
কেন রে নটে মুড়ুলি?
গরুতে কেন খায়।
কেন রে গরু খাস?
রাখাল কেন চরায় না।
কেন রে রাখাল চরাস না?
বউ কেন ভাত দেয় না।
কেন রে বৌ ভাত দিস না?
কলা গাছ কেন পাত ফেলে না।
কেন রে কলাগাছ্ পাত ফেলিস না?
জল কেন হয় না।
কেন রে জল হ'স না?
ব্যাঙ কেন ডাকে না।
কেনরে ব্যাঙ ডাকিস না?
সাপে কেন খায়।
কেন রে সাপ খাস?
বোকার ধন খাব নি —
গুড়্‌গুড়্‌তে যাব নি।।

বাস্তব জীবন কেন্দ্রিক ছড়া

এ ছড়াটিতে সমাজ জীবনের দুঃখ দুর্দশার ছবি ফুটেছে ঃ -

ও পারেতে কালো রঙ্, বৃষ্টি পড়ে ঝম্ ঝম্
এ পাড়েতে লঙ্কাগাছটি রাঙা টুকটুক্ করে।
গুণবতী ভাই আমার, মন কেমন করে।।
এ মাসটা থাক দিদি, কেঁদে ককিয়ে।
ও মাসেতে নিয়ে যাব পাল্কী সাজিয়ে।।
হাড় হল ভাজা ভাজা, মাস হল দড়ি।
আয়রে আয় নদীর জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ি।।

এ'গুলি হ'ল প্রচলিত ছড়া বিশেষ। রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর উত্তর কালে আধুনিক যুগে এ ছড়া বিশেষভাবে বৈচিত্র্যপূর্ণ হয়েছে প্রাজ্ঞ ব্যাক্তিদের দ্বারা অলংকৃত হয়ে নিম্নরূপ ধারণ করেছে। এই সংস্কার ও অলংকরণ পর্বে একদিকে যেমন আছেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ অন্যদিকে প্রগতিশীল শিশু সাহিত্যিক সুকুমার রায় এবং সাহিত্য জগতের আর এক দিকপাল শ্রী অন্নদা শংকর রায় প্রমুখ। তাঁদের অপূর্ব রচনাশৈলীর নিদর্শন স্বরূপ আধুনিক ছড়ার উদাহরণ নিম্নে সংকলিত হ'ল।

জমিদার

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ঝিনেদার জমিদার কালা চাঁদ রায়রা,
সে-বছর পুষেছিল একপাল পায়রা।
বড়ো বাবু খাটিয়াতে বসে বসে পান খায়,
পায়রা আঙিনাতে খুঁটে খুঁটে ধান খায়।
হাঁসগুলো জলে চলে আঁকা-বাঁকা রকমে
পায়রা জমায় সভা বক্ বক্ বকমে।

বউচুরি

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সুরেশ্বরে মজা ভারি!
কাঠবেড়ালের বউচুরি!
বুড়ো-আংলা মানুষ এলো,
দুটো বাচ্ছা দিয়ে গেলো।
মহান্ত ঠাকুর বড় দয়াল
খাঁচা খুলে ছেড়ে দিলো
বাচ্ছা-সমেত কাঠবেড়াল।।

হ য ব র ল

সুকুমার রায়

একের পিঠে দুই চৌকি চেপে শুই
পোটলা বেঁধে থুই গোলাপ চাঁপা যুঁই
ইলিশ মাগুর রুই হিঞ্চে পালং পুঁই
শান-বাঁধান ভুঁই গোবর জলে ধুই
কাঁদিস কেন তুই?

কম্‌লা-ফুলি

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

কম্‌লা-ফুলি, কম্‌লা-ফুলি! কম্‌লা লেবুর ফুল!
কম্‌লা-ফুলির বিয়ে হবে কানে মোতির দুল!
কম্‌লা-ফুলির বিয়ে —
দেখতে যাবে, ফলার খাবে, চন্দনা আর টিয়ে!
কোথায় থাকো কম্‌লা-ফুলি? — 'সিলেট আমার ঘর'
টিয়ে বলে, 'দেখতে যাব, পাখায় দিয়ে ভর!'

চাঁদের মাটি

প্রেমেন্দ্র মিত্র

আকাশেতে ছিল চাঁদ
হ'ল তাই প্রাণে সাধ
একবার গিয়ে আসি বেড়িয়ে।
দরকার ভাবলে
মাটি কিছু থাকলে
নিয়ে আসি আসমান পেরিয়ে।
সেই মাটি বিলিয়ে
পৃথিবীতে মিলিয়ে
দিলে লেগে যায় যদি ভেলকি,
হিংসার নখ দাঁত
খসে গিয়ে নির্ঘাত
মানুষ-ই দেখাবে নয়া খেল কি?
মাটিতে পা আর নিয়ে চোখে চাঁদ,
দুনিয়া আরেক হোক সংবাদ।

দে হাওয়া দে

নির্মলেন্দু গৌতম

হাজার টাকার হিসাব কষে যখন তিনি ক্লান্ত,
পান যাকে ঠিক সামনে তাকেই বলেন 'পাখা আনতো'।
'দে হাওয়া দে —' বলতে থাকেন হেসেই অট্টহাস্য,
টাকার গরম আছেই, সে হোক পাঁচ অথবা পাঁচশো।
"হিসেব তার গরম আরো —
কাজেই হাওয়া বইয়ে —
দেনা এবার টাকার গরম
একেবারে ক্ষইয়ে!!"

উটের ছড়া

অন্নদাশঙ্কর রায়

উষ্ট্র ভাবায় বিলাপ করে উট,
সব জন্তুর লিখলে ছড়া আমারটাই ছুট।
বাঘ ভাল্লুক বেড়াল কুকুর বেঁজি
সাপ কচ্ছপ কাঠবেড়ালী আমিই হেঁজিপেঁজি!
আমি বলি, রাগ করো না, উট!

সাচ্চা কথা শোনাই তোমায় নয়কো এটা ঝুট!
অনেক আগে আমার ছেলেবেলায়
উটের গাড়ী চলত নাকি কোন্ বাঁকুড়া জেলায়!
বড় হয়ে সেথায় গেলাম যেই
মোটর গাড়ী আছে, কিন্তু উটের গাড়ী নেই।
ভাগ্য দোষে কথা ছিল আবার
বাংলা থেকে বদলি হয়ে রাজস্থানে যাবার।
গেলে পেতেম সেই একটি সুখ
উটের পিঠে চড়ার সেই অপূর্ব কৌতুক।
ঘটলো নাকো আজমীরে সেই যাওয়া
উটের পিঠে সওয়ার হয়ে মরুর খেজুর খাওয়া।
রাজস্থানের তুমিও এক রাজ
মরুভূমি পারাপারের তুমিই জাহাজ।
কোন্ জানোয়ার আছে তোমার মতন?
কুব্জ যার উচ্চ, তারই উচ্চতম আসন।

ভূমিকায় — একাল বিচিত্রা

মহম্মদ রফিক আহমেদ

"সত্য সেলুকাস —
কি বিচিত্র এ দেশ"
সাধুর বসন চোর ধরেছি
ওটা যে ফলস্ কেশ।
যে দেশ ছিল জন্মভূমি
স্বর্গ থেকে সেরা,
সে দেশ যে আজ বধ্যভূমি
অন্ধকারে ঘেরা।।
চলছে হেথা সাট্টা জুয়া
মদ মাতালের ভিড়,
অন্যায়েরই দম্ভ দিতে
নেই সে তেমন বীর।
সাধুর সাজে মহান পাপী
খুনের মালা গলে,
চলার সুপথ দেখিয়ে যেজন
নিজেই উল্‌টো চলে।

রাজা রাজায় রাখী পরায়
প্রজা প্রজায় খুন,
হাওয়ায় যে গা ভাসিয়ে রাজা
চলেন যে রেঙ্গুন।
গণতন্ত্রের নামে হেথা
শতেক গ্যাঁড়া কল,
হরেক দেবের শতেক পূজা
শতেক গন্ডা দল।।
দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি যে হয়
গরীব মারা কলে,
খুচরো কড়ি উধাও হ'ল
ভীষণ কৌশলে।।
ঘুষ ছাড়া আজ মুখোশ খোলা
ভীষণ হ'ল দায়।
ধনীর দুলাল ননীর রাজা
আমরা মরি হায়।

বাজ-at

প্রবুদ্ধ বন্দ্যোপাধ্যায়

বাজেট সে তো বাজেই হবে
বাজান মন্ত্রী মশয়।
তিনিই জানেন লাখো টাকা
গলতে পারে ক'-শয়
টি, ভি, দেখুন, সিন্‌মা দেখুন
যুগটা ইলেট্রনিক
খাবার কথা আবার বলেন!
— রোগটা বোধহয় ক্রনিক।
রেল বাড়ল, তেল বাড়ল —
বাজার জুড়ে আগুন।
আমরা মরি কপাল ঠুকে,
ওদের ডেরায় ফাগুন।
গরীব যিনি হবেন গরিব
বড় আরও বড়ো
মরে-পচে গরিব হটে
সুখের এদেশ গড়ো।।

তিনছড়া

নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

এক

ঠাকুর বাড়ীর রবীন্দ্রনাথ
আজকে পরম গুরু,
আজ মানে এই বোশেখ-পঁচিশ
কাল থেকে গান শুরু।

দুই

ফেল করলেই আঁধার আঁধার
অসময়ে জীবন নাশ.
ওসব নিয়ে ভাবনা বলেই
অগ্রে করি প্রশ্ন ফাঁস

তিন

বর্ষা কালের নরম মাটি
শীত-গ্রীষ্মে কঠিন রয়
সি,এম,ডি,এ তাই বুঝি ভাই
মেঘের ডাকে ময়ূর হয়।

বইমেলা-৯৭

সুভাষ মুখার্জী

দাউ দাউ আগুনে
বই মেলা জ্বলছে।
হাহাকার উঠছে
এ ওকে দুষছে
পোড়া বই ঝাপটে
প্রকাশক ছুটছে
পিশাচেরা হাসছে
কেউ কেউ ভাবছে
সবই বুঝি শেষ যে।
বই শুধু বই নয়
বই বড় হাতিয়ার
বই আনে চেতনা
বই বাধা মানে না।
পোড়া মাঠে ঝড় ওঠে
ছাই ওড়ে মাঠ জুড়ে
আশা ভরা আকাশে
মিটি মিটি চাঁদ হাসে
আঁধার স[illegible] প্রভাতে
প্রত্যয় জাগে মনে।
হয়ে বই হাতিয়ার
বাধা করে চুরমার
বুকে জমা কান্না
তবু ওরা হারেনা
বইপোড়ে মেলা পোড়ে
বইমেলা পোড়ে না
কলকাতা হারে না।

ছন্দের সুর-বাহার

শ্যামলী দাশ

ছন্দ পড়ি ছন্দ গড়ি,
ছন্দেতে দিই পাড়ি,
ছন্দে ছন্দে তুলছি গড়ে
সাত মহলা বাড়ী।
ছন্দ তোমার ছন্দ আমার
ছন্দে দুলি সবাই,
দুনিয়া জুড়ে সব খানে আজ
ছন্দ ভরা তাই।

ভালো লাগে

মঞ্জুষ দাশগুপ্ত

হোক না তা খুকখুক খিল খিল হাসি
হা হা হো হো ফিক ফিক তাও ভালবাসি
ভালোবাসি ভেউ ভেউ ঘেউ ঘেউ ঘোঁত
রিম্ ঝিম্ ঝিমঝিম্ নদীটির স্রোত;
মিউ মিউ ম্যাও ম্যাও তাও লাগে ভালো
সন্ধ্যায় দপদপ প্রদীপের আলো,
ভালোলাগে প্যাঁক প্যাঁক ময়ূরের কেকা
রাত্তিরে ঝিল মিল তারাদের দেখা।
শুধু যেই বাঘ করে হালুম হুলুম
অমনি দু'হাত দিয়ে কানটি মুলুম।

গানের টানে দুঃখ আনে

ভবানী প্রসাদ মজুমদার

গাইলে আমি 'খেয়াল'
কাঁপতে থাকে ঘর-বাড়ী-দোর
জানলা কপাট দেয়াল।।

গাইলে আমি 'ভজন'
পালায় ছুটে পাড়াপড়শি
আত্মীয় আর স্বজন।।

গাইলে আমি 'গজল'
সুরের ঠেলায় হয় শ্রোতাদের
দু'চোখ অশ্রু সজল।।

গাইলে আমি 'জীবনমুখী'
সবাই ভয়ে কাঁপতে থাকে
হয় সকলেই দুখী।

গাইলে আমি 'বাউল'
চেঁচায় সবাই দোহাই দাদা
আর কোরো না 'ফাউল'।।

গাইলে 'ভক্তিগীতি'
সবাই ভয়ে কাঁপতে থাকে
এই কি গীতির রীতি।।

গাইলে 'ধ্রুপদ-ধামার'
হেঁচকি ওঠে বাবার কাকার
প্রেসার বাড়ে 'মামার'।

তাইতো এখন দাদা
সাইলেন্সার লাগিয়ে মুখেই
চলছে গলা সাধা।।

বাংলাদেশের ছড়া

॥ ঘুম পাড়ানী ছড়া ॥

আয় চাঁদ লড়িয়া
সোনার ঘোড়ায় চড়িয়া
হাল বাইতে বলদ দিমু
দুধ খাইতে গাই দিমু
চাঁদের কপালে চাঁদ টিপ দিয়া যা ॥

এ ছড়ায় মা তাঁর সন্তানকে চাঁদের সঙ্গে যেন অভিন্ন সূত্রে বাঁধার প্রয়াস পেয়েছেন। এখানে মায়ের মমত্বই যেন মূর্ত হয়ে উঠেছে।

॥ দুধ খাওয়ানোর ছড়া ॥

আয়রে আয় মিনি
খোকার দুধে চিনি
দুধ খাবেনা রাগ করেছে
আমার জাদুমনি ॥
এই তো খোকন খাইল দুধ
আচ্ছা বেটা বাপের পুত ॥

এ ছড়াতে শিশুর কোমল হৃদয়ের সঙ্গে পোষা প্রাণীর কোমলতা প্রকাশ পেয়েছে।

এরপর ছড়া এসেছে বাস্তব জীবনের নানা পর্যায়ে। যেমন —

জল ভালা ভাসা
মানুষ ভালা চাষা,
বল বল আপনার বল
ছায়া মিঠা ছাতির তল ॥

খেলার ছড়া ঃ

এটি ঢাকা জেলার এক ধরণের খেলার ছড়া। বিছানায় চিত হয়ে শুয়ে পা দুটিকে গুটিয়ে নিলে পায়ের চেটোর উপরে একটি দোলনা তৈরী হয়। ঐ দোলনায় বসিয়ে কোন বাচ্চাকে ছন্দে ছন্দে এই ছড়া পড়ে ক্ষাণিকক্ষণ নাচিয়ে ডান দিকে বা বাঁ দিকে বিছানায় ফেলে দেওয়া হয়। একে বলা হয় - 'ঘুঙ্গি ঘুঙ্গি' খেলা।

ঘুঙ্গিল ঘুঙ্গি দাওখান দিবি।
দাও দিয়া কি করবি?
পাতা কাটুম।
পাতা দিয়া কি করবি?
বৌ ভাত খাইব।
বৌ কই?
জল আনতে গেছে।
জল কই?
ডাউগে খাইছে।
ডাউগ কই?
ধোপায় নিছে।
ধোপা কই?
কাপড় কাচে।
কাপড় কই?
খাটে থুইছে।
খাট কই?
ভাইঙ্গা গেছে।
বেঙের খাঁচা, তুইলা নাচা। (বহুবার)
পড়পড় পড়পড় গুয়ের ডালে পড়
নয়ত - সোনার ডালে পড়।

উত্তরবঙ্গের ছড়া ঃ

উত্তরবঙ্গের সন্ধ্যাবেলায় অথবা বর্ষার দিনে বালক বালিকারা ঘরের মধ্যে বৃত্তাকারে জোড়াসন করে বসে। পরে একজন নিজের হাতটি অন্যদের হাঁটুর ফাঁকে গুঁজে দিয়ে এই খেলার ছড়াটি বলতে থাকে ঃ

ডমনারে ডুমুনি -
শোড়া মাছের ঘুমুনি।
শাক খায়, শুকাতি খায় ঃ
ডম্না বেটা কুন্ঠে আয় ॥ ....

এটি 'আঙ্গুল দোলা' খেলার ছড়া। সাধারণতঃ বালিকারাই এই খেলায় অংশ নিয়ে থাকে। ক্রমঅনুসারে প্রত্যেকের ডান ও বাঁ হাত একের পর এক রেখে একসঙ্গে সকলে মিলে দোলাতে দোলাতে বলে ঃ-

ইছন-বিছন ধাপুরি বিছন
তাতে আছে মোগল কাটা।
মোগলকাটা নড়ে চড়ে
আইকুমারী ডাক পাড়ে।
এলে রে, বেলে রে
ফুল ছিঁড়িবা গেলো রে।
ফুলের মান্‌ডালা ফুল
ছিরি আংটি হাত কাট্‌ ॥
এরপর উপরের হাতটি নামিয়ে নেয়। এইভাবেই খেলা চলে।
পথ চল্‌তে চল্‌তে হোঁচট্‌ খেয়ে পড়ে গেলে সঙ্গীরা ছড়া কাটে ঃ
বণু বণু বণু
ইটা বাড়ীত পন্নু।
হাত ধরিয়া অঠা বণু,
তোরে মাইয়া হণু ॥

এবার উল্লেখ করছি এক প্রকার সামাজিক ছড়ার। এই ছড়া-কাটাকে উত্তরবঙ্গের ভাষায় বলে "ডাঙ্কা দেয়া" অর্থাৎ ডাক দেওয়া ক্রিয়া থেকেই যে উৎপত্তি হয়েছে বুঝতে কোন অসুবিধা হয় না। নিমন্ত্রিত অতিথিদের খাবার উদ্দেশ্যে ছড়াটি বলা হয়, তার অর্থ আস্তে আস্তে খাও, তাড়াহুড়ার প্রয়োজন নেই। আকাশে মেঘ তাতে কি হয়েছে?

উপরে বহে মেঘ-মেঘানি
পবনে বহে বাও।
ঘর মইধ্যে এক পাকোয়ানী
ধীরে ধীরে খাও ॥
বলি হে সাধু,
মধুরসে পানি।
হরে হরে জয় ॥

বৃষ্টি নামা বা থামার ছড়া। রঙ্গ করে একজন বলে—
আয় রে পানি ঝিম্‌ ঝিম্‌।
পাঁঠা কাটিয়া দিম্‌ দিম্‌ ॥
অপরজন তার উল্টো ছড়া বলে পূর্বের ছড়ার কাটান দেয়।
যারে পানি ঘুরিয়া।
শিদল দিম্‌ পুড়িয়া ॥
এরপর প্রথমজন পুনরায় বলে ঃ
আইসেক পানি ঝাঁকে ঝাঁকে।
শিদল খাবো গাছে গাছে ॥

ডুয়ার্সের চা-বাগানে ওড়াওঁ শিশুদের ছড়া

ওঁড়াও মায়েরা শিশুর কান্না ভোলায় এই ধরণের ছড়া গান গেয়ে।

চি চান্দো পা পা
ঘুর গাণ্ডিনু খতরা।
তুরী মুককা দেততা
অব মারলে খাট্টিয়া।
তাংগা গে মান্না।

অর্থাৎ চাঁদকে বলছে — চাঁদ তুমি রুটি দাও। গোবর ফেলা গর্তে যে রুটি পড়ে যায়। তুরী মহিলা সেই রুটি কুড়িয়ে সবাইকে ভাগ করে দেয়। তার নিজের কিছু থাকে না।

শিশুর মা-বাবা দুজনেই যখন কাজের প্রয়োজনে বাইরে যায় তখন শিশু একা হয়ে ঘরের মধ্যে কাঁদে। প্রতিবেশীরা এসে শিশুকে সান্ত্বনা দেয় এই ধরণের ছড়া বলে।

হো-ও বাবু - মাইয়া দুরো বোলো
আম্বা চিখা
নিং গিও কেরা মা-সি নোড়া
নিশ্বাস কেরাস ইন্‌জো পিটা।
কিরোর হলে মামা চিঅর
পাপা চিঅর।

অর্থাৎ - কেঁদোনা বাছা কেঁদোনা! তোমার মা গেছে কালাই একপ্রকার ডাল আনতে। বাবা গেছে মাছ ধরতে। ওরা ফিরে এসে তোমায় ভাত ও রুটি দেবে।

বান্না চুন্না কিচরি
কুরায় কর পেন্নো
যোখাস নিংহায় বানি
কোঁড়াতি এড়ান দাস।

অর্থাৎ - মেয়ে তুই-এই ফুলছাপা শাড়ী পর। তোকে দেখতে খুব ভাল লাগবে। দরজার আড়াল থেকে তোর বর তোকে দেখবে।

ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা একে অন্যের হাত ধরে দুলে দুলে বৃত্তাকারে ঘোরে আর মুখে ছড়া বলে। এ এক ধরণের খেলার ছড়া।

দাইগো দাইগো ছালা ছিদা মাছালি
লেপ লেপা কোদায় ঢেমা ঢাস ঢিস
অনিস গোটা মিখিয়ান
পওয়া লেখা ফুলেরা
আরে হ্যায়, আনগো হ্যায়।
দাইগো = দিদিগো।
লেপা = পিচ্ছল।
পওয়া লেখা = একরকম পিঠে।

ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ঘরের বিছানায় গড়াগড়ি খায় আর আনন্দে গায় ঃ

মা-সি গুডুর গুডুর
কা কোদায় পা পা।
মা-সি = কলাই, গুডুর গুডুর = শিল নোড়ার শব্দ, পাপা = রুটি, কোদায় = রান্না করা।

অসমীয়া ছড়া

'ধাইনাম' বা 'নিচুকনী' হ'ল শিশু ভোলানো গান বা সুরেলা ক্ষুদ্র ছড়া। শিশুর দেখাশো- রত ধাই বা দাসীদের গান হ'ল 'ধাইনাম'। আর নিচুকনী কথার অর্থ হল ক্রন্দনরত শিশু- শান্ত করার জন্যে গান বা ছড়া কাটাকে বোঝায়। সুতরাং ঘুমপাড়ানি গান, ছেলেভুলানো ছড়া ও খেলা-ধূলার ছড়াতে শিয়াল ও চাঁদের কথা পাই। একটি ঘুমপাড়ানি গানের নমুনা তুলে ধরা হল ঃ-

শিয়ালী এ নাহিরি রাতি
তোরে কান কাটি লগাম বাতি;
শিয়ালীর মূররে মরয়া ফুল
শিয়ালী পালেগৈ রতন পুর।

(বাংলায় তর্জমা) —
শিয়ালী, তুই এলে রাতি —
কান কেটে তোর — জ্বালাই বাতি,
শিয়ালীব মাথায় মরুয়া ফুল,
শিয়ালী গেল রতনপুর।

আর একটি ছড়ায় শিশু, চাঁদের কাছে একটি ছোট্ট তারা চাইছে। চাঁদ বলছে পাতা নেই, লতা নেই, কি দিয়ে মুড়ে তারা পাঠাবো।

লাই হালে জালে আবেলি বতাহে
লফা হালে জালে পাতে;
আমারে মইনা হালিছে জালিছে
কালি দুপ্‌রর ভাতে।

(বাংলায় তর্জমা) —
লাইশাক হেলে দোলে বিকেল বাতাসে
লাফা শাকের হেলে-দোলে পাতা;
সোনা আমার হেলে-দোলে যখন, মনে পড়ে
কাল দুপুরে ভোজ খাবার কথা।

অনেক সময় শিশুরা সন্ধ্যার পর রাতের খাওয়ার পূর্বেই অসময়ে ঘুমিয়ে পড়ে। সেই সময় তাকে জাগিয়ে রাখার জন্যে দিদিমা বা ঠাকুরমারা এই ছড়া বলে তাদের চোখের ঘুম কেড়ে নেন ঃ-

জোনবাই এ, বেজী এটি দিয়া।

বেজী নো কেলৈ? মোনা সীবলৈ।
মোনা নো কেলৈ? ধন ভৰাবলৈ।
ধন নো কেলৈ? হাতী কিনিবলৈ।
হাতী নো কেলৈ? উঠি ফুৰিবলৈ।
হাতীত উঠি পানীৰাম ঘৰলৈ যায়।
আলি বাটৰ মানুহে ঘুৰি ঘুৰি চায়।

(বাংলা তর্জমা) —
ও চাঁদ দিদি, সূচ এক দাও।
— সূচে কী হবে? — থলে বানাব।
কেন রে থলে? টাকা রাখব।
কী হবে টাকায়? হাতী কিনিব।
কেন রে হাতী? চড়ে বেড়াব।
হাতীর পিঠে পানীরাম ঘরে ফিরে যায়,
পথে পথে সকল লোক ঘুরে ঘুরে চায়।

প্রবাদ

সামাজিক জীবনের সূত্র ধরে মানুষের কতগুলি বিশেষ অভিজ্ঞতা জন্মে। এমন অভিজ্ঞতা যখন সমাজের বেশীর ভাগ লোকের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রতিপন্ন হয় তখনই দু'এক ছত্রে অভিজ্ঞতার সারাংশটি সর্বত্র মুখে মুখে প্রচারিত হয় কিংবদন্তী বা জনশ্রুতির মত। এই দু'এক ছত্রের বক্তব্য অনেকটা শিক্ষা লব্ধ জ্ঞানের মত, উত্তরসূরীর নিকট পৌঁছে যায় তখন এগুলিই 'প্রবাদ' নাম ধারণ করে। বাঙলার প্রবাদগুলি বাঙলার জনজীবনের সূত্র ধরেই সৃষ্টি হয়েছে। এগুলির মধ্যে যে বাস্তবতা ও অভিজ্ঞতার কথা আছে তাও বাঙালীর স্বভাব ও পরিবেশজনিত রসচেতনায়। ডঃ সুশীল কুমার দে তাঁর 'বাঙলা প্রবাদ' গ্রন্থে লিখেছেন — "যেমন গানে, উপাখ্যানে, মঙ্গল কাব্যে, তেমনই প্রবাদের মধ্যেও বাঙালীর বাঙালীয়ানা নানা রূপে নানা ভঙ্গীতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। .... ইহার রসপ্রেরণা আসিয়াছে দেশের আলো জলবায়ু হইতে, জাতির জীবিত চেতনা হইতে। উচ্চ ভাবুকতা ও কল্পনা ব্যতিরেকেও এগুলি রসসম্পৃক্ত হইয়া উঠে।" এই রস সম্পৃক্ততার লক্ষণেই এসব বাগধারা সাহিত্য গোত্রীয় হয়ে উঠেছে। কুলজী গ্রন্থে এমন বহু উল্লেখ আছে সেগুলি সামাজিক বিশেষ ঘটনার সঙ্গে জড়িত।

রামপুরহাটের নিকটস্থ ভদ্রপুরের নন্দকুমার মুর্শীদাবাদের নবাব সেরেস্তায় বড় চাকুরী পেয়ে হলেন মহারাজ নন্দকুমার। নুতন বড় মানুষ হয়ে গ্রামের তাঁতীদের কাপড়ের পরিবর্তে বালুচরী চেলী দিয়ে করলেন দুর্গা পূজা। তাঁতীরা ক্ষুব্ধ হলেন। কেউ তাঁর কাছে কাপড় বিক্রয় করে না। ক্রমশঃ বণিকেরা, ধোপারা এমনকি নাপিতেরাও ধর্মঘট করল তাঁর বিরুদ্ধে। সকলকে সন্তুষ্ট করতে তিনি প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা স্বরূপ সব জাতির সকলকে জগন্নাথ দেবের আটকে ভোগ খাওয়াতে মনস্থ করলেন। এই প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থার মধ্যেই ভেদবুদ্ধি প্রযুক্ত হলো রাঢ়দেশের একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা এবং তারই ফলাফলের ভিত্তিতে প্রচলিত আঞ্চলিক প্রবাদ সৃষ্টি হ'ল —

'ভাদুরের নন্দকুমার,
লক্ষ বামুন করলে শুমার।
কেউ পেলে মাছের মুড়ো,
কেউ খেলে বন্দুকের হুড়ো ॥"

প্রথানুসারে বাঙলার সব জাতিরই নিজস্ব জাতবৃত্তি ছিল। নানা কারণে বৃত্তিচ্যুত হয়ে তারা জাত হারাত। তখন এমন একটি জাতি হল যার কোনও নিজস্ব বৃত্তি নেই। তাঁরা লেখক, করণিক, জমাদার, পাটোয়ার, চাকুরীজীবী, ভৌমিক ইত্যাদি সবই হতে পারতেন। তাঁরাই ছিলেন জাতিতে কায়স্থ। কুলজীতে তাই প্রবাদ লেখা হ'ল

"জাত হারালে কায়েত"। অনুরূপ জাতি বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিতে কুলজী গ্রন্থে প্রবাদ আছে —

"ধানে আমন, জেতে বামণ,"

অর্থাৎ আমনের চাষে যেমন রোয়া, বোয়া, নিড়েন ইত্যাদি বহু শ্রমসাধ্য কর্ম করতে হয় তেমন ব্রাহ্মণের জাতিগত অভ্যাস সৃষ্টিতে, বিস্তৃতিতে ও পুষ্টিতে বহু পরিশ্রম করতে হয়। তাই এই প্রবাদ।

প্রাচীন সামাজিক প্রথা অনুযায়ী কোন গোষ্ঠী যে কোন ব্যক্তিকে গ্রাম থেকে বিতাড়ণের উদ্দেশ্যে সবাই মিলে গ্রাম-চত্বরে বারোয়ারী তলায় আলোচনায় বসতেন। একে বলা হত 'ঘোঁট'। এই ঘোঁটের পর পুরহিতকে ডেকে ধর্মরাজের ঘট স্থাপন করা হত। ঐ ঘটের গায়ে সিঁদুর, তেল, আমের পল্লব ইত্যাদি দিয়ে পূজো করা হত। ঘটের সামনে রাখা হ'ত এক তাড়া পান ও সুপারী। পূজার শেষে সব গোষ্ঠীর মাতব্বরগণ একটি পান, একটি সুপারী ও এক টুকরো হলুদ হাতে নিয়ে ঘট স্পর্শ-করে শপথ করত এবং সঙ্কল্পের পর এই ঘট নিয়ে গ্রামের মধ্যে ঘুরানো হ'ত। সেই সঙ্গে থাকত একটি ঢাক। এই ঘটকে বলা হ'ত 'ধর্মঘট'। ঐ ঢাক শুনে সকলেই ভয় পেত এবং একমত হয়ে ঐ ব্যক্তি বা পরিবারকে বর্জন করত। এর থেকেই সৃষ্টি হয় নীচের প্রবাদটি —

"আর কি রক্ষে আছে
ঢাকে কাঠি পড়েছে।"

এই ঢাকই হ'ল ধর্মের ঢাক। বাদক যখন না বাজায় পাশের লোকরাই বাজাতে থাকে, যেন ঢাকটি নিজে নিজেই বেজে চলেছে। এর থেকেই প্রবাদ সৃষ্টি হয় -

"ধর্মের ঢাক আপনি বাজে।"

আর একটি অতি প্রচলিত প্রবাদ আছে —

"হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গা।"

এই প্রবাদটিরও একটি বিশেষ সূত্র আছে। বৌদ্ধ সহজিয়াদের আমলে একটি হাঁড়ি সিঁদুর মাখিয়ে বসানো হ'ত। সেটির নাম হ'ত— "লুইয়ের হাঁড়ি"। নামটি করা হ'ত সিদ্ধাচার্য লুই -পাদের নামে। হাঁড়িটিতে পূজা হ'ত। খাসী বলি দেওয়া হ'লে খাসীর নাড়ী ভুঁড়ি ঐ হাঁড়িতে ভরা হ'ত। খাওয়া দাওয়া শেষ হ'লে কোন অভিযোগের বিষয় নিয়ে ঘোঁট হ'ত। বিশেষতঃ লাম্পট্যের বিষয় নিয়ে। তারপর ঐ নাড়ীভুঁড়ি পূর্ণ হাঁড়িটি মাথায় নিয়ে হাটের দিনে বড় হাটে যাওয়া হ'ত। জমজমাট হাটে কুৎসাটি রটনা করে আছাড় দিয়ে হাঁড়িটি ভেঙ্গে দেওয়া হ'ত। এর ফলে ঐ লম্পটেরা আর সমাজে স্থান পেত না এবং ঠেকো হয়ে থাকত। এ

নিয়ে রাঢ় দেশে প্রচলিত মজার প্রবাদটি হ'ল —

> "ফাট্‌ল হাটে হাঁড়ি,
> ছড়াল কুচ্ছার ভুঁড়ি ও নাড়ী,
> দুর, দুর ছোঁড়া ও ছুড়ী।"

খুঁজলে দেখা যাবে প্রায় সব প্রবাদেরই প্রথম কোন না কোন উৎস আছে। বহুদিন যাবৎ বাগধারাগুলি কথোপকথনে সাহিত্যে ও গানে অঙ্গীভূত হয়ে গিয়েছে। এ'গুলির উৎস সন্ধানের আর বিশেষ প্রয়োজন বোধ হয় নি। এই সব প্রবাদ বিচার করলে প্রাচীন সমাজের কাঠামো তখনকার লোকদের বিশ্বাস আচার-আচরণ সম্পর্কে সামগ্রিক ধারণা হয়।

সমাজ-জীবনে মহিলাদের মধ্যে কিছু কিছু বিশেষ কথা, ছড়া আকারে মুখে মুখে প্রচলিত। পরবর্তীকালে এই বিশেষ কথাগুলিই 'প্রবাদ' রূপে পরিচিতি ঘটেছে। বিষয়বস্তু সম্পূর্ণই লৌকিক উপাদান। এর মধ্যে সুরের প্রাধান্য না থাকলেও উচ্চারণের একটা ঢঙ বর্তমান। এই কথাগুলি ছন্দ-প্রধান, এর মধ্যে দিয়ে সমাজের একটা সুন্দর চিত্র পরিস্ফুট। এমন কিছু প্রবাদ নিচে সংকলিত হ'ল।

(দুই শব্দ বিশিষ্ট)

যমের অরুচি । টাকার কুমীর।
অকর্মের ঢেঁকি । ব্যাঙের আধুলি
তীর্থের কাক সাপের পাঁচ-পা।
ডুমুরের ফুল । কড়ায় গণ্ডায়।
পিণ্ডি চট্‌কানো । গোবরে পদ্ম।
ঘাটের মড়া চিনির বলদ।
নুনের পুতুল ।
শাঁখের করাত । রাবণের চিতা।
মরণ দশা । বিদ্যের জাহাজ।
ননীর পুতুল । পাঁকাল মাছ।
উঠোন চালাকি । চিঁড়ে চ্যাপ্‌টা।
শুক্‌নো অশান্তি । বামুনের গরু।
উকিলের জেরা । কলির কেষ্টা।
সরসের ফুল । কুম্ভকর্ণের ঘুম।
সোনায় সোহাগা । গো গ্রাসে।
শকুনের দৃষ্টি । বলির পাঁঠা।
বালির বাঁধ । ধানি লঙ্কা।
নৈবেদ্যের নাড়ু । বুদ্ধির ঢেঁকি।
কাঁঠালের আঠা । পঙ্গপালের ঝাঁক।
হাতে হ্যারিকেন । লবঙ্গ লতিকা।
হাতির খোরাক । গজ চক্ষু।

(দুইয়ের অধিক শব্দ বিশিষ্ট)

চোখ বাঁধা বলদ । সরষের মধ্যে ভূত।
আগ হাঁড়ির ধন । গা জ্বলে যায়।
শুক্ল পক্ষের চাঁদ । কানের মাথা খাওয়া।
ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা । কচু পোড়া খাও।
তেলে জলে মেশে না । শুঁড়ির সাক্ষী মাতাল।
জিলিপির আড়াই-প্যাঁচ্ । হরি ঘোষের গোয়াল।
কই মাছের জান । বাড়া ভাতে ছাই।
পটল চেরা চোখ । বাঁশির মতন নাক।
শিবরাত্রির সলতে । হরিণের মতো চোখ।

একছত্রের সাবলীল গদ্যবাক্য :

১। কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন।
২। ধর্মের ঢাক আপনি বাজে।
৩। দে গরুর গা ধুইয়ে।
৪। আপনি বাঁচলে বাপের নাম।
৫। জেলের পাছে কেলে হাঁড়ি।
৬। পেটে খেলে পিঠে সয়।
৭। নুন আনতে পান্‌তা ফুরোয়।
৮। লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন।
৯। টকের ভয়ে তেঁতুল তলায় বাসা।
১০। ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে।
১১। সাপের হাঁচি বেদে চেনে।
১২। কিবা বিয়ে তার দুপায়ে আলতা।

১৩। কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে।
১৪। বুনো ওল আর বাঘা তেঁতুল।
১৫। চোরের মায়ের বড় গলা।
১৬। শুকনো কথায় চিঁড়ে ভেজে না।
১৭। নিজের জোটে না শংকরাকে ডাকে।
১৮। শালুক চিনেছেন গোপাল ঠাকুর।
১৯। বরের ঘরে মাসি কনের ঘরের পিসি।
২০। বামুনের বংশ কল্মিশাকের ঝাড়।
২১। যাকে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা।
২২। নাচতে না জানলে উঠোনের দোষ।
২৩। মরা হাতি লাখ টাকা।
২৪। পুরানো চাল ভাতে বাড়ে।
২৫। বোঝার ওপর শাকের আঁটি।
২৬। অতি চালাকের গলায় দড়ি।
২৭। ঠক বাছতে গাঁ উজাড়।
২৮। যেমন কর্ম তেমন ফল।
২৯। শূন্য কলসীর আওয়াজ বেশী।

দুই ছত্রের প্রবাদ

১। কবে রাম রাজা হবে।
তবে সীতা বনে যাবে ॥
২। নিকুলে পুঁছলে ঘর।
সাজালে গোজালে বর ॥
৩। চালুনির পোঁদ ঝির-ঝির করে।
চালুনি ছুঁচের বিচার করে ॥
৪। দেখবুনি গো বৌ তোকে সোনার খাটে।
দেখবো তোকে পুকুর ঘাটে ॥
৫। অড়তল বড়তল।
সেই বুড়ির পাছতল ॥
৬। রূপ যৌবন আড়াই দিন।
যমের মেয়ে মানুষ চিন ॥
৭। নেই কাজ ।
তো খই ভাজ ॥
৮। কোথাকার - কে।
বলে, আমড়া ভাতে দে ॥
৯। যদি হয় সুজন।
তেঁতুল পাতায় ন'জন ॥

১০। চিঁড়ে বল, মুড়ি বল ভাতের বাড়া নয়।
পিসি বল মাসি বল, মায়ের বাড়া নয় ৷৷

১১। ভাত দেয় কি ভাতারে।
ভাত দেয় গতরে ৷৷

১২। জন জামাই ভাগ্না।
তিন নয় আপনা ৷৷

১৩। বামুন গেল ঘর।
তো লাঙ্গল তুলে ধর ৷৷

১৪। ছেলে জব্দ কিলে।
বৌ জব্দ শিলে ৷৷

১৫। বামুন বাড়ী চাক্‌রি করে কোন শালা।
ভিজে ভাত খাইয়ে মারে দু'বেলা ৷৷

১৬। কাজের সময় কাজী।
কাজ ফুরুলে পাজী ৷৷

১৭। কারও পৌষমাস।
কারও সর্ব্বনাশ ৷৷

১৮। কপালে নেইকো ঘি।
ঠক্‌-ঠকালে হবে কি?

১৯। খুঁত-খুঁত মন যার।
কোরন্দ ভাতার তার ৷৷

২০। জরু গরু ধান।
তিনে নজরান ৷৷

২১। গরু খেলে বাড়ে।
মানুষ খেলে মরে ৷৷

২২। দিদিমা না দ্যাখে দুখ্‌।
ভাই না দ্যাখে সুখ্‌ ৷৷

২৩। টাক্‌, টিকি, দাড়ি।
বদমাসের ধাড়ি ৷৷

২৪। লাগালাগি বাস।
দেখাদেখি চাষ ৷৷

২৫। সেজে গুজে রইনু বসে।
পাল্কী এলো না চোপার দোষে ৷৷

২৬। খাচ্ছিল তাঁতী তাঁত বুনে।
কাল হলো তার এঁড়েগরু কিনে ৷৷

২৭। দেখলুম তোমার গিন্নীপনা।
নুন থাকে তো, তেল থাকেনা ৷৷

২৮। পুড়বে নারী, উড়বে ছাই।
তবেই নারীর গুণ গাই ॥
২৯। ঘরে থাকতে নানান নিধি।
খেতে দেয়না দারুন বিধি ॥
৩০। কাঁচায় না নুইলে বাঁশ।
পাকলে করে ট্যাশ ট্যাশ ॥
৩১। অদৃষ্টে করলা-ভাতে।
বিচি কচ্‌কচ্‌ করে তাতে ॥
৩২। অর্চনের ধন চর্বনে যায়।
উৎপাতের-কড়ি, চিৎপাতে যায় ॥
৩৩। আগে না বুঝলে যাহা যৌবনের ভরে।
পশ্চাতে কাঁদিতে হবে নয়নের ঘোরে ॥
৩৪। আ-দেখলের ঘটি হলো।
জল খেতে খেতে প্রাণ গেলো ॥
৩৫। ইল্লৎ যায় না ধুলে।
আর স্বভাব যায় না মলে ॥
৩৬। এক হেঁসেলে দুই রাঁধুনী।
পুড়ে ম'ল তার ফ্যান গাগুনি ॥
৩৭। কার শ্রাদ্ধ কেবা করে।
খোলা কেটে বামুন মরে ॥
৩৮। ঘোড়া চিনে কানে।
দাতা চিনে দানে ॥
৩৯। চুন খেয়ে গাল পোড়ে।
দই দেখলে ভয়ে মরে ॥
৪০। জীব দিয়েছেন যিনি।
আহার দেবেন তিনি ॥
৪১। তুমি যাবে বঙ্গে।
তোমার কপাল যাবে সঙ্গে ॥
৪২। দরিদ্রে আহার খোঁজে।
ধনীতে ক্ষুধা খোঁজে ॥
৪৩। দশে মিলি করি কাজ।
হারি জিতি নাহি লাজ ॥
৪৪। দিন থাকতে বাঁধে আল।
তবে খায় নানা শাল ॥
৪৫। দিনে বাতি যার ঘরে।
তাঁর ভিটায় ঘুঘু চরে ॥

৪৬। নিজের বেলায় আটিশাটি।
পরের বেলায় দাঁত কপাটি ॥

৪৭। পড়ল কথা সভার মাঝে।
যার কথা তার গায়ে বাজে ॥

৪৮। পড়েছি মোগলের হাতে।
খানা খেতে হবে সাথে ॥

৪৯। বড় হাতি গেল তল।
মশা বলে কত জল ॥

৫০। বল বুদ্ধি ভরসা।
চল্লিশ হলেই ফরসা ॥

৫১। বিপদে ভগবানের দোহাই।
সম্পদে বলি একি বালাই ॥

৫২। বেকায়দায় পড়লে হাতি।
চামচিকেও মারে লাথি ॥

৫৩। ভাগাড়ে গরু মরে।
শকুনির টনক নড়ে ॥

৫৪। মুর্খের নাই হেতুবাদ।
বাজি রেখে করে মাত ॥

৫৫। মোর বুদ্ধি তোর কড়ি।
আয় দুজনে ফলার করি ॥

৫৬। যত মান সব বাইরে ঘরে।
বিদ্যাবুদ্ধি প্রকাশ করে ॥

৫৭। যত হাসি তত কান্না।
বলে গেছেন রাম মান্না ॥

৫৮। যার কাজ তার সাজে।
অন্যের মাথায় লাঠি ভাজে ॥

৫৯। যার ধন তাঁর ধন নয় নেপোয় মারে দই।
কেউ মরে বিল ছেচে কেউ খায় কই ॥

৬০। যার বিয়ে তার মনে নেই।
পাড়া পরশীর ঘুম নেই ॥

৬১। যার শিল তার নোড়া।
তারই ভাঙ্গি দাঁতের গোড়া ॥

৬২। খাবি জেনে বসবি টেনে।
বাপে টাকা দিলেও নিবি গুনে ॥

চার ছত্রের প্রবাদ ঃ

১। মায়ের বোন্ মাসী,
কাদায় ফেলি ঠাসি।
বাপের বোন পিসি,
ভাত-কাপড়ে পুষি ॥

২। মেয়ের ঘরের নাতি,
মুখে মারবে লাথি।
ছেলের ঘরের নাতি,
স্বর্গে দেবে বাতি ॥

৩। যে এলো চষে,
সে রইল বসে।
যে রইল ধেড়ে,
তাকে দিল ভাত বেড়ে ॥

৪। বৌ ভাঙলো সরা,
গেল পাড়া পাড়া।
শাশুড়ী ভাঙলো নাদা,
ও কিছু নয় দাদা ॥

মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণ প্রান্ত ও উড়িষ্যার সংযোগ অঞ্চলে (কাঁথি মহকুমা অঞ্চল) **দোভাষী** (বাংলা ও ওড়িয়া) **গ্রামীণ প্রবাদ বা নীতিকথাগুলি নিম্নরূপ ঃ**

১। লাল লাটিম পাকা পান
দিদির ঘইতা মুসলমান।
—ছোটবোন তার বোনপোকে বলছে ইয়ার্কি কথায় দিদির স্বামী মুসলমান। জামাই বাবুকে অতিরিক্ত সোহাগ বশে মুসলমান বলা হয়েছে।

২। মন্‌স বুলিনে মরে।
বাঁশ ফুলিনে মরে ॥
বাঁশ গাছে ফুল ধরলে বাঁশের ঝাড় মরে যায় ....
আর কর্মহীন মানুষ দুর্দশায় ঘুরে ব্যাড়ালে না খেয়ে মরে।

৩। যদি দিশে ঘরর টুই।
ন ছাড় ভাই মুঠা দুই ॥
কোন কিছু কেউ আগ্রহ করে দিলে অর্থাৎ যাচা জিনিস ছাড়াতে নেই।

৪। গুরু করবু জানি।
জল খাবু ছানি ॥
দেখে শুনে গুরু করবে আর জল খাবে ছেঁকে।

৫। পড়শী নাই যেইঠী।
ঢাম করিবু সেইঠী ॥
আপনজন কাছে থাকলে লুকিয়ে বা চাপা দিয়ে কিছু বলা যায় না।
চাম > ঢম >ঢঙ্ অর্থে (বাড়িয়ে বলা)।

৬। বড় লোক মান্-র মরে।
অখা চিরি গামছা পরে ॥
বড়লোকমি দ্যাখান, আসল অবস্থা গরীব।

৭। কট কর্ মেঘঅ বাড়ীতলে খুড়া।
মেঘঅ আসি দুয়ার খাড়া ॥
মেঘের গতি এত সত্বর (তাড়াতাড়ি) যে বাইরের ঘোড়াকে বাঁধতে সময় দেয় না।

৮। বাপর কাল-র নাই - দুল্ই।
আজ দ্যে-ই-চি দুই ঠ্যাং তুল্ই ॥
বাপের সময় আমার আর্থিক অবস্থা অতি নগন্য ছিল কিন্তু এখন আমি ঠ্যাঙ তুলে দোলা খাচ্ছি।

৯। পড়িবু শুনিবু মরিবু দুঃখে।
মৎস্য ধরিবু খাইবু সুখে ॥
পড়াশুনাকে অবহেলা করা আগের দিনের লোকেদের এই উপদেশ। কাজ কর, মাছ্ধর এবং তা বিক্রী করে সুখে ঘর সংসার কর।

১০। উপুর জমি অর্থে মাণে।
গোহীর জমি কড়ঙে ॥
উঁচু জমিতে ফলন কম
আর নিচু জমিতে ফলন বেশী হয়।

১১। নিদকী জারএ বন বুদা।
ভুককী জানে কচাঁ উদা ॥
নিদ্রা যখন আসে তখন শরীরে সাড় (হুস) থাকে না আর খিদে যখন পায় তখন তার জ্বালা বা সাড় এতই বেশী যে তখন রান্না বা সিদ্ধ কিছুই মানে না।

১২। হুর হাট যায় যে।
খটা মিঠা খায় সে ॥
কোন জিনিস বা কাজকে নিয়ে আঁকড়ে থাকলে একদিন তার জয় হবেই।

১৩। ঝিঅর পুঅ নাতি উখ্ড়া গুহুর সাথী।
পুঅর পুঅ নাতি স্বর্গে দিয়ে বাতি ॥
খই যখন ফোটে তখন যেসব খই ফোটে না ধানের খোসা লেগে থাকে সেগুলো ছাড়িয়ে দিতে হয় - অর্থাৎ পৌত্রই পারলৌকিক কাজ করবে।

১৪। কুল কুলানী পিতল পানি।
অলিআ মা শুকা চুরুনী ॥
চোর সাজান খেলার ছড়া রূপে প্রচলিত।

১৫। কুশে যিবু ধুইবু পা।
যাই ইচ্ছা তাই যা ॥
এক ক্রোশ পথ হাঁটার পর পা ধুয়ে নিয়ে পুনরায় হাঁটা কাজ করলে পরিশ্রম লাঘব বোধ হয়।

১৬। মোটেই মা রাঁধে না।
পান্তা আর তপ্ত ॥
ঘরে চালবাড়ন্ত; তাই গরম ভাতে জল দিয়ে পান্তা খাওয়ার সাধ।

১৭। জরু গরু ধান।
এ তিন নজরান ॥
স্ত্রী, গরু, ধান এই তিনি জিনিসের প্রতি নজর রাখতে হয় তবেই সে সম্পদবান হয়।

চট্টগ্রামের প্রবাদ ঃ

১। আশ্বিনত্ রাঁধি কাতিত্ খায়,
যেই বর মাগে, হেই বর পায় ॥

২। ভাতের মধ্যে গিরিং,
মাছের মধ্যে চিড়িং ॥

৩। নেক্ সোয়াগী তরে,
পাড়া সোয়াগী মরে ॥
স্বামী সোহাগী নারী বাঁচে, আর স্বামী ছেড়ে পাড়া ঘুরুনী নারী মরে।

৪। মানুষ চিনে আকলে,
গাছ্ চিনে বাকলে ॥
বুদ্ধির বিচারে মানুষ চেনা যায়, আর গাছের ছাল দেখে গাছ্ চেনা যায়।

৫। যার দিলত্ কালি,
তার কোয়ালত ছালি ॥
যার মনে বদ চিন্তা তার কপালে ছাই।

চাকমা প্রবাদ ঃ

১। যার বাপরে কুইরে খায়,
তার পুয়া ঢেউ দেইলে ডরায় ॥
যার বাপকে কুমিরে খায়, তার ছেলে ঢেউ দেখলেই ভয় পায়।

২। চিগন, মরিচ ঝাল্ বেচ্!
ধানি লঙ্কার বেশী ঝাল।

৩। সাত ওঝায় পোয়া মারে।
সাত বৈদ্যে বা অনেক ডাক্তারে মিলে ছেলেকে মারে।

৪। মানুষ বুঝি পুগিয়ে কামাড়ায়।
বোকা মানুষকে চালাক মানুষ ঠকায়।

৫। যে দেশত বৃক্ষ নাই সে দেশত্ এরণ্ডা প্রধান।
যে দেশে গাছপালা নেই, সে দেশে ভেরেণ্ডাও গাছ বলে চিহ্নিত হয়।

৬। উলত নাই তেনা,
মিডাগুলি ভাত খানা।
পরনে কাপড় নেই, মিষ্টি দিয়ে ভাত খায়।

৭। পথত্ পেলাম কামার,

দা গড়িদে আমার।
পথে কামার দেখে অমনি বলে আমায় দা বানিয়ে দাও।

৮। সময় থাকতে বান্,
দিন থাকতে হাঁট।
সময় থাকতে বাঁধ বাঁধো, আর দিন থাকতে হাঁটা পথ পাড়ি দাও।

মানভূমের প্রবাদ

১। ভাইগ্ করেছি ছিঁড়া কাঁথা,
লেপ খুঁজলে পাবি কোথা ॥
ভাগ্যে গরীব ঘরে জন্মে বড়লোক হবার বাসনা।

২। জনি আর জমি সমান।
জমি ও নারী দুই-ই অশান্তির মূল।

৩। উরাধুরা মধুপুরা।
সংসারের প্রতি টান নেই, - ভবঘুরের মত ঘুরে বেড়ায়।

৪। বাপের কারণে সৎমাকে দণ্ডবৎ।
পুত্র-সন্তান থাকা সত্ত্বেও বিপত্নিক পিতা আবার বিবাহ করলে পিতার অপকর্মের ফল পুত্র সন্তানদের উপরই বর্তাবে।

৫। তেলের মাছ তেলেই ভাজা।
অন্যের দেওয়া অর্থ নয়-ছয় করা।

৬। লাগের বেলা ভাগ
ভাগবাটোয়ারা হবার পর ভাগ চাইলে ভাগ আর পাওয়া যায় না।

৭। ভেক্ না করলে ভিখ্ মেটে না।
ভিক্ষা পেতে হলে ভিখারীর সাজ ধরতেই হবে।

৮। তলে তলে বেলা যায়,
সিয়ান বহু তিনবার খায়।
চালাক মানুষ নিজের ভাগের অংশ বেশীটাই সংগ্রহ করে নেয়।

৯। যে জন উভে, সে তৃষ্ণায় মরে না।
যে কাজে যে লোক জড়িত থাকে সেই কাজে থেকে জীবনে সে বঞ্চিত হয় না।

১০। মরদ চিন, হায় মচে.
মাঁয়া চিন হায় খঁচে।
বাইরের রূপ দেখেই স্ত্রী অথবা পুরুষ চেনা যায়।

১১। যদি দিবি চার চাষ,
তবে পাবি ধানের আশ্।
চারবার চাষে জমিতে ফলন বেশী হয়।

১২। ফেস্ কাঁদনা।
ছিঁচ্ কাঁদুনে। সামান্য কিছু বললেই কেঁদে ফেলা।

১৩। হেলার ভাত ঢেলা।
প্রয়োজন না থাকলে মূল্যবান জিনিসকেও তুচ্ছ জ্ঞান করা হয়।

১৪। যেমনি কাম, তেমনি দাম।
কাজে অবহেলা দিলে ফলও কম পাওয়া যায়।

১৫। কুঁড়ির কোথাও ভাত নাই।
কুড়ে মানুষরা কাজ করে না তাই অন্নও জোটে না।

উত্তরবঙ্গের প্রবাদ ঃ

১। যদি অহে মোর কোপালে,
দেখা হবে আমের মউলে
আর বিলেন শৌলে ॥

প্রবাদটিতে ভাগ্যে থাকলে ফলবে আমের মুকুল দিয়ে শোল মাছ রাঁধা উপমায় বলা হয়েছে।

২। ঠেলা-গোরুর পেলা ধান।
দৌড়া-গোরুর নেউড়া ধান ॥

গরুকে ঠেলে ঠেলে চাষ করালে লাঙলের ফলা মাটির গভীরে যায়, জমি চষা ভাল হয় সেই চষা জমিতে ফলনও বেশী হয়। আর গরুকে ছুটিয়ে চাষ করালে সে জমির মাটি ভাল হয় না কাবণ লাঙলের ফলা মাটির গভীরে যায় না। — ফলনও কম হয়।

৩। চিলা দাঁতি, খড়ম পায়া, সাপ - নেজ্জা চুল।
হাতে হাতে গাওয়াইলেক বানিয়ার জাতি কুল ॥

সরু সরু দাঁত, খড়মের মত পায়ের মাঝখান উঁচু, মাথায় অল্প চুল সম্পন্ন নারীর বৈধব্য হবার সম্ভাবনা।

৪। দই কিনি যার মাঝত্ খাল।
কইনা আনি যার মাওটা ভাল্ ॥
মা ভাল হলে তার সন্তানেরাও ভালো হয়।

৫। আগিনা নষ্ট করে ছিম্ ছিম্ পানি।
ঘর নষ্ট করে কান-ভাঙ্গানী ॥

ঝিরঝিরে বৃষ্টিতে যেমন উঠান পিছল হয় তেমনি সংসারে অপরের কানে কুমন্ত্রণা দিয়ে কান ভারি করলে সংসারের শান্তি হরায়।

৬। অসুনে অসুনে গোটা।
পিঁয়াজি ফের কেটা ॥

অনেকগুলি কোষ মিলে সম্পূর্ণ একটি রসুন। অর্থাৎ বিভিন্নতা থাকলেও একতার ঐক্য আছে। অথচ একটি পিঁয়াজ অনেক পাটে মোড়া থাকা স্বত্ত্বেও একতার ঐক্য নেই।

৬। কিল্ কানিত্ না আটে ধান।
তার তানে ছাম-গাইন আন্ ॥
অল্প ধান ভানতে ঢেঁকি নিস্প্রোয়জন।

৭। যদি থাকে মনত্।
থাকে না কেনে দেশের কোনত্ ॥
অর্থাৎ ইচ্ছা থাকলে উপায় হয় দুঃসাধ্য কোন কাজও আটকায় না।

৮। পুবিয়া-পছিয়া বায়ে নড়ে ভাতের হাঁড়ি।
একনা মাইয়া পুষি'র না পায়,
আরো চান্দায় আড়ী ॥

রাজবংশী সম্প্রদায়ের মধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত আছে। যার বিয়ে করা বৌ-এর ভরণপোষণের ক্ষমতা নেই সে আবার চায় আর একজন বিধবাকে বিয়ে করতে।

৯। বাপই, তোর যানংগুণ
আন্দা শাগত্ তুই দিস ণুন ॥

কেউ পাকা ধানে মই দিলে তখন তার বংশ পরিচয় তোলা হয়।

১০। ঘাটাত্ পাইলং কামার।
দাও গড়ে' দাও হামার ॥

ঘোড়া দেখলে খোঁড়া হবার মতন। অর্থাৎ লোক দেখলে কাজের কথা মনে পড়ে যায়।

উত্তরবঙ্গের রাজবংশী প্রবাদ ঃ

১। জাতে না ছারে জাতের পানি, হলদি না ছারে অং
তিন ধোয়া দিলেও তাও, না যায় সুকটার গন্।

উচ্চ নীচ জাতের সম্পর্ক থাকে হলুদের রঙ্ হল্দেই থাকে রঙ্ বদলায় না। তিনবার ধুলেও শুঁটকির গন্ধ যায় না।

বাংলাদেশের প্রবাদ প্রবচন

প্রবাদ হ'ল মানব জীবনের অভিজ্ঞতালব্ধ বাস্তব জ্ঞানের সহজ সরল অর্থবহ্ এবং স্বল্প কথায় ব্যক্ত সত্য ভাষণ। শুধু বাংলাদেশ নয়, সারা বিশ্বের লোকমানসের জ্ঞান বিকাশের সহজতম কথ্য মাধ্যম। আর প্রবচন হল আভিধানিক অর্থে প্রবাদেরই নামান্তর।

এখানে স্বাস্থ্য সম্মত বাসগৃহ অর্থাৎ সুগৃহ সম্পর্কিত একটি প্রবাদ উদ্ধৃত করা হল।

(১) 'পুবে হাঁস পশ্চিমে বাঁশ
উত্তরে বেড়ে দক্ষিণে ছেড়ে
ঘর কর গে'॥ —

অর্থাৎ দক্ষিণ দুয়ারী ঘর হল সবার সেরা ও স্বাস্থ্য সম্মত। অর্থাৎ পূর্বদিকে পুকুর অথবা নদী, পশ্চিমে বাঁশ অর্থাৎ বাগান, উত্তরে ঘেরা কিন্তু দক্ষিণ দিক হবে উন্মুক্ত খোলা।

ঘর সম্বন্ধে আর একটি প্রবন্দ হল।

' দক্ষিণ দুয়ারী ঘরের রাজা
পুব দুয়ারী তাহার প্রজা।
পশ্চিম দুয়ারীর মুখে ছাই
উত্তর দুয়ারীর খাজনা নাই' ॥

ঘরের পর আসা যাক খাদ্যে —

(১) 'আগে তিতা, পাছে মিঠা'।
(২) মিনিট দশেক স্নানের পরে
থাকা উচিত অনাহারে' ॥

(৩) হারে রান্ধে ধীরে খায়
তবে বিজের মজা পায়' ॥

(৪) মাংসে মাংস বৃদ্ধি
ঘৃতে বৃদ্ধি বল
দুধে বীর্য বৃদ্ধি
শাকে বৃদ্ধি মল' ॥

গৃহস্থ জীবনে বাস্তবরূপে প্রবাদ কেমন জড়িয়ে আছে তার উপমা দেওয়া যেতে পারে। যেমন—

'অন্ন নাই যার ঘরে
তারে কেবা মান করে'. ॥

কিংবা—

'ভাত নাই যার, মান নাই তার'।

দারিদ্রে অনেক সদগুণ নাশ হয়। যে কথা নিয়ে রচিত প্রবাদ হল—

'দারিদ্র দোষে, গুণরাশি নাশে' ॥

অর্থ ব্যতীত দৈনন্দিন জীবন এমনকি বন্ধুত্বও অচল হয়ে যায়।

'কড়ি কট্‌কা চিড়ে দই
কড়ি বিনে বন্ধু কই' ॥

কার্পণ্য বিষয়টি মানবজীবনের একটি উল্লেখ যোগ্য দিক। তানিয়ে প্রবাদ হল —

(১) 'খেতে গেলে হাস হাস.
দিতে গেলে সর্বনাশ' ॥

(২) দেখে দাতার দান
বখিলের ফাটে প্রাণ' ॥

মানব চরিত্রের স্বার্থপরতা উদারতা ব্যক্তি বিশেষের ক্ষেত্রে কিভাবে প্রকাশ পায় তা আলোচিত। অপরিমেয় সম্পদের অধিকারী হতে চায় মানুষ। সকল উপায় সে গ্রহণ করে

(১) 'তলেরও কুড়াই, গাছেরও চাই'।

(২) 'হাতে দই পাতে দই
তবু বলে কই কই' ॥

প্রারম্ভিক লেখা পড়া শেখার কথাও প্রবাদে স্থান পেয়েছে।

'কালি কলম পাত, তবে লেখার জাত'।

তর্জন গর্জন করে ব্যক্তিগত প্রভাব এবং শৌর্য-বীর্যের প্রকাশ কিরূপ হয় তার একটি উদাহরণ যেমন—

'হুঙ্কারে খাইলাম, ঝঙ্কারে ধাইলাম।
পর্বতের মাথায় লাথি, হাতীর কান্ধে রামদা ধাবাই।
আমি বাঞ্ছারামের নাতি' ॥

এছাড়া প্রাচীন চিকিৎসা পদ্ধতির মধ্যে মন্ত্র প্রভাব স্পষ্ট প্রবচন

(২) 'যাওরে শীতলা সইরা যাও
উত্তরে যাও দক্ষিণে যাও

কামিখ্যার পর্বতে যাও
যদি না যাও
তবে মহাদেবের আর পার্বতীর মাথা খাও'।।

উপরের প্রবাদ প্রবচন বা লৌকিক মন্ত্রে গৃহস্থ জীবন ও তার পারিপার্শ্বিক বিশেষ ভাবে লক্ষ্যনীয়।

মাছ নাই বিলত্ খালি বগের সোসানী।
বিলের জলে মাছ নেই বক শুধু শুধু প্রতীক্ষা করে।

৩। বাঁশ বামন ক্যালা তিনো ঝনে প্যালা,
যম জামাই ভাগিনা তিনো ঝনে বেগেনা।

৪। আছে গরু না বয় হাল, তার দুক্কো চিরকাল।
হালের গরু থাকা সত্ত্বেও যে চাষ না করে তার চিরকালই দুঃখে কষ্টে কাটে।

৫। বাঘের ঘরত্ কখ্খন কি ছাগল যায়া সন্ধায়,
চিকার গতর কখ্খন কি আতর আতর গন্ধায়।
বাঘের ঘরে কি ছাগল প্রবেশ করে? চাম্‌চিকের গায়ে কি আতরের গন্ধ পাওয়া যায়।

৬। কালাই মোদ্দে মুসুরী, সাগাই মোদ্দে শাশুরী।
ডালের মধ্যে মুসুরী ডাল ভাল, কুটুম্বের মধ্যে শাশুড়ী ভাল।

ধাঁধা

'ধাঁধা' শব্দটির আভিধানিক অর্থ 'ধন্ধ' অর্থাৎ কোন একটি বস্তুর আপাত স্বরূপটি বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ নয়, প্রতীয়মান, — তাকে বলা হয় 'ধাঁধা'। যেমন চোখের 'ধাঁধা' অর্থাৎ ঐন্দ্রজালিকের ক্রিয়াপ্রকরণে একটি বস্তুকে আর একটি বস্তুর আচ্ছাদনে অন্যরূপে দেখানো যায়। 'ধাঁধা'য় মায়ার সংসারে অসত্যই সত্য বলে প্রতিপন্ন হয়। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায় আছে —

"দৈবীহ্যেষা গুণময়ী মম মায়াদুরত্যয়া।" মায়া এই প্রপঞ্চ শক্তির পশ্চাতেও ভগবৎ শক্তি ক্রিয়াশীল। এই মায়াও একপ্রকার 'ধাঁধা' সমাধান হৃদয়ঙ্গম করা। অসার মায়াকে সার বলে গ্রহণ করেছেন যারা শঙ্করাচার্য তাঁদের বলেছেন 'মূঢ়'। তাই 'ধাঁধা' মানুষের দৃষ্টিকে যেমন আচ্ছাদিত করে ফেলে, তেমন বুদ্ধিকেও আচ্ছাদিত করে। সেই সূত্রে কবি, সাহিত্যিক কেন গ্রামগঞ্জের সাধারণ লোকরা এমন কিছু উক্তি ব্যবহার করেন যার আপাত অর্থ ও প্রকৃত অর্থের মধ্যে বিশেষ প্রভেদ থাকে। প্রকৃত অর্থ বা তাৎপর্যকে বুঝিয়ে বলতে পারার জন্য তীক্ষ্ণবুদ্ধির প্রয়োজন। আর এই বুদ্ধির লড়াই ক্ষেত্রে বিশেষভাবে 'ধাঁধা' প্রয়োগ করা হোত অতি প্রাচীন কাল থেকেই। আগেকার রাজসভায় যারা ভাট বা ভাঁড় থাকতেন তাঁরা অত্যন্ত তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন হতেন কিন্তু আপাত বিচারে সাধারণ লোকের কাছে কমবুদ্ধির বলেই তাঁরা পরিচিত ছিলেন। রাজা মহাশয়ের চমক লাগিয়ে মাঝে মাঝে কিছু পুরস্কার লাভের আশায় ভাঁড় মহাশয় বেশ চিন্তাশীল বাক্য বা 'ধাঁধা' প্রয়োগ করতেন। যার নিদর্শন আমরা কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আমলে গোপাল ভাঁড়ের উপাখ্যানে পেয়ে থাকি। বহু পূর্বে পাত্রপাত্রী নির্বাচন ক্ষেত্রে ধাঁধার আসর বসত বলে জানা যায়। উপযুক্ত পাত্রের বুদ্ধি পরীক্ষা করবার জন্য শ্যালক, শ্যালিকাগণ বহু রকমের ধাঁধা বলে থাকত। এই ধাঁধা প্রকরণ পরে সমাজজীবনে বিশেষ স্থান অধিকার করেছিল। অনেক সময় ছোট ছোট অভিজ্ঞতার সূত্রে অনেকে ধাঁধা

রচনা করে থাকেন। মৃত কুকুরের দেহকে একটি কাক বসে খাচ্ছে। তাই দেখে একজন বললেন - "নাই তাই খাচ্ছ, থাকলে কোথায় পেতে?" অস্পষ্ট বা সান্ধ্যভাষার প্রয়োগের মত তেমন ভাসানো কয়েকটি দুর্গামূর্তির মাটি ক্ষয়ে খড়ের ব্যানাটি এসে পাড়ে পড়েছে। একটি গরু ঐ ব্যানার সিংহমূর্তির খড়গুলো টেনে টেনে খাচ্ছে। তা দেখে একজন বলে উঠলেন —

"কলির অদ্ভুত রীতি জানকি সুধীর?
গরুতে ভক্ষণ করে সিংহের শরীর।" এটিই একটি প্রশ্ন মূলক ধাঁধা।

আবার অনেক ধাঁধা আছে অঙ্কের সংখ্যার কিন্তু প্রকৃত পক্ষে কিছুই নয়। যেমন -

"ন মন গোদা ন মন গোদি
ন মন তাঁর পুত্র দুটি।
খেয়াঘাটের তরিতে, ন মন পারে চড়িতে, পার হবে কেমনে?"
এমন সংখ্যা উল্লেখের 'ধাঁধা' আছে -
"এ পারে সোয়া - একটি কবুতর,
ও পারে সোয়া - একটি কবুতর,
মোট ক'টি কবুতর?"

পথে চলতে চলতে পথ গেছে হারিয়ে। বহু চেষ্টা করে, জিজ্ঞাসাবাদ করে পথটি খুঁজে পেয়ে লোকটি তাঁর অভিজ্ঞতায় বললেন —

"হারাইলে খুঁজি তারে,
পেলে তারে লইনা ঘরে ॥"

হয়ে গেল একটি সুন্দর ছড়াকার ধাঁধার প্রশ্ন।

"একটি লোক নিয়ে যাচ্ছে একটি বাঘ, একটি ছাগল, আর কিছু পান। বাঘে ছাগল খায়, ছাগলে পান খায়। খেয়া ঘাটে একটি নৌকা, একটি বস্তু নিয়ে একবার পার হওয়া যায়। তিনটি দ্রব্যকে লোকটি কি করে পার করবে?

নানা ধরণের সম্ভাব্য সমাধান শুরু হয়ে যায় কেবল চতুর লোকই যথার্থ উত্তর দিতে পারেন। এমন কি দুধের ওজন, সোনার ওজন ইত্যাদি নিয়ে বহু ধাঁধা রচিত হয়েছে বিভিন্ন সময়ে। বিভিন্ন বর্ণসমষ্টি নিয়ে তৈরি অর্থপূর্ণ শব্দটি কোন একটি বর্ণের লোপ বা সংযোগে অন্য আর একটি অর্থপূর্ণ শব্দ সৃষ্টির ভেল্কী দেখান যায় তার প্রয়োগ ও ধাঁধায় দেখা যায় ধাঁধা সৃষ্টি হয়েছে। যেমন —

"তিন অক্ষরে নাম তার রাত্রি বেলা লাগে
শেষের অক্ষর ছেড়ে দিলে সবে ভয়ে ভাগে।
মাঝের অক্ষর না থাকিলে মিষ্টি মধুর বাজে,
প্রথম অক্ষর ছেড়ে দিলে ময়রা নিয়ে ভাজে ॥"

এমন শব্দভিত্তিক বহু ধাঁধা রচিত হয়েছে। তাছাড়া সামান্য ইংরাজী শিক্ষার প্রসারে ইংরাজী ও বাংলা মিশিয়ে ধাঁধা রচিত হয়েছে যেমন —

"If যদি is হয় but কিন্তু not নয় what মানে কি?"
এর উত্তরও তৈরী - "তুমি যদি বলে ফেল আমি বলব কি?"

এমন বহু ধাঁধা আগেকার দিনের পত্র পত্রিকায় ছাপা হ'ত। প্রবাসী, ভারতবর্ষ, বসুমতী, শনিবারের চিঠি, সচিত্র ভারত, শিশুসাথী ইত্যাদি পত্রিকাগুলিতে।

লোকসাহিত্যের ধাঁধার বৈশিষ্ট্যগুলি গ্রহণ করে কাব্যে অলঙ্কার রূপে প্রযুক্ত হয়েছে। বিশেষতঃ মঙ্গলকাব্য ও কড়চা গ্রন্থে। রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র তার 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে ঈশ্বরীর পরিচয় দিতে যে দ্ব্যার্থ শব্দ প্রয়োগ ব্যঞ্জনা অবলম্বন করেছেন - তা হ'ল উন্নত ধরণের এক ধাঁধা।
যেমন -

অতি বড় বৃদ্ধপতি সিদ্ধিতে নিপুণ।
কোন গুণ নাই তাঁর কপালে আগুন ॥
কুকথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠ ভরা বিষ।
কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ।" — ইত্যাদি।

প্রাচীনকালে চিঠিপত্রে, গোপন কথা বা রাজনৈতিক কোন খবরাদি প্রদান ক্ষেত্রে নানাবিধ ধাঁধা বা হেঁয়ালীর প্রয়োগ হ'ত। চৈতন্যদেব নীলাচলে থাবা কালে অদ্বৈতাচার্য তাঁকে যে পত্র লিখেছিলেন তার ভাষাটি নিম্নরূপ।

বাউলকে কহিও লোক হইল আউল।
বাউলকে কহিও হাটে না বিকায় চাউল ॥

এটি একটি প্রসিদ্ধ ধাঁধার মত ব্যবহার হ'ল। এমন ব্যবহার আরও বহু ক্ষেত্রে পাওয়া যায়।

এছাড়া বাউল গানে — আধ্যাত্মতত্ত্ব, দেহতত্ত্ব, পঞ্চতত্ত্ব ইত্যাদি নিয়ে নানা ধরণের প্রশ্ন ভিত্তিক রচনাশৈলী আছে এগুলিও ধাঁধার মতন। কবিগানে ধাঁধার প্রচলন খুবই বেশী। এই গানে ধাঁধা প্রয়োগ দ্বারা যে সাসপেন্স তৈরী হয় তা গানের একটি বিশেষ আকর্ষণ।

সেকালে জমিদার মহলে ধাঁধার চর্চা রীতিমতো করা হত। ধাঁধার সঠিক উত্তর দিতে পারলে জমিদার মহাশয় উত্তরদাতাকে পুরস্কৃত করতেন। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মতে "এ হল জনশ্রুতি মূলক ধাঁধা। ধাঁধার বিষয়বস্তুতে গৃহস্থালির ব্যবহৃত কোন জিনিস, পশুপাখি, ফলমূল, ইত্যাদি। বংশানুক্রমিকভাবে চলে আসছে তাই প্রাচীনত্বের অধিকারী। ধাঁধা শুনে উত্তরদানের জন্যে কৌতুহল দেখা দেয় হাস্যরসেরও অভিব্যক্তি ঘটে। সঠিক উত্তরদানের জন্য সুক্ষ্ম চিন্তার স্ফূরণ হয়। এরূপ কয়েকটি ধাঁধা নিচে উদ্ধৃত করা হল ঃ

একপদী ধাঁধা		উত্তর
১।	কোনগ্রামে লোক নেই?	স্বরগম
২।	কোন দেশে মাটি নাই?	সন্দেশ
৩।	কোন ট্রেন চলে নাই?	নাম্বার টেন
৪।	কোন সাগরে চুল নাই?	বিদ্যাসাগরে
৫।	কোন হাঁসের মাংস নাই	ইতিহাস
৬।	কোন বনে মধু নাই?	মধুবনে
৭।	কোন বাচ্চার মা নাই?	চৌবাচ্চা
৮।	কোন মাছি ওড়ে নাই?	ঘামাচি
৯।	কোন বাতিতে আলো নাই?	ধূপবাতি
১০।	কোন লাইট জ্বলে না?	সানলাইট
১১।	কোন কুয়াতে জল নাই?	কানকো
১২।	কোন হস্তির শুঁড় নাই?	জলহস্তি

১৩। কোন পাখি উড়ে না? উটপাখি
১৪। কোন ড্রেনে জল নাই? চিলড্রেন
১৫। একটুখানি জলে মাছ খিল খিল করে কি? পান্তাভাত
১৬। বড় লোক তুলে রাখে গরীবে ফেলে দেয় কি? নাকের শিকনি
(ক) তেঁতুল ছড়ি তেলে ভাজি নোয়াতে পারি ভাঙতে নারি — চুল
(খ) ঝুণ্ডুর ঝুণ্ডুর বাপ থাকতে বেটার কেন নেগুড় (লেজ) — ব্যাঙাচি।
(গ) ঝুপঝুপ গাছটি তার তলে সাপটি মুলো।
(ঘ) জন্ম দিয়ে মা পালালো, বাপ হল বনবাসী
যার ছেলে তার নয়, ঝাল খেল পাড়াপড়শী কোকিল।
(ঙ) হাত আছে পা আছে মুখ আছে সব
চলতে পারে কর্তে পারে কইতে পারে না। পুতুল।
(চ) চাঁদকে বলে সবাই মামা
চাঁদের মামা কে? ভগীরথ
(ছ) জীব নয় জন্তু নয় জ্যান্ত মানুষ খায় - জামা

বাংলার লোকজীবনে তথা লোকসংস্কৃতির বিস্তৃত ক্ষেত্রে লোকগাথা, লোক-পুরাণ. লোকসঙ্গীতে প্রবাদ প্রবচনের মত ধাঁধারও একটা বিরাট ভূমিকা বর্তমান। ধাঁধাগুলির মধ্যে লোক ভাষার সঙ্গে একটা শিক্ষণীয় ও নির্মল হাস্যরসের মেলবন্ধন বিশেষভাবে লক্ষণীয়। যেমন ঃ

(১) দিইতো পথে ঘাটে দিই, দিইতো পর পুরুষকে দিই
তুমি আমার আমি তোমার. তোমায় দেব কি?

স্বামী-স্ত্রীর কথপোকথনের মধ্যে সৃষ্ট এ ধাঁধাঁ। উত্তরটা-ঘোমটা।

(২) তিন অক্ষরে নাম তার সব সংসারে আছে।
প্রথম অক্ষর বাদ দিলে সর্ব লোকে খায়।
শেষ অক্ষর বাদ দিলে ভয়ে যায় না কাছে।
মাঝের অক্ষর বাদ দিলে গুনগুনা গুন গায়। উত্তর ঃ বিছানা।
(৩) ওরে ও মামা দেখি তোর গায়ে কত জামা — কি বস্তু?
উত্তর ঃ মোচা, পেঁয়াজ, রসুন ইত্যাদি।
(৪) চিৎ করে ফেলে, বুকের ওপর চেপে,
পাছা নেড়ে দিলাম ছেড়ে — কি বস্তু? উত্তর ঃ শীল নোড়া।
(৫) কাঁচায় তলতল, পাকায় লাল — কি বস্তু?
উত্তর ঃ মাটির পোড়া হাঁড়ি, কলসী ইত্যাদি।
(৬) 'সাজালে সাজে, বাজালে বাজে
হেনো ফুল ফুটে আছে, নগরের মাঝে।' কি বস্তু?
উত্তর ঃ মাটির তৈরি বাসন-পত্র।
(৭) 'ঘরের ভেতরে ঘর
নীচে কোনে বর' —কি বস্তু? উত্তর ঃ মশারী।

(৮) আগে পিছে একই শব্দ (অক্ষর) মধ্যে টকের গোড়া।
এমন একটা জায়গার নাম কি? উত্তর : কটক।

(৯) দু ঠ্যাং ফাঁক করে মধ্যিখানে পুরে দিয়ে
দু-চারবার নেড়ে চেড়ে দিলাম ছেড়ে— কি বস্তু? উত্তর : যাঁতি।

(১০) ফুটোর ভেতরে দিয়ে ফাটা
নাড়তে চাড়তে পড়ে আঠা — কি বস্তু?
উত্তর : ঝরনা কলম (ফাউন্টেন পেন)

(১১) কোন্ চিল ওড়ে না?
উত্তর : পাঁচিল।

(১২) কোন্ দেশে মাটি নেই?
উত্তর : সন্দেশ।

(১৩) কথা বলতো কোন চিল?
উত্তর : চার্চিল।

(১৪) তুমি দাও একবার, আমি দিই বারবার।
উত্তর : সিঁথির সিঁদুর।

(১৫) বন থেকে বেরুলো হুই
তার বাচ্চা কাহাঙ্গুই — কি বস্তু?
উত্তর : কেন্নো বা কেন্দাই।

(১৬) এরা দু-বাপ বেটা, ওরা দু-বাপ বেটা
আম তলা দিয়ে যায়।
পাকা তিনটে আম পড়লো
গোটা গোটা খায়।
ওরা কারা?
উত্তর : এক পরিবারের বাবা, ছেলে, নাতি।

দ্বিপদী ছড়াকারে ধাঁধা

(১) একটু খানি ডালে।
কেষ্ট ঠাকুর দোলে।।
উত্তর : বেগুন বা লঙ্কা।

(২) বন থেকে বেরুলো চিতি।
চিতি বলে তোর পাতে মুতি।।
উত্তর : পাতি, কাগজী অথবা গন্ধরাজ লেবু।

(৩) বন থেকে বেরুল টিয়ে।
সোনার টোপর মাথায় দিয়ে।।
উত্তর : আনারস।

(৪) কি আশ্চার্য দেখে এলাম খেঁজুর তলার মাঠে।
মরা মানুষ দাঁড়িয়ে আছে জ্যান্ত তার পেটে।।
উত্তর : মাছ ধরা ঘুনি।

(৫) একটুখানি গাছে।
রাঙা বউটি নাচে।।
উত্তর ঃ লঙ্কা।

(৬) এপার মাল্‌সা ওপার মাল্‌সা।
মধ্যিখানে লাল তামাসা।।
উত্তর ঃ মুসুরি ডাল।

(৭) করে তার খসর মসর পাত করে তার ফেনী,
ফুল করে তার লাল তামাসা ফল করে কুস্তনি।
উত্তর ঃ শিমূল ফুল

পূর্ববঙ্গের ধাঁধা ঃ

১। একটু খানি ডালে
কৃষ্ণ ঠাকুর ঝুলে
উঃ মরিচ

২। দুই হাত, দুই পা
কুড়ি আঙ্গুল তার নাকটা
চক্ষু, কর্ণ, নাক, নাই
এমন জীব কোথায় পাই।
উঃ মানুষ।

৩। দশ শিব নহে রাবণ।
ধরে আষাঢ় শ্রাবণ ॥
উঃ ঝিঙ্গা।

৪। বিপাকে বিমলা মা ছাড়া হইলা
ছেলে হইলা যখন, মা, বাড়ীতে নয় তখন ॥
উঃ কুশ (লব)

৫। ঘষা দিলে মিঠে আশা।
নইলে পরে সব নিরাশা ॥
উঃ দিয়াশলাই।

৬। বাকা মাথা এক ঠ্যাং ডুল ডুলে জামা গায়।
ঠেলা দিলে ফুলে ওঠে, নাম কি জান তায় ॥
উঃ ছাতা।

৭। ফুল ফুল ফুলুনী,
গাছের আগায় ঝুলুনী।
পাকলে সকলে খায়,
হাট বাজারে ন্যাংটা যায়।
উঃ তেঁতুল।

উত্তরবঙ্গের ধাঁধা ঃ

জলপাইগুড়ি জেলার লোকেরা 'ধাঁধা'কে বলে 'ফাক্‌রি'। এই প্রসঙ্গে বাঙলায় প্রচলিত শব্দ 'ফক্কিকারি' অর্থাৎ কুট প্রশ্ন বোঝায়। কয়েকটি উত্তবঙ্গের ধাঁধা তুলে ধরা হল ঃ-

১। ঝিন্ ঝিন্ ঝিন্ ঝিঙ্গার ফুল-
চৌদ্দ আজায় করে মূল।
তাঁহো না পায় ঝিঙ্গার ফুল ॥
উত্তর ঃ - নক্ষত্র

২। হাতি যায় দিম্ দিম্, ঘোড়া যায় নাপে।
এই শিলুক বুঝি দে রে বর্মার বাপে ॥
বর্মার বাপের নাম ঘোকোলডিং।
এই শিলুক বুঝিতে খাবে চৌদ্দ দিন ॥
উত্তর - ভূমিকম্প

৩। আজার বেচী কেশেরী —
চুলি মেলে আথারী - পাথারী ॥
উত্তর - পুঁই শাকের গাছ।

৪। অট্‌কট্, জট্‌কট্ —
দুয়ার বান্ধে কট্‌কট্ ॥
উত্তর - শামুক

৫। আজার বেটী কামলী।
ভিজিরা পারি, শুখিবা না পারি ॥
উত্তর - জিহ্বা।

৬। আগ দিয়া বাঘ যায় -
ন্যাটো দিয়া জল খায় ॥
উত্তর - প্রদীপ শিখা।

৭। হাটে গেলে চড় খায় কে?
উত্তর - মাটির হাঁড়ী।
টুপুলুং চ্যাং।
চাইর মাথা বারো ঠ্যাং ॥
উত্তর - গাই দোহানো।
চিত্ চিত্ পাখেনা —
না গেয়া দিলে ছাড়ে না ॥
উত্তর - বাপমার দেওয়া "নামকরণ" - যা পরিবর্তিত হয় না।

বাংলাদেশের ধাঁধা

বাংলাদেশ যেহেতু কৃষি প্রধান দেশ সেহেতু কৃষি ও তার যন্ত্রপাতি বিষয় নিয়ে বহু ধাঁধার সৃষ্টি হয়েছে। যেমন —

(১) ঝোড়ে থ্যা বাইরিল টিয়া
রুইপ্যার টোপর মাথায় দিয়া
যদি 'টিয়া মন করে
উড় মাটি চুড় করে' ॥
উত্তর ঃ লাঙ্গল।

(২) চিন্তায় জৰ্জ্জর ভাতে বুদ্ধি নাশ।
কান্দে কইর‍্যা লইয়া যায় ত্রিশ শাল বাঁশ ॥
উত্তর ঃ লাঙ্গলের ঈশ।

(৩) চাইর চামোর ঢোলে — খোল বইটা পড়ে ॥
সদাগরের নাও — শুকনা দিয়া চলে ॥
উত্তর ঃ মই।

ধাঁধাতে দৈনন্দিন জীবনের টুকিটাকি জিনিসও বাদ যায়নি। যেমন —

(৪) গাছ নাই আছে পাতা ॥
মুখ নাই কয় কতা (কথা) ॥
উত্তর ঃ বই ও কলম।

এমন কিছু ধাঁধা আছে, যা প্রশ্ন ও উত্তর করা হয় ধাঁধাতেই। যেমন—

(১) ভাঙ্গেনা টুটেনা
আছাড় যদি খায় ॥
মাংগোস (মাংস) ছাড়া আড়ডিনাই
যে জনের গায় ॥
এমন কেনে বীজ
জীনের জীবন
সন্ধান কইরা কও
সে কোন্ আলোকবন ॥
উত্তর ঃ মাংগোস ছাড়া আড়ডিনাই
সে বীজের গায়।
বাংলাদেশে এ বীজ
সর্বলোকে খায়।
খাইলে জীবন বাঁচে
না খাইলে মরে।
বাংলাদেশে এ বীজ
ভাত নাম ধরে ॥

বচন

আভিধানিক, অর্থে 'বচন' হল 'কথা' বা 'বাক্য'। কিন্তু বাংলায় বচন শব্দটির ব্যবহার হয় প্রায় সমোচ্চারিত ইংরাজী শব্দ 'Version' এর অর্থে। কথা সকলেই বলে কিন্তু সব কথা বচন নয়। কেবল ভগবৎ মুখনিসৃত মুনি, ঋষি, জ্যোতিষ প্রমুখের বাক্য নিত্য ও সত্য বলে প্রতিপন্ন হলে তবে তাকেই বলা হয় বচন। শাস্ত্রের সমস্ত কথাই ভগবানের মুখ নিঃসৃত কোন না কোন রূপে তাই ঐ গুলিকে বলা হয় শাস্ত্র — বচন। মুনি ও ঋষিগণ বিশেষ বিশেষ সময়ে তাদের বিশেষ বিশেষ অভিজ্ঞতা জ্ঞানের বিষয় হিসাবে লোকের কাছে বলে থাকেন — সে গুলিই হয় বচন। যেমন 'ভৃগু বচন', 'অত্রি বচন'। তা ছাড়া বায়ু পুরাণে বায়ু সমস্ত ঋষিকে উদ্দেশ্য করে যে কিছু তত্ত্ব জ্ঞান, দিয়ে ছিলেন তাকে বলা হয় 'বায়ু বচন'। অনুরূপ নৈমিষারণ্যে, যাট হাজার ঋষি শ্রোতার সম্মুখে শুকদেব যে কৃষ্ণ কথা বলেছিলেন তাকেই বলা হয় "শুকের বচন"। এটিই পরবর্তী কালে শ্রীমদ্ ভাগবত পুরাণ হিসাবে সর্বত্র পরিচিত। এ ছাড়া মুনিগণ যখন তাঁদের শিষ্যবৃন্দকে বসিয়ে বিশেষ ভাবে আশীর্বাদ করতেন তাকে বলা হ'ত — 'আশীর্বচন'। গর্গ মুনি শ্রীকৃষ্ণের নামকরণ সময়ে যে সব উক্তি করেছিলেন, সেগুলিকে বলা হয় 'গর্গের বচন' ইত্যাদি। তা ছাড়া নাপিতের ছড়ার শেষ অংশটিকে বলা হয় 'গোর্বচন'। এমন বহুবিধ বচন প্রচলিত আছে। পূজা প্রসঙ্গে বিশেষ পূজা ক্ষেত্রে অবশ্য পাঠ্য হ'ল 'স্বস্তি বচন'। এ' বচন বেদ ভেদে চার প্রকার — ঋকবেদীয় সামবেদীয়, যজুর্বেদীয় এবং অথর্ববেদীয়। অন্যান্য সব বচনের তুলনায় 'জ্যোতিষ বচন' সব থেকে বেশী জনপ্রিয় এবং এর পরিধিতে মধ্য 'খনার বচন' সর্বজন গ্রাহ্য।

খনার বচন

গুপ্ত বংশের প্রসিদ্ধ সম্রাট ছিলেন দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত তাঁর অপর নাম ছিল বিক্রমাদিত্য এবং তাঁর রাজসভায় বিভিন্ন বিষয়ের নয়জন পণ্ডিত নিয়োজিত ছিলেন, এই জন্য এই সভাকে বলা হত 'নবরত্ন' সভা। এই সভায় ছিলেন সমকালীন শ্রেষ্ঠ জ্যোতিষী, পণ্ডিত বরাহ। তিনি অদ্বিতীয় জ্যোতিষী ছিলেন এবং তাঁর গণনা ছিল অব্যর্থ। তাঁর পুত্রের নাম ছিল মিহির এবং খনা ছিলেন মিহিরের স্ত্রী। বিক্রমাদিত্যের কোনও একটি বিষয়ে বরাহ যে গণনা করেছিলেন খনা সেই গণনাকে ভুল প্রমাণ করেছিলেন। ফলে রাজা খনাকে রাজসভায় নিতে চেয়েছিলেন। বরাহ এবং মিহিরের প্রবল আপত্তি থাকায় খনা তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। কিন্তু এমন কিছু কিছু অব্যর্থ গণনা তিনি করেছেন যাতে তাঁর খ্যাতি ছড়াতে শুরু করল এবং বরাহ ও মিহিরের খ্যাতি হ্রাস পেতে শুরু করল। তখন খনা নিজেই তাঁর জিভ কেটে দিলেন। 'খনার বচন' বন্ধ হয়ে গেল। ঐ খণ্ডিত জিভটি আবার একটি টিকটিকি খেয়ে নেয়। তাই টিকটিকির জিভের শব্দকে সত্য ধ্বনি বলে মানা হয়। এই গল্প কথা লোকে বিশ্বাস করত।

প্রশ্নগণন ঃ সাত পাঁচ তিন কুশল বাত।
নয়ে এক হাতে হাতে।।

কি করবে ছুটে চটে।
কার্যনাশ দুয়ে আটে।।

জন্মলগ্নের শুভাশুভ ঃ

সূর্যকুজে রাহু মিলে।
গাছের দড়ি বন্ধন গলে।।
যদি রাখে ত্রিদশ মাথ।
তবু সে খায় নীচের ভাত ॥
খনা বরাহেরে বলে কোন লগ্ন দেখ।
লগ্নের সপ্তম ঘরে। কোন গ্রহ দেখ।।
আছে শনি সপ্তম ঘরে অবশ্য তারে খোরা করে,
থাকয়ে রবি ভ্রমর ভূ-খণ্ড, চন্দ্র থাকয়ে ধরে নবদণ্ড।।
মুষল থাকে করে খণ্ড খণ্ড অস্ত্রাঘাতে যায় তার মুণ্ড।
থাকে বুধ বিষয় করায়, গুরু শুক্র থাকে বহু ধন পায়।।
লগ্নে আকা লগ্নে বাঁকা, লগ্নে থাকে ভানু তনুজা।
লগ্নের সপ্তম অষ্টমে থাকে পাপ, মরে জননীপীড়ে বাপ।।
খালি ছাগল বৃষে চাঁদা, মিথুনে পুরিষে বেদা।
সিংহে বসু কি কর বসে, আর সব পুরিবে দশে।।

পরমায়ুগনণা ঃ

কিসের তিথি কিসের বার, জন্ম নক্ষত্র সার।
কি কর শ্বশুর মতিহীন. পলকে জীবনে বার দিন. ॥
খরা গজা কিসে হয়, তার অর্দ্ধেক পচে হয়।
বাইশ বলদা তের ছাগলা, তার অর্দ্ধেক বরা পাগলা ॥

দম্পত্তির মধ্যে অগ্রপশ্চাৎ মরণ গণনা ঃ

অক্ষর দ্বিগুণ চৌগুণ মাত্রা, নামে নামে করি সমতা।
তিন দিয়ে হয় আন, তাহে মরা বাঁচা জান ॥
একে শূন্য মরে পতি দুই থাকলে মরে যুবতী।

যাত্রার সময় নিরূপণ ঃ

মঙ্গলের উষা বুধে পা, যথা ইচ্ছা তথা যা।
রবি গুরু মঙ্গলের উষা, আর সব ফাশাফুশা ,
ডাকয়ে পাখী না ছাড়ে বাসা, উড়িয়ে বসে খাবে করি আশা ॥
ফিরে যায় নিজালয় না পায় দিশা, খনা ডেকে বলে সেই সে উষা
উড়ে পাখী যায় না, তখনি কেন যায় না ॥

যাত্রাকালের শুভাশুভ গণনা ঃ

৬। শুকনো কলসী শুকনো না।
শুকনো ডালে ডাকে কা ॥

যদি দেখ মাকুন্দ চোপা।
এক পাও না - বাড়াও বা-পা ॥

যাত্রাকালে শূন্য কলসী, নদীরতীরে শুক্‌নো নৌকা বা যদি গাছের শুক্‌নো ডালে বসে কাক কা - কা করে ডাকে বা কোন রজক বা দাড়ি গোঁফহীন লোক নজরে পড়ে ঐ সময় যাত্রা করা উচিত নয় কারণ যাত্রার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হতে পারে।

৭। দ্বাদশ অঙ্গুলি কাঠি।
সূর্য্য মণ্ডলে দিয়ে দিবি ॥
রবি কুড়ি সোমে ষোল।
পঞ্চদশ মঙ্গলে ভালো ॥
বুধ এগারো বৃহস্পতি বার।
শুক্র চৌদ্দ শনি তের ॥

যেখানে সারাদিন রৌদ্র থাকে এমন একটি স্থানে মাটিতে একটি কাঠি পুঁততে হবে। মাটি থেকে কাঠির উচ্চতা হবে বার আঙ্গুল। অর্থাৎ মাটি থেকে কাঠিটি বার আঙ্গুল উর্ধ্বে জেগে থাকবে। এবার যাত্রাকালে কাঠির ছায়ার দৈর্ঘ্য লক্ষ্য রাখবে। এইরূপ ছায়ার দৈর্ঘ্য রবিবারে কুড়ি, সোমবারে ষোল, মঙ্গল বারে পনেরো, বুধবারে এগারো, বৃহস্পতিবারে বারো, শুক্রবারে চৌদ্দ এবং শনিবারে তের আঙ্গুল ছায়ার মাপ দেখে যাত্রা করলে যাত্রা শুভ হয়।

৮। ভরা হতে শূন্য ভাল যদি ভরতে যায়।
আগে হতে পিছে ভাল যদি ডাকে মায় ॥
মরা হতে জ্যান্ত ভাল যদি মরতে যায়।
বাঁয়ে হতে ডাইনে ভাল যদি ফিরে চায় ॥
বাঁধা হতে খোলা ভাল মাথা তুলে চায়।
হাসা হতে কাঁদা ভাল যদি কাঁদে বাঁয় ॥

যাত্রাকালে কোন রমনী শূন্য কলসী কাঁখে নদীতে বা পুকুর ঘাটে জল ভরতে যাচ্ছে দেখলে তা অমঙ্গলের কারণ নয়। আবার মা যদি পিছন থেকে ডাকে তবে সন্তানের যাত্রা অত্যন্ত শুভ হয়। এছাড়া মৃতদেহ দর্শন অমঙ্গলের হলেও কোন মুমূর্ষু ব্যক্তি দর্শন করে যাত্রা করলে যাত্রার উদ্দেশ্য সফল হয়। যাত্রাকালে বাঁ দিকে শৃগাল দর্শন যাত্রা শুভ। শৃগাল যদি ডান দিকে যেতে যেতে যাত্রাকারীর দিকে চেয়ে দেখে তবে সে যাত্রা অধিক সুফল প্রদান করে। বাঁধা গরুর দর্শন মঙ্গলের। ছাড়া গরু দর্শন অমঙ্গলের। কিন্তু ছাড়া গরু যদি যাত্রাকারীর দিকে ফিরে চায় তা হলে যাত্রা অধিক মঙ্গলের।

যাত্রাকালে রোদনধ্বনি মঙ্গলের নয় কিন্তু রোদন ধ্বনি যদি বাম দিকে থেকে আগে শোনা যায় তা হলে যাত্রার ফল শুভ হয়।

তিথি গণনা ঃ

রবি কুড়ি সোমে ষোল পশ্চাদপদ মঙ্গলে ভাল।
বুধ এগারো বৃহস্পতি বার, শুক্র চৌদ্দ শনি তেরো ॥
হাঁচি জ্যাঠি পড়ে যাবে, অষ্টগুণ লভ্য হবে।

চন্দ্রগ্রহণ গণনা ঃ

যে যে মাসে যে যে রাশি, তার সপ্তমে থাকে শশী।
সেই দিনে হয় পৌর্ণমাসী, অবশ্য রাহু গ্রাসে শশী ॥
দুই তিন পাঁচ ছয়, একাদশে দেখতে হয়।

গর্ভস্থ সন্তান পরীক্ষা ঃ

বাণের পৃষ্ঠে দিয়ে বাণ, পেটের ছেলে গণে আন।
নামে মাসে করে এক, আট হরে সন্তান দেখ ॥
এক তিন থাকে বাণ, তবে নারীর পুত্র জান।
দুই চারি থাকে জয়, অবশ্য তার কন্যা হয়।
যদি থাকে শূন্য সাত, তবে নারীর গর্ভপাত ॥
গ্রাম গর্ভিনী ফলেযুতা, তিন দিয়া হব পুতা।
একে সুত দুইয়ে সুতা, শূন্য হলে গর্ভ মিথ্যা।
একথা যদি মিথ্যা হয়, সে ছেলে তার বাপের নয় ॥
নামে মাসে করি এক, তার দ্বিগুণ করি দেখ।
সাতে পুরি আটে হরি, সমে পুত্র বিষমে নারী ॥
যত মারে গর্ভ নারীর নাম 'ষ' অক্ষর।
যত জন শুনে পক্ষ দিয়ে এক কর ॥
সাতে হরি চন্দ্র নেত্র বাণ যদি রয়:
ইথে পুত্র পরে কন্যা জানিবে নিশ্চয় ॥

অঙ্ক কষতে হবে এইভাবে ঃ গর্ভিণীর নামের অক্ষর, গর্ভমাসের সংখ্যা এবং উপস্থিত লোকসংখ্যা যোগ করে যোগফলের সঙ্গে দুই পক্ষ অর্থাৎ ২ যোগ করে মোট যোগফলকে ৭ দিয়ে (অর্থাৎ হরির ৭) ভাগ করতে হবে। ভাগ শেষ ১, ৩ বা ৫ হলে পুত্র অন্যথায় কন্যা জন্মলাভ করবে।

গর্ভবতীর নামের অক্ষর ধরুন -	৫
গর্ভমাসের সংখ্যা ধরুন -	৮
উপস্থিত লোক সংখ্যা ধরুন -	৫
পক্ষ ধরুন -	২
মোট -	'২০

একে ৭ দিয়ে ভাগ করলে ভাগ শেষ ৬ থাকে। তা হলে বুঝতে হবে গর্ভিনীর কন্যা জন্মলাভ করবে।

মড়ক গণনা ঃ

চৈত্রে কুয়া ভাদ্রে বান।
নরের মুণ্ড গড়াগড়ি যান ॥

বন্যা গণনা ঃ

পূর্ণ আষাঢ়ে দক্ষিণা বয়।
সেই বৎসর বন্যা হয় ॥
আমে ধান। তেঁতুলে বান।
বামুন বাদল বান। দক্ষিণা পেলেই যান ॥

১। শ্রাবণের পুরো, ভাদ্রের বারো।
এর মধ্যে যত পারো ॥

অর্থাৎ সারা শ্রাবণ মাস এবং ভাদ্রমাসের প্রথম বারো দিনের মধ্যে ধান রোয়ার প্রকৃষ্ট সময়।

২। দিনে রোদ রাতে জল।
দিন দিন বাড়ে ধানের বল।

দিনের বেলায় রোদ্দুর আর রাত্রে বৃষ্টি হলে ধানগাছে খুব তেজ ধরে।

৩। রাত দিয়ে বর্ষা।
খনার বচন ফরসা ॥
শনির সাত মঙ্গল তিন।
আর সব দিন দিন ॥

যদি রাতে বৃষ্টি নামে তবে সকালে সে বৃষ্টি থেমে যায়। শনিবার বৃষ্টি নামলে সাত দিনের পূর্বে থামে না। মঙ্গলবার বৃষ্টি নামলে তিন দিন চলে এছাড়া অন্য দিনগুলিতে বৃষ্টি নামলে এক দিন মাত্র স্থায়ী হয়।

৪। দিনে জল রাতে খরা।
এই দেখবে দুখের ধারা ॥

বর্ষাকালে যদি দিনে বৃষ্টি আর রাতে আকাশে তারা ফোটে তবে জানবে সে বৎসর দুঃখ কষ্টের কারণ ঘটবে। অর্থাৎ শস্য ফলন হবে না।

৫। পাঁচ রবি মাসে পায়।
ঝরা কিংবা খরায় পায় ॥

বৎসরের মধ্যে কোন মাসে যদি পাঁচটি রবিবার পড়ে তবে সেই বৎসর অতিবৃষ্টি, বন্যা অথবা খরায় দেশের সর্বনাশ হ'তে পারে।



তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বাংলার গাজন উৎসব ও গান

মঙ্গলকাব্য থেকে জানা যায় যে, শিবপূজা প্রধানত কোচ, ডোম, বাগদি প্রভৃতি অন্ত্যজ শ্রেণীর জনজাতির মধ্যেই প্রচলিত ছিল।

শিব-শিবানী সম্পর্কে অনেক লৌকিক উপাখ্যানও গড়ে উঠেছিল। ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে — বাংলার লোকজীবনে বৃষভধ্বজ-শিব প্রমথেশ অপেক্ষা গঞ্জিকা ধুস্তুরাসেবী, পরস্ত্রীলোলুপ, কৃষক শিব অধিকতর প্রাধান্য লাভ করেছে।

গাজন ছিল ধর্মঠাকুরের উৎসব। কালক্রমে, শিবপূজার সঙ্গে 'গাজন' সংশ্লিষ্ট হয়ে বর্ষশেষের উৎসব রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। শ্রী হংস নারায়ণ ভট্টাচার্য্যের মতে — 'এই সব ধর্মাচার ও সংস্কৃতির সমন্বয়ে ধর্মঠাকুর রাঢ় দেশে গ্রাম্য দেবতা রূপে রূপান্তরিত হয়েছেন। তাঁর গ্রাম্য জনোৎসবের নাম হয়েছে 'গাজন'।

শিব ক্রমে প্রধান গ্রাম দেবতায় রূপান্তরিত হয়েছেন বলে ধর্মের গাজন সহজেই শিবের গাজনে পরিণত হয়েছে।

প্রাগ-বৈদিক যুগে আর্য সমাজে শিব দেবতারূপে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকলেও তিনি সারা ভারতে বহুরূপে বিরাজমান। কোথাও রুদ্ররূপে, কোথাও নটরাজ, কোথাও বুদ্ধের ন্যায় শান্ত-সৌম্য, আবার কোথাও তিনি কৃষক, কোথাও বা ভিক্ষাজীবী রূপে পূজিত হয়ে আসছেন। প্রথা বা সংস্কার অনুযায়ী পৌরাণিক শিব লৌকিক শিবরূপে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্নরূপে পূজিত হয়ে আসছেন।

গাজনের সন্ন্যাসীর কাছে শিব উপাস্য দেবতা। সেজন্যে তারা গাজন উৎসবে ধর্মীয় আচার, উপবাস-ব্রত, কৃচ্ছ্র সাধনার কঠিন অনুশাসন মেনেই চলেছে। গাজন উৎসব, জনমানসেরই উৎসব।

গাজন নানাভাবে বিভক্ত যেমন — চড়ক গাজন, নীল গাজন, ধর্মগাজন, বোলান গাজন, গম্ভীরা গাজন ইত্যাদি।

এক এক অঞ্চলে এক এক ধরনের গাজন উৎসব হয়। শৈবধর্ম প্রভাবিত অঞ্চলেই শিব গাজন, নীল গাজন, বোলান গাজন উৎসব হয়। আর আদ্যের গম্ভীরা গাজন ও ধর্ম গাজন উৎসব হয় লৌকিক বৌদ্ধধর্ম প্রভাবিত অঞ্চলে।

বাঙালীর যে কোন উৎসব মানেই গান। গাজন উৎসবেও তাই গান বা সঙ্গীত হয়ে ওঠে এক অপরিহার্য বিষয়।

তাই গাজন গান বলতে সহজেই মনে আসে নীলের গান, বোলান গান, অষ্টক গান, বান্দুটি গান, ত্রিনাথের গান ইত্যাদি।

গাজন উৎসবের পূজায় মন্ত্রপাঠ হয়। তবে তা সংস্কৃত ভাষায় নয়, আঞ্চলিক উপভাষায়। ধূপ, চৌশর ও ঢাক শুদ্ধির ক্রিয়া চলে ঐ মন্ত্র উচ্চারণের মধ্য দিয়ে।

ধূপদান কালের মন্ত্র ঃ 'স্বর্গে চলিলাম ধূপ, মর্ত্তে উঠে ধুয়া,
স্বর্গের ইন্দ্রানী নাচে, নাচে চাঁদ চুয়া।"

ঢাক শুদ্ধির মন্ত্র ঃ 'হনুমান আনিল বীচি মৃত্তিকা সঞ্চয়
আগে হইল অঙ্কুর পশ্চাতে হইল গাছ
মুচি ভাইয়া গোবর্ম লাগায় পরলে পরলে
দিব্য ঢাক শুদ্ধ হইল নব শংখের জলে।' ...

গাজন উৎসবের পূজারীরা ভিন্ন জাতের অর্থাৎ ব্রাহ্মণ নয়। তারা হাড়ি, বাগদী, ডোম, ধীবর (জেলে), তাঁতি (তন্তুবায়) ইত্যাদি সম্প্রদায়ের মানুষজন। এই পূজারীদের উৎসবকালে 'ভক্তা' হতে হয়। এঁরা 'ধড়া' অর্থাৎ যজ্ঞ উপবীত গলায় পরে ব্রাহ্মণোচিত আচার নিষ্ঠা সহ শিব গোত্র গ্রহণ করে, নিরামিষ ভক্ষণে দিনান্তে একবার হবিষ্য আহার, সংযম, ব্রত, উপবাস পালন করে গাজনের পূজারী হন।

সংক্রান্তির দিনে সন্ন্যাসীসহ ভক্তদের নদীর-ঘাটে গিয়ে স্নান করে শিবগোত্র গ্রহণ করার বিধি প্রচলিত। গোত্র ত্যাগ করার মন্ত্র "মম গোত্রম্ পবিত্যজ্যম্ শিব গোত্রম্ পরিগ্রহামি"। মন্ত্র উচ্চারণ করে যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করার যেমন বিধি ঠিক তেমনি ভাবেই পয়লা বৈশাখ নদীতে গিয়ে অর্থাৎ গাজন উৎসব শেষ হলে পরের দিনে নদীতে স্নান করে যজ্ঞোপবীত ত্যাগ করে স্বগোত্রে ফিরে আসেন।

মেদিনীপুর ঝাড়গ্রাম অঞ্চলে গাজন উৎসবে স্নান যাত্রার প্রথাগত রীতি আছে। দেয়াসীরা ভক্তদের কাঁধে চেপে স্নানের ঘাটে যান। আবার পূজা শেষে উপবিষ্ট ভক্তদের পিঠের ওপর দিয়ে হেঁটে চলে আসেন শিবতলায়। সেখানে শিবভক্তি, শিব মাহাত্ম্য প্রমাণ ক্রিয়া কর্ম শুরু হয় 'আগুন ঝাঁপ' "কাঁটা ঝাঁপ ও চড়কগাছে বৃত্তাকারে ঘুর্ণনের মধ্য দিয়ে।

গাজন উৎসবে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মত অনুযায়ী নানান আচরণ পালন করা হয়। কোথাও কোথাও আবার পাঁঠাবলির প্রচলনও আছে। বাঁকুড়া, বীরভূম অঞ্চলে ধর্মরূপী শিবঠাকুরকে তৃপ্ত করার জন্যে পশুবলি দেওয়া হয়। এই প্রথা প্রান্তিক অনার্য জাতিদের কল্পনাপ্রসূত বলেই অনেকের ধারণা।

উৎপত্তি

(১) কারো কারো মতে গাজন উৎসব জাতি নির্বিশেষে সর্বসাধারণের তাই এই উৎসবের নামকরণ হয়েছে 'গাজন'।

(২) আবার কারো মতে উৎসব জনসমাবেশজনিত গম্ গম্ ধ্বনিতে মুখর বলে নামকরণ 'গাজন' হয়েছে।

(৩) ভক্তসন্নাসীদের গর্জনরূপী হুঙ্কার 'গাজন' নামকরণের মূল উৎস।

(৪) এই সময় অনাবৃষ্টির জন্য দেশজুড়ে হাহাকার রব ওঠে। বাণ রাজা গুরুর আদেশে বৃষ্টির জন্য বালার্করূপী সূর্যের পূজা করেন এবং বৃষ্টিও হয়। শৈবভক্ত রাজা সেই সময় থেকে গাজন উৎসবের প্রচলন করেন। গাজন উৎসবের একদিকে আছে যেমন নৃত্যগীত অন্য দিকে তেমনি আছে কঠোর সংযম ও নিষ্ঠার মেলবন্ধন।

(৫) আবার কেউ কেউ বলেন চৈত্র-সংক্রান্তিতে সূর্যদেব মেষরাশিতে তার তুঙ্গ ঘরে আসেন। সূর্যের এই ক্রিয়াকে স্বাগত জনানোর জন্যে চৈত্র মাসের শেষ দিনে চড়ক ঘুর্ণনের প্রথা। সূর্য পূজার প্রচলন ছিল প্রাচীন ভারতেও। সূর্যের পূজারীদের কোন কোন অঞ্চলে বলে 'বালা'। এই 'বালা' শব্দ থেকেই 'বালার্ক' শব্দটির উৎপত্তি।

(৬) কেউ কেউ বলেন চড়ক ঘূর্ণনের মধ্য দিয়ে জন্ম-মৃত্যুর পৌনঃপুনিক আবর্তনের প্রতীকরূপে প্রচ্ছন্ন রয়েছে বৌদ্ধ উৎসবের স্মৃতি।

(৭) প্রাচীনকাল থেকেই বাঙলায় গাজন উৎসব চলে আসছে সে কথা চতুর্থ খ্রীস্টাব্দে চৈনিক পরিব্রাজকগণ লিপিবদ্ধ করে গেছেন। তাই অনেকের ধারণা রাজা বিক্রমাদিত্যের আমল থেকেই গাজন উৎসব প্রচলিত এবং বৌদ্ধ রথোৎসবের অনুসরণেই এই গাজন উৎসবের উৎপত্তি।

ধর্মগাজন ঃ

ধর্ম ঠাকুর লোক দেবতা। আর ধর্ম ঠাকুরকে নিয়েই ধর্মের গাজন উৎসব। পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া, বীরভূম, বাঁকুড়া, বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে ধর্মঠাকুরের পূজা হয়। ধর্ম দেবতা কোথাও কূর্মমূর্তি, কোথাও বা প্রস্তর মূর্তি আবার কোথাও বা লৌহশলাকা বিদ্ধ কাষ্ঠখন্ড বাণেশ্বরী। শিব গাজনের সব আচার রীতি নীতিই ধর্মগাজনে মূলত পালন করা হয়। ধর্মগাজনে শোভাযাত্রা বের হয়। দেবতা নিয়ে গ্রাম প্রদক্ষিণ, তার সঙ্গে চলে সঙের নাচ। নানাবিধ ঝাঁপেরও প্রচলন আছে। একথা বলা চলে যে বাঙলার শিব-গাজন ও ধর্ম-গাজন উৎসবে বিভিন্ন জাতি-উপজাতির আচার ও সংস্কৃতিগত মিশ্রণ ঘটেছে।

হুগলী জেলার শিব-তীর্থ তারকেশ্বরের গাজন ঃ

তারকেশ্বরে গাজন-উৎসব খুব ধুম ধাম সমারোহের সঙ্গে হয়। চৈত্র-সংক্রান্তিতে এখানে হয় সন্ন্যাসীদের মহা সম্মেলন, বিরাট মেলা বসে। চতুর্দিকে শুধু ধড়া-উপবীত ধারী রঙিন বস্ত্রে সজ্জিত ভক্ত সন্ন্যাসীদের উপচে পড়া ভীড়। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এই সব ভক্তদের সমাগম। শিবের মাথায় জল ঢালতে সন্নাসীরা পায়ে হেঁটে আসেন। উৎসব প্রাঙ্গণ মুখরিত হয়ে ওঠে। কাঁটা ঝাঁপ, আগুন-ঝাঁপ, নীলাবতীর বিয়ে, শোভাযাত্রা, সঙের নাচ সবই চলে। সেবাইত দশনামী সম্প্রদায়, বৈদিক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। পাশেই কালীমন্দির, নিত্য পূজার্চনা ও ভোগ চলে।

তারকেশ্বরে শিবের মাহাত্ম্যের নানা কিংবদন্তী আছে। পূর্বে তারকেশ্বরের শিবের ভক্ত মুসলমানরাও হতেন। নানা সামাজিক পরিবর্তনে তা বন্ধ হয় তবে এখনো চেরাগ জ্বালানো প্রথা ঐ সম্প্রদায়ের মধ্যে চলে আসছে।

প্রচলিত প্রবাদ আছে যে মক্কায় শিব আবদ্ধ আছেন। সেই সম্বন্ধে গানও শোনা যায় ঃ

শোন বলি শিবের ভক্ত
শিব আছেন মক্কায় বন্ধ
যে তারে আনতে পারবে
বলব তারে ওস্তাদী।

মালদার গম্ভীরা গানেও এই একই প্রতিবেদনই দেখা যায়।

এ বুড়া মক্কা হৈতে পালিয়ে এ্যস্যা
আমাদের ঢুঁড়িয়া করলে হানাহান।

শিবের কোন জাত নেই। সকল শ্রেণীর মানুষ শিব গোত্র নিয়ে শিবের পূজা করতে পারে। তিনি সকল ভক্তকে রক্ষা করেন। অল্পেই তুষ্ট হন শিব। যুগ যুগান্তের বুড়োরাজ অনাদি লিঙ্গ জগতের হেতু — পাতাল থেকে উঠেছেন। তাই সৃষ্টির প্রতীক রূপে সর্বত্র পূজিত

শিব। ভারতে শিব বহুরূপী। তাঁকে কেন্দ্র করেই বাঙলায় গাজন উৎসব। সর্বজন উৎসব এই গাজন। গাজনে শিব ভক্তি ও শিব মাহাত্ম্য প্রদর্শনে আছে আত্মনিপীড়ন ও নিগ্রহ যেমন বাণ ফোঁড়া, বঁড়শি ফোঁড়া, কাঁটা ঝাঁপ, আগুন-ঝাঁপ ইত্যাদি। কোন কোন অঞ্চলে আছে শব দেহ ও নরমুন্ড নিয়ে নৃত্যের প্রচলন।

শিবগাজন, ধর্মগাজন, পঞ্চানন্দের গাজন, মহাকালের গাজন শিব, ধর্মঠাকুর, পঞ্চানন্দ, মহাকাল প্রভৃতি দেবতাগণকে নিয়েই। সব গাজনেই আছে শবরী মন্ত্র, ভর নামা, আচার অনুষ্ঠান ও নৃত্যগীতের প্রচলন। শবরী মন্ত্র গাজন উৎসবের প্রধান অঙ্গ।

পান্না গ্রামে গাজন উৎসব ঃ

আবৃত্তির মত শবরী মন্ত্র পাঠ দিয়ে সুরু ঃ
হংসরথে এসো প্রভু জটা উড়ে বায়
আমার ঠাকুর ভোলানাথ সেবক চাইলে যায়।

কি কর হে ব্রহ্মা বিষ্ণু কি কর বসিয়া
সেবকে করিছে পূজা চল যাই দেখিগা।

গাজনের দেয়াসীরা নিরক্ষর। সংস্কৃত মন্ত্র তাদের মুখে উচ্চারণের অসুবিধা। অথচ শিবের পূজা করতে হবে। তাই শবরী মন্ত্রের আশ্রয় নিতে হয়েছে তাদের। তাছাড়া শিব বিল্বপত্রেই তুষ্ট। আপন জনের মতন ভেবেই তারা শিবের পূজা করেন।

শবরী মন্ত্রের দুটি ভাগ (১) বৈধী মন্ত্র অর্থাৎ সংস্কৃত শাস্ত্রীয় মন্ত্র (২) শবরী মন্ত্র অর্থাৎ স্থানীয় কথ্য ভাষায় রচিত মন্ত্র। এই শবরী মন্ত্র শবর ও নিষাদ জাতির সমাজে প্রচলিত ছিল। গাজন উৎসবে শবরী মন্ত্র পাঠের মাধ্যমে সব কিছুই শোধন করতে হয়। একটি ফুলপড়া শবরী মন্ত্র উল্লেখ করা হল ঃ

ফুল পড়ি কুলেশ্বরী নাচে দেবী কামেশ্বরী
নাচে দেবী আপনার পায়।
আমি এই ফুল পড়িয়া দিলে
অমুকের সুনজর আমার লেগে হয়
ইল কাঁপে বিল কাঁপে জানিয়ে ফুলের নাম
আমার এই ফুলপড়া অমুকের পঞ্চাত্মা
পাঁচ পরাণে লাগে।

ধূপদানকালে দেয়াসীদের মন্ত্র পাঠ ঃ

কি কি ধূপ, শ্বেত ধূপ, নেত ধূপ
ধুলা ধূপ, কালা ধূপ
চারি ধূপ করিয়া চুর
আমার ধূপের গন্ধ যায় কৈলাসপুর।

ধূপের গন্ধে কৈলাসপুর আমোদিত। দেবগণের নিজ নিজ বাহনে মর্ত্যে আগমন। শবরী মন্ত্রে রয়েছে —

স্বর্গে চলিলাম ধূপ মর্ত্তে উঠে ধূয়া
স্বর্গের ইন্দ্রানী নাচে, নাচে চাঁদ চুয়া।

ইন্দুরের পৃষ্ঠে দিয়া পাও
গনেশ আসিয়া ধূপ খাও
চেলার পৃষ্ঠে দিয়া পাও
সরস্বতী আসিয়া ধূপ খাও।

মেদিনীপুর জেলার কেন্দুয়ার গাজন উৎসব ঃ

ঝাড়গ্রাম থেকেই কেন্দুয়ায় যেতে হয়। দূরত্ব প্রায় আট-নয় মাইলের মতন। এখানকার গাজন উৎসব চৈত্র মাসে হয় না, হয় বৈশাখ মাসের মাঝামাঝি সময়ে। বিরাট মেলা বসে, কেনা বেচা ভালই। যাঁরা শিবের কাছে মানত করেন তারা এবং অন্যরা মেলায় আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবার অভিলাষে শিবতলায় উপস্থিত হয়। এটি গ্রামীণ মেলা এবং গ্রামবাসীদের মিলন ক্ষেত্রই বটে। বটতলায় শিবের মন্দির। সাড়ম্বরে বালা অর্থাৎ পুরোহিত স্নান যাত্রা করেন তার পরবর্তী আনুষ্ঠানিক সমস্ত ক্রিয়া অন্যান্য অঞ্চলের গাজনের মতই। ভক্তদের শিবধ্বনি সমস্বরে চতুর্দিক মুখর। চলে আগুন ঝাঁপ, আগুন মাড়িয়ে যাওয়া অর্থাৎ শিবভক্তি প্রমাণের আত্মনিপীড়নক্রিয়া।

একপ্রান্তে চড়ক বৃক্ষও থাকে। ভক্তদের পিঠে বঁড়শি বিঁধিয়ে চড়ক বৃক্ষের সঙ্গে পাক খাওয়া ইত্যাদি ক্রিয়াও চলে। তার সঙ্গে ভক্ত সন্ন্যাসীদের সমস্বরে শিবধ্বনি। সগর্জনে বাজে ঢাক। সব মিলিয়ে মেলা জমে ওঠে। এখানে মুখোস পরে ছৌ-নাচের প্রতিযোগিতাও হয়ে থাকে। পৌরাণিক দেবদেবীর ও পশুপাখির মুখোশ পরেও নৃত্যের প্রচলন রয়েছে। ছৌ-নৃত্য নারী বর্জিত। পুরুষরাই নারী বেশে নারীর চরিত্রে নৃত্য করে। ছৌ-নৃত্যে আছে বহু প্রকারের নৃত্য। বিভিন্ন গ্রাম থেকে নৃত্য গোষ্ঠী এখানে উপস্থিত হয়ে ঐ সকল নৃত্য প্রদর্শন করেন। লোক সমাগম বিশাল।

গাজন উৎসব ও গান ঃ

বারো মাসে তের পার্ব্বণের দেশ এই বাংলা। কাজেই পালপার্বণের উৎসবের দিনগুলি শহরের মানুষ ভুললেও গ্রামের মানুষ ভোলেনি। নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে উৎসবগুলি আবার গানও বাঁধে। কথায় বলে 'ধান ভানতে শিবের গীত'। বাংলা শিবের গাজন খুবই জনপ্রিয়। গ্রাম্য মানুষজন শিবের কাছে মানত করে রোগ, শোক, দুঃখ দৈন্য প্রভৃতি কারণে তারা অঙ্গীকারবদ্ধ থাকে। মানতের ফল সম্পূর্ণ হলে তারা সারা চৈত্রমাস ধরে সন্ন্যাস ব্রত পালন করে। গলায় এক গোছা সুতার উপবীত পরনে নতুন গেরুয়া কাপড় ও উত্তরীয় বা নতুন গামছা। ঐ পোষাকই সারা চৈত্রমাস ধরে অঙ্গে থাকে। নিরামিষ ভোজন-একাহার। পশ্চিমবঙ্গের সন্ন্যাসীদের কারোর হাতে ত্রিশূল বা চিমটে থাকতে দেখা যায় যা অন্য কোথাও দেখা যায়না। পূর্ববঙ্গ অপেক্ষা পশ্চিমবঙ্গেই গাজনের উৎসব অপেক্ষাকৃত অনেক বেশী। এই উৎসব বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন নামে প্রচলিত। যেমন মালদহ জেলায় 'গম্ভীরা', উত্তর বাংলায় 'গমীরা', জলপাইগুড়ি জেলায় এবং পূর্ব বাংলায় 'নীলের পূজা' নামেই প্রচলিত। এ সবই শিব ঠাকুরের বিবাহকে কেন্দ্র করে। পূজা রীতি নীতি সবই একই ধরণের। গাজন গানের বিষয় বস্তু শিব কেন্দ্রিক অর্থাৎ হর পার্বতীর বিবাহকেন্দ্রিক। এই উভয় বাংলায় একই দিনে এই উৎসব পালিত হয়। ধর্মঠাকুরের গাজনও এই ধরনেরই হয়। গাজনের সন্ন্যাসীরাই ধর্মের স্থানে গিয়ে দণ্ডী খাটে ও ঝাঁপ খায় বাঁশের উঁচু মাচান থেকে ছাবড়ার গদির উপরে। আবার চড়ক উৎসবের দিন অর্থাৎ গাজন উৎসবের শেষদিন চড়ক তলায় চড়কের গাছ

ঘোরানো হয়। সেখানে ফুল ঝাঁপ, কাঁটা ঝাঁপ, বিবিধ প্রকার ঝাঁপের প্রচলন আছে। চৈত্র সংক্রান্তির আগের কয়েকদিন গাজনের সন্ন্যাসীরা ফলমূল ও হবিষ্যান্ন খেয়ে থাকেন। সংক্রান্তির দিন একেবারে নির্জলা উপবাসে থেকে গাজন তলায় পুজো দিয়ে মানত সাঙ্গ করেন।

একটি গাজন উৎসবের বন্দনা গান ঃ

প্রভু যোগ নিদ্রা কর ভঙ্গ সেবকের দেখ রঙ্গ
পরিহার তোমার চরণে।
কার্তিক গণেশ কোলে শয়নে আছে নিদ্রা ভোলে
আমরা তোমায় প্রণাম করিব কেমনে।
নিদ্রা ত্যজ দেবরাজ বসহ খট্টার মাঝ
নিরন্তর গৌরী রাখ বামভাগে
তুমি দেব অধিপতি হরি ব্রহ্ম করে স্তুতি;
অন্য দেব কোনখানে লাগে।

শেষে ভোলানাথের আগমন, ভাঙ খাবার বর্ণনা সম্পৃক্ত গাজন গানটি লক্ষণীয় ঃ

'এলোরে কাশীনাথ যোগীয়া
(ভো) বোম্ বোম্ ভোলা এল নাচিয়া।।
তুমি ভাঙ্ খাও, ধুতুরা খাও
কুচ্নি গো পাড়ায় যাও
কাহ্যান প্যাত্যা কুঠিয়া
ফুল দিয়া ঢাকিয়া
ঘটির মধ্যে গুলিয়া
গামছা দিয়া (হায়রে)
গামছা দিয়া ছাকিয়া ছাকিয়া
ভো বোম্।। ...

আর একটি গাজন গান, যার মধ্যে শিবের প্রতি কটাক্ষপাত করা হয়েছে শিবের দ্বিতীয় বার বিবাহকে কেন্দ্র করে। গানটি হল —

'ভাঙ্ খাও ধুতুরা খাও
ভাঙের মর্ম জান,
গাঙ্ পহিড়্যা যত ভাঙ্ বুড় বাইন্ধ্যা আন।
বুড় বহিন্ধ্যা আইন্যা ভাঙ্
তুইল্যা থুইলো চালে
বৈকালে লামহিয়া ভাঙ্
ঢেঁকি দিয়া কুটে'।। ...

বিপত্নীক শিবের পুনরায় বিবাহে ঘটকালি করেছেন দেবদূত নারদ। পল্লীকবির গানে তা ফুটেছে। নিচে গানটি উদ্ধৃত করা হল —

শুন সবে মন দিয়ে হইবে শিবের বিয়ে
কৈলাসেতে হবে অধিবাস।

নারদ করে আনা গোনা কৈলাসে বিয়ার ঘটনা
শুন শিবের বিয়ার ইতিহাস।।
দক্ষ যজ্ঞে মৈলা সতী কেঁদে আকুল পশুপতি
নয়ন জলে বক্ষ ভেসে যায়।
সতী জন্মিল পুনরায় গিরিরাজার কন্যা হয়
ধ্যান যোগে নারদ জানতে পায়।।
দেবগণ সব সঙ্গে নিয়া করিতে বিয়ার সম্বন্ধ
নারদকে পাঠাল গিরিপুরে।
চলিল ব্রহ্মার পুত্র করিবারে লগ্ন পত্র
মগ্ন হয়ে হরিগুণ সুরে।।
করি ইষ্ট আলাপন বিবাহের উত্থাপন
করেন মুনি গিরিরাজার কাছে।
রাজা, তোমার নাকি আছে কন্যা রূপে গুণে অতিধন্যা
দিবা নাকি বিয়া তার শিবের কাছে।
তোমার কন্যা যোগ্য তার তিনি যোগ্য জামাতার
শুনিয়া কহেন হিমগিরি।
পঞ্চানন বিবাহের ছেলে রাণীর অনুমতি হলে
তবেই আমি পত্র করিতে পারি।।

হাওড়া জেলার গাজন উৎসব

কথিত আছে যে মানুষ সাংসারিক কলুষতা, পঙ্কিলতা, দুঃখ-দারিদ্র্য, বিপদ-আপদ, রোগ-ব্যাধি-র হাত থেকে মুক্তি কামনায় শিব, কালী, শীতলা, পঞ্চানন্দ ও ধর্মরাজের কাছে মানত করে অর্থাৎ 'সন্ন্যাস' গ্রহণ করে -- এদেরই সন্তুষ্টির উৎসবকেই বলা হয় 'গাজন'।

গ্রাম-বাংলার মানুষ বিশেষ করে নিম্ন বর্ণের মানুষ — যথা ডোম, হাড়ি, বাগদী, জেলে ইত্যাদি (পরবর্তী কালে অব্রাহ্মণ সম্প্রদায়) এই ব্রত পালন করে। একে বলা হয় 'সন্ন্যাস' গ্রহণ করা।

সমগ্র চৈত্র মাস জুড়ে এই ব্রত পালন করা হয়। কৃচ্ছ সাধনের জন্য দৈহিক বসন ভূষণ এমন কি আহার বিহার পর্যন্ত ত্যাগ করে কঠোর ভাবে এই ব্রত পালন করা হয়। গৈরিক বা হলুদ রঙে ছাপান নূতন উত্তরীয় এবং নতুন গামছা এংবং গলায় একগোছা সাদা সুতোর উত্তরীয় এই হল সন্ন্যাসীর বা গাজনের সাজ। সূর্য ওঠার আগে সামান্য ফল-মূল আহার করে সারা দিন উপবাসে থেকে এবং গ্রামে-গ্রামে ভিক্ষা করে আতপ চাল ও সবজী ইত্যাদি যা পায় তাই দিয়ে অপরাহ্নে হবিষ্যান্ন গ্রহণ করে। সারা চৈত্র মাস যাবৎ এই কঠোর শারীরিক কৃচ্ছ সাধনই গাজনের মূল উদ্দেশ্য।

এরা কিন্তু শিবের ভক্ত, তাই শিবের মতই এদের আচার আচরণ এবং মুখে সর্বদা 'বাবা বুড়ো শিবের (প্রকারান্তে তারকনাথের বা ধর্মরাজের বা নাম্নার পঞ্চানন্দের) চরণে সেবা লাগে · মহাদেব" এই নাম কীর্তন শোনাযায়। অবশেষে চৈত্রমাসের শেষ দিন বা আগের দিন ঢাক, ঢোল, কাঁসি বাজিয়ে এরা দল বেঁধে গৃহস্থের বাড়ি বাড়ি গিয়ে গৃহস্থের মঙ্গল

...মনা করে। একে বলে "ফল ভাঙা"। গৃহস্থেরাও এই সব সন্ন্যাসীদের আহারের জন্য ডাব, ...েল, কাঁঠাল, আম ইত্যাদি ফল মূল দান করে। শেষে সারা দিন উপবাসের পর এই সন্ন্যাসীর দল স্নান করে ধর্ম রাজের মন্দিরে বা শিবের মন্দিরে সমবেত হয়।

মন্দিরে তারা পূজায় অংশ নেয়, নানা ভাবে এরা দেবতাকে তুষ্ট করার চেষ্টা করে। অবশেষে দেবতা তুষ্ট হলে তার মাথায় দেওয়া ফুল বেলপাতা মাটীতে পড়ে এবং এটাকে সন্যাসীরা দেবতার অনুমতি মনে করে উল্লসিত হয় এবং বাঁশ বাঁধা ভারা থেকে কখনও আগুনে, কখনও কাঁটায় কখনও মাটীতে বা খড়ের গদিতে ঝাঁপ দেয় একেই "গাজনের ঝাঁপ বা ঝাঁপান বলে।

সবশেযে দেবতার চরণারমৃত গ্রহণ করে তাদের উপবাস ভঙ্গ হয় এবং ব্রত-উদ্‌যাপন হয়।

গাজনের ক্রিয়া কর্ম্ম ও মন্ত্র গান ঃ

প্রধান সন্ন্যাসী (মূল) দেবতার মন্দির সংলগ্ন প্রাঙ্গণে ঘটি ভরা জল ও গোবর লেপে মাটীকে শুদ্ধ করে — একে বলে "ধূল সাপট" —

মন্ত্র ঃ বুড়িং চরণে পঞ্চ প্রণাম (৩বার)
গম্ভীরে আছেন ভোলা মহেশ্বর
তাহার চরণে পঞ্চ প্রণাম।
সিংহ দ্বারে আছেন নন্দী মহাকাল
তাহার চরণে পঞ্চ প্রণাম।
পাতালে আছেন ধর্ম্মাধিকারী
তাহার চরণে পঞ্চ প্রণাম।
বার রুদ্র তেরো সমুদ্র
তাহার ওদিকে বল্লুক সমুদ্র
তাহার ধূল আনিয়া মূল সন্ন্যাসী
ধূল সাপট করিলেন —
তাহার সন্নিধান কি?
স্বর্গের ধূল স্বর্গে থাক
মর্ত্যের ধূল মর্ত্যে থাক
মূল সন্ন্যাসীর খাটা খাটুনিতে ঠাকুর তুষ্ট হইলেন
আসন মুদ্রা লয়ে বসিলেন
ভূ-ভাণ্ডারী ভূ-ভাণ্ডারী।।

এরপর মুল সন্ন্যাসী ঘটিভরা জলে তুলসী মুঞ্জরি দিয়া জল শুদ্ধি করিবেন — একে বলা হয় "জল-সাপট"।

মন্ত্র ঃ স্বর্গের সেরা কপিলাকে মর্ত্যে আনিলেন রাজা লাউসেন ত্রিভুবন তরিবার তরে। তাহার গোময় এ স্থান পবিত্র হয় দুগ্ধ হতে দধি, ঘৃত লাগে 'হোম যজ্ঞে'।

"গঙ্গা যমুনা বহে সমতুল
গঙ্গার জল তুলসী ফুল"
(পূজার সামগ্রী)

পুবে পুবতি অতি প্রসিদ্ধ রাজা, যাঁহারে সেবিলে মুক্তি পদ পাই
না যাব যমপুরী যাব শিবপুরীর ঠাঁই।
ধর্ম্মাদি, কর্ম্মাদি সাত দেউলে পূর্বদ্বারে পুষ্পাঞ্জলি।

(এই ভাবে পশ্চিম দ্বারে, উত্তর দ্বারে ও দক্ষিণ দ্বারে) ঘট থেকে জল ফেলে ক্রিয়া কর্ম করার রীতি।

বুড়িং চরণে পঞ্চ প্রণাম (৩বার)
গম্ভীরে আছেন ভোলা মহেশ্বর
তাহার চরণে পঞ্চ প্রণাম ....
.... তাহার সন্নিধান কি?
স্বর্গের জল স্বর্গে থাক, মর্ত্তের জল মর্ত্তে থাক
মূল সন্ন্যাসীর খাটা খাটুনিতে ঠাকুর তুষ্ট
হইলেন আসন মুদ্রা লয়ে বসিলেন ...
ভু-ভাণ্ডারী-ভুভাণ্ডারী।।

গোড় খাটুনি (ধুলায় গড়াগড়ি দেওয়া) ঃ

(মূল সন্ন্যাসী এই মন্ত্র পাঠের পরে মাটীর ওপর একবার ডান দিকে একবার বাম দিকে গড়াগড়ি দেয় একেই বলে 'গোড় খাটুনি')

মন্ত্র ঃ পূর্বে হেমরাজ রোহিত রোহিমালে মহাসিংহী দ্বারে দ্বারে ভানু নামে মহাবীর গোরক্ষ নামে নিযুক্তি পায়। শয়ন মুক্ত পূর্ব-দ্বার।

(একই রূপে উত্তরে আড়বাদ্য নামে মহাবীর দক্ষিণে হনুমন্ত নামে ও পশ্চিমে হেম কেদার নামে মহাবীর) মন্ত্রপাঠ চলে।

বেতশন ঃ

(বেতের গোছা লইয়া ছড়ির মত খেলা। আসলে এটাই গাজনের অস্ত্র স্বরূপ। চার জন সন্ন্যাসীতে এই খেলা হয়।)

মন্ত্র ঃ

- আদি অন্ত পর ঘর সে তত্ত্ব পঞ্চ বক্র কাশিশ্বর, মর্মে মর্মে সে তত্ত্ব, তাবৎ দ্বারে দ্বারে বারিকং পদলঞ্চ সহদেব মৃত্যুঞ্জয়।
- দক্ষিণে তামরাক্ষ পথে মনি মুকুতালঞ্চে ভূষিত রাবণ রাজা তাবৎ দ্বারে দ্বারে বারিকং পদলঞ্চ সহদেব মৃত্যুঞ্জয়।।
- উত্তরে হেমরাজা বসতি বন গৃহে সাধুমতি, সাগরে সিন্ধুবারি পায়, লয়, লগ্ন ইশ্বত, বিশ্বত, শ্রী উত্তরি দ্বার মুক্তাং।
- পশ্চিমে কেদার ছত্রি পূর্বভাগে সংকৃষণ, মাধব মাধব শ্রী মাধব পায়, লয়, লগ্ন, ইশ্বত, বিশ্বত পশ্চিম দ্বার মুক্তাং।

প্রণাম ঃ

- গগনেশ্বর, ঈশ্বর প্রভু সর্বগুণেশ্বর, পরাৎপর, পঞ্চমুখ হং তং প্রণমি সদাশিব পাপ হরং।
- মহাদেব মহাত্রাণ মহাযোগী মহেশ্বর মহাপাপ হরং দেব মকরায়ঃ শিবাযঃ নমঃ।

- কালি কালি করাল বদনি শিরমাল্য শোভিনী চামুন্ডা মুন্ডমালয়ে লোক নারায়ণি
  নমঃ নমঃ শিবায়ঃ নমঃ।
  প্রভু হে, যোগ নিদ্রা কর ভঙ্গ সেবকের দেখ রঙ্গ
  কি করো নিদ্রায় ঘোরে শয়ান।
  শচী, ব্রহ্মা, ইন্দ্রপতি তাঁরা করেন যোড় স্তুতি
  অন্যদেব লাগে কোন খান।
  বসিয়া বৃষ পরে শিঙার ডমরু করে
  গৌরি আছেন বসে বামে।
  কার্ত্তিক গণেশ লয়ে কোলে, নিদ্রা যাও বিভোলে
  সেবক প্রণাম হইবে কেমনে।।
  নিরামিষ হবিষ্যি করি, শালবনে ঘর করি
  তোমা দেখে লাগে বড় ভয়।
  সেবকের অপরাধ ক্ষমা করো পুরাও সাধ
  দয়া করো ঠাকুর মৃত্যুঞ্জয়।।

দে বন্ধন, দ্বার বন্ধন, ঘাট পাট লাঠি বন্ধন, সত্যের কপিলা বন্ধন, আদ্যের তুলসী বন্ধন, আর বন্ধন সরস্বতী কাং। সম্মুখে আছেন ছোকরা শিব তাহার চরণে পঞ্চ প্রণাম।

লীলাবতীর বিবাহ

গাজনের মূল সন্ন্যাসী যিনি তিনিই হবেন কন্যা কর্তা। তাঁর বাড়ীতেই এই বিবাহ অনুষ্ঠান হয়। একটি ঘটকে লীলাবতী রূপে পূজা করা হয়। সকাল থেকে তার বিবাহ কার্য সম্পন্ন হয়। সন্ধ্যায় শিবমন্দির থেকে (যেহেতু শিবলিঙ্গ স্থানান্তর করা যায়না) দুই মাটীর খুরীর মধ্যে নারিকেল-মুচি শিবের প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করা হয়। লাল-সুতায় দুই মাটীর খুরী বা সরাকে বাঁধা হয়। তার পর সেই মন্দিরে শিবের আরাধনা ও খাটাখাটুনি করে শিবের অনুমতি পাবার পর ওই প্রতীককে মাথায় করে আনা হয় লীলাবতীর গৃহে। সঙ্গে ঢাক, ঢোল, কাঁসি বাজে, আলোর সাজ থাকে এবং বরযাত্রী হিসাবে গাজনের দল সঙ্গে চলে।

লীলাবতীর গৃহে সারারাত ধরে বিবাহ কার্য অনুষ্ঠিত হয়। (সবটাই মেয়ে বিয়ের মত আয়োজন) বিবাহ শেষ হলে লীলাবতী ও শিব ফিরে আসে পূর্বস্থানে। ফল মূল ও চরণামৃত গ্রহণ করার শেষে গাজনসন্ন্যাসীদের উপবাস ভাঙে। শেষরাতে যে যার গৃহে ফিরে যায়। এই ভাবে লীলাবতীর বিয়ে সম্পন্ন হয়।

বিয়ের গান ঃ

আয়গো আয় ত্বরা করে
আয়গো ছুটে আয়।
আজ, লীলাবতীর বিয়ে তোরা
দেখবি যদি আয়।।
বরযাত্রী যত সন্ন্যাসী
তারা ফুল তুলেছে রাশি রাশি
সবাই তারা হল খুশী
পদে পুষ্পাঞ্জলী দেয়।।

কোথায় গেল উড়ে বেহারা
ত্বরা করে আয়রে তোরা
কোথায় গেলি কূল বালা
সাজিয়ে আননা বরণ ডালা
ত্বরা করে আয় গো তোরা
উলু দিয়ে শাঁখ বাজায়।।
ওগো নাপিত ভায়া কোথায় গেল
বিয়ের কনে আনতে বলো
লগ্ন বুঝি ভ্রষ্ট হল
দাওনা শিব সিঁদুর পরায়।।
এই পদ্ধতি আছে সব দেশে
দেখে সব মন উল্লাসে
প্রতি বছর চৈত্র মাসে
বিবাহ হয় এই সময়।।
ওগো পরেশ চন্দ্র দাসে বলে
এই নিবেদন সভাস্থলে
আমাদের তাপিত অঙ্গ শীতল করো
ঠাকুর তোমার চরণ ধূলায়।।...

গাজনের গান

(১)

ভাঙ্গড় ভোলা, শিব, তোমার একি মোহন বেশ
মাথাতে পরেছ মুকুট নেই কো জটার লেশ।
বাঘছাল কোথায় গেল, কোথায় গেল হাড়ের মালা।
মাথাব সাপ কি বনে গেল, হইয়ে ঝালা পালা।
রাজার মেয়ে করলে বিয়ে হলে রাজার জামাই,
ঘরে আছে গঙ্গা মাই, তুলনা তার নাই।
কিন্তু, বাবা, বলি তোমা করি প্রণিপাত।
এই দুই সতীনে বিবাদ হলে না হয় বিসম্বাদ।
শুন বলি, ওগো ঠাকুর, পেন্নাম শ্রীচরণে,
গঙ্গামাই মাথায় রেখো গৌরী গো হৃদয়ে।

— ২৪ পরগণা (টাকী) স্বঃ লিঃ- ৮

(২)

ভাঙ্গব চারি দুয়ারের কবাট,
দেখব এবার শিবের পাদচরণ।।
দশেতে করিল পুজা দশগিরি রাবণ।
লোহার গুণে সেবা করে সেই পঞ্চানন।।
দেবদেবন মহাদেবন গণার ঊর্ধ্বে পৈতা কাঁধে।
পূর্বদুয়ার মুক্ত হ'ল দেখ পঞ্চানন।। — মালদহ

(৩)

জয় বাবা ভোলে বাবা ওগো ভোলানাথ
জয় বাবা ভোলে বাবা ওগো ভোলানাথ
তুমি বাবা ত্রিশুলধারী বাবা তারকনাথ।
ছাইভস্ম মেখে তুমি হলে শ্মশানবাসী,
কোন দুঃখেতে ঘর ছেড়ে আজ হয়েছে সন্ন্যাসী।।
ভাঙ ধুতুরা খেয়ে তুমি লাল করেছো চোখ
বব্‌ম্‌ বব্‌ম্‌ নৃত্য করে কাঁপালে তিনলোক।।

(৪)

শিবের পাশে বসে শিবানী বলে, সংসার চালানো যে দায়।
ভিক্ষা করে কয় দিন চলে, সোনার যাদুরা কি খায়।।
সোনার যাদু আমার কার্ত্তিক আর গণেশ,
না খেয়ে শুকিয়ে গেল মুখ।
হাড় হাভাতের পাল্লায় পড়ে,
আমার সাড়া জীবন দুঃখ।।
তুমি শুধু গাঁজায় মারো দোম্‌-ও ভোলানাথ
তুমি শুধু গাঁজায় মারো দোম্‌।
হাড়ের মালা গলায় নিয়ে গো - হো বলো শুধু বম্‌ বম্‌
বলো ও ভোলা মন।।

(৫)

চাষ করতে গেল ভোলা কৈলাস ছেড়ে।
ত্রিশুলটাকে লাঙ্গল করে ষাঁড় দিল জুড়ে।।
ভোলানাথ কৈলাস ছেড়ে, গেল চলে, আমার তাতে লাগে ভয়,
মিনসের স্বভাব ভাল নয়।
পরের মেয়ে দেখলে ভুলে যায় ও ভোলা নাথ
পরের মেয়ে দেখলে ভুলে যায়।
কাচকামিনীর বাড়ি গিয়ে গো, করে ওসে যাচ্ছে তাই
মিনসের স্বভাব ভাল নয়।।
মাছ ধরার জালি খানি কাঁধে ফেলে,
রূপোর চুড়ি হাতে পড়ল।
রূপোর চুড়ি হাতে পড়ল, ধানের জমির আল্‌ ধরল।।
তোমায় দেখে মজল আমার মন ও সুন্দরী,
তোমায় দেখে মজল আমার মন।
একবার আমায় দাও না ধরা বাঁচাও আমার এ জীবন।।
দুর্গা বলে নামটি আমার উমা বাগদিনী।
তোমার নামটা কিহে বুড়ো বলো তো শুনি।।
যদি তুমি আমার হোতে চাও-ও মিনসে-

যদি তুমি আমার হোতে চাও।।
হা-পুর - হা-পুর জল হেঁচে ভাঙর ভোলানাথ।
মোটা ভুঁড়ি - জলে ঠেকে, হলো কুপো কাত
ভোলা হলো কুপো কাত।।
বুড়ো ষাঁড় কাছে ছিল, চড়ল তাতে ভোলানাথ।
শিবানী বসল শিবের কোলে।
হর-গৌরীর মিলন হলো গো - কি শোভারে ভূতলে
শিবানী বসল শিবের কোলে।।

(৬)

দাও পরিচয় ও মহাশয় এখানে।
ওহে ভণ্ড, কাছে ষণ্ড, কাণ্ডজ্ঞান রয় কোনখানে।।
কাকোদর ছাপ কেন তোমার ঐ পদমূলে,
কোন কার্য সিদ্ধির লাগি, অর্ধচন্দ্র রয় ভালে।
কোন বা শ্মশানে থাকো, কোন ভস্ম গায়ে মাখো,
যদি দেবাদিদেব হয়ে থাকো, অত গাঁজা খাও কেনে।।
হাড়ের মালা গলায় পড় - কি করে তা শোভাকর
কেন হলে দিগম্বর, কেন নারীর দিকে মন টানে।।

(৭)

ও শিব নাচেরে নবীন কীর্ত্তনের মাঝে
নন্দী ভৃঙ্গী আদি শংখ মৃদঙ্গ বাজিল রে।।
শিব নাচে পার্বতি নাচেরে
ও ভাই, আর নাচে ভূতে
বৃষে উন্মত হইয়া পুচ্ছতুইল্যা নাচেরে।
ও শিব নাচেরে।।
নাচিতে নাচিতে শিবরে
ও শিব, হইয়াছে বেভুল,
আজিকার নাচেরে হারাইবার জাতিকুল।
ও শিব নাচেরে।।
রাম নাচে লক্ষ্মণ নাচেরে
ও ভাই, মন্দোদরী তারা
আকাশে গড়ুর নাচে
হইয়া আত্মহারা।
ও শিব নাচেরে।। — কাছাড় জেলা। **স্বঃ লিঃ - ৯**

দক্ষিণ ২৪ পরগণার গাজন গান

দক্ষিণ ২৪ পরগণার কাকদ্বীপ, নামখানা, সাগরদ্বীপ, কুল্পি, মন্দিরবাজার, ডায়মণ্ড হারবার, মথুরাপুর ও জয়নগর অঞ্চলে গাজন উসব ও গাজন গান, এলাকার এক বহুল প্রচলিত লোকউৎসব।

লোকাচার হিসাবে গাজন উৎসবের প্রাক্কালে অর্থাৎ চৈত্র মাসের পঁচিশ - ছাব্বিশ তারিখ নাগাদ পাথরের 'শিবমূর্তি' কোথাও বা 'শিবলিঙ্গ পুকুরে' ডোবানো থাকে।

তারপর গাজনের আগে মূল সন্ন্যাসী, আরো যারা সেই বছরের গাজনে সন্ন্যাসী হয়েছে তাদের সকলকে নিয়ে পুকুর থেকে 'শিবমূর্তি' তুলে এনে ছোট একটা খড়ের কুটিরে রাখা হয়। তারপর সেখানে স্থাপন করার পর শুরু হয় সন্ন্যাসীদের গাজনের পুজো বা গাজন উৎসব।

সে সময় গাজন তলায় গাজনের মূল সন্ন্যাসী গাজনের মন্ত্র হিসাবে উচ্চারণ করে থাকেন —

'শিব শিব,
 বলো শিবের বলো নাম
হর গৌরী শিবের নাম
 শিব পূজা করবো।
সেই ফুল তুলবো
 ফুল ফুল কাঞ্চন ফুল
 শিবের ঘর কতদূর
হর হর বিশ্বেশ্বর বোম
 বাবা মহাদেব — চরণে সেবা'।। ...

এই মন্ত্রের সঙ্গে অন্যান্য সন্ন্যাসীরা মূল সন্ন্যাসীর সুরের সঙ্গে সুর মিলিয়ে 'ধুয়া' তোলে। এরপর শিবের বন্দনা, পরে রাধাকৃষ্ণের কাহিনীকে কেন্দ্র করে গান, দ্বৈত হাস্যকৌতুক, রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী, এ ছাড়া সামাজিক নানান বিষয় কেন্দ্রিক গান নিয়ে জমে ওঠে গাজন উৎসব, গাজনের গান।

এসব গাজন গানের লেখক তথা কবিরা প্রায় সকলেই গ্রাম্য কবি। দক্ষিণ ২৪ পরগণার উল্লেখযোগ্য কয়েকজন গ্রাম্য কবি হলেন — ভবেশ মণ্ডল, জ্যোতিন, জয়দেব, নজরুল, তপন, উজ্জ্বল, প্রণবেশ, পরমেশ্বর, হামিদ প্রমুখ।

২৭শে চৈত্র সকাল ৯টা থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত গাজন গান হয় মেলাতলায়। এছাড়া প্রত্যেক গ্রামের পাড়ায় পাড়ায় মঞ্চ তৈরী করা থাকে, সেখানে গিয়েও গাজনের গান গাওয়ার প্রচলন এখানে বহুদিনের।

এবার আসা যাক এ অঞ্চলের গাজন গানের দলগুলির কথায়। যেমন (১) মাকালি গীতিনাট্য গাজন সংস্থা, (২) রামকৃষ্ণপুর মাকালী গাজন সংস্থা, (৩) কোচফলের গাজন সংস্থা, (৪) হামিদের গাজনের দল, (৫) পোলের হাট গাজন সংস্থা, (৬) শ্যাম বসুর গাজন পার্টি, (৭) গাজীর মহল গাজন সংস্থা, (৮) হুটু ভঞ্জের গাজন দল, (৯) রানাঘাট গাজন দল ইত্যাদি।

দক্ষিণ ২৪ পরগণায় গাজন গানের শুরু হয় শিবের বন্দনা, প্রার্থনা দিয়ে। তারপর রাধাকৃষ্ণের কাহিনী অবলম্বনে দ্বৈত সঙ্গীত, হাস্য কৌতুক, রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনীকেন্দ্রিক গান, নানান অশ্রুসজল ও সামাজিক ঘটনাকেন্দ্রিক গান, সাপুড়ে গান ইত্যাদি চলতে থাকে নানান পর্বে।

এবার গাজন গানের পালাপর্বে আসা যাক। বেশ নাটকীয় ভঙ্গিতে গাজনের লৌকিক

শিব নাচতে নাচতে মঞ্চে আসে। সঙ্গে তিনজন ছেলে, তিনজন মেয়ে শাঁখ, ঘন্টা, পূজার থালা নিয়ে মঞ্চে প্রবেশ করবে এবং শিব পূজার পর শুরু হবে গান। গাজনের শিবকেন্দ্রিক গানের বিষয় হিসাবে আসে সমুদ্র মন্থন, দক্ষযজ্ঞ, হর হর বোম্ বোম্, রামচন্দ্রের শিবপূজা এরকম নানান ঘটনা। তেমন একটি গান হল — ভবেশ মণ্ডল রচিত বন্দনা গান ঃ

'আয় আয় আয়রে তোরা আয়রে ছুটে আয়
ভাঙ্গড় ভোলা এসেছে আজ মোদের আঙিনায়।
তোরা সব ছুটে ছুটে আয় — (২)।।
বাজে মাদল ধিনাক্ ধিন বাজেরে কাঁসি
ছেলে বুড়ো সবার মনে একটু ছোঁয়ায় হাসি
বোম্ বোম্ বোম্ বলে গান যে সবাই গায়। ...

আর একটি গান হল —

ছাই ভষ্ম মাখা তোমার মাথায় — জটাধারি,
ভক্তের ডাকে এসো গো বাবা এসো কৈলাস ছাড়ি।
সমুদ্র ওই মন্থনে করেছিলে বিষপান
দেবতারা পেলে পরিত্রাণ অসুরেরা হোল নিধন।
বিষের জ্বালায় জ্বলে মর হয়ে তুমি নিরুপায়
মায়ের দুগ্ধ পান করে সবারে করলে মন।।
সাধন, ভজন, আরাধন, কিছুই আমরা জানিনা
পূজার থালি সাজিয়ে দিলাম গ্রহণ তুমি কর না
চরণ-কমল ধুইয়ে দিলাম নয়ন জলে
অধম ভবেশ লিখে যায় গানের ছলে।' ...

রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক একটি দ্বৈত সঙ্গীত হল

কৃষ্ণ ঃ যমুনার তীরে বসি
বাজাই আমি বাঁশরী
এখনো এলো না আমার রাধারাণী।।
রাধা ঃ ত্রিবেণী তীর্থপথে কে গাইল গান
ঘুমায়ে ছিলাম আমি জাগায়ে তুলিল পরাণ
ও-ও-ও বারে বারে কেন বাজাও ও বাঁশী।।
কৃষ্ণ ঃ তোমারে না দেখি যখনি সপ্ত সুরে তখনি
রাধা রাধা বলে বাজাই কত রাগিনী
জীবনে তুমি আমার প্রেয়সী।।
রাধা ঃ ভবেশ গাঁথা মালা পরালাম তোমার গলায়
যুগে যুগে আমি থাকিব চরণ সেবায়
ও-ও-ও তোমারে আমি কত ভালোবাসি।। ....

গাজন গানে নতুন জামাইকে নিয়ে কৌতুক-ও করা হয় নানান ছলে — যেমন
দ্বাদশী ঃ ওরে একাদশী বিপদে পড়েছি

চল যাই বাড়ি
জামাই ষষ্ঠি খেতে এসে
দিল গলায় দড়ি।।

একাদশী ঃ পচা আম পচা কাঁঠাল পচা আনারস
তিন দিনের পোড়া লুচি নেইকো কোন রস
আর কোনদিন করব নাকো দুটি পায়ে ধরি।।

শ্বশুর শ্বাশুড়ী ঃ পথে মেয়ে দেখলে পরে কি ভাবিবে মনেতে
মা মাসি জ্ঞান থাকে না টিটকারি মুখেতে।।

উভয়ে ঃ আজ থেকে তোমরা আমার শ্বশুর-শ্বাশুড়ী।।

এভাবেই চলে নানান ঘটনাকে কেন্দ্র করে গাজন গান। গ্রাম্য মানুষের অভিজ্ঞতাই মূর্ত হয়ে ওঠে গাজন গানে।

নীলগাজনের গান

শিবের অপর নাম নীল। শিবের অর্থ্যাৎ হরপার্বতীর বিবাহকে কেন্দ্র করেই গাজন উৎসব, সন্ন্যাসীরা ত্রিশূল হাতে বাঘছাল পরা অবস্থায় নৃত্য করে, নৃত্য শেষে নীলের গান শুরু-হয়। গানের বিষয়বস্তুতে থাকে শিবের পারিবারিক জীবনের ঘটনা সম্পৃক্ত খন্ডগীতি।

ভক্তরা শিবের বিবাহের ঘটকালির বর্ণনা গায়।
মন দিয়ে শোন সবে, হইবে শিবের বিয়ে
কৈলাসেতে হইবে অধিবাস
নারদ মুনির আনাগোনা কৈলাসে বিয়ার ঘটনা
বাজে ঢোল কাঁসি, বাজে, বাজে বাজে মোহন বাঁশি।।

নীল গাজনে বিবাহ সভায় দিগম্বর শিবের বর্ণনা —
নারদ মুনি ডাইক্যা বলে
শোন মামী শোন কই তোমারে
মামার বিয়ার আছে এক নিয়ম,
শ্বাশুড়ীর বরণকালে, ঈশান মূল থাকবে ডালে
(মামী) তবেই বরণ করবে পঞ্চানন।।
লয়ে ঈশান মূল বরণ ডালে
শ্বাশুড়ী বরণকালে
বরণ করতে লাগল তালে তালে,
ঈশান মূলের গন্ধ পেয়ে
শিব ছেড়ে সাপ যায় পালায়ে
(শিবের) খসিয়া পড়ে পরা বাঘের ছাল।।

নীল গাজনের গানে শৃঙ্গার রসের প্রভাব পড়েছে —
আমার মত দুই রূপসী, থাকে নারদ যার ঘরে
বেজায় খুসি, জোয়ার ভাটা বুঝতে সেই পারে।
আবার ভাঙের নেশা জমাট হতে কোলে বইসে রস করে।

নারদ বলে — মামা, কোলেই নিলে হতো যদি রসোদয়
দুই সতীনের ঝগড়ায়, কেন ভূমিকম্প হয়।

একটি নীলপূজার গান উদ্ধৃত করা হ'ল ঃ —

মোচ্‌রা শিঙ্গে মোচ্‌রা শিঙ্গে মোচর পায়ে চলে,
নয়তো চলে ধাপবনে নয়ত চলে জলে,
শুনতে যদি চাস্‌ ওগো মোচ্‌রা শিঙ্গের কথা,
ভূত প্রেত সঙ্গে করে দেও দেখি দেখা।

এর পরের অংশে আছে ঃ —

দেবী দুর্গার শাঁখা পরার গান

হাওড়া জেলার আখ্যান গীত

দুর্গতি নাশিনী দুর্গা সর্ব দুঃখ হরা।
অন্তিমে তারিনী মাগো তুমি পরাৎপরা।।
জপিলে শ্রী দুর্গা নাম পুরে মনস্কাম্‌।
অন্তিম কালেতে তার হয় মোক্ষধাম।।
একদিন ব্যাঘ্রাসনে বসেন যোগপতি।
হরের বামেতে বসেন চন্ডিকা-পার্বতী।।
গৌরী বলেন শুন ঠাকুর করি নিবেদন।
শঙ্খ পরার বড় সাধ পুরাও ত্রিলোচন।।
দুই হাতে শঙ্খ কিনি দাও দেবরাজ।
শূন্য বাহু শঙ্খ নাই পাই লোকলাজ।।
শুনিয়া গৌরীর কথা কহেন ত্রিপুরারী।
কড়ার ভিখারী আমি কোথা পাব কড়ি।।
তোমার পিতা দক্ষরাজা ধনের ঈশ্বর।
শঙ্খ পরার সাধ থাকে যাও বাপের ঘর।।
তোমার সাধের কথা বল গিয়া তারে।
স্বতন্তরা হয়ে শঙ্খ কিনে দিতে পারে।।
তখন, গৌরী বলে কি কর্ম্ম করিল মা-বাবা আমার পরে।
জেনে শুনে বিয়ে দিল ভিখারীর ঘরে।।
কি কার্য্য করিল আমার পিতৃসম খুড়ো।'
জেনে শুনে বিয়ে দিল বেঙ্গা ধরা বুড়ো।
তখন, ঠাকুর বলে শোন বলি দিওনা আর গাল।
দুই হাতের দুই শঙ্খ আমি কিনে দেব কাল।।
দুর্গা বলে, থাক তুমি কুচ্‌নির ঘরে গিয়ে।
চল্‌লাম আমি বাপের বাড়ী কার্ত্তিক গনাই নিয়ে।।
কোলে নিলেন কার্ত্তিকেরে হাঁটিয়ে লম্বোদর।
রাগ করে যাত্রা করেন পিতা মাতার ঘর।।

পথ মাঝে দরশন নারদের সনে।
বিরস বদন কেন মামীর কিসের কারণে।।
জিজ্ঞাসিল নারদ ঠাকুর বল মামী বল।
কি কারণে রাঙ্গা তোমার বদন মণ্ডল।।
দুর্গা বলে, দুই গাছা শঙ্খ চাইলাম তোর মামার কাছে।
শঙ্খ কেনার ক্ষমতা নাই, কড়ি কি তার আছে।।
বলে, কড়ার ভিখারী আমি কড়ার লেগে মরি।
তাই আমি যাচ্ছি চলে পিতা-মাতার বাড়ী।।
নারদ বলে, শোন মামী থাক হেথায় তিলেক বসিয়ে।
মামাকে জিজ্ঞেস করে তোমায় যাবো নিয়ে।।
গৌরী বলে, ব্রহ্ম ডাঙ্গাতে রইলাম নারদ তোর পথ চেয়ে।
মামাকে জিজ্ঞেস করে শীঘ্র আয় নেমে।।
তাড়াহুড়ো করে নারদ করিল গমন।
মামার সাক্ষাতে গিয়ে দিল দরশন।।
নারদ বলে, মামাগো তুমি তো বেশ বসে আছ রতন সিংহাসনে।
শূন্য কেন দেখি আজি কৈলাস ভুবনে।।
কার্ত্তিক গণেশ কোথায় গেল দেখিতে না পাই।
মামীরে খুঁজিয়া দেখি সেও ঘরে নাই।।
মামা তখন বলে, চেয়েছিল দুগাছা শাঁখা বড়ই সাধ করে।
রাগ করে তাই চলে গেল পিতামাতার ঘরে।।
তোমার মামীরে ভাগ্নে ফিরায়ে আন গিয়া।
কাল দেব দুগাছা শাঁখা তোমার মামীরে কিনিয়া।।
নারদ বলে, ভালই হয়েছে মামী বাপেরবাড়ি গেল।
আজ থেকে কৈলাসেতে কোন্দল ঘুচিল।।
তখনই তো বলেছিলাম বিয়ে নাহি কর।
ঠেলা বোঝ এখন তুমি ভোলা মহেশ্বর।।
শীঘ্র করে যাও নারদ আনগা ফিরিয়া।
দু হাতের শাঁখা দেব কালই বাজারে কিনিয়া।।
মামার বাক্য শুনে নারদ করিল গমন।
মামীর সকাশে গিয়া কহিল বচন।।
যেথা যাচ্ছো যাও মামী দিলাম তোমায় ক'য়ে।
দুয়ারে বসেছে মামা ত্রিশূল হাতে নিয়ে।।
ধরতে পাল্লে তোমায় জেনো বধিবে পরাণে।
নারদের কথায় গৌরী ভীত মনে মনে।।
চলিলেন বাপের বাড়ি কার্ত্তিক গণেশ সনে।।
এবে দৌড়া দৌড়ি করে নারদ করিল গমন।
মামার সাক্ষাতে আসি দিল দরশন।।

মামা গো মামা, মামীর হাতে ধরে সাধলাম বারে বারে।
তবুও এলোনা মামী শঙ্করের ঘরে।।
তখন শিব বলে, উপায় বল নারদ তুমি উপায় বল মোরে।
তোমার মামীকে ঘরে আনি কি প্রকারে।।
মামীকে ফিরাতে গেলে উপায় একটা বলি।
ব্যাঘ্র হয়ে পথ রোধে এখনি যাও চলি।।
নারদের কথা শিবের মনেতে ধরিল।
ব্যাঘ্র হয়ে গৌরীর পথ অবরোধ করিল।।
ভালোই হল গৌরী বলে বাহন পেলাম পথে।
কষ্ট কিছু লাঘব হবে বাপের বাড়ি যেতে।।
লম্ফ দিয়ে চড়তে গেল বাঘের উপর।
লজ্জা পেয়ে শিব ঠাকুর চলে গেল দূর।।
ব্যাঘ্র যে দূর্গার বাহন তাও আমি জানি।
পালিয়ে না এলে মামা পিঠে চাপতো মামী।।
শিব বলে নারদ তুমি বুদ্ধি কিছু দাও।
মামী তোমার ঘরে ফিরুক এই যদি চাও।।
নারদ বলে শোন মামা উপায় একটি আছে।
মায়া নদী হয়ে রও মামীর পায়ের কাছে।।
এই কথা শুনে শিব মায়া নদী হয়।
পথ মাঝে নদী হয়ে অতি বেগে বয়।।
জলে ভাসে কুমীর আর আড়ায় ডাকে বাঘ।
তাহা হেরি ত্রিনয়নীর হইল ভীষণ রাগ।।
হেন কালে মহাদেব মায়া বশ করিল।
ভাঙ্গাতরী লয়ে জলে ভাসিতে লাগিল।।
দুর্গা দেখেন ভাঙ্গা তরী ভাসে স্রোতের জলে।
মাঝিরে ডাকিলেন দুর্গা পার কর বলে।।
ছল করি মহাদেব ভিড়াইল তরী।
পার কর বলে তখন দুর্গা সুন্দরী।।
বুড়ো শিব বলে আমি বড় সৎজন।
বুকে করে পার করি পাই কিছু ধন।।
কর্ণধারে কড়ি দিয়া তুষ্ট কর মন।
ছাওয়ালের ছ'বুড়ী তোমার তিন পন।।
এ পারেতে আঠারো বুড়ী কড়ি দাও গুণি।
হাঁসিলেন ত্রি-নয়নী মাঝির কথা শুনি।।
আমি যে গো গিরিসূতা গণেশ জননী।
কর্ণধার কড়ি নিবে কেমনে আপনি।।
রাজকন্যা রাজেশ্বরী জানেন সবাই।

আশীর্বাদ দিই শুধু কড়ি মোর নাই।।
বুড়া বলে বিলক্ষণ আমি তাই চাই।
কড়ি নিয়ে কি করিব কৃপা কর তাই।।
দুর্গা বলেন ওহে মাঝি পার কর চট্‌পটে।
বচনে বুঝিলাম তুমি সৎ লোকই বটে।।
শিব বলে তিনজনে করি না তো পার।
ভাঙ্গা তরী ভয়ে মরি ডুবিলে হাহাকার।।
চারজনে পার করিতে ভরসা না হয় মোর।
ধীরে ধীরে চলবে তরী রাত হবে ভোর।।
প্রথমেতে দুই পুত্র রাখি পর কূলে।
তারপরে তোমায় আমি লইব যে তুলে।।
এই বলি দুই পুত্র রাখি পরকূলে।
ভগবান ভবানীরে নিলেন নায়ে তুলে।।
আসন বিছাইয়া দুর্গা বসিলেন পাটায়।
মহাদেবে বায় তরী তর তরাইয়া ধায়।।
হেন কালে দুর্গা দেখেন নায়ে ওঠে জল।
ডুবু ডুবু করে তরী যায় রসাতল।।
অসহায় হয়ে শিব হাল ছেড়ে দিল।
পর্বতের মত বুড়া বসিয়া রহিল।।
ভাঙ্গা নায়ে ভেসে যান ভূবন সুন্দরী।
কুমার গণ কাঁদে পাড়ে মা-মা করি।।
হাঁকিয়া বলেন দুর্গা বাছা ভয় নাই।
আকুল হইওনা পুত্র ধৈর্য্য ধর তাই।।
দুর্গা তখন এক গণ্ডুষে নদী শুকাইল।
ভয় পেয়ে দুর্গা ছেড়ে মহাদেব পলাইল।।
কোথা গেল মায়া নদী কোথা গেল জল।
বুঝিয়া হরের জায়া হাসেন খল্‌খল্‌।।
পুত্রদ্বয় লয়ে দুর্গা চলেন ক্রোধভরে।
পরাজিত হয়ে শিব ফিরিলেন ঘরে।।
দুরবস্থা দেখি মামার নারদ হইল ভীত।
মামারে সান্ত্বনা দেয় স্থির হও চিত।।
শিব বলে নারদ তুমি উপায় বলো মোরে।
তোমার মামী ঘরে আমি, আনি কি প্রকারে।।
নারদ বলে শোন মামা আমারি বচন।
শাঁখারী সাজিয়া শীঘ্র দাও দরশন।।
যত ছিল ধন নিল নিল শংকর ঝুড়ি।
অধিক করে নিলেন ঠাকুর গাঁজার ধুকুড়ি।।
শাঁখা নেবে বলে শাঁখারী হাঁকিতে লাগিল।

পদ্মা বলে চল শাঁখারী আমাদের ঘরে চল।।
শাঁখা পড়বেন দুর্গা অভয় মঙ্গল ।।
দুই গাছা শাঁখা পদ্মার মনেতে লাগিল (ধরিল)।
তেল জল নিয়ে শাঁখারীর আগে আগে দিল।।
শাঁখা পরাবেন ঠাকুর বসে বাম পাশে।
দুর্গা বসলেন আসি শাঁখারীর সকাশে।।
দেবী দিলেন হাত বাড়াইয়া শঙ্খ পানে চায়।
হরের শঙ্খ উঠিল গো ভবানীর গায়।।
ব্যাঘ্র ছাল বিছাইয়া বসেন যোগপতি।
তখনই চিনিলেন দুর্গা নিজ প্রাণপতি।।
বাম পাশে বসি দুর্গা কহেন বচন।
একটি কথা বলি শোনো দেব ত্রি-লোচন।।
পতি ছাড়া নারীর মুক্তি হয়না জীবনে।
তুমি ছাড়া এমন দয়াল নাই ত্রি-ভুবনে।।

বোলান গান

বোলান শব্দের অর্থ আবৃত্তি। লোকসঙ্গীতের মধ্যে 'বোলান' তার একটু স্থান করে নিয়েছে। বর্ধমান জেলার কাটোয়া, মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি এবং বীরভূম ও নদীয়া জেলার কোন কোন অঞ্চলে এ গানের প্রচলন দেখা যায়। চৈত্র মাসে বোলান উৎসব হয়। শিবের গাজনের মতনই এ উৎসব। অর্থাৎ শিবকে উপলক্ষ করেই বোলান গান এবং তা নৃত্য সহযোগে ভক্তরা পরিবেশন করেন। দরিদ্র মানুষজন নব পোষাক পরিধান করে। বোলান গান দলবদ্ধ ভাবে পরিবেশিত হয় গানের সঙ্গে সঙ্গে মৃদঙ্গ বাজে। একজন মূল গায়ক গান গায় অন্যরা নৃত্য করে এবং গান গায়। এ গানের বিষয়বস্তুতে শিব ছাড়া রাধাকৃষ্ণ ও রাম-সীতা স্থান পেয়েছে। কোন কোন অঞ্চলে ভক্তেরা শিবকে নিয়ে নৃত্যগীত সহ গ্রাম পরিক্রমা করেন।

রাধাকৃষ্ণের বিষয়ে রচিত একটি গানের আংশিক তুলে ধরা হল।
"আর কি সখি শ্যাম সনে হবে আমার দেখা
হৃদয় ভরা পোষা পাখি আমার সে বধুয়া।"

গাজনের আঙ্গিকেই বোলান উৎসব। গাজন সন্ন্যাসীদের ব্রত উপবাস চলে সারা চৈত্র মাস ধরে। চৈত্রের শেষ চারদিন চলে উৎসব। বোলান গান গোষ্ঠিবদ্ধ হয়েই নাচে আর গায় গ্রামের শিবমন্দিরতলায়। বর্ধমান জেলার কাটোয়ায় একটি বোলান উৎসবের গান

যা গো বিন্দে কইয়ে আয় মানা,
ভোরের বেলা যেন কালা কুঞ্জে আসেনা।
শুধু মুখে মধুর হাসি ভাল লাগে না
ঐ কালো রূপ আমি আর হেরব না।
নয়নে কাজল রেখা চেয়ে দেখ না
তুমি চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে গিয়ে পুরাও বাসনা

ঐ কালো রূপ আমি আর হেরব না।।

ঐ অঞ্চলের আর একটি বোলানে গানে রাধাকৃষ্ণের প্রসঙ্গে দেখা যায়—

শ্যামকে ভালবেসে আমার কি হইল সখি।
আসব বইলে আশা দিয়া দিলো গো ফাঁকি।
ওগো বিন্দে, কত আর থাকব ধৈরয ধ'রে —
আসবে না সে চিকন কালা আমায় গেল ভুলিয়ে।
ওগো আমি মনের ভুলে মোমের বাতি খেলাম মিষ্টি বইলে
কার বা দোষ দিব সজনী, লিখা ছিল এই কপালে —
বলেছিল পিরিত কইরো না,
পথে ব'সে কান্দবি শেষে পাবি যাতনা।।

মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি অঞ্চলের বোলান উৎসব রুদ্রদেবের মন্দির প্রাঙ্গণে নাচ গান সহ খুবই জাঁকজমকে সারারাত ধরে হয়। মেলা বসে দোকান পাঠ কেনা বেচা সবই চলে। এখানকার বোলান গানে গজল ও কীর্তনের সুর মেশানো থাকে। গণেশ বন্দনা দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু করে।

কাহারবা ছন্দে ঃ সর্বদেবের আগে বন্দন, গণেশের চরণ গো, গণেশের চরণ।
যাহার নাম বিঘ্নহর, শিবের নন্দন গো, শিবের নন্দন।।

তেওড়া ছন্দে ঃ পড়িয়া ভব ঘোরে ডাকি মা তোমারে
আমায় কৃপা কর আপনি।
না জানি ভজন পূজন আমি অতি মূঢ় জন
তোমার মহিমা কি জানি?

দাদরা ছন্দে ঃ আমি পূজা করিব আমি পূজা করিব
গণপতি দেবের চরণে পূজা করিব।।

এবার আদমতলার গাজন উৎসব প্রসঙ্গে আসা যাক। আদমতলার চড়ক গাজন খুবই জনপ্রিয় লোক উৎসব। এ উৎসবে দুটি চড়ক গাছ থাকে। যাদের নাম আদম-গাদম। উৎসব শেষে গাছ দুটিকে বিলের জলে ডুবিয়ে রাখা হয়। এ অঞ্চলের মানুষ বিশ্বাস করে এই গাছ জাগ্রত দেবতা। তাই ভক্তরা মানত করে, ফলও পায়। এবং অলৌকিক মহিমার কথা ও প্রবাদ হিসাবেই প্রচলিত হয়ে আসছে দীর্ঘদিন ধরে। গাজন উৎসবকে কেন্দ্র করে জমজমাট মেলাও বসে যায়।

সন্ন্যাসীদের মানত আদায়ের নানা আচার অনুষ্ঠানও চলে তারই সঙ্গে। একই সঙ্গে শিবের গাজন এবং তার দল নিয়ে বোলান গানের আসরে গান ধরে করিম শেখ। রাধাকৃষ্ণ বিষয় অবলম্বনে গান। মুল গায়ক একজন মুসলমান। অসম্ভব মনে হলেও এটাই বাংলার লোক উৎসবের ক্ষেত্রে সম্ভব হয়েছে হিন্দু-মুসলমান মৈত্রীর বন্ধনে। গানের কথাও অভিনবত্বের অংশীদার। যেমন ঃ

'বিন্দাবনে সখি সনে বসিয়া রাধে
কি জানি মন কেমন করে ওঠে কেন্দে কেন্দে।
না দেখিয়া শ্যামচান্দে।।
ওগো ইশারায় বইলে গেল

শ্যাম চিকন কাল
কিশোরী দেরী কইরো না
দেখবে যদি প্রাণবন্ধুকে বইসে থেকো না।
যত সখি, সবে মিলি যাও কুসুম তুলিতে।।

নানান বেশভূষায় বোলান দলকে শিবতলায় গাজন উৎসবে গাইতে দেখা যায়। অধিকাংশ গানই রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক। তেমনই একটি গান হ'ল —

'ওগো বিন্দে
কত আর আছ ধৈরষ ধইরে
আসবে না সে চিকন কালা
আমায় গেল ভুলিয়্যে —
ওগো মনের ভুলে মোমের বাতি খেলাম
মিস্টি বইলে।।
কার বা দোষ দিব সজনী
লিখেছিল এই কপালে
বলেছিল পীরিত কইরো না
পথে বসে কান্দবি শেষে পাবি যাতনা'। ...

ডাক বোলান

[মুর্শিদাবাদ জেলার ভরতপুর থানার 'আলুগ্রাম' দক্ষিণ পাড়া থেকে সংগৃহীত একটি প্রাচীন ও আদি ধারার বোলান-পালা]

॥ রম্ভাবতী হরণ পালা ॥

বন্দনা ঃ **(এক)**

১। গণপতি এই মিনতি তোমারি চরণে
কৃপাগুণে এসো থানে ভকতি জানিতে
জ্ঞানের কর্তা জানি তুমি বলে সাধু জনে
আজি মোরে জ্ঞানের আলো জ্বালাও গো এখানে।

২। বীণাপাণি শ্বেত-বরণী মোর-গামিনী
হৃদয় বীণা বাজাও বীণা বলাও সে সার্জ তোমারে সে মধুর বাণী।

৩। আঁখির জল সম্বল মা দেব তোমার চরণে
গিয়ে বনে কুসুম এনে চেয়ে চেয়ে দেখবো তোমার সে মধুর বাণী।

৪। আঁখির জল সম্বল মা দেব তোমার চরণে
গিয়ে বনে কুসুম এনে চেয়ে চেয়ে দেখবো তোমায় হৃদয় আসনে।

৫। বৃক্ষ কুলে জন্ম তোমার নাম জানি গো মন্দিনী
বন্দি সূর্য সদায় ধার্য একচক্র রথে ভ্রমণ
দিবা রাত্রি তোমার দ্বারায় বেচে থাকে প্রাণীগণ।

৬। বন্দি মোরা মা মনসা নাগ যে আমার মাতাগো
পদ্ম ফুলে জন্ম হোল হরের বিষের জ্বালা গো
৭। কেন মন অকারণ বসে আছো এখন মিছে
ও করি মানা মিছে যেন মায়াতে মজো না
মনকে ঐক্য করি পড়িয়া ব্রজের দড়ি এখন ব্রজে চল না।

(দুই)

১। বসন্ত কালে গাহিছে কোকিলে মলয় হাওয়ায়
দোলন দিয়ে বেয়ে বেয়ে চলে।
দিগ্-বিজয় করিয়া রাবণ কৈলাসেতে চলে, শিবের চরণ
পূজবো বলে মনে মনে বলে।
২। হর হর দিগম্বর লহ নমস্কার
দিগবিজয় করে চলিছে বাড়ি
তোমার চরণ দেখবো
বলে অভিলাষ একবার।
৩। আশীর্ব্বাদ করেন শিব রাবণে বসতে দিল
জালা রজনী ভাবে তখনি রাবণের মন হল যে চঞ্চল।
৪। রাবণ ভাবে নিরন্তর যাবে কখন নিজের ঘর
হেন কালে কোকিল বলে কুহু কুহু স্বর —
রাজার কাঁদিছে অন্তর।
৫। চাঁদের আলো দেখতে ভাল ফোটা ফুলে গন্ধ বায়।
রাবণ রাজা ভাবছে মনে মজে আমার নারী নাই
৬। চন্দর চন্দরি তারা মধু লোভে ফিরে গো
এপারে চাঁদ ওপারে তারা দুধার জন্য ঘোরে গো।
৭। ভাবিছে দশানন পেলে হয় একজন, পুরাব কামনা মনের বাসনা।
ওসবে কেমন করে থামাব মন পরিয়া
বিদেশে বন্দি কামের পাশে আমার ও আশা মরিল না।

(তিন)

১। এথি ওথি চাহিছে রাবণ চাহিছে আলো পানে
বিদ্যুৎ ভামিতে ছেল আকাশের এককোণে
ভামিয়া ভামিয়া মনে হয় এই পানে —
মেঘ নাই এমন বিদ্যুৎ বলো হয় কেমনে।
২। ঠিক ভাবে রাবণ রাজা করে নিরীক্ষণ
আসে এক নারী কি বাহাদুরী কোন বিধাতার
রূপ এমন করেছে দেখি নাই এমন।
৩। রূপ দেখে থাকতে নারে বারণ রাজা কয় কন্যা
আজকের নিশি তোমার সঙ্গে সুখেতে কাটায়।

৪। কি নাম কোন দেশে বাড়ী শুনতে বাসনা ভারি
রম্ভাবতী নামটি আমার আমি অপ্সরি —
আমি গন্ধর্বের নারী।

৫। রম্ভা বলে, রাবণ রাজা আজকের মত ছেড়ে দাও
নলকুপের কাছে যাব আজকে আমার কথা নাও

৬। এক সপ্তাহ পরে তোমার মন মজাবো আমি গো
রাবণ কয় সজনী এই সান্ধ্য রজনীতে আমারে ফেলে যেও না।
তোমার সনে নিশীথে থাকি দুজনে,
পেয়েছি আমি যখন ছেড়ে দেবনা এখন
মিটাবো মনের বাসনা।

(চার)

১। এই যে মধুর ধবলি তাহে চাঁদের আলো
এ সময়ে নারী পেলে কেহ বল
কোকিল কোকিলা গান সবে সুখি হল এত বিচ্ছেদ
কেমন করে সেই বাণী বল।

২। রম্ভা বলে, রাজা তুমি জান না
আমাদের নীতি আছে, পদ্ধতি যখন-তখন
যখন তখন চাইলে পরে দেখা মিলবে না
তোমাতে আমাতে সম্বন্ধ তো জান না
সম্বন্ধে শ্বশুর সে জানে অসুর —
নলকূপ তোমার ভাইপো বুঝে রাজন তাই দেখ না।

৪। রাবণ বলে, সুন্দরী তুমি হও বিদ্যাধরী
সকলের তো মন জোগাবে পূর্ণ বাঞ্ছা করি সর্ববিদ্যাধরী।।

৫। ইন্দ্র-পবন-চন্দ্র পাবে আমি কেন পাবনা,
বেশ্যা মধ্যে তুমি গম্য আমি ছেড়ে দেব না।

৬। রম্ভা বলে, বেশ্যা বলে যখন তখন পাবে না
আমাদের নীতি আছে, শোন রাজন শোন না।
যারে কথা দেব সেদিন তারি হব আজি এখানে রবনা।
শুবলি তোমায় বাসনা মিটাবো তোমার
সাতদিন পরে হলে পরে যে দিন বলিবে মোরে
আসিতে অমত হবে না।

(পাঁচ)

১। তুমি বল যত মনেতে ধরে না তো আজি তুমি
আমার সনে পীরিতে হও রত
বারে বারে বলছি তোমায় হলে না সম্মত
আর যে ধৈর্য্য নাই ধরে হও হে অনুগত।

২। তুমি আমি চাঁদনি রাতে মানাবে ভাল
ও ধারে যেওনা আমারে আর চেয়ো না
চেয়ে চেয়ে দেখ ধনি রাত্রি যে হোল।

৩। রাবণের মন মানেনা, রম্ভাবতীর মন সরে না
এই ভাবে সময় যায় দুজনে কাল কাটায়
বাবণের মনের আশা মিটলনা।
৪। রম্ভাবতী যেতে চায়, রাবণ ধরিয়া বসায়
রাবণের মন ভরিল, সেবিল নিরালায় কেমনে সাধ মিটায়।
৫। রাবণ রাজা জোরা জুরি বাসনা যে পুরালো
রাবণ রাজার এই মূর্তি শিশির কুমার রচিল।
৬। দোল-নিধু-লক্ষী-কালু এদের বাতিক ভারি গো
ভাগু মোদের ঢোল বাজাচ্ছে মিষ্টি-মিষ্টি করে গো
৭। উদয় বই বলে, আমরা গাই সকলে
বেনুকর দলপতি হয়।
ঐ চোত্ মাসে থাকতে নারি ঘরে বসে
আনন্দে বলে রতন-দল করিয়া যতন
আলুগ্রাম বাড়ী মোদের হয়।

অষ্টক গান

নীল গাজনে অষ্টক গানের প্রচলন আছে। রাধাকৃষ্ণ, গোষ্ঠ লীলা, নিমাই সন্ন্যাস বিষয়গুলি অষ্টকগানের অন্তর্ভুক্ত। এ গানের কথা, সুর ও গায়নরীতি ভিন্ন।

অষ্টক গান ঃ

কৃষ্ণ ডুবে আছে কালিদায়
বলাই মনে মনে ভাবিলেন. হৃদয়
কৃষ্ণের মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে
উপনীত হইল নন্দালয়ে।
কি শুনালি ও যাদুমণি —
ও তুই কি শুনালি কি নিঠুর বাণী
শূন্য করে গেছে আমার সংসার
তোরা কোথায় লুকায়ে আলি রে
আমার প্রাণের নীলমণি।।
নন্দরাজা কেন্দে বলে, রাণী কেন্দো না আর
তোমায় বলি পূর্ব জন্মে পাপ ছিল
ও তাই ঘটে গেল আমার কপালে।

অষ্টকে 'নিমাই সন্ন্যাস' গান ঃ

শচীরাণী কেন্দে বলে নদেবাসী দেখবি আয়
আমার নিমাই আমায় ছেড়ে যায়।
আর বুঝি মা বলে —
নিমাই আমার ডাকবে না আমায় —
এই নদীয়া আঁধার হ'ল,
নিমাই চান্দ ছেড়ে গেল
আমার ভাগ্যে এই ছিল —
বাঁচার চেয়ে ওরে নিমাই, মরণ আমার ভাল।

ত্রিনাথের গান

নীল গাজনে বান্দুটি গানের প্রচলন আছে। সমবেত কণ্ঠে ধীর লয়েই এ গান গাওয়ার রীতি।

বান্দুটিয়া গানে লক্ষ্মণের শক্তিশেল ঃ

কান্দে রাম রঘুমণি —
ছাড়িয়ে দুই চোক্ষের পাণি
হারা হলেম প্রাণের লক্ষ্মণে
উঠ উঠ ভাইরে লক্ষ্মণ, উঠে বল কথা —
অভাগা রামদাদা ডাকে — গাত্র তুলে চল হেঁটে
দূরে থাক্ মোর ভ্রাতৃশোকের ব্যথা।
কি কুক্ষণে ভাইকে লয়ে এসেছিলাম বনে —
সৎমায়ের কানের সোনা —
পূর্ণিমার চান্দের কণা
হেন রত্ন কেন আনলাম বনে।

ত্রিনাথের গান

ত্রিনাথ হলেন তিন দেবতা যথা — ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর। অর্থাৎ সৃষ্টি, স্থিতি আর প্রলয়ের দেবতা। আবার কোন কোন লোকসঙ্গীতবিদ-এর মতে ত্রিনাথ হলেন শুধু মহেশ্বর। (পূর্ব বাংলায় (অধুনা বাংলাদেশ) হিন্দু সমাজে এই পূজা ত্রিনাথের মেলা বলেই প্রচলিত। বর্তমানে এ গানের প্রসার ঘটেছে পশ্চিমবঙ্গেও। প্রসারতা ঘটেছে ত্রিনাথের মেলার) অন্য মতাবলম্বীরা বলেন বৌদ্ধ ধর্মের বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘ এই তিন দেবতারই রূপ হিন্দুধর্মে অনুপ্রবেশ করেছে। নাথ পন্থীরা বলেন ত্রিনাথ; গোরক্ষনাথ সহ আরো দুজন ধর্মগুরুকে নিয়ে ত্রিনাথের পূজার প্রচলন হয়েছে।

সে যাইহোক, এ ক্ষেত্রে প্রচলিত প্রথামত ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরকে ঘিরেই আলোচনা করা হচ্ছে।

আখ্যান ঃ তিন দেবতা (ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর) মর্ত্যের মানুষের কাছ থেকে একত্রে পূজা গ্রহণ করবেন। ব্রহ্মার পরামর্শে তিনজনে ছদ্মবেশে মর্ত্যে এক গৃহস্থের বাড়ীতে কোলাহল শুনে উপস্থিত হন এবং স্থির করেন এখান থেকেই তাঁরা পূজার সূচনা করবেন। গৃহস্বামী গোপীনাথ ঘোষের সঙ্গে তার স্ত্রী ও পুত্রদের বনিবনা হচ্ছিল না। গৃহে একটি গাভী ছিল তার দুগ্ধ বিক্রি করে তিনি তার সংসার প্রতিপালন করতেন। সেই গাভীটি তিন ছদ্মবেশী দেবতা অপহরণ করে একটি বট বৃক্ষের তলায় গোপীনাথ ঘোষের অপেক্ষায় রইলেন। সন্ধ্যায় পরিশ্রান্ত হয়ে গোপীনাথ গাভীর শোকে আচ্ছন্ন হয়ে অন্ধকারে খুঁজতে বেরুলেন। গাভী না পেয়ে বটবৃক্ষের তলে বিমর্ষ হয়ে বসে কাঁদতে লাগলেন। তখন বটবৃক্ষ থেকে দৈববাণী হলো "হে গোপীনাথ তুমি যদি একটি পূজার ব্যবস্থা কর তবে তোমার গাভী ও সংসারের সুখ সম্পদ ফিরে পাবে। গোপীনাথ পূজায় রাজী হয়ে গেলেন। তখন দেবতাত্রয় কিভাবে পূজার আয়োজন হবে তার বর্ণনা দেন।

পূজার উপকরণ ঃ সমস্ত উপকরণ তিনিটি ভাগে হবে। যেমন — তিনটি প্রদীপ, তিনটি

পান সুপারী, গাঁজা, দোক্তপাতা সবই এক পয়সার করে। এখন অবশ্য এ দামে কিছুই পাওয়া যায় না। সন্ধ্যায় পুরুষ ব্রতীরা ত্রিনাথের গান সুরু করেন। তিনটি গান এখানে উদ্ধৃত করা হল —

গান

(১)

এলোরে ত্রিনাথ ঠাকুর জগতে
আজগুবি তামাসা হল কলিতে।
কলিতে হরি সর্বময়
পূবেতে পাগলের আশ্রয়
চিতোল্যাতে শম্ভুনাথ আপনি উদয়।।
জেঙ্গরা মোরা সিদ্ধেশ্বরী (ও ভোলা মন)
এলোরে ধাম্রাইর মাধব রথেতে।।
উমা রাজ রাজেশ্বরী
আছে কুমিন্ন বাড়ী
কলকাতায় কালী আছে
ঢাকায় ঢাকেশ্বরী
পাটনায় আছে পটেশ্বরী (ও ভোলামন)
আছে অন্নপূর্ণা কাশীতে।।
আজগুবি তামাসা হল কলিতে।।
কাশীতে কাশী বিশ্বেশ্বর
হুগলীতে তারকেশ্বর।
ভক্তি ভরে কর পূজা
ভোলা মহেশ্বর।
আছে বৃন্দাবনে রাধা প্যারী
গৌড় হল নদেতে।।
আজগুবি তামাসা হল কলিতে।। **স্বঃ লিঃ - ১০**

(২)

ও তিন পয়সাতে হয় যার মেলা
কলিতে ত্রিনাথেরমেলা।
এক পয়সার তৈল দিয়ে
তিন বাতি জ্বালিয়ে (ও সাধু ...)
বাতি জ্বলছে ধীরে নেভেনা রে
একি আজব কারখানা
এক পয়সার পান সুপারী
তাতে নাই মশল্লা। (ও সাধু ...)

খেয়ে পানের খিলি 'সাধুজন মিলি
বোসে বাজায় এক তারা
এক পয়সার গাঁজা দিয়ে
তিন কল্কি সাজিয়ে (ও সাধু ...)
গাঁজায় মারছে দম্ বলছে ব্যোম্
বোকায় বলে ব্যোম ভোলা।।
কলিতে ত্রিনাথের মেলা।।

(৩)

সারাদিন গেলে ত্রিনাথের নাম লইও।
লইও পরম যতনে সাধুরে ভাই।।
সারাদিন করিও ভাইরে গৃহবাসের কাম,
সন্ধ্যে হলে নিও ঠাকুর ত্রিনাথের নাম।।
দয়া করে ত্রিনাথ ঠাকুর যার বাড়িতে যায়
কোন অভাব থাকেনা তার সুখে দিন কাটায়।।
ত্রিনাথের নাম শুনে আবার যে বা করে হেলা,
স্ববংশ নির্বংশ হয় তার চক্ষে বেরোয় ঢেলা।।
সাধুরে ....
ত্রিনাম লয়ে যে বা বন বাদাড়ে যায়
সর্পেতে না দংশে আবার ব্যাঘ্রেতে না খায়।।
তামা নয় রে কাঁসা নয়রে পুরান্ হয়ে যাবে
নিলে ত্রিনাথের নাম নতুন সোনা পাবে।।
সাধুরে ...
ভাটি গাঙে দিলাম জবা উজান কেন ধায়
না জানি কোন অপরাধ করেছি রাঙা পায়।।
যার নাম লওয়া মাত্র পাপ দূরে যায়
এমন দয়াল প্রভু কে বা কোথায় গেলে পায়।।
সাধুরে ....

ত্রিনাথের গান

শ্রীহট্ট জিলায় প্রচলিত

নিমন্ত্রণ ঃ

নিমন্ত্রণে নারদ মুনি চলিলা
ত্রিভুবন বিজয় বীণা বাজাইয়া।।
ও বীণা বাজাইয়া বাজাইয়া বাজাইয়া
ত্রিভুবন বিজয় বীণা বাজাইয়া।।

তোমার বীণার সুরে ও নারদ মুনি ও
তোমার বীণার সুরে লক্ষ্মী গণেশ আইলা চলিয়া
ত্রিভুবন বিজয় বীণা বাজাইয়া।।
তোমার অঙ্গ ভঙ্গি ও মহাদেবহে
তোমার অঙ্গ ভঙ্গির শত গুণ
শতগুণে রজগুণ, রজগুণে তম গুণ
কোন গুণে নেও কলির জীবকে তরাইয়া।।
ত্রিভুবন বিজয় বীণা বাজাইয়া।।

আসর ঃ

দয়াল ত্রিনাথ ঠাকুর দয়া করে আইস আমার আসরে
আইস আমার আইস আমার আইস আমার আসরে।।
তিন কলকি তিন সিদ্ধি দিয়া ভাং ধুতুরা সাজাইয়া
বেলপত্র আসনে দিয়া, বইস আমার হৃদ মাঝারে।।
এস প্রভু দিগম্বর ভক্তের বাঞ্ছা পূরণ কর
নাম তোমারী গঙ্গাধর রেখেছি যতন করে।।
দয়াল ত্রিনাথ ঠাকুর দয়া করে আইস আমার আসরে।।

উদয় ঃ

হইল নূতন রসেরই সঞ্চাররে
ঠাকুর ত্রিনাথ অবতার।
ও রসে বসে রস মিশাইয়া
ও রসে দেও সাঁতার রে
ঠাকুর ত্রিনাথ অবতার .....।। (দোহা)
ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরে। তারা তিনে ত্রিনাথ নাম ধরে
ও ত্রিনাম উদয় হইল, উদয় হইল
ও ত্রিনাথ উদয় হইল অবনী মাঝারে।।
ঠাকুর ত্রিনাথ ... ।।
কলির জীবের ভাগ্য অতি, ঠাকুর ত্রিনাথের কর স্তুতি '
ত্রিনাথ ভজন কর পাইবে নিস্তার রে।।
ভাইরে রাধা রমণ বলে ঠাকুর ত্রিনাথের চরণ কমলে
ত্রিনাথ নিজগুণে তরাইয়া নেও আমার রে।।

সাজানী ঃ

'ত্রিনাথ সাজায় বনফুলে নাগর সজনী
ত্রিনাথ সাজায় বনফুলে।।
সইগো সই অষ্টগাছের অষ্ট ফুল আন গো তুলিয়া

ও ঠাকুর ত্রিনাথের চরণে ফুল দেওনা সাজাইয়া
নাগর সজনী ত্রিনাথ সাজায় বনফুলে।।
সইগো সই সোয়াত্র চন্দন আন কটরায় ভরিয়া
ঠাকুর ত্রিনাথের চরণে ফুল দেওনা ছিটাইয়া
নাগর সজনী ঠাকুর ত্রিনাথ সাজায় বনফুলে।।
গাজা স্তান তোলা তোলা সাদা দেও মিশাইয়া
ত্রিনাথের চরণে তিন কলকি দেওনা বসাইয়া
নাগর সজনী ঠাকুর সাজায় বনফুলে।। ...

ত্রিনাথ পূজা ঃ

'ভোলা মন হর শংকর, ভক্তিভাবে পূজা তার কর
ও মনরে ভক্তিভাবে পূজা তার কর।
ত্রিনাথ পূজার এইতো বিধান
আসন দিলাম ঘট বসাইলাম আরও দিলাম
দিবানিশি ভাব বসি ব্রজ ভোলা মহেশ্বর।
ভক্তিভাবে পূজা তার কর।।
রইলে মন তুই ঘুমে অচেতন
গেল গেল রে দিন না হইল চেতন
অজামিল বৈকুণ্ঠে গেল প্রহ্লাদকে করলেন উদ্ধার
ভক্তিভাবে পূজা তার কর।। ...

সেবা ঃ

আজি কি আনন্দ হইতেছে, ত্রিনাথ ঠাকুরের সেবা লাইগাছে ॥
ও সেবা লাইগাছে, লাইগাছে, লাইগাছে, ত্রিনাথ ঠাকুরের সেবা লাইগাছে।
ত্রিনাথ ঠাকুরের ভক্ত যত, হরি হরি বলতেছে,
ও গাজার দম লাগাইয়া, বিভোর হইয়া
জেলে ভুলে পারতেছে, ঠাকুর ত্রিনাথের সেবা লাইগাছে।
খির, খিচুরী, মালহা - পুরি, পরমান্ন সাজাইছে
ও প্রসাদ খাইবার বাঞ্ছা মনে, শ্যামচান্দে বলতাছে।

সংগ্রহ — রেণু বিনোদ দাস। শিলচর, আসাম।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মঙ্গল কাব্য

দ্বাদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত অবিভক্ত বাংলাদেশে লৌকিক দেব-দেবীর মাহাত্ম্য কীর্তন মূলক যে সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছিল, তা মঙ্গলকাব্য নামে পরিচিত ও প্রচলিত।

এই কাব্যগুলিকে বাংলার জাতীয় কাব্য বললে মনে হয় ভুল হবে না। সঙ্গীতের ক্ষেত্রে মঙ্গল শব্দের ব্যবহার হয়েছে আদিকাল থেকে। 'ভরতের নাট্যশাস্ত্র', 'শার্ঙ্গদেবের সঙ্গীত রত্নাকর', জয়দেবের 'গীতগোবিন্দম্', কালিদাসের 'কুমার সম্ভব' গ্রন্থে মঙ্গল গীতের উল্লেখ দেখা যায়।

মানুষের কল্যাণ, কামনা পূরণ ও দেবতাদের আশীর্বাদ প্রার্থনাই এই মঙ্গল গানের প্রধান বিষয়বস্তু। এইজন্যই এ জাতীয় গানকে 'মঙ্গলগান' আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

এক বিশেষ সম্প্রদায় এই মঙ্গল গাথা বা মঙ্গল গান মৃদঙ্গ, নূপুর, মন্দিরা ও চামর সহযোগে একক বা দলবদ্ধভাবে পরিবেশন করতেন। মঙ্গল গানের পরিবেশনরীতিতে একজন মূল গায়ক এবং সঙ্গে থাকেন দোহারবৃন্দ। মঙ্গল গান ব্যক্তি-বিশেষের দ্বারা রচিত হতো। বিরহাত্মক ও মিলনাত্মক উভয় রসই মঙ্গল গানে নাটকীয়ভাবে বর্ণিত। এ গানের গায়ক সম্প্রদায় বাউল ভাবাপন্ন বলে মঙ্গল গানে বাংলার লৌকিক সুর অনেকটাই স্থান করে নিয়েছে।

বৈদিক সাহিত্যে মঙ্গল গান সম্বন্ধে যা উল্লেখ আছে, তা হ'ল—

'ভদ্রং কর্ণেভির শৃণুরাম দেবা
ভদ্রং পশ্যেমাক্ষ ভির্যজত্রাঃ
স্থিরৈ বঙ্গৈস্তুষ্টুবাং সস্তনুভির্ব্যশেমহি
দেব হিতং যদায়ুঃ
ওঁ শান্তি শান্তি শান্তি'—

মধ্যযুগে লৌকিক দেব-দেবীকে নিয়ে রচিত হত 'মনসা মঙ্গল', 'চণ্ডীমঙ্গল', 'কালিকা মঙ্গল', 'শীতলা মঙ্গল', 'বাসুকি মঙ্গল', 'রায় মঙ্গল' প্রভৃতি।

পরবর্তীযুগে 'শিবমঙ্গল', 'সূর্যমঙ্গল', 'অন্নদা মঙ্গল' প্রভৃতি পৌরাণিক কাহিনী মঙ্গল কাব্য রচনায় গৃহীত হয়েছে। শাক্তদের মঙ্গলকাব্যের প্রভাবে বৈষ্ণবরাও প্রভাবিত হয়ে তাদের সাহিত্যে 'মঙ্গল' শব্দটির সংযোজনে 'চৈতন্য মঙ্গল', 'অদ্বৈত মঙ্গল', প্রভৃতি সৃষ্টি করেছেন।

চৈতন্য আবির্ভাবের পূর্বেই বাংলায় 'মঙ্গল চণ্ডীর গান', 'বিষহরির গান' বহুল প্রচলিত ছিল। দ্বাদশ থেকে ত্রয়োদশ শতকে 'পাঁচালী' আকারে এর জন্ম।

দেখা যায় মধ্যযুগে বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরণের মঙ্গল গান সৃষ্টি হয়েছে। এর গায়ন পদ্ধতি কীর্তন গানের পাশাপাশি প্রবহমান। কীর্তন গানের মত মঙ্গল গানের প্রথম পর্যায়ে আসর বন্দনা, পরে আরতির বিধি প্রচলিত।

সমগ্র বাংলাদেশে ঠিক ঐ সময়ে একদিকে কীর্তন গানের প্রচলন, অন্যদিকে লোকসঙ্গীত সাধারণ লোকসমাজে প্রচলিত ছিল। এই দুই ধারার মধ্যবর্তী স্থানে মঙ্গলগান

স্বকীয় রূপে ও বৈশিষ্ট্যে সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। তাই মঙ্গল গানের সাঙ্গীতিক বৈশিষ্ট্য কীর্তন ও লোকসঙ্গীত উভয়ের মধ্যে সেতুবন্ধনের কাজ করেছে।

আবার বৌদ্ধধর্ম প্রভাবিত বাংলায় সেন রাজত্বের অবসানকালে মুসলমান রাজত্বের ভিত্তি স্থাপিত হয়। আর সেই সময়েই 'মঙ্গল সাহিত্যের' সৃষ্টি। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে গ্রাম্য কবিরা 'মঙ্গল'কাব্যের পরিপূর্ণ রূপদান করেন।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মুসলমান শাসনের সূচনা। সমাজের মধ্যে নিপীড়ন, ধর্মে অনিশ্চয়তা প্রভৃতি কারণে বিজিতরা অসহায় হয়ে লৌকিক দেব-দেবীর চরণে আত্মসমর্পণ করে। মঙ্গল কাব্যে বর্ণিত দেব-দেবীরা এখন হলেন - শিব, মনসা, চণ্ডী, কালিকা, শীতলা, ধর্মঠাকুর প্রভৃতি।

ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি লৌকিক দেব-দেবীরা পৌরাণিক দেব-দেবীর সঙ্গে মঙ্গলকাব্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। চর্যা গানের ন্যায় মঙ্গল কাব্যে বা মঙ্গল গানে প্রাচীন রাগ-রাগিনীর উল্লেখ পাওয়া যায়। মঙ্গল শব্দটি যুক্ত হয়ে রাগের নামকরণ হয়েছে মঙ্গল কোষ, মঙ্গল কৌশিক, মঙ্গল ভৈরব ইত্যাদি।

মঙ্গলকাব্য হ'ল আখ্যান কাব্য। এতে তুকের বিভাজন ঠিক নেই। তবুও রাগ-রাগিনীর আশ্রয়ে কেমন করে গাওয়া হোত এ গান, তা নিয়েও মতান্তর আছে। মনে হয় মঙ্গল গীতে রাগের রূপটি রক্ষা করে সুরে আবৃত্তি করা হতো।

মঙ্গল গানের সংক্ষিপ্ত আলোচনান্তে কয়েকটি মঙ্গল গানের নমুনা তুলে ধরা হল। এখানে জেনে রাখা প্রয়োজন যে দেব-দেবীর নামানুসারেই মঙ্গল গানের নামকরণ করা হয়েছে।

মনসামঙ্গল ঃ

এটি পদ্মপুরাণের কাহিনী অবলম্বনে রচিত। মনসা মঙ্গল গানের আদি রচয়িতা হলেন খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্বের কবি হরি দত্ত। তিনি ছিলেন বরিশাল অঞ্চলের লোক. তবে ময়মনসিংহ জেলায়ও তাঁর রচিত বহু গান পাওয়া গেছে। হরিদত্ত কে কানা হরিদত্তও বলা হ'ত। এ ছাড়া ময়মনসিংহের নারায়ণ দেব, বরিশাল জেলার গৈলা গ্রামের বিজয় গুপ্ত, চব্বিশ পরগণা জেলার বাদুরিয়া গ্রামের বিপ্রদাস প্রমুখ ছিলেন প্রসিদ্ধ রচয়িতা। পশ্চিমবঙ্গে কেতকা দাস ক্ষেমানন্দ, জগজ্জীবন ঘোষাল, ষষ্ঠীধর দত্ত প্রমুখের নামও উল্লেখযোগ্য।

চণ্ডীমঙ্গল ঃ

চণ্ডী মঙ্গল রচনার প্রথম কবি মালদহ জেলার কবি মাণিক দত্ত। সম্ভবতঃ পঞ্চদশ শতকের প্রথম ভাগে তাঁর কাব্য রচিত হয়। অপর স্রষ্টা দ্বিজমাধব জন্মেছিলেন ষোড়শ শতকে হুগলী জেলার ত্রিবেণীর নিকট সপ্তগ্রামে। তবে এ মঙ্গলের সর্বশ্রেষ্ঠ রচয়িতা ছিলেন কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী। তিনি বর্ধমান জেলার দামুন্যা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে মেদিনীপুরে বসবাস করেন। এ ছাড়া আছেন চট্টগ্রামের কবি দ্বিজ রামদেব এবং মুক্তারাম সেন। এরপর ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে হাওড়া জেলার রাধানগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন প্রসিদ্ধ রচয়িতা রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র রায়। অন্যান্যদের মধ্যে জয়নারায়ণ সেন, ভবানীশংকর, অকিঞ্চন চক্রবর্তী প্রমুখ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

কালিকামঙ্গল ঃ

কালিকা মঙ্গল রচিত হয় মধ্যযুগে এবং সে অনুসারে প্রথম এ মঙ্গল গীত রচয়িতা ও প্রচারক হলেন - চব্বিশ পরগণা অঞ্চলের নিমতা গ্রামের কৃষ্ণরামদাস। এতে আছে কাশ্মীর রাজকুমার কালীভক্ত সুন্দর ও বর্ধমানের রাজকুমারী বিদ্যার গুপ্ত প্রণয় এবং পরে বিবাহের ঘটনা। রচয়িতাদের মধ্যে কঙ্ক, দ্বিজ শ্রীধর, রামপ্রসাদ সেন প্রমুখই প্রধান।

রায়মঙ্গল ঃ

এ মঙ্গল রচিত হয় ব্যাঘ্র বাহন দক্ষিণ রায় দেবতার প্রসঙ্গ রচিত। সুন্দরবন অঞ্চলের দেবতা হিসাবে গণ্য এই দক্ষিণ রায়ের বিষয়ে মঙ্গল সঙ্গীত রচিত হয় সপ্তদশ শতকের শেষ ভাগে। এর রচয়িতার মধ্যে কৃষ্ণরাম দাস, কেতকা দাস ক্ষেমানন্দ প্রমুখই প্রধান ছিলেন।

শীতলা মঙ্গল ঃ

এ মঙ্গল রচয়িতাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন মেদিনীপুরের কাশীজোড়ার রাজা রাজনারায়ণের সভাসদ শ্রী নিত্যানন্দ। মা শীতলার মর্ত্যে আগমন, রোগ নিরাময় ইত্যাদি বিষয়গুলি এ মঙ্গলে বিশেষ ভাবে গাওয়া হয়। এ ছাড়া অষ্টাদশ শতকের কবি বল্লভের নামও উল্লেখযোগ্য।

ধর্মমঙ্গল ঃ

বাংলাদেশের রাঢ় অঞ্চলে ডোম ও নিম্ন শ্রেণীর সমাজে ধর্মপূজা এবং ধর্মমঙ্গল প্রচলন হয়। বন্ধ্যা নারীগণ পুত্রলাভের জন্য ধর্মপূজা করে থাকেন। এ ক্ষেত্রে কোনও মূর্তি পূজার নিয়ম নেই। উত্তরবঙ্গের প্রসিদ্ধ গায়ক হরিদাস গোস্বামী এই মঙ্গল গান ভাল করতেন।

সারদামঙ্গল ঃ

মধ্যযুগে সারদা বা সরস্বতী দেবীকে নিয়ে সারদা মঙ্গল রচিত হয়। এ গানের রচয়িতাদের মধ্যে দয়ারাম বিশেষ প্রসিদ্ধ। হাওড়া, মেদিনীপুর, হুগলী, নদীয়া, চব্বিশ পরগণায় নানা স্থানে এ গান প্রচলিত হয়। হাওড়া জেলায় শ্রী বিমল চক্রবর্তী ভাল সারদা মঙ্গল গান করেন।

সূর্যমঙ্গল

বাংলাদেশে কুমারী কন্যাগণ মাঘ মাসের সকালে যখন সূর্য কুয়াশায় ঢাকা থাকে তখন জবা ফুল নিয়ে পুকুর পাড়ে দাঁড়িয়ে এ মঙ্গল গান করে। তা ছাড়া বিয়ের পর কন্যা যখন শ্বশুর বাড়ী যায় তখন নৌকা বিদায় দিয়ে ঘাটে দাড়িয়ে পিতা, মাতা ও আত্মীয়বর্গ অশ্রুসিক্ত নয়নে সূর্যের নিকট প্রার্থনা জানিয়ে মঙ্গল গান করেন।

কপিলা মঙ্গল ঃ

মধ্যযুগে ভাগবতের কাহিনী অবলম্বনে ব্রহ্মার দ্বারা কপিলা ধেনু হরণের বৃত্তান্ত নিয়ে এই কপিলা মঙ্গল রচনা হয়। বাঙ্গলা দেশে কার্তিক মাসে কালীপূজার পর গো-উৎসব উপলক্ষে

এই গান করা হয়। হাওড়া জেলায় শ্যামপুর অঞ্চলে এখনও এ প্রথা প্রচলিত আছে। ঐ অঞ্চলের গোলগাঁয়ের নন্দকুমার ছিলেন এ গানের প্রসিদ্ধ গায়ক।

গঙ্গামঙ্গল ঃ

ভগীরথ দ্বারা গঙ্গাকে পৃথিবীতে আনার বৃত্তান্ত থেকে গঙ্গার স্তুতি ইত্যাদি নানা বিষয়ক গান এ মঙ্গলের অন্তর্গত। মহাভারতের রাজা শান্তনু-র পুত্র দেবব্রতের কাহিনীও এ মঙ্গলে গাওয়া হয়। এ গানগুলি গঙ্গাপূজার সময় গঙ্গার তীরে বসে গাওয়া হয়। হাওড়া জেলায় রামকৃষ্ণপুর অঞ্চলে চিন্তামণি ঘাটে গঙ্গাপূজা উপলক্ষে অদ্বৈত ঠাকুর এই গঙ্গামঙ্গল গান করতেন।

বাশুলী মঙ্গল ঃ

এই মঙ্গলের রচয়িতা মুকুন্দ মিশ্র। বাশুলী দেবী হলেন চণ্ডীর প্রতীক। বাশুলীর কৃপা হ'লে ধন, পুত্র, বিদ্যা ইত্যাদি লাভ হয়। নান্নুরেয় কবি বড়ু চণ্ডীদাস এই বাসুলী দেবীর পূজা করতেন। বর্ধমান জেলার মাণিক গোস্বামী এই মঙ্গলের একজন শ্রেষ্ঠ গায়ক। নিচে কয়েকটি মঙ্গল গানের নমুনা তুলে ধরা হল।

মনসামঙ্গল

ওকি হায়রে নৃত্য করে বেহুলা সুন্দরী।
পায়েতে নূপুর পরি তালে তালে ভর করি
নৃত্য করে বেহুলা সুন্দরী।
যত দেব চারিভিতে বসি দেখে হরষেতে
কটাক্ষে মোহিল সুরপুরী ॥
খঞ্জন গমনে পায় তাল রেখে হাতে পায়
অলক্ষ্যেতে সূতার সঞ্চারে।
বায়ু ভরে উষা হয় শূণ্যে ভর করি রয়
উলটে সকট তান ভরে ॥
তাহার নাচন দেখি দেবসভা হইল সুখী
বেহুলা যে করে অনুমান।
পাকদিয়া পদ্মা আগে অঞ্চল পাতিয়া মাগে
অনাথার স্বামী দেহদান॥
প্রথম বয়সে মোর বধিয়াছে প্রাণেশ্বর
শুনো মাগো জগত জননী।
ফিরি ফিরি পাকের আগে আঁচল পাতিয়া মাগে
করুণ বচনে চন্দ্রাননী ॥
নয়নে স্রবয়ে নীর কথা কহে অতি ধীর
শুন দেবী আস্তিকের মাই
অনাথারে কৃপা কর ফিরে দাও প্রাণেশ্বর
প্রভু লয়ে দেশে চলে যাই ॥ স্বঃ লি—১১

তাহা দেখি দেবগণে কহিলা পদ্মার স্থানে
ক্ষমা কর কৃপার দয়াল
অসীম সাহস করি আসিয়াছে দেবপুরী
স্বামী সুখে (শোকে) আকুল ছাওয়াল ॥
শিব বলে বিষহরি তব বাক্য দৃঢ় করি
সত্য যদি দংশিছ লখাই।
শিঘ্র জিয়াইয়া দেহ্ যাবত না জানে কেহ্।
নায়েতে হারায়ে কার্য নাই ॥
শঙ্করের শুনি কথা চাঙ্গা হইল হেঁট মাথা
শঙ্করীরে আড় চোখে চায়।
দুই চক্ষু রাঙা করি বসিলেন বিষহরি
বংশীবদন দ্বিজে গীত গায় ॥

অন্নদামঙ্গল

অন্নপূর্ণা উত্তরিলা গাঙ্গিনীর তীরে।
পার কর বলিয়া ডাকিলা পাটুনীরে ॥
সেই ঘাটে খেয়া দেয় ঈশ্বরী পাটুনী।
ত্বরায় আনিল নৌকা বামাশ্বর শুনি ॥
ঈশ্বরীরে জিজ্ঞাসিল ঈশ্বরী পাটুনী
একা দেখি কুলবধু কে বট আপনি ॥
পরিচয় না দিলে করিতে নারি পার।
ভয় করি কি জানি কে দিবে ফেরফার ॥
ঈশ্বরীরে পরিচয় কহেন ঈশ্বরী।
বুঝহ ঈশ্বরী আমি পরিচয় করি ॥
বিশেষণে সবিশেষ কহিবারে পারি।
জানহ স্বামীর নাম নাহি ধরে নারী ॥
গোত্রের প্রধান পিতা মুখ্যবংশজাত।
পরম কুলীন স্বামী বন্দ্যবংশখ্যাত ॥
পিতামহ দিলা মোরে অন্নপূর্ণা নাম।
অনেকের পতি তেঁই পতি মোর বাম ॥
অতিবড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ।
কোন গুণ নাহি তাঁর কপালে আগুন ॥
কুকথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠভরা বিষ।
কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ ॥
গঙ্গা নামে সতা তার তরঙ্গ এমনি।
জীবন স্বরূপা সে স্বামীর শিরোমণি ॥
ভূত নাচাইয়া পতি ফেরে ঘরে ঘরে।
না মরে পাষাণ বাপ দিলা হেন বরে ॥
অভিমানে সমুদ্রেতে ঝাঁপ দিলা ভাই।
যে মোরে আপনা ভাবে তারি ঘরে যাই ॥

চণ্ডীমঙ্গল

কালকেতুর ভোজন

মোচড়িয়া গোঁফ দুটা বান্ধিলেন ঘাড়ে।
এক শ্বাসে সাত হাঁড়ি আমানি উজাড়ে ॥
চারি হাড়ি মহাবীর খায় খুদ জাউ।
দুই হাড়ি মুশুর মুগ মিশায়্যা তথি লাউ ॥
ঝুড়ি দুই তিন খায় আলু ওল পোড়া।
কচুর সহিত খায় করন্‌জা আমড়া ॥
অম্বল খাইয়া তার বণিতারে পুছে।
রন্ধন কর্‌যাছ ভাল আর কিছু আছে?
এন্যাছি হরিণী দিয়া দধি এক হাঁড়ি।
শয়ন কুৎসিত বীরের ভোজন বিটকেল।
ছোট গ্রাস তোলে যেন তে- আটিয়া তাল ॥

মা চণ্ডী ফুল্লরাকে অলঙ্কার দিতে এলে ফুল্লরার সঙ্গে চণ্ডীর কথোপকথন —
তোরে আমি বলি ভাল স্বামীর বসতি চল
পরিণামে পাবে বড় সুখ।
শুনল বিমূঢ় মতি যদি ছাড় নিজপতি
কেমনে চাইবে লোক মুখ ॥
স্বামী বনিতার পতি স্বামী বনিতার গতি
স্বামী বনিতার সে বিধাতা।
স্বামী যে পরমধন স্বামী বিনে অন্যজন
কেহ নহে সুখে মোক্ষদাতা ॥

মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল গানে জাতি বিন্যাস।

চণ্ডীমঙ্গল গানে গুজরাটে নগর পত্তনে নানা জাতীয় লোকের আগমন

(১)

হিন্দু সম্পর্কে

মৎস্য বেচে চষে চাষ বৈসে দুই জাতি দাস
কল্যুরা নগরে পাতে ঘানি।
বাইতি নিবসে পুরে নানাজাতি বাদ্য করে
পুরে ভ্রমে মঞ্জুরী বিকিনি ॥
বাগ্‌দি নিবাসে পুরে নানা অস্ত্র ধরি করে
দশ বিশ পাইক করি সঙ্গে।
মাছুয়া নিবাস পুরে জাল বুনে মাছ মারে
কোচগণ বৈসে নানা রঙ্গে ॥

নগর করিয়া শোভা বসিল অনেক ধোবা
দড়ায় শুকায় নানা বাঁশে।
দরজী কাপড় সীয়ে বেড়ণ করিয়া জীয়ে
গুজরাটে বৈসে এক পাশে ॥
সিউলি নগরে বৈসে খাজুরের কাঠি রসে
গুড় করি বিবিধ বিধানে।
ছুতার নগর মাঝে চিড়া কোটে খই ভাজে
কেহ গড়ে শকট বিমানে ॥

(২)

মুসলমান সম্পর্কে

দশ বিশ বিরাদরে বসিয়া বিচার করে
অনুদিন পড়য়ে কোরাণ।
কেহ বা বসিয়া হাটে পীরের শিরণি বাঁটে
গাহে বাজে দগড় নিশান ॥
বড়ই দানিশ মন্দ করে নাহি করে ছন্দ
প্রাণ গেলে রোজা নাই ছাড়ি।
করয়ে কাম্বোজ বেশ মাথায় না রাখে কেশ
বুক আচ্ছাদিত রাখে দাড়ি ॥

কালিকামঙ্গল

'শুন সভে একচিত কেমনে হইল গীত
কৃষ্ণপক্ষে ত্রয়োদশী তিথি।
প্রথম বৈশাখ মাসে স্বপন আপন বাসে
দেখিনু সারদা ভগবতী' ॥ ......

রায় মঙ্গল

রজনীর শেষে এই দেখিলাম স্বপন।
বামপীঠে আরোহণ এক মহাজন ॥
করে ধনুর শরচায সেই মহাকায়।
পরিচয় দিলা মোরে দক্ষিণের রায় ॥
আমার সঙ্গীত যার মনে নাহি লাগে।
সবংশে তাদের সব সংহারিবে বাঘে ॥
স্তব করে সদাগর হইয়া কাতর।
ভক্ত বৎসল তুমি গুণের সাগর ॥
অপরাধ ক্ষমা কর বলি যোড় পাণি।
কৃপার সাগর প্রভু রায় গুণমণি ॥
ইন্দু হেন বদন আর মদন জিনি রূপ।
তোমা বিনা দক্ষিণের কেবা আছে ভূপ ॥

কপিলামঙ্গল

কপিলা গাই চলে গেল গিরি বৃন্দাবন।
ডোহরে ডৌড়িল অষ্টনায় বামা ছেকিল আওয়াইল ॥
ছড়বে তো বামা রাজকিরে পথ ধরে।
নহি আমি ছাড়িব রাজকের পথ,
বার বার বার বৎসর ভূখে আছি রে।
আজি খাব খাদ্য আমি পেট পুরে ॥

অবনী মণ্ডলে যখন গরু নাই কো ছিল।
দেবতা সবাই তখন কোন কর্ম করিল ॥
ব্রহ্মা যে করলেন সৃষ্টি অনেক যতনে।
তুমি না রাখিলে মাতা রাখে কোন জনে ॥
ঘৃত বিনা যজ্ঞ পূজা কিছুই না হবে।
গোধন বিহনে সৃষ্টি কেমনে রহিবে ॥

শিব মঙ্গল

ভোলা বেশ ভালোত মজা
এ কেমন তোমার পূজা।
করলি ভ্যাকম্ এক রকম
ঠিক যেন ভ্যাক্ ভ্যাকম্ রাজা
এ কেমন তোমার পূজা ॥
মুলুকাসনে আছ আসানে
শ্মশানে হইয়া মশানের রাজা
এ কেমন তোমার পূজা ॥ (ভোলা হে) —
আবার পইড়্যা কপনি আছ আপনি
ঢুল্যাঢুল্যা খাচ্ছ গাঁজা
এ কেমন তোমার পূজা ॥........ **স্বঃ লি—১২**

(আবার) কুচানি পাড়ায় বেড়াচ্ছ খুইড়্যা
কখনও বা দামড়ায় চড়্যা (শিব)
টানে টানে পর‍্যাছো টানে
চটানে পর‍্যা চুলকায় ঘাসটা।
ভূষণ অলোদ গহ্না ভ্যাসটা (শিব)
দেখ দেখ বাইদ্যার ব্যাটা
গণশার বাপটা।
ঠিক যেন কোন গুণি রোঝা
এ কেমন তোমার পূজা ॥.............

শিব মঙ্গল গান

শুনিতে সুন্দর শিব সেবিতে সুন্দর।
দেখিতে সে দরিদ্র দারুণ দিগম্বর ॥
গঙ্গারে গৌরব কর‍্যা ধর‍্যা ছিল শিরে।
গড় কর‍্যা গেল তেঁহ রত্নাকরনীরে ॥
লক্ষ্মীছাড়া ললাটে লাগিয়া শশধর।
অর্ধভাবে অপূর্ণ আছেন নিরন্তর ॥
দারিদ্র্য দোষের পরে দোষ নাহি আর।
যত দিন সঞ্চয় সকল যায় মার ॥
নির্গুণ নিষ্কাম বাম পথে অবস্থিতি।
কে জানে কি জাতি তার পুত্র কার নাতি ॥
বুড়া কত কালের কহিতে নারে কেহ।
চল্যা যাইতে টল্যা পড়ে অতি বৃদ্ধ দেহ ॥
বুড়া বল্যা বাসনা কর‍্যাছ বুড়া বরে।
ভিক্ষা মাঙ্গ্যা খায় ভুজি ভাঙ্ নাই ঘরে ॥
জ্বলিবে জঠরানলে জীবে কত কাল।
একমুখে পঞ্চমুখ বিষম জঞ্জাল ॥

শীতলা মঙ্গল

আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে বিষ - চিকিৎসা প্রকরণে বসন্ত রোগের অধিষ্ঠাত্রী ও রোগ প্রশমনকারিনী দেবী শীতলার উল্লেখ আছে। শুধু বাংলা দেশেই নয়, ভারতের নানা স্থানেই এই দেবীর পূজার প্রচলন আছে। প্রকৃত পক্ষে ইনি লৌকিক দেবী, পরবর্তীকালে হিন্দু পৌরাণিক দেবীর আভিজাত্য লাভের প্রয়াস পেয়েছেন বলা যায়।

করিল পুত্রেষ্টি যজ্ঞ নহুষ রাজন
কত মুনি-ঋষি আইল কে করে গণন।
নির্বিঘ্নে করিয়া যজ্ঞ দিলেক আহুতি
হইলেক পূর্ণ যজ্ঞ শান্তমতি।
যজ্ঞ পূর্ণ নিভাইল যজ্ঞের অনল
তাহে জনমিল এক কন্যা সমুজ্জ্বল।
মস্তকে ধরিয়া কুলা বাহির হইলা
দেখি প্রজাপতি তারে যত্নে শুধাইলা।
কে তুমি সুন্দরী কন্যা কাহার গৃহিনী
কি হেতু অগ্নিতে ছিলা কহ সে কাহিনী।
দেবী কন অগ্নিকুণ্ডে মম জন্ম হইল
কোথা যাই কি করিব পরাণ বিকল।
শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মা কহিলা বচন
যজ্ঞ শীতলের কালে তোমার জনম।
সে হেতু শীতলা নাম তোমার হইল
মম বাক্যে যাহ তুমি শীঘ্র ভূমণ্ডল ॥

ধর্ম মঙ্গল

ধর্ম্মপাল নামে ছিল গৌড়ের ঠাকুর
প্রসঙ্গে প্রসবে পুণ্য পাপ যায় দূর।
পৃথিবী পালিয়া স্বর্গ ভুঞ্জে নর বর
বীর্য্যবন্ত পুত্রতার গৌড়ের ঈশ্বর।
রূপে গুণে কুলে শীলে অখিলে পূজিত
কৃষ্ণ পরায়ণ যেন রাজা পরীক্ষিত।
কলিকালে কর্ণ হেন দানে কল্পতরু
নিত্য দান অখিলে অসার অন্নমেরু।
প্রতাপে প্রত্যক্ষ যেন সেন মহাশয়
দুষ্টের দমন কাল কেহ কেহ কয় ॥

ধর্মপূজা

বিগত উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে পশ্চিমবাংলার একটি লৌকিক ধর্মানুষ্ঠানে 'ধর্মঠাকুরের পূজা' প্রসঙ্গটি নিয়ে পণ্ডিতগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে কলকাতার এশিয়েটিক্ সোসাইটির এক সভায়, স্বর্গীয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেন যে ধর্ম্ম ঠাকুর প্রচ্ছন্ন বুদ্ধ - দেবতা। এইভাবেই, ধর্মঠাকুরের বিষয়টির উপর তিনি আলোকপাত করেন।

পশ্চিমবঙ্গের রাঢ়-অঞ্চলে বহুদিন পর্যন্ত অনার্য জাতিরা বাস করতেন। মনে হয় এরা আদি- অস্ট্রালয়েড বা প্রোটো অস্ট্রালয়েড জাতির এক কিম্বা একাধিক শাখা ভুক্ত ছিলেন। তাই মনে হয় ধর্ম-ঠাকুরের পূজা ওই অঞ্চলেই উদ্ভূত হ'য়ে ওই অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ। কালক্রমে বৌদ্ধ সম্প্রদায় হিন্দুধর্মের মধ্যে অন্তর্লীন হয়। এই অঞ্চলে ধর্মঠাকুর, ধর্মরাজ ঠাকুর, বা ধর্ম্মনামক এক দেবতা পূজিত হ'য়ে থাকেন। ধর্ম - ঠাকুরের পূজারীগণ তাঁকে কোথাও শিব, কোথাও যম, কোথাও সূর্য্য বলে (বর্ধমানের সর্বমঙ্গলা মন্দিরে একটি ধর্মমূর্ত্তিকে সূর্য্য বলে পূজা করার প্রথা আজও চ'লে আসচে। ধর্মরাজ ঠাকুরের কোনও প্রতিমা কোথাও দেখা যায় না। ধর্ম ঠাকুরের মন্দিরে কেবল একটি শিলাখণ্ড থাকে, তা ধর্ম ঠাকুরের আবরণ বলেই পরিচিত। বাঁকুড়ায় 'বেলিয়াতোড়' গ্রামে ধর্ম ঠাকুরটি সুগোল একটি শালগ্রাম শীলা। এর মধ্যে কোনও ছিদ্র নাই। আসানসোলের ডোম্‌রা গ্রামে তিনটি ধর্ম ঠাকুরই ডিম্বাকৃতি। কেউ কেউ বলেন ধর্ম শীলা ত্রিকোণ বা চতুষ্কোণ। আবার কেউ কেউ বলেন ধর্মশীলা কচ্ছপ আকার। আবার গোপালপুরের গ্রামে ধর্মশীলাটি দেখতে কাঁকড়া বিছার মত। সেইখানে কাঁকড়া -বিছা ধর্ম ঠাকুর বলেই প্রচলিত। তাই দেখা যাচ্ছে, স্থান ভেদে ধর্ম ঠাকুরের মুর্ত্তিভেদ পরিলক্ষিত হয়। ছোট নাগপুর ও উড়িষ্যার আদিম অধিবাসীগণের কাছে 'ধর্ম-ঠাকুর' ধর্মদেবতা বলেই পরিচিত। এরা তাঁকে সূর্য্য দেবতা ভিন্ন অন্য কোনও দেবতা বলে মানেন না।

পশ্চিমবঙ্গের 'ডোম্" জাতিরা এখনও 'প্রস্তর খণ্ডে' ধর্ম্ম ঠাকুরের পূজা করে থাকেন। অস্পৃশ্য ডোম্-জাতিভুক্ত লোকই প্রধানতঃ এই দেবতার পূজারী। এই পূজারীদের বলে 'দেয়াসী'। 'ডোম' পূজারীগণ বাহুতে তামার তাগা এবং আঙ্গুলে তামার আংটি ধারণ করেই 'ধর্ম্মঠাকুরের পুরোহিত হন। শিবের গাজন অনুষ্ঠানেও পাশাপাশি ধর্ম্ম-ঠাকুরের গাজনও হয়। গাজন উপলক্ষে কোনও কোনও গ্রামে 'চড়ক'ও হয়ে থাকে।

অনেক সমালোচক মনে করেন ধর্মমঙ্গল কাব্যটি জাতীয় কাব্যের মর্য্যাদা পাওয়ার যোগ্য।

প্রথমে বন্দি জয় জয় পরাৎপর।
স্থানে স্থানে মূর্ত্তিভেদ মহিমা বিস্তর ॥
বেলডিহার বাঁকুড়া রায় বন্দি এক মনে।
অসংখ্য প্রণতি শীতল সিংহের চরণে ॥
ফুল্লরের ফতে সিং বৈতলের বাঁকুড়া রায়।
শুদ্ধভাবে বন্দি দোঁহে নত হ'য়ে কায় ॥
পাণ্ডুগ্রামের বুড়া ধর্ম্মেবন্দিয়া সাদরে।
শ্যাম বাজারের দনু রায়ে দিয়ে জয় জয়কারে ॥
দেপুরে জগৎ রায়ে জোড় করি কর।
গোপালপুরের কাঁকড়া বিছায় বন্দি তারপর ॥
দিয়াসের কালাচাঁদ ত্রিন্দাসের বাঁকুড়া রায়।
বন্দিব বিস্তর নতিকরে নত কায় ॥
গোপুরের স্বরূপ নারায়ণ স্বর্ণ সিংহাসনে।
বন্দিয়া বন্দিব মঙ্গলপুরের রূপ নারাণে ॥
পশ্চিম পাড়ার যাত্রাসিদ্ধি বন্দিয়া তাহায়।
বড়ুজা গ্রামের বন্দিব মোহন রায় ॥
গুড়্ছা গ্রামের বন্দি শীতল নারায়ণে।
আলগুড় ছিন্নার খুদিরায়ে বন্দি সাবধানে ॥
আকুটিকুল্লার মাল্লার ধর্ম্মের করিয়া স্তবন।
বন্দিপুরের শ্যাম রায়ের বন্দিয়া চরণ ॥
জাড়াগ্রামে কানুরায়ে কামিন্যা সহিত।
ভাজপুরের দেহারা বন্দি দৃঢ় করি চিত ॥

ধর্মরাজের বন্দনা গান

ধর্মরাজের বন্দনার অংশবিশেষ; কবি ঘনরাম চক্রবর্তী রচিত —

বন্দি পরাৎপর ব্রহ্ম অনাদি অনন্ত ধর্ম
বিশ্ববীজ অখিল আধান।
সূক্ষ্ম শূণ্য সনাতন নৈরাকার নিরঞ্জন
নিত্যানন্দ নির্গুণ নিধান।।
তব ইচ্ছা সুপ্রকাশে সৃজন পালন নাশে
তিন তনু ত্রিগুণ তোমার।
স্বগুণ শরীর ধর বিধি বিষ্ণু-মহেশ্বর
রজঃ সত্ত্ব তমোগুণাধার।।
তুমি সকল তন্ত্রে তন্ত্রী জগন্ময় যন্ত্রে যন্ত্রী
তুমি মন্ত্র মন্ত্রী মহাশয়।

অসুর অমর নর যক্ষ রক্ষ বিদ্যাধর
সর্বঘটে তোমার আশ্রয়।।

ধর্মমঙ্গলে ধর্মাঠাকুর যবনের ছদ্ম বেশে

ধর্ম হইলা যবন রূপী শিরে পরে কাল টুপি
হাতে ধরি ত্রিকচ কামান।
চাপিয়া উত্তমহয় দেবগণে লাগে ভয়
যোদ্ধার হইল এক নাম ॥
ব্রহ্ম হইল মহম্মদ বিষ্ণু হইল পেগম্বর
মহেশ হইল বাবা আদম।
গনেশ হইল কাজী কার্তিক হইল গাজী।
ফকির হইল মুনিগণ ॥

(২)

ধর্মমঙ্গলে পীরের বর্ণনা

বন্দো পীর ইসমালি গড় মান্দারণে।
বাচ্য মহিষ পালে পালে বাসায় কামনে ॥
মান্দারণ গৌড়েতে যাহার জাঙ্গাল।
তাহার মধ্যে সাপ বেজি আর শিয়াল ॥
গড় মাঝে বনাল্যা আঠার গোণ্ডা কোট।
তাহার চরণ বন্দো ভূমে হয়্যা লোট ॥
দারোগা ফকির বন্দিব নিগাঙ্গে।
জোড় হাতে বন্দিব গাড়ুয়ার মুখী খাঞে ॥

পীরবন্দনার ক্ষেত্রে সে যুগে হিন্দু-মুসলমান ঐকমত প্রকাশ করতেন। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মনে ভক্তি-আন্দোলনের ক্ষেত্রে পীরবন্দনা সাড়াজাগাতে পেরেছিল।

(৩)

ধর্মপূজা করিলে দুঃখ দূর হয়।
ধর্মপুত্র লাভ হয় নাহি থাকে ভয় ॥
তাই বলি এস সবে করি এক মন।
ধর্মরাজ পদে ভক্তি কর নিবেদন ॥

সূর্য মঙ্গল

উত্তর সালা কদম গাছটি দক্ষিণ আলা বাওরে।
গা তোল গা তোল সূর্যাই ডাকে তোমায় মাওরে ॥
শিখরে চন্দনের বাটি বুকে, ছিটা পড়েরে
গা তোল গা তোল সূর্যাই ডাকে তোমার মাওরে ॥

(২)

ভাঙ্গা নাও মাঁদারের বৈঠা চলকে ওঠে পানি
ধীরে ধীরে বাওরে মাঝি মায়ের কান্দন শুনি ॥

নাইবারে দিয়াম তার বালা মাঝির দিয়াম কড়ি।
ধীরে ধীরে বাওরে মাঝি ভাইয়ের কান্দন শুনি ॥
ভাঙ্গা নাও মাঁদারের বৈঠা চলকে ওঠে পানি।
ধীরে ধীরে বাওরে মাঝি বাপের কান্দন শুনি ॥

গঙ্গামঙ্গল

নিমিষ কানন স্থল অতি নিরমল।
শৌণকাদি যথা স্থিতি ঋষির মাতল ॥
ব্যাসাসনে শুক যথা কহেন পুরাণ।
জিজ্ঞাসিল মুনিগণ না করিহ আন ॥
শুনিল গঙ্গার বার্তা দ্রবময় হরি।
তোমার প্রসাদে সবে ভবপারে তরি ॥
পাদোদ্ভবা করি গঙ্গা তিন লোক কয়।
বিবরিয়া কহ তত্ত্ব ঘুচাহ বিস্ময় ॥
শুক বলে সর্বজন শুনহ আখ্যান।
বলি হৈতে পাদোদ্ভাবা হৈলা ভগবান ॥

শান্তনুর পুত্রের উপাখ্যান

পুত্রের দেখিয়া যত্ন করেন রাজন।
তোমার সমান কোন নাহি অন্যজন ॥
একপুত্র হও তুমি সহস্র সখমন।
গঙ্গার গর্ভেতে জন্ম জগতে বাখান ॥
চিত্তে তোলাপাড় করি না হয় নির্ণয়।
এক চক্ষু চক্ষু নহে জানিল হৃদয় ॥
এক নাশা কর্ণ কর এক পদ যার।
এক হৈতে শোভা নহে এই চমৎকার ॥
একেতে অনেক তুমি ইহা ভালো জানি।
তথাপিও অনুক্ষণ হৃদে অনুমানি ॥

চৈতন্য মঙ্গলের গান

এমন ভবনে হৈলে গৌরাঙ্গ এমন কেনে হৈলে।
নটবর বেশ গোরা কি লাগি ছাড়িলে ॥
সুরধনি তীরে গোরা তিলেক দাঁড়াও।
চাঁদ নিরখিয়ে তবে বাড়ি যাও ॥
এক বোল বলি নিমাই যদি তুমি রাখ।
সন্ন্যাসের কাজ নাই ঘরে বৈসে থাক ॥
সন্ন্যাসী না হইও নিমাই বৈরাগী না হইও।
অভাগী মায়েরে নিমাই ছাড়িয়া না যাইও ॥ স্বঃ লি—১৩

রামায়ণ গান

পর্ব ঃ রামের বনবাস

বন্দনা

রামং, লক্ষ্ণণ পূর্ব্বজং রঘুবরং সীতাপতীং সুন্দরং।
কাকুৎস্থ্ করুণা ময়ং গুণনিধিং বিপ্র প্রিয়ং ধার্ম্মিকম ॥
রাজেন্দ্রং সত্যসন্ধং দশরথ তনয়ং শ্যালং শান্ত মুক্তিং
বন্দে লোকভিরা ণং রঘুকুলতিলকাথ রাঘবং রাবণরিম্ ॥
দক্ষিণে লক্ষণো ধন্বী বামতো জানকী শুভা।
পুরতো মারুতির্যস্য তং নমামি রঘুত্তমম্ ॥
রামায় রামচন্দ্রায় রামভদ্রায় বেধসে।
রঘুনাথায় নাথায় সীতায়াঃ পতয়ে নমঃ ॥

শমন দমন রাবণ রাজা রাবণ দমন রাম।
শমন ভবন নাহয় গমন যেলয় রামের নাম ॥
রাম নাম জপ ভাই অন্য কর্ম্ম পিছে।
সর্ব্ব ধর্ম্ম কর্ম্ম রামনাম বিনা মিছে ॥
মৃত্যুকালে যদি নর রাম বলি ডাকে।
বিমানে চড়িয়া সেই যায় দেবলোকে ॥
শ্রী রামের মহিমার কি দিব তুলনা।
তাহার প্রমাণ দেখো গৌতম ললনা।
রামনাম লইতে ভাই না কর হেলা।
ভবসিন্ধু তরিবারে রামনাম ভেলা ॥
অনাথের নাথ রাম প্রকশিল লীলা।
বনের বানর বন্দী জলে ভাসে শিলা ॥
রাম নাম স্মরণে যমের দায় তরি।
ভব সিন্ধু তরিবারে রামপদ স্মরি ॥
চণ্ডালে যাহার দয়া বড় সকরুণ।
পাষাণে প্রমাণ আছে শ্রী রামের গুণ ॥
কি দিব শ্রী রামের গুণের তুলনা।
পাষাণ মনুষ্য হয় নৌকা হয় সোনা।
রাম নাম বলো ভাই মুখে বার বার।
ভেবে দেখো রাম বিনা গতি নাহি আর ॥
অশ্বমেধ করিলেন শ্রীরাম যতনে।
অশ্বমেধ ফল পায় রামায়ণ শুনে ॥
এমন রামের গুণ কি বর্ণিতে পারি।
হেলায় তরিয়ে যাবে মুখে বল হরি ॥
রাজ্যখণ্ড ছাড়িয়া শ্রী রাম যান বনে।
পাছে পাছে কতো ধায় স্ত্রী পুরুষ গণে ॥

দশরথ- দশরথ গড়াগড়ি যান ভূমিতলে।
কেকেয়ী- হেনকালে কেকয়ী রাজারে ধরি তুলে ॥
দশরথ- নরপতি বলেন না ছুঁইস পাতকিনি।
স্ত্রী হইয়া স্বামীকে বধিলি চণ্ডালিনি ॥
রাত্রিদিন কাঁদিলোক করে জাগরণ।
কোথাহে শ্রী রামচন্দ্র যেওনা বন ॥
রাম- শ্রীরাম তমসা নদী হইলেন পার।
প্রাতঃ স্নান আদি করি নিয়ম আচার ॥
পিতৃসত্য পালিবারে শ্রীরাম যান বন।
জানকী, লক্ষণ যান কিসের কারণ ॥
সাতা- জানকী বলেন গো কৌশল্যা ঠাকুরাণী।
স্বামীর সেবা করিতে আমি ভালো জানি ॥
স্বামীর সেবা করিমাত্র আমি এই চাই।
তে কারণে ঠাকুরাণী বনবাসে যাই ॥
রাম- সবারে বন্দেন রাম যত রাজরাণী.
সবাকার ঠাঁই রাম মাগেন মেলানী ॥
নমস্কার করিলেন কৈকেয়ীর চরণে।
অনুমতি করো মাতা যাই আমি বনে ॥
মায়েরে সঁপেন রাম নৃপতির পায়।
যাবৎ না আসি পিতা পালহ্ মাতায় ॥
দশরথ- রাজা বলিলেন যদি রহে এ জীবন।
তবেতো তোমার মায়ে করিবো পালন ॥
আমার এ আজ্ঞা রাম না করো লঙ্ঘন।
তিনদিন রথে চড়ি করহ্ গমন ॥
রাম- জনক জননীর পদে করিয়া প্রণাম।
বনপথে যাত্রা করিলেন শ্রী রাম ॥
রামচন্দ্র (গান) জননী এখনি আমায় বন যেতে হলো।
বনে যেতে হলো আমায়, বনে যেতে হলো ॥
জননী.........
চৌদ্দ বৎসর বনে ভ্রমণ, ফলমূল আহরণ।
কাজকি আমার রাজাভরণ গাছের ফল ॥
জননী.........
বিমাতা জননীর কথায়, সত্য করে ছিলেন পিতায়।
সেইজন্য বনে পাঠায় সীতা রহিল ॥
জননী......।
স্বর্ণ ছাতা দিতাম মাথায়, ছাতা হয়না বৃক্ষেরপাতায়
পদধূলি দেহ মাথায় পথের সম্বল।

জননী.......... ॥
দ্বিজ মন মোহন বলে, বিধি এই কি লিখেছিল কপালে।
কালকে যে রাজা হবে আজসে বন গেল ॥
জননী................ ॥

কৌশল্যা- কৌশল্যা কান্দিয়া কন রাজার কাছে।
রামকে বনে যেতে দিওনা কোনো মতে ॥
কৌশল্যা (গান) আমার জীবন রামকে বনে দিওনা।
জীবন রামকে বনে দিলে জীবনে জীবন রবে না ॥
আমার জীবন............।
রামকে লোয়ে দেশান্তরে, খাওয়াইব ভিক্ষা করে।
কাজকি আমার অযোধ্যা পুরে ॥
ভরতকে রাজ্য দিয়ে, পুরাও মনের বাসনা।
আমার জীবন................ ॥
ধরিযে তব চরণে, রামকে দিওনা বনে,
রাখো ভবনে।
রামকে বনে দেবে তুমি, রাম আমার কিছুই জানেনা।
আমার জীবন............. ॥
রাম আমার রাজার ছেলে, বনে থাকবে কেমন করে।
বলো না মোরে।
ফলমূল ভক্ষণ করে, কেমনে রবে বলো না।
আমার জীবন...............॥
রহেন একরূপে পঞ্চবটি তিন জন।
কোন কালে ঘটে এক অপূর্ব ঘটন ॥
শূর্পনখা- রাবণের ভগ্নীসেই নাম শূর্পনখা।
অকস্মাৎ রামের সম্মুখে দিল দেখা ॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে গেল রামের সদনে।
শ্রীরামে দেখিয়া সে মাতিল মদনে।
এতভাবি মায়াবিনী দুষ্ট নিশাচরী।
নবরূপ ধরে নিজ রূপ পরিহরি ॥
পর্ব্বত নাড়িতে চাহে হইয়া দুর্ব্বল।
রামে ভুলাইতে করে নানা রূপ ছল ॥
বহুদুর নহে তারা আইল নিকটে।
হেন রূপবান তুমি পড়িলে সঙ্কটে ॥
শূর্পনখা- সঙ্গে দেখি চন্দ্রমুখী ইনি কে তোমার।
এই যুবক তব সমান আকার ॥
রাম- সরল হৃদয় রাম দেন পরিচয়।

মম পিতা দশরথ রাজা মহাশয়।
ইনি ভ্রাতা লক্ষ্মণ প্রেয়সী সীতা ইনি।
সত্য হেতু বনে ভ্রমি শুন লো কমিনী ॥
শুনিলে আমার কহ নিজ পরিচয়।
কে বট আপনি কোথা তোমার আলয় ॥
জিজ্ঞাসা করেন রাম সরল হৃদয়।
শূর্পনখা- সূর্পনখা আপনার পরিচয় দেয় ॥
লঙ্কাতে বসতি আমি রাবণ ভগিনি।
নানা দেশে ভ্রমি আমি হয়ে একাকিনী ॥
লঙ্কা পুরে বসে ভাই দশানন রাজা।
নিদ্রা যায় কুম্ভকর্ণ ভ্রাতা মহাতেজা ॥
অন্যভ্রাতা সুশীল ধার্ম্মিক বিভীষণ।
এখানে খর দুষণ ভাই দুইজন ॥
অতি আহ্লাদিনী আমি কনিষ্ঠা ভগিনি।
তোমার হৈলে কৃপা ধন্য করি মানি ॥
তথা যাব যথা নাই মনুষ্য সঞ্চার।
তুমি আমি কৌতুকেতে করিব বিহার ॥
প্রতিবাদী হয় যদি জানকী লক্ষ্মণ।
রাখিয়া নাহিকে কার্য করিব ভক্ষণ ॥
রাম- শ্রীরাম বলেন সীতা না করিহ ত্রাস।
রাক্ষসী সহিত কিছু করি পরিহাস ॥
আমার ভার্যা হইলে পাবে যে সতিনী।
লক্ষ্মণের ভার্যা হও সে যে বড় গুণী ॥
লক্ষ্মণ কনকবর্ণ বড়ই সুন্দর।
লক্ষ্মণের ভার্য্যা নাই তুমি করো ঘর ॥
সত্যজ্ঞানে নিশাচারী লক্ষ্মণেরে বলে।
তোমাহেন রূপবান পাব কোনস্থলে।
তুমি যুবা হইয়া একেলা বঞ্চরাতি।
রতিক্রীড়া ভুঞ্জ তুমি আমার সংহতী ॥
লক্ষ্মণ- লক্ষ্মণ বলেন আমি শ্রী রামের দাস।
সেবকের প্রতি কেন কর অভিলাষ ॥
ভজহ শ্রী রামে তুমি হৈয়া সাবধান।
মানুষী কি করিবেক তোমা বিদ্যমান ॥
শূর্পনখা- উপহাস না বুঝিয়া বলা মাত্র ধায়।
লক্ষ্মণেরে ছাড়িয়া রামের কাছে যায় ॥
পুনর্বার আইলাম রাম তব পাশে।
ব্যাঘাত ঘুচাইব সীতারে গিলি গ্রাসে ॥

যেদিকেযান সীতা সেইদিকে রাক্ষসী।

সীতা- রাক্ষসীর ডরে কাঁপে জানকী রূপসী ॥

রাম- শ্রী রাম বলেন ভাই ছাড় উপহাস।

ইঙ্গিতে বলেন কর ইহাকে বিনাশ ॥

লক্ষ্মণ- ক্রোধেতে লক্ষ্মণ বীর মারিলেন বাণ।

এক বাণে তাহার কাটেন নাক কান ॥

খান্দা নাকে খান্দা কানে রক্ত পরে স্রোতে।

ওষ্ঠাধর রাক্ষসীর ভিজল শোনিতে ॥

রাবণে কহিতে যায় নিজ সমাচার।

নাক কান কাটা তার বিভৎস আকার ॥

সভাকরি বসে আছে রাবণ ভূপতি।

সুরগণ সহিত যেমন সুরপতি ॥

নিজ নিজ স্থানে বসিয়াছে মন্ত্রীগণ।

হেন কালে শূর্পনখা দিল দরশন ॥

নাক কান কাটা তার মুর্ত্তিখানি কালী।

সভামধ্যে রাবণেরে দেয় গালাগালি ॥

শৃঙ্গার কৌতুকে রাজা থাক রাত্রিদিনে।

রাক্ষস করিতে নাশ রাম এল বনে ॥

শূর্পনখা (গান) এই নিবেদন জানাই দাদা শুনো দশানন।

ফুল তুলিতে গিয়েছিলাম পঞ্চবটি বন ॥

তারা দু'ভাই ধনুর্ধারী, কিবা তাদের রূপ মাধুরী।

নয়ন ভরে হেরে যদি জুরাবে তাপিত জীবন।

এই নিবেদন............

তিনজনারে বনে হেরে গেলাম পরিচয়ের তরে।

নাক কানকেটে লক্ষণ আমার করিল অপমান ॥

এই নিবেদন.................

দ্বিজ মন মোহনে বলে, নারি অপমানের বদলা

লও এই কালে।

তাহার রমণী তুমি করহ হরণ ॥

এই নিবেদন............. ॥

রাবণ- শূর্পনখার মুখেতে শুনি বিবরণ

মারীচ বলিয়া ডাকে রাজা দশানন।

মরিচ- রাজার আজ্ঞায় মারিচ দিল দরশন।

ভক্তি ভাবে প্রণমিল রাবণের চরণ ॥

রাবণ চড়িয়া রথে চলিল গগনে।

রথ হৈতে ভুমিতে নামিল দুইজনে ॥

মারীচের কর ধরি কহে লঙ্কেশর।

মৃগরূপ ধর তুমি দেখিতে সুন্দর।
মৃগরূপ ধরিল মারীচ নিশাচর।
নবনীত সদৃশ কোমল কলেবর।
শ্বেতবর্ণচারি ক্ষুর দেখিতে সুন্দর।
দুই শৃঙ্গে তার যেন প্রবাল প্রস্তর ॥

রাবণ- বনমধ্যে লুকাইয়া রহিল রাবণ।
আলোকরি মায়া মৃগ করিল গমন ॥

রাম সীতা- যেইখানে রাম সীতা বসি দুইজন।

মারিচ- সেইখানে স্বর্ণ মৃগ দিল দরশন ॥

সীতা- শ্রীরামে বলেন সীতা মধুর বচন।
অনুমতি হয় যদি করি নিবেদন ॥
এই মৃগচর্ম যদি দাও ভালোবাসি।
কুটীরে কৌতুকে রাম বিছাইয়া বসি ॥

রাম- আগ্রহে শুনিয়া রাম সীতার বচন।

লক্ষ্মণ- লক্ষ্মণের ডাক দিয়া বলেন তখন।

রাম- যাবৎ মারিয়া মৃগ নাহি আসি ঘরে।
তাবৎ করহ রক্ষা লক্ষ্মণ সীতারে।

রাবণ- বৃক্ষ আড়ে থাকিয়া রাবণ সব শুনে।
মনে ভাবে জানকীরে হরিব এক্ষণে ॥

রাম- শ্রী রাম করেন সজ্জা হাতে ধনু শর।
মৃগ মারিতে যায় লক্ষ্মণেরে রাখী ঘর।

মারিচ- শ্রী রামে দেখিয়া মারিচ ভাবে মনে মনে
পালাইয়া গেলে মোরে মারিবে রাবণে ॥
বরঞ্চ রামের হাতে মরণ মঙ্গল।
রাবণের হাতে মৃত্যু নরক কেবল।
ক্ষণেক নিকটে যায় ক্ষণেক অন্তরে।

রাম- শ্রী রাম নিকটে গেলে পালায় সে দুরে ॥
প্রাণে ধরিবেন মৃগ নাহি মারেন বাণ
নিকটে পাইলে মৃগ ধরে দুই কান।
এমন চিন্তিয়া রাম বুঝে কারণ
স্বরূপেতে মৃগ নহে হবে দুষ্ট জন।
ঐষিক বিশিক রাম পূরণে সন্ধান
মারীচের বুকে বাজে বজ্রের সমান ॥

মারিচ- বেদনায় মারীচসে পড়িল অন্তরে।
রাক্ষসের মূর্তিধরি হাহাকার করে ॥
মারীচ তখন করে রাবণের হিত।

রামের ডাকের তুল্য ডাকে আচম্বিত ॥
আইস লক্ষ্মণ ঝাট কর পরিত্রাণ।
রাক্ষস মিলিয়া ভাই লয় মোর প্রাণ ॥
মারিচ- লক্ষ্মণ বলি ডাকে উচ্চৈঃস্বরে।
রাম- শুনিয়া রামের হয় কম্প কলেবরে ॥
সংহারিয়া মারিচেরে বাণ লয়ে হাতে।
সীতার নিকটে রাম চলেন ত্বরিতে ॥
সীতা- হেথা সীতা শুনিলেন করুণ বচন।
বলিলেন শীঘ্র যাহ দেবর লক্ষ্মণ ॥
আর্তস্বরে শ্রী রাম ডাকেন যে তোমারে।
দেখ গিয়া তাঁহারে রাক্ষসেতে মারে।
লক্ষ্মণ- লক্ষ্মণ বলেন শ্রীরামের নাহি ভয়।
মৃগ মারি আসিবেন কিসের বিস্ময় ॥
তার কথা শুনি লক্ষ্মণ এরে কহে।
শূন্য ঘরে থাকা তবু যুক্তিযুক্ত নহে ॥
সীতা- না মানেন সীতা দেবী হয়ে উতরোলী।
শিরে ঘা হানেন মুখে দেন গালা গালি ॥
বৈমাত্রেয় ভাই কভু নহেত আপন।
আমার প্রতি লক্ষ্মণ তোমার বুঝি মন ॥
ভরত পাইল রাজ্য তুমি লহ নারী।
ভরতের সনে তব আছে ভারিভূরি ॥
লক্ষ্মণ- লক্ষ্মণ ধার্মিক অতি মনে নাহি পাপ।
সকলেরে সাক্ষী করি করে মনস্তাপ ॥
গণ্ডীদিয়া বেড়িলেন লক্ষ্মণ সে ঘর
প্রবেশ না করে কেহ ঘরের ভিতর ॥
বিদায় করো সীতা ঠাকুরাণী।
আর কিছু না বলিহ দুরক্ষর বাণী।
সীতা- শিরে ঘা হানেন সীতা নেত্র জল তিতে।
সীতা প্রণমিয়া যান লক্ষ্মণ ত্বরিতে ॥
রাবণ- থাকিয়া বৃক্ষের আরে দেখিয়ে রাবণ।
লক্ষণ- বিমুখ হইল বিধি চলেন লক্ষ্মণ।
রাবণ- এতক্ষণে রাবণের সিদ্ধ অভিলাষ।
তপস্বীর বেশধরি যায় সীতা পাশ।
ভিক্ষা দেহ বলে রাবণ আসিল দ্বারেতে।
সীতা- পঞ্চফল ভিক্ষা লই যায় যে গো সীতে ॥
রাবণ- রাবণ বলিল সীতা ব্রত করি বনে
আশ্রমে না ভিক্ষা লই জানে মুনিগণে ॥

সীতা- জানকী কহেন দেব এক কথা কই।
প্রভু আজ্ঞা বিনাগৃহ বাহির না হই ॥
রাবণ- রাবণ বলেন ভিক্ষা আনহ সত্বর।
নতুবা উত্তর দেহ যাই নিজঘর ॥
সীতা- জানকী ভাবেন ব্যর্থ অতিথি যাইবে।
ধর্ম্ম কর্ম্ম নষ্ট হবে প্রভু কি বলিবে ॥
ফলহাতে বাহির হইলেন জানকী।
রাবণ- লইতে আইল দুষ্ট রাবণ পাতকী ॥
ধরিল সীতার হাত লইল ত্বরিত।
সীতা জানকী বলেন হায় একি বিপরীত ॥
দূরাচার দুর হও পাপিষ্ঠ দুর্জ্জন।
আমা লাগি হবে তোর সবংশ নিধন ॥
রাবণ- রাবণ বলিল সীতা শুনহ বচন।
আত্ম পরিচয় কহি আমি দশানন ॥
রাক্ষসের রাজা আমি লঙ্কা নিকেতন।
কুড়ি হাত কুড়ি চক্ষু, দশটি বদন ॥
করিয়া রামের সেবা জন্ম গেল দুঃখে।
আমার করিলে সেবা রবে নানা সুখে ॥
তোমার রূপেতে আমি বড় অভিলাষী।
অন্য যত মহিষী হবে তোমার দাসী ॥
সীতা- কোপান্বিতা সীতা দেবী রাবণ বচনে।
রাবণেরে গালিদেন যত আসে মনে ॥
অধার্ম্মিক নগণ্য কুকর্ম্মী দুরাচার
করিবেন রাম তোরে সবংশে সংহার।
রাবণ- সীতারে ধরিয়া লয়ে তুলিল রাবণ।
মেঘের উপরে শোভে চপলা যেমন ॥
সীতা- বিপদে পড়িয়া সীতা ডাকেন শ্রী রাম।
চক্ষু মুদি ভাবেন সে দুর্ব্বাদল শ্যাম ॥
সীতা লৈয়া রাবণ পালায় দিব্য রথে ॥
রাম বুঝি এল বলি দেখে চারিভিতে ॥
সীতা- জানকী বলেন শুন যত দেবগণ।
প্রভুরে কহিও সীতা হরিল রাবণ।
সীতা (গান) আমায় ছেড়ে দেরে রাবণ ওরে পাপী রামের সীতা পাননা এখন ॥
আমায় ছেড়ে দেরে রাবণ ॥
স্বর্ণমৃগ ধরিবারে, প্রভুগেছে বনান্তরে,
তোরে বলিরে এখন ॥
আমায় ছেড়ে........... ॥

শ্বাশুড়ী কৌশ্যলা সতী, স্বামী আমার রঘুপতি।
দশরথ শ্বশুর মম, দেবর লক্ষ্মণ।
আমায় ছেড়ে................. ॥
ছেড়ে দেরে ও দুর্মতি, তোরে করি মিনতি
রামেরসীতা হরলে পরে সবংশে হবি নিধন।
আমায় ছেড়ে দে............. ॥
মনমোহন কহে রাবণ একি দুর্মতি।
সীতায় হরিলে পাবি অশেষ দুর্গতি ॥
বংশে বাতিদিতে তোর না রহিবে একজন।
আমায় ছেড়ে............ ॥

জটায়ু- জটায়ু নামেতে পক্ষী গরুড় নন্দন।
দূর হইতে শুনিলেন সীতার ক্রন্দন ॥
আকাশে উড়িয়া পক্ষী চতুর্দিকে চায়।
দেখিল রাবণ রাজা সীতা লয়ে যায় ॥
দুই পাখা প্রসারিয়া আগুলিল বাট।
রাবণেরে গালি দিয়া মারে পাখসাট ॥
কি কইব হয়েছি বৃদ্ধ ঠোঁট হৈল ভোঁতা।
নতুবা ফলের মতো ছিড়িতাম মাথা ॥

রাবণ- বত্রিশ হাজার বাণ রাবণ এড়িল।
সর্ব্বাঙ্গে ফুটিয়া পক্ষী কাতর হইল।
রামের অপেক্ষা করি রহে পক্ষীবর
প্রাণ পণে যুঝিল সাহসে করিভর ॥
রাবণ দেখে পক্ষী বলে নাহি টুটে
অর্দ্ধচন্দ্র বাণে তাহার দুই পাখা কাটে ॥

জটায়ু ভুমেতে পরিয়া পক্ষী করে ছট ফট।
সীতা- আসিয়া কহেন সীতা পক্ষীর নিকট ॥
সীতা- যাবৎ না দেখ তুমি শ্রী রাম লক্ষ্মণ।
তাবৎ না হইবেক তোমার মরণ
প্রভুরে দেখহ যদি বনের ভিতর।
বলিও তোমার সীতা নিল লঙ্কেশ্বর ॥
শ্রীরাম বলিয়া সীতা করেন ক্রন্দন।
অন্তরীক্ষে হাহাকার করে দেবগণ ॥
রামে জানাইতে সীতা ফেলেন ভূষণ।
সীতার ভূষণ গুলি ছাইল গগন।

সীতা (গান) কেন সাধ করে স্বর্ণ মৃগের তরে।
দুর্জন মাঝারে নাথেরে পাঠালাম ॥
কেবা বাদি হলো এ বাদ সাধিল।

পতিপদ সেবায় বঞ্চিত হইলাম ॥
রেখে গেল আমায় গণ্ডির ভিতরে।
লয়ে যায় আমায় দুষ্ট নিশাচরে ॥
গণ্ডির বাহিরে যাইতে নিষেধ করে।
কেন আমি গণ্ডির বাহির হইলাম ॥
কেন সাধ করে ....।
দুর্জন মাঝারে............. ॥
অতিথি জ্ঞানে আসিলাম বাহিরে
ধরিল. আমায় দুষ্ট লঙ্কেশ্বরে ॥
কোথা আছ লক্ষ্মণ, রক্ষঃ গো আমারে।
কু বাক্য বলিয়া কি ভুল করিলাম ॥
না শুনিলাম আমি লক্ষ্মণ বচন।
গালি দিলাম তারে আমি অকারণ।
সুযোগ পেয়ে আমায় হরিল রাবণ।
লক্ষ্মণে পাঠাইয়া কি ভুল করিলাম।
কেন সাধ................।
দুর্জন মাঝারে...........॥

রাম- রাম চলিলেন করে ধনুর্বাণ হাতে।
সহসা লক্ষ্মণেরে দেখিলেন পথে ॥
লক্ষ্মণেরে দেখিয়া বিস্ময় মনে মানি।
ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করেন রঘুমণি ॥

রাম- কেন ভাই আসিতেছ তুমি যে একাকী।
শূন্যঘরে একাকিনী জানকীরে রাখী ॥
প্রমাদ পাড়িল বুঝি রাক্ষস পাতকী।
জ্ঞান হয় ভাই হারাইলাম জানকী ॥

রাম-লক্ষ্মণ এইমত কহিতে কহিতে দুইভাই।
বায়ুবেগে চলিলেন অন্যজ্ঞান নাই ॥
উপনীত হইলেন কুটীরের দ্বারে।
সীতা সীতা বলিয়া ডাকেন বারে বারে।
শূন্য ঘর পাইয়া হরিল কোন চোরে।
তখনে বলেন রাম, সীতা নাই ঘরে ॥

রাম- (গান) কেন গেলাম মায়া মৃগ ধরিতে (২)
তোমরা কি কেউ দেখেছ সীতারে যাইতে।
কেন গেলাম........... (২)
শোন লতা তরুগণ বিহঙ্গ মুকুল
আমি রাম সীতা হেতু হতেছি ব্যাকুল।
তোমরা দেখেছো কি সীতারে বধিতে (২)

শোনো বলি গিরি বর উচ্চ তোমার শিখা।
তুমি কি পেয়েছে আমার জানকীর দেখা ॥
জানকী, জানকী, জানকী যে ॥
কেন গেলাম.......... (২)
মন মোহন বলে রাম কাঁদলে কোথায় পাবে।
রাবণ রাজা সীতারে লয়ে গেছে হরে ॥
গেছেযে, গেছেযে লঙ্কা পুরিতে।
কেন গেলাম .... ॥

রাম ও লক্ষ্মণ — শ্রী রাম লক্ষ্মণ দোঁহে ভ্রমেন দণ্ডকে।
সহায় করিতে যান বানর কটকে ॥
দুই ভাই উঠিলেন পর্ব্বত শিখরে।
দেখিয়া বানর পঞ্চ শঙ্কিত অন্তরে ॥

সুগ্রীব- দেখিয়া সুগ্রীব বলে আসে দুই নর।
মনে করি বালি রাজা পাঠাইল চর ॥

সুগ্রীব- সুগ্রীব বলিল দেখি তপস্বী উভয়।
কিন্তু ধনুর্ব্বাণ ধরে মনে লাগে ভয় ॥

হনুমান- হনুমান মুনিবেশে দেখে দুইজন।
তপস্বীর বেশ ধরি করে সম্ভাষণ ॥
কোথা বাড়ী কি কারণে হেথা আগমন।
কহপ্রভু বিশেষিয়া সব বিবরণ।
সুগ্রীব বানর রাজ[illegible] [illegible] খ্যাতিমান।
তাহার সচিব আমি নাম হনুমান ॥
তোমাসহ মিত্রতা করিতে অভিলাষ।
আমারে পাঠাইল সুগ্রীব তব পাশ।
হনুমান বলে উভয় দরশনে ॥
পরস্পর প্রীতি হবে উভয়ের মনে ॥
সুগ্রীবের রাজ্য নাই নাই তার নারী।
বালিরাজা হরিয়া করিল দেশান্তরী ॥
সুগ্রীব পাইবে রাজ্য সাহায্যে তোমার।
সুগ্রীব করিবে তব সীতার উদ্ধার ॥

শ্রীরাম- শ্রী রাম বলেন কপি করহ গমন।
সুগ্রীবের সনে মোর করাও মিলন ॥

হনুমান — এত বলি হনুমান লইয়া চলিল।
সুগ্রীব মাথায় আছে তথায় দেখা দিল ॥
পরস্পর হস্ত রাখি হইল পরিচয়
হনুমান বলে ওঠে শ্রী রামের জয় ॥
কাষ্ঠ আনে বড় বড় বাছি দুই খান।

মুনিবেশ ছাড়ি কপি হয় হনুমান ॥
দুই কাষ্ঠ ঘর্ষণ করিতে অগ্নি জ্বলে।
অগ্নি সাক্ষী করি দোহে মিত্র মিত্র বলে ॥

(গান) জয় জয় রঘু পতি রাঘব রাজা রাম।
পতিত পাবন সীতারাম ॥
ইশ্বর আল্লা তেরে নাম।
সবকো সুমতি দে ভগবান
গরিবের প্রভু তুমি তুমি ভগবান
রঘুপতি রাঘব রাজা রাম।

সংক্ষেপে রামায়ণ গান এই খানেই সারি। প্রেমানন্দে ভক্তবৃন্দ বলুন হরি হরি ॥

রামায়ণ গান

বাংলার গ্রামে গ্রামে রামায়ণ গান আজো পালাগান রূপে জনপ্রিয়তার শীর্ষে। পালাগান নীতিশিক্ষার এক অন্যতম বাহন। এ পালা গানের প্রচলন বিশেষ করে হাওড়া, বর্ধমান, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর ও ২৪ পরগনা জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে।

রামায়ণ গান শুনলে পূণ্য অর্জন করা যায়, এ বিশ্বাস আজো গ্রামের মা, ঠাকুমা, বৌ-ঝি-দের মধ্যে বদ্ধমূল হয়ে আছে।

পালা-পার্বণ, অন্নপ্রাশন, শ্রাদ্ধ, বাসর ইত্যাদি নানান সামাজিক অনুষ্ঠানে এ গানের আয়োজন চলে আসছে। আসর বসে সন্ধ্যায় শেষ হয় মধ্যরাত্রে, চলে মাসাধিককাল।

রামায়ণ গানের আদি কাণ্ডে রামের জন্ম থেকে বিবাহ পর্যন্ত নানন ঘটনা পালা বিন্যাসের মাধ্যমে গাওয়া হয়। পালাগান গুলি যথাক্রমে অহল্যা উদ্ধার, রামের হরধনুভঙ্গ , পরশুরামের দর্পচূর্ণ, ও সুন্দর কাণ্ডে হনুমানের সীতা অন্বেষণ, রাবণ বধ পালা ইত্যাদি।

রামায়ণ গানের গায়ক ও সম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁদের খ্যাতি আছে তাঁরা হলেন—বীরভান পুরের প্রহ্লাদ ধর, মঠগদাগ্রামের শ্রীরাম পদ শনগিরি, বিনোদ ধর, চন্দ্রকোনা রোডের গোবর্ধন ঘোষাল প্রমুখ। এ গানের গায়কীতে স্বকীয়তা রয়েছে। উদাহরণ হিসাবে এখানে রাবণবধ পালার অংশ বিশেষ তুলে ধরা হ'ল।

পর্ব ঃ রাবণ বধ

বন্দনাগীত ॥ বন্দে অহং শ্রীগুরু মুক্তপদকমলং।
কীর্তনেরসুরে দোহারবৃন্দ ঃ গায় ॥ রাম এসো হে
জানকীর সনে, একবার এসো হে
দুটি চরণ বন্দিব, একবার এসো হে
ও রাম, জানকীরে লয়ে —
রাম, হৃদি, পদ্মাসনে, একবার এসোহে

মূল্যগায়ক গায় ॥ মন তুমি কার, কে তোমার
(মন শিক্ষারগান) কার জন্যে বা ভাব হে
ঘর দরজা, বালাখানা
বাজী করের বাজীরে ॥

এর সঙ্গে সঙ্গেই এসে পড়ে শ্রীরামচন্দ্রের রূপ বর্ণনা ঃ

ঃ নবঘন নবীন নীরদ নীল নিন্দিত
ও নব ঘন নবীন মেঘ হেরে।
নয়ন চকোর ফিরে নারে
শশীর দর্প হরে।
ওগো, চপলা চারু, কিরণ হেরে,
গগন বিধু লুকায় লাজে
বিধু যায় ভুবন ত্যজে
গগন মাঝে লুকায়ে লাজে ॥

তারপর তুকের অংশ গায় ঃ রামের বাহু কণ্ঠমূলে,
মণিমাণিক্য হার দোলে,
হেলে দুলে হার লুটাতে চায়
রামের চরণ মধু পিব বলে —

এখন রাবণ চলেছেন যুদ্ধে পরিবেশ অনুযায়ী কথা, সুর, ছন্দের ভিন্ন ধরন।

বাজনা বাজিছে গো সমর সাজে
দ্রিমিকি দ্রিমিকি বাজে,
মহাবীর রণে সাজে,
মেদিনী কাঁপিছে গো বাজনার তেজে।

সংলাপ ঃ রাণী মন্দোদরীর ভূমিকায় মূল গায়েন বলেন—"প্রাণনাথ, আপনি এখনো শ্রীরামচন্দ্রকে চিনতে পরেন নি। উনি পূর্ণ ব্রহ্ম,. নারায়ণ অবতার, আর সীতা হলেন স্বয়ং লক্ষ্মী"।

সুরে গান চলে ঃ কহে রাণী মন্দোদরী
হরিলে রামের নারী,
কারো বাক্য না শুনিলে কানে,
বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া হরি, জন্মিলেন জটাধারী
পূর্ণ ব্রহ্ম অযোধ্যার ভুবনে।

রাবণের উক্তি ঃ যার নাম সীতা জনকশ্চ সুতা
যার নাম রাম মধুসূদনঞ্চ
অহং জানামি, তত্রাচ সীতায়ং নং সমর্প য়ামি।

রাবণ রাজা গায় ঃ আমায় কি বোঝাবে গো মন্দোদরী রাণী
আমি জেনে শুনে এনেছি রামঘরণী
সীতা এনে অশোক বনে, রেখেছি পরম যতনে
বংশ উদ্ধারিবার তরে, এনেছি রামঘরণী, হো।

সংলাপ ঃ শ্রীরাম চন্দ্র অকালে দশভূজার পূজা করলেন একশত আটটি পদ্ম দিয়ে। পদ্মও সংগৃহীত হল। পূজা আরম্ভ—

মূল গায়েন গায় ঃ ওমা ভব ভয় হারিণী
কেন বিরূপ গো ভবানী?
কি করিলে হর রমণী
আমি কি তোর পুত্র নই মা
তবে কেন নিদয় শ্যামা
একি উচিত তোর হ'ল তারিণী।

সংলাপ ঃ শ্রীরাম চন্দ্র সুবেল পর্বতে গুহার মধ্যে পদ্মাসনে বসে দুর্গা মন্ত্র জপ করছেন। কাঁদছেন আর বলছেন.

মূল গায়েনের গান ঃ

(১) অনাথ তারিণী জগৎ জননী, ত্রিতাপ হারিণী ত্রিনয়নী তারা।
জয় মা কালীকে নৃমুণ্ড মালিকে গিরিশ বালিকে মহেশ দারা ॥

(২) সত্ত্ব, রজতম, ত্রিগুণ ধারিণী ত্রিপুরেশ্বরী ত্রিজন পালিনী।
দেবী আদ্যাশক্তি ত্রিসন্ধ্যারূপিনী, পতিত পাবনী জগ মন হরা ॥

(৩) সুরা সুর নর গন্ধর্ব কিন্নরে, তোমার মহিমা কে বর্ণিতে পারে।
অনন্ত মহিমা বিশ্বচরাচরে সর্ব শক্তিময়ী সর্বসারাৎ সারা ॥

(৪) সর্ব জীবগণ মুক্তি বিধায়িনী কৃতান্ত দলনী কাল ভয়হারিণী
হীরুর কাল ভয় নাশ গো জননী ওমা মহাকাল হৃদয় বিহরা ॥

দশভূজা আবির্ভূতা হয়ে শ্রীরামচন্দ্রকে বরদান করেন। হনুমান ব্রাহ্মণের বেশ ধরে গণৎকার সেজে রাবণের মৃত্যুবাণ সংগ্রহ করে আনলেন। রাবণ বধ হয়। পরবর্তী পালার শেষে দশাবতারের শ্লোক —

প্রলয়কালে পয়োধি জলে বেদ উদ্ধারিলে
কেশব কংসারি কৃপাময় হরি
নম মীন অবতার।

রামায়ণ গান

পর্ব ঃ জটায়ুর কথা

সংলাপ ঃ লঙ্কাপতি দশানন পঞ্চবটী বনের কুটির হতে সীতাদেবীকে অপহরণ করে নিয়ে গেছে। রামচন্দ্র লক্ষ্মণের সঙ্গে সীতাকে খুঁজছেন। তার কমল নয়নে দরদর ধারে অশ্রু বিগলিত হচ্ছে। প্রত্যেকটি নিঃশ্বাসের সঙ্গে বলছেন — হা সীতা, কেন সীতা, মম হৃদয়গতা, কেন বা কুত্র দৃষ্টা খুঁজতে খুঁজতে গোদাবরী তীরে এসেই জিজ্ঞাসা করছেন —

গান ঃ গোদাবরীর জল তুই জানিস যদি বল
সীতারে কে নিল হরে, করি এমন ছল ॥
তোর তীরেতে কলসী কাঁখে
আসত সীতা জল আনিতে
সেই জলেতে ধুইয়ে দিত
আমার চরণতল ॥
সেই সীতা মোর কৃশলতা বনবাসী দুঃখে রতা
শয়ন ছিল বনের লতা ভোজন বনের ফল ॥

সংলাপ ঃ এইভাবে বনের বৃক্ষ, পশু, পাখী, পর্বত সকলকে জিজ্ঞাসা করছেন। কখনও বা গাছকে জড়িয়ে ধরছেন। কখনও উঠছেন, কখনও বসছেন। ক্রমশ রাত্রি হয়ে গেল। আকাশে চাঁদ উঠেছে। রামচন্দ্র একটি গাছের তলায় বসে ক্লান্ত স্বরে লক্ষ্মণকে বলছেন—

রাম ঃ উঃ লক্ষ্মণ, আজ সূর্য্যদেব কি প্রচণ্ড কিরণ বিকিরণ করছেন। আজ যেন দ্বাদশ মার্তণ্ডের একসঙ্গে উদয় হয়েছে।

লক্ষ্মণ ঃ সে কি দাদা, এখন রাত্রি। আকাশে সূর্য্য কোথায়? ও তো চন্দ্র।

রাম ঃ না রে না। দেখছিস না। কি রকম রৌদ্রের তেজ। সব সময় ঝলমলিয়ে দিচ্ছে।

লক্ষ্মণ ঃ দাদা দেখুন, এ রাত্রিকাল। ঐ দেখুন শিশির পড়ছে। গাছের পাতায় শিশির, আকাশে চাঁদের গায়ে কলঙ্ক। সূর্য্যের তো কলঙ্ক নাই দাদা। কিন্তু ওতে যে কলঙ্ক রয়েছে।

রাম ঃ ওতে কলঙ্ক রয়েছে বলে বলছিস ও চাঁদ। কিন্তু ভাই আজ সূর্য্যেরও কলঙ্ক রয়েছে যে। তার কুলবধূ আজ অপহৃতা।

লক্ষ্মণ ঃ দাদা দেখুন, এ জ্যোৎস্না। ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে, এ রাত্রি।

রাম ঃ কিন্তু ভাই, আমার কি মনে হচ্ছে জানিস, আমার মনে হচ্ছে

কীর্ত্তন ঃ নবতরু কিশলয়মনঙ্গ কৃপাণ।
কাল নিশা মম নিশি শশী ভানু ॥
কুবলয় বিপিন কুন্তল বন সরিয়া।
বারিদ তপন তৈল, জানু বরিয়া ॥

রাম ঃ নতুন পল্লব গুলিকে আমার মনে হচ্ছে অগ্নিশিখা, রাত্রিকালের মত, চন্দ্রকে মনে হচ্ছে সূর্য্য। বাতাসকে সাপের নিঃশ্বাসের মত মনে হচ্ছে শিশিরকে মনে হচ্ছে যেন তপ্ত তৈল বিন্দু।

সংলাপ ঃ এইভাবে ক্রমশ রাত্রি প্রভাত হয়ে এল। প্রাতঃ কালে আরও কিছুদূর অগ্রসর হয়ে ক্লান্ত হয়ে একটি গাছের তলায় রামচন্দ্র উপবেশন করছেন। পিপাসায় কাতর হয়ে লক্ষ্মণকে বলছেন —

রাম ঃ লক্ষ্মণ, একটু জল। বড় পিপাসা, আর পারছিনা, কণ্ঠ শুষ্ক প্রায়। একটু জল দে ভাই।

লক্ষ্মণ ঃ দাদা আমরা গোদাবরী থেকে অনেক দূর চলে এসেছি। আপনি একটু বিশ্রাম করুন। আমি দেখছি কোথায় জল পাওয়া যায়।

সংলাপ ঃ এই বলে লক্ষ্মণ জল আনবার জন্য গমন করলেন কিন্তু জল এখন কোথায় পাওয়া যায়। এদিক ওদিক চাইছেন। চাইতে চাইতে একটি গাছের উপরে কতকগুলি বক বসে থাকতে দেখে ভাবলেন নিশ্চয় ওখানে কোন জলাশয় আছে। তা না হলে ওখানে বক আসবে কেন? একবার গিয়ে দেখি না, এই ভাবে লক্ষ্মণ ঠাকুর সেখানে গিয়ে দেখচেন - একটা ক্ষীণ স্রোত ধারা সেখান দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। দেখেই লক্ষ্মণ সেখানে গাছ থেকে কয়েকটি পাতা পেরে নিয়ে তাই দিয়ে একটা ঠোঙা তৈরী করে সেই জল নিয়ে সামনে যেই অগ্রসর হচ্ছেন —

পয়ার ঃ মৎস্য রাঙা পক্ষী এক বৃক্ষে বসে ছিল। পাখার ঝাপটা দিয়া জল ফেলে দিল ॥

সংলাপ ঃ পাতার ঠোঙাতে করে জল নিয়ে লক্ষ্মণঠাকুর যেই অগ্রসর হয়েছেন অমনি বৃক্ষে একটা মাছরাঙা পাখী বসেছিল, হঠাৎ উড়ে এসে পাখার ঝাপটা দিয়ে জলটা ফেলে দিল। তাই দেখে লক্ষ্মণ ঠাকুর বলছেন —

লক্ষ্মণ ঃ হায়রে বিধাতা যখন বাম হয়, তখন সবাই বাম হয়ে যায়, তানা হলে দাদা আমার পিপাসায় কাতর। তাঁর জন্য কোন রকমে একটু জল সংগ্রহ করে, নিয়ে যাচ্ছি। তাও সামান্য একটা পাখীতে সেটা ফেলে দিল।

সংলাপ ঃ লক্ষ্মণ ঠাকুর আবার জল নিয়ে যেমনি যেতে যাবেন অমনি —

পয়ার ঃ পুনঃ পাখী উড়ে আসি জল ফেলে দিল। তাহা দেখে লক্ষ্মণ ঠাকুর অতি ক্ষুদ্ধ হইল —

সংলাপ ঃ লক্ষ্মণ ঠাকুর অতিশয় ক্রুদ্ধ হয়ে তখন বলছেন - আরে মুর্খ পাখী বার বার নিষেধ সত্ত্বেও তুই জল ফেলে দিচ্ছিস রে তোর কাজের উপযুক্ত প্রতিফল গ্রহণ কর। এই বলে —

পয়ার ঃ অতি ক্রুদ্ধ হয়ে লক্ষ্মণ ধনুক ধরিল।
ধনুকেতে বাণ তখন যোজনা করিল ॥

সংলাপ ঃ যেমন লক্ষ্মণ ধনুকেতে বান যোজনা করেছেন অমনি দেখা গেল -

পয়ার ঃ বৃক্ষ হইতে উড়ি পক্ষী (লক্ষ্মণের) হাতেতে বসিল।
তাহা দেখি লক্ষ্মণ ঠাকুর কহিতে লাগিল ॥

লক্ষ্মণ ঃ পক্ষী তুমি আমার শরণ নিলে। তাহলে তুমি বেঁচে গেলে। আমি তোমাকে ক্ষমা করলাম। কারণ আমি ক্ষত্রিয়। শরণার্থীকে রক্ষা করাই আমার ধর্ম। কিন্তু তোমাকে আমি বন্দী করে রাখব। তা না হলে তুমি সকলের জল ফেলে দিতে পার। দাদার কাছে গিয়ে তার জল পান করা হলে তারপর তোমাকে ছেড়ে দেব। এই বলে সেই ধনুকের গুনের দ্বারা পক্ষীকে বন্দী করে জল নিয়ে লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের নিকট এসে দাঁড়িয়েছেন। রামচন্দ্র তখন বলছেন -

রাম ঃ লক্ষ্মণ - জল এনেছিস ভাই, দে দে পিপাসায় আমার কণ্ঠ শুষ্ক প্রায়।

লক্ষ্মণ ঃ এই যে দাদা জল পান করুন।

সংলাপ ঃ এই বলে কাঁধ থেকে ধনুক খানা নামিয়ে জলপূর্ণ পাতার ঠোঙাটী রামচন্দ্রের হাতে দিয়েছেন। এদিকে লক্ষ্মণের ধনুতে বাঁধা সেই পাখী একটু আলগা পেয়ে

- যেমন ঠোঙাটি রামচন্দ্র মুখের কাছে নিয়ে গেছেন - অমনি।

পয়ার ঃ আলগা পেয়ে পক্ষী তখন উড়িয়া আসিল
রামচন্দ্রের হাত হতে জল ফেলে দিল ॥

সংলাপ ঃ যেমন পক্ষী আবার জল ফেলে দিয়েছে, লক্ষ্মণ ঠাকুর অতি ক্রুদ্ধ হয়ে বলছেন, দাদা আদেশ করুন, আগে এই পক্ষীটিকে বিনাশ করি। প্রভু রামচন্দ্র তখন পক্ষীটিকে হাতে নিয়ে তার অঙ্গে হাত বোলাতে বোলাতে বলছেন হ্যারে পাখী কেন তুই আমার পিপাসার জল ফেলে দিলি।

পাখী ঃ প্রভু আপনার হাতে বসে আপনার স্পর্শ পেয়ে আমি বাকশক্তি পেয়েছি। তাই বলছি - আপনি যে জল পান করতে যাচ্ছেন; ওকি জল? একবার ভাল করে দেখুন দেখি।

রাম ঃ হ্যাঁ হ্যাঁ তাইত হ্যাঁরে লক্ষ্মণ একি জল? রক্তাক্ত আঠালো কীট যুক্ত - এতো জল নয় ভাই।

লক্ষ্মণ ঃ দাদা আপনি পিপাসায় অত্যন্ত কাতর হয়েছেন। তাই আমি তাড়াতাড়ি এই জল সংগ্রহ করে চলে এসেছি — এই ভেবে যে অন্তত চোখে, মুখে দিয়ে একটু স্থির হবেন। তারপর আমি ভাল জল সন্ধান করে নিয়ে আসব, কিন্তু এখন দেখছি ওতো জল নয়।

সংলাপ ঃ পক্ষী তখন বলছে—

পাখী ঃ না, প্রভু এ জল নয়। এ হচ্ছে জটায়ু নামে এক শকুনের মুখ নিঃসৃত লালা। দু একদিন আগে লঙ্কার রাক্ষস রাবণ, সীতা নামে এক এক রমণীকে অপহরণ করে রথে করে শূন্য পথে নিয়ে যাবার সময়ে, সেই রমণীর কাতর কণ্ঠের প্রার্থনায়, তাকে রক্ষা করতে গিয়ে. রাবণ কর্ত্তৃক দগ্ধ অঙ্গ ও ছেদিত পক্ষ হয়ে কেবলমাত্র আপনার অপেক্ষায় মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করছে। আর তারই মুখ দিয়ে অনর্গল এই লালা নির্গত হয়ে এই ক্ষীণ স্রোত ধারার সৃষ্টি করেছে। যেমন পক্ষী এই কথা বলেছে — অমনি রামচন্দ্র বললেন — পাখী, এ তুই কি কথা শুনালি। আমার মৃতদেহে প্রাণ দিলি। আশীর্বাদ করি মুক্ত হয়ে নিত্যধাম প্রাপ্ত হ। লক্ষ্মণ আর আমার পিপাসা নাই ভাই, চল দেখি কোথায় সেই জটায়ু। তার কাছে গেলে আমার সীতার সন্ধান পাব।

কথা ঃ কিছুদুর অগ্রসর হয়েই দেখলেন অদূরে পর্ব্বতাকার একটি গৃধ্র মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করছে আর রাম রাম বলে কাতর স্বরে ডাকছে। রামচন্দ্র তার সামনে যেতেই, জটায়ু দেখতে পায়, একি .... এযে —

কীর্তন ঃ নব দূর্ব্বাদল, সুন্দর শ্যামল মুরতি অনুপম।
জিনি - নবঘন, অঙ্গের বরণ, জগজন অভিরাম ॥

আফর ঃ রাম কি এলে হে - আমার নিকটে তবে - বল বল বল প্রভু ॥

রাম ঃ হ্যাঁ পক্ষীরাজ আমিই দশরথ পুত্র রাম। কিন্তু তোমার এরকম দুর্দশা কেন?

জটায়ু ঃ শোন রাম এই সেদিন রাবণ যখন সীতামাকে চুরি করে নিয়ে যায় তখন মা বলতে বলতে যাচ্ছিলেন, আমি রামচন্দ্রের পত্নী। দশরথের পুত্রবধূ, যদি কোন বীর থাক, আমাকে রক্ষা কর। আমার নাম সীতা, এই কথা শুনে আমি বললাম

- ভয় নাই মা, আমি তোমাকে রক্ষা করছি। তারপর আরম্ভ করলাম রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ, পক্ষীর সম্বল পাখা, ঠোঁট আর নখ। কিন্তু সশস্ত্র রাবণ অগ্নিবাণের দ্বারা আমার সর্বাঙ্গ দগ্ধ করেছিল। তারপর তীক্ষ্ণ ধার অস্ত্রের আঘাতে আমার পাখা দুটিকে ছেদন করে দিল। আমি ভূতলে পড়ে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। তখনই আমার মৃত্যু হত। কিন্তু সীতা মায়ের আশীর্বাদে তোমাকে সংবাদ প্রদান করার জন্য কোন রকমে বেঁচে আছি। কারণ মা বলে গিয়েছিলেন

কীর্ত্তন ঃ খুঁজিতে খুঁজিতে মোর প্রাণনাথ আসিবেক এই বনে।
আমার বারতা শোন পক্ষীরাজ দানিবি তাঁহার চরণে ॥

আখর ঃ মরণ হবে না - ততদিন তোর মরণ হবে না - যতদিন প্রভু না এসে ছোঁয় ॥

জটায়ু ঃ শোন - এখান থেকে এই বন পার হয়ে ক্রৌঞ্চারণ্য। তারপর পম্পা সরোবর। সেখান থেকে স্বাযামুখ পর্বত। সেখানে সুগ্রীব, হনুমান নল নীল এবং জাম্বমান এই পাঁচ জন বানর আছে। সেই সুগ্রীবের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করে, হনুমানকে বশীভুত করবে। তাদের সাহায্যে তোমার সীতাকে উদ্ধার করবে। আমি আর বলতে পারছিনা। আমার কণ্ঠ রোধ হয়ে আসছে। এস তুমি আমার সামনে দাঁড়াও। তোমাকে দেখতে দেখতে এই পক্ষীদেহ পরিত্যাগ করি।

সংলাপ ঃ জটায়ু তখন রামকে দেখতে দেখতে রাম নাম করতে করতে প্রাণত্যাগ করল।

পাঁচালী গান

পাঁচালী শব্দটি কেবল বঙ্গদেশেই প্রচলিত। ঘটনা বহুল কোন আখ্যান মূলক বর্ণনা, দেবদেবীর মাহাত্ম্য কথা ছন্দোবদ্ধ ভাবে পাঠ পদ্ধতিকেই পাঁচালী বলে। অর্থাৎ পাঁচালীগানে ঘটনার বর্ণনাই হল মুখ্য। পাঁচালী পাঠ কথকতার আঙ্গিকে আর পাঁচালীগান সুরারোপিত করে গাওয়ার-দু ভাবেই রীতি আছে। এই পাঁচালীগানের উদ্ভব মধ্যযুগে। আদিযুগের পুরাণ কাহিনীর বিভিন্ন অপভ্রংশ মধ্যযুগে বঙ্গদেশে পাঁচালী নামে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যের সঙ্গে পাঁচালীর একটা সুপষ্ট সম্পর্ক আছে।

লৌকিক পাঁচালীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল মনসার পাঁচালী, সত্যনারায়ণের পাঁচালী, মানিক পীরের পাঁচালী ধর্মঠাকুরের পাঁচালী, লক্ষ্মীর পাঁচালী। শনি ঠাকুরের পাঁচালী ও রামায়ণের পাঁচালী। এ ছাড়া অনেক রচয়িতা নিজ নিজ কল্পনার ভিত্তিতে গান রচনা করেছেন সেগুলিও পাঁচালীর পর্য্যায়ভুক্ত। যেমন দাশরথি রায়ের পাঁচালী, গোবিন্দ ওঝার পাঁচালী, নীলকণ্ঠের পাঁচালী ইত্যাদি।

এমন কয়েকটি পাঁচালী রচনা থেকে কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত করা হচ্ছে -

প্রথমে 'সত্য নারায়ণের পাঁচালীর' কিছু অংশ -

তুমি সত্যনারায়ণে যে পুজিবে
হৃদে সিন্ধু সুতা অচিরেতে পাবে
বিপদ ঘোর মধ্যে ভাবিলে তোমাকে
পরিপূর্ণ বাঞ্ছা পাবে সর্ব্বলোকে। ইত্যাদি।

পরবর্তী পাঁচালী মানিক পীরের। অগ্রাহায়ণমাসে মুসলমান ফকিরদের মুখে মানিক পীরের গান শোনা যায়। গো-মড়কের সময়ও এ পাঁচালী শোনা যায়। এটি হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের কাছেই গ্রহণ যোগ্য।

কণ্ঠে ফটিকের মালা হাতে চামর, মাথায়টুপি পরে, ফকির সাহেব গান -

আমার দুক্কের ছাওয়াল পীর
বার বছরের কালে হইয়াছে ফকির।
খাশা হাতে খড়ম পায়ে মুখে পুর দাড়ি
ধীরে ধীরে চললেন মানিক কানু ঘোষের বাড়ী ॥

সত্যপীরের পাঁচালী

আজি মুশকিল আশান কর দয়াল সত্যপীর
ওমা সকালে উঠিয়া পীর করিল গো মন
গোয়ালের ঘরে গিয়া দিল দরশন।
কানু ঘোষের ঝি বলে গো নন্দ ঘোষের ঝি
এলোরে দয়াল ফকির দান দেব কি।
গাই নাই গোত্র নাই বাছুর গেছে পালে
দুধ যে দোয়ার ঠাকুর আমিও সকালে।
হিন্দুকুলে নারায়ণ গো মমীন কুলে পীর
দুই কুলে সিন্নি খাবে বাবা সত্যপীর। স্বঃ লি—১৪

লক্ষীর পাঁচালী

প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় গৃহস্থ বধূর কণ্ঠে শোনা যায় গরীব ব্রাহ্মণ কেমন করে লক্ষ্মীর কৃপায় ধন দৌলত পেলেন এবং গরীব থেকে বিত্তশালী ধনী হয়ে উঠলেন। লক্ষ্মীর পাঁচালী গানের মধ্যে তার আভাস পাওয়া যায়।

(১)

প্রতি পরিবারে লোক আছে যতজন
সকলের আহারান্তে করিবে ভোজন।
পরিজন সেবা যেই করে নিজহাতে
আনন্দিত হই আমি বড়ই তাহাতে।
তুলসী তলায় দীপ সন্ধ্যাকালে দিবে
দীপ দিতে প্রতিঘরে কভু না ভুলিবে।
সন্ধ্যায় রহিবে রত দেব আরাধনে
পূজিবে দেবতা সবে ভক্তিপূর্ণ মনে।
যেই নারী পূজে নিত্য দেবের চরণ
সদা বাঁধা থাকি আমি তাহার ভবন।
রজনীতে নিজ হাতে করিয়া বন্দন

আগে সব পরিজনে করাবে ভোজন।
ভোজন করিয়া পরে করিবে শয়ন।
সেবিবে তখন সতী স্বামীর চরণ।
প্রত্যহ স্বামীর সেবা করে যেই নারী
সদা তুষ্ট থাকি আমি তাহার উপরি।
গৃহ মাঝে ধুপধুনা দিবে সন্ধ্যাকালে
গৃহে যেন নিষ্ঠীবন কভু নাহি ফেলে।
সতী সাধ্বী নারী যত স্বরূপ আমার
তাহাই মুরতি মোর জেনো এই সার ॥

রামায়ণের পাঁচালী

রামের হরধনু ভঙ্গের কাহিনী বর্ণিত এই পাঁচালী গানে।
অগুনতি লোকের শোভা ভারত ব্যাপী খ্যাতি
সভায় আছেরে দেখ মালা হাতে নন্দিনী।
কিবা শোভা অপরূপ বর্ণিবারে নাহি পারি
মা কমলা আসিয়াছেন সীতারূপ ধরি।
বীরবর রামচন্দ্র স্মরিয়া শ্রীহরি
মুহূর্ত মধ্যে দেখ তুলিল ধনুকী।
দেখিয়া সভার লোক বিস্ময় মানিলা
বিস্ফারিত নেত্রে চাহে জনকের বালা।
করজোড়ে মালা হস্তে ডাকিছেন নারায়ণে
এতদিনে ভগবান দরশন দিলে।
অভাগী সীতার কথা মনে যদি পড়ে
আমার প্রার্থনায় যেন প্রভু পরীক্ষায় উৎড়ে।
জয়জয় বলি রামে ধনুকে জোড়ে তীর
মড়্মড়্ শব্দ করি ভাঙ্গিল ধনুক খান
পড়ে যেন মহাবীর
এই রূপে সভাজন হরষিত মন
সীতার যোগ্য পাত্র পাইল তখন ॥

শনির পাঁচালী

সুমঙ্গল একজন গরীব ব্রাহ্মণ। শনিঠাকুর তার প্রতি সদয় হন তাকে ও সে দেশের রাজাকে দর্শন দেন। তারপর থেকে মর্ত্যলোকে শনিপূজার প্রচলন হয়।

বন্দি দেব গণপতি বিঘ্ন বিনাশন।
আদি দেব আগে পূজে যে চরণ ॥
ও পদ ভজি হয় অশেষ সম্পদ।
ভজমন গজানন নাহবে বিপদ ॥

ভ্রমর পঙ্কজ মধু লোভে ধায়।
কি আশ্চর্য্য পদাম্বুজ ওহে গণরায় ॥
বিমল কমল নিন্দি রাঙ্গা পদতল।
অকলঙ্ক অর্ধশালী নভেতে উজ্জ্বল ॥
খর্বস্থূল কলেবর মুষিক বাহন।
আজানু লম্বিত কর মাতঙ্গ বদন ॥
তনুর তুলনা দিতে সাধ্য রাখে কেবা।
জানি শতশত ভানু শ্রীঅঙ্গের আভা ॥

দাশরথি রায়ের পাঁচালী

আর কি সময়, নাহি রসময়, বাজাতে মোহন বাঁশি।
তোমারে হেরিতে, কাননে আসিতে, নিরন্তর অভিলাষী ॥
সদা গুরুজন নিকটেতে রই, বাঁশি শুনে প্রাণে ব্যাকুলিত হই।
কত আর বল যাতনা সই, প্রতিবাদী প্রতিবাসী ॥
কে বলে সরল বাঁশরী তোমারি, তবে কেন নেয় প্রাণমন হরি।
ছাড়না ছলনা কপট শ্রহরি, শ্রীমতি তোমার দাসী ॥
না জানি বাঁশি কিবাগুণ ধরে, বারেক বাজায়ে মন প্রাণ হরে।
না দেয় আমারে থাকিতে যে ঘরে, করিলে সদা উদাসী ॥ স্বঃ লি—১৪ (ক)

দাশরথী রায়ের পাঁচালী

জটিলা কুটিলা

কৃষ্ণের যাত্রা শুনি মথুরায় আহ্লাদে প্রফুল্ল কায়
কুটিলে গিয়ে জটিলারে কয়।
বলে গোকুলে হৈল কিসের গোল শুনিস নাই সুমঙ্গল
নন্দের বেটা গোকুল ছাড়া হয় ॥
কংস রাজার এসে দূত লয়ে যায় নন্দসুত
যজ্ঞছলে করিবে দর্পচুর।
ভালই হল ঘুচিল দায় ষাড়ের শত্রু বাঘে খায়
বৃন্দাবনের বালাই হইল দূর ॥
হেসে হেসে কুটিলে কয় এমন আহ্লাদ হবার নয়
আজি কি আহ্লাদের দিন মরি।
একি আহ্লাদ বল মা ফুটে আহ্লাদে গা শিউরে উঠে
আহ্লাদের ভাবেতে হইলাম ভারি ॥
কোথা থেকে আহ্লাদ জুটিল আহ্লাদে পেট ফেটে উঠিল
আহ্লাদ যে ধ'রে না আর ঘরে।
ঘিরেছে আহ্লাদ গাটাময় এত আহ্লাদ ভাল নয়
সামলাতে না পারলে পরে আহ্লাদে লোক মরে ॥

জটিলে বলে মরি মরি আয় মা একবার কোলে করি
ফিরে বল কি কথা শুনালি।
খুব খুব খুব হয়েছে চারি যুগ যে ধর্ম আছে।
কালুটে আমার কুলে দিয়েছে কালি।

দাশুরায়ের পাঁচালী গান

পালা "শ্রীরামচন্দ্রের দেশাগমন"

গীত ১নং

একবার অবিলম্বে ওরে শত্রুঘ্ন।
কর ভাইরে অন্তঃপুরে গমন,
রাখরে পাপিনী মাকে করিয়া বন্ধন
শংকা মনে আছে আবার এসে রামের কাছে
পাছে বলে রামরে তুই যারে বন"

ও মা নয় পাপিনী সাপিনীর আকার
মায়া নাই মার আমার
সেই তো মনে দিয়ে কালি বনে দিল বনমালী,
সেই অবধি আঁধার হলো
অযোধ্যাভবন ॥

গীত ২নং

পালা- শ্রীরাধিকার "কলংকভঞ্জন"

এক সতী বসতী করে এই ব্রজমণ্ডলে,
চিনতে নারে তারে গোকুলে ডাকে সকলে রাধাবলে ॥
গতি বিহ্নিজনের গতি দুর্গতি বিনাশিনী
গোবিন্দ প্রিয়ে-গুণময়ী-গোলোকবাসিনী
সে ধনী গোপের কান্তা (আছে) গোপনে গোকুলে ॥
ভেবে আয়ান গোপ কান্তা
হয়ে ভ্রান্তা তার ননদিনী
হরিপরিবাদিনী রব রটালে কুটিলে।
শিরে পশরা লয়ে মথুরা হাটেতে যায় শতত,
সে হাট করনীর হাটে জগজ্জনের গতায়াত,
যার ধর্ম্ম, অর্থ কাম মোক্ষ পদ পদতলে ॥

"ভারত চন্দ্রের মৃত্যুকাল হইতে গুপ্তকবির মৃত্যুকাল পর্যন্ত শত বৎসর কালকে বাঙলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে রাত্রিকাল বলিয়া অভিহিত করা যায়, যদিও ইহার দ্বিতীয়ার্ধে ইংরাজী শিক্ষাপ্রবর্তনের উৎসাহ, বাংলা গদ্য প্রচেষ্টা, সাময়িক পত্রিকা প্রকাশ প্রভৃতির দ্বারা উদয় দিগ্বলয়ে নূতন দিনের পূর্বাভাস ফুটিয়া উঠিয়াছিল। (দাশরথি ও তাঁহার পাঁচালী ডঃ হরিপদ

চক্রবর্ত্তী ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকা সম্বলিত প্রথম অধ্যায় পৃ ঃ ২)

এই শত বৎসরের রাত্রির স্তিমিতালোকের মধ্যে ছোট বড় বিভিন্ন নক্ষত্র পুঞ্জের ক্ষীণ জ্যোতি লইয়া বাঙ্গালা জন সাহিত্য গগনে যাহারা ভীড় জমাইয়া ছিল, বর্তমান দিনের প্রখরালোকে তাহারা অদৃশ্য হইয়া গেলেও সে রাত্রিতে তাহাদের দাম ও দান কম ছিল না। কবি, তর্জা, কীর্তন, ঢপ, পাঁচালী, যাত্রা, খেউড়, আখড়াই, হাফ আখড়াই, ঝুমুর, টপ্পা প্রভৃতির বিপুল ও বিচিত্র আয়োজনে সমসাময়িক বাঙ্গালী জনসমাজের মনের ক্ষুধা ও রসের তৃষ্ণা পরিপূর্ণভাবেই হয়ত মিটেছিল। তারপর নূতন আশা-আকাঙ্খা ও জীবনভঙ্গী লইয়া যখন নবযুগের আবির্ভাব হইল, তখন সূর্য্যোদয়ে নক্ষত্র পুঞ্জের মত অকস্মাৎ তাহারা যেন দিগন্তে মিলাইয়া গেল।" (ঐ- পৃ ঃ ৩/৪)

পাঁচালী

নূতন পদ্ধতির পাঁচালী (কবি, টপ্পা, আখড়াই)

ভারত চন্দ্রের মৃত্যুকাল থেকে গুপ্তকবির মৃত্যুকাল এই সময় নিধুবাবু ও শ্রীধর কথক, রামবসু, হরু ঠাকুর, দাশরথি রায়ের পাঁচালীর কাল।

"বাঙ্গলা সাহিত্যের আলোচ্য শত বৎসর পরিমিত যুগান্তর কালটিকে কেহ কেহ 'গানের যুগ' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাঙ্গলা সাহিত্য সুর সংযোগেই গীত হইত, অর্থাৎ আসরে বসিয়া যন্ত্র তন্ত্রাদি সহযোগেই মঙ্গলকাব্যাদি গান করা হইত। তবু কবি 'গানের যুগ' বলিয়া একটি বিশেষ কালকে চিহ্নিত করা হইল কেন তাহা চিন্তনীয়। একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যায় যে মঙ্গলকাব্য, প্রাচীন পদ্ধতির পাঁচালী প্রভৃতির মধ্যে গীত থাকিলেও কবি, টপ্পা, আখড়াই, নূতন পদ্ধতির পাঁচালী প্রভৃতির মধ্যেগানের যতখানি গুরুত্ব ও প্রাধান্য আছে, উহাতে ততখানি ছিল না। টপ্পা ও আখড়াই প্রভৃতি একেবারেই গীত সর্বস্বছিল, আবৃত্তির বা ছড়া কাটিবার স্থান বা সুযোগ তাহাদের মধ্যে ছিল না। কবি, নূতন পদ্ধতির পাঁচালী প্রভৃতির মধ্যেও গানের গুরুত্ব ও প্রাধান্য বহুল পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছিল এবং রসিক শ্রোতার কাছে উহাদের মূল্য ও শ্রেষ্ঠত্ব বিচারে গানের একটি বিশেষ স্থান ছিল। অধিকন্তু এই সময়কার শ্রেষ্ঠ জনকবিগণ সঙ্গীতকার হিসাবেই বাঙ্গলা সাহিত্যে স্বতন্ত্রভাবে নাম করিয়াছিলেন। নিধুবাবুর ও শ্রীধর কথকের আদিরসাত্মক সঙ্গীত, রামবসু, হরুঠাকুর প্রভৃতির কবির গান, দাশরিথ রায়ের পাঁচালী এই সময়েই রচিত হয়। এই সময়েই বাঙ্গলাদেশে কবিগানের প্রবল প্রার্দুভাব হইয়াছিল। কবির লড়াই ও প্রতিযোগিতামূলক রীতি অন্যান্য শাখার মধ্যেও যথাসম্ভব সংযোজন করিবার ব্যবস্থা এবং আগ্রহ-ও এই সময় হইতেই পরিলক্ষিত হইতে থাকে। মুখ্যতঃ এই দিকেই নজর রাখিয়াই কেহ কেহ ইহাঁকে 'কবিওয়ালাদের যুগ"বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।" (ঐ পৃ ঃ ৫/৬)

"মোটামুটিভাবে ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দকে ধরাযায় ইহার মধ্যবিন্দু। ইহার পূর্বার্ধে অর্থাৎ ১৮০০ খ্রীঃ পর্যন্ত বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রাচীনধারা নূতন সৃষ্টির অভাবে দৃষ্টিপাতহীন প্রদেশের অগভীর জলাশয়ের মত শুষ্কপ্রায় হইয়া উঠিয়াছিল। মুক্তারাম নাগকৃত দুর্গাপুর (১৭৭) প্রমুখ কয়েকখানি মঙ্গলকাব্য প্রয়াস, কাশীশ্বরকৃত ব্রহ্মোত্তর খণ্ড (১৭৯৫) জাতীয় কিছু অনুবাদ

প্রচেষ্টা এবং সাকের মামুদ, গরীবুল্লা, সৈয়দ হামজা প্রমুখ মুখ্যতঃ মুসলমান সাহিত্যিকদের আখ্যায়িকা কাব্যাদি রচনা ছাড়া আরি বিশেষ কিছুই ....অর্ধশতাব্দীর সংগ্রামে আত্মরক্ষার জন্য ইংরাজী প্রভাব বর্জিত শাখার কবি প্রমুখ দলগুলি নিজেদের কাটিয়া ছাঁটিয়া, প্রযোজনানুযায়ী সংযোগ সমম্বয় করিয়া কতভাবে যে জনচিত্ত অধিকার করিতে, বাঁচিয়া থাকিতে চেষ্টা করিয়াছে তাহার ইতিহাস অতিবিচিত্র ও কৌতুকপ্রদ।" (ঐ- পৃঃ ৯)

— মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কার, গদ্য সাহিত্যের প্রয়াস ও প্রসার, সাময়িক পত্রিকা ও সংবাদ পত্রের উদ্ভব এবং পড়িবার অভ্যাস বৃদ্ধি, ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে রুচির পরিবর্তন, থিয়েটারের উৎপত্তি প্রভৃতি যাবতীয় অবস্থা ও পরিবেশই প্রাচীন শাখার সংরক্ষণের প্রতিকূলতা করিয়া ছিল। ইংরাজী প্রভাব বর্জিত শাখার নেতৃত্ব ছিল কবিওয়ালাদের হাতে। কাজেই নেতৃত্ব গৌরবের দিক হইতে এই সংগ্রামকালকে সাধারণভাবে কবিওয়ালাদের বহুরূপে আত্মরক্ষা মূলক যুদ্ধপর্ব বলিয়াও আখ্যাত করা যায়।" (ঐ- পৃঃ ৯/১০)

কবিওয়ালাদের শ্রেণীভেদ
লোকগীতি বিষয়ক

ইংরাজী প্রভাব বর্জিত শাখাতে প্রশাখার সংখ্যা অনেক। দাঁড়াকবি, তর্জা, পাঁচালী, ঢপ, যাত্রা, কীর্তন, ঝুমুর, বোলান, সারি, জারি, মালসী, খেউড়, টপ্পা, আখড়াই, হাফআখড়াই, বাউল, ভাটিয়ালী, কথকতা, গম্ভীরা, আলকাপ. দেহতত্ব, গাজীরগান, লেটোগীত নলেগীত. ভাটেলগীত, পৌষপার্বণ গীত, হাটগীত, রয়ানী, ভাসান, মানিকপীরের গীত, ছড়া প্রভৃতি সবগুলিই এই শাখার অন্তর্গত।

(সর্ব প্রকার লোক সঙ্গীত বিযয়কে কবিগানের অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে। কারণ এগুলি ছিল ইংরাজী শিক্ষার প্রভাব বর্জিত।) (ঐ- পৃঃ ১০)

— "বলা বাহুল্য সে বিবয় বস্তু, ঢঙ, সুর ও গায়কীর রীতি ইত্যাদির বিচারে এই গুলি এক জাতির ও সমমানের নহে।" (ঐ- পৃঃ ১০)

— "সুর ও গীতের প্রাধান্যের দিক হইতে এই শাখাকে মুখ্যতঃ দুইভাবে বিভক্ত করা যায়। কতকগুলিকে বলা যায় গীতি প্রধান, আর কতকগুলিকে আখ্যায়িকা প্রধান। গীতি প্রধান ধারা কীর্তনাদির মত নানা বিশিষ্ট সুরের খাতে প্রবাহিত হইয়াছে। সুর ও গীতের প্রাধান্যের দিক হইতে এই শাখাকে মুখ্যতঃ দুইভাগে ভাগ করা যায়। কতকগুলিকে নতুন পদ্ধতির পাঁচালীতে গীত ও আবৃত্তি ছাড়াও কতকগুলি ছড়ার প্রাধান্য ছিল (পৃঃ ৫৯) —এই ছড়াগুলির মধ্যে ছিল কবির তর্জার সুস্পষ্ট ঝোঁক। দাশরথির পাঁচালীতে এই জাতীয় প্রচুর ছড়া পাওয়া যায়। দাশরথির পূর্বেকার কোন নূতন পদ্ধতির পাঁচালীর নিদর্শন পাওয়া যায় নাই।

পক্ষান্তরে এই সময়ে প্রাচীন খাতের এই প্রবীণ ধারা অস্ফুষ্ট কলতানকে ছাপাইয়া উঠিয়াছিল বর্ষণ বিপুল শ্রাবণের অবিশ্রান্ত কোলাহলের মত কবিওয়ালাদের গান।" (ঐ- পৃঃ ৬/৭—

— "মধ্যযুগীয় কাব্যধারার কোন প্রতিভাবান কবির উদ্ভবের অনুকূল অবস্থা রহিল না। রাজনৈতিক এবং তদনুযায়ী সমাজ নৈতিক ক্ষমতার শাসনরজ্জু হস্তান্তরিত হইবার সঙ্গে

সঙ্গে যে নতুন ভাগ্যান্বেষীর দল সমাজের পুরোভাবে আসিয়া দাঁড়াইলেন — অদর্শে, জীবনভঙ্গীতে, আশা-আকাঙ্খায়, সমাজ চেতনায় এক কথায় জীবনের মূল্য বোধে দৃঢ়তা ও সংযমের অবক্ষয় তাঁহারা খানিকটা নূতন আবেগ ও প্রতিশ্রুতি বহন করিয়া আনিলেন। বুনিয়াদী শ্রেণীর পৃষ্টপোষকতা গভীর ও পুরাতন কাব্যধারা অপেক্ষা হালকা, সহজবোধ্য, গীতবহুল ও সাধারণের কণ্ঠস্ফূর্ত নূতন সাহিত্যধারার প্রতি তাঁহারা স্বাভাবিক ভাবেই সমধিক আকৃষ্ট হইলেন।" (ঐ- পৃঃ ৭)

— "কিন্তু এই সময়ের প্রথমদিকে কবি প্রমুখ জনসাহিত্য ধারাগুলি নূতন জমিদার শ্রেণীর নিকট হইতে যে বিশেষ উৎসাহ ও পৃষ্ঠ পোষণ পাইয়াছে, তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায়না। জন সাধারণের আগ্রহে ও আনুকূল্যে ইহারা নিজের বেগেই প্রথমার্ধে স্থান করিয়া লইয়াছিল। কাশিমবাজার, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া হইতে গঙ্গার ধারা অনুসরণ করিয়া হুগলী, চুঁচুড়া হইয়া অন্যান্য বিষয়ের সহিত সাহিত্যের আসরও জমিয়া উঠিল ইংরাজের নূতন সৃষ্ট রাজধানী কলিকাতা নগরীতে।" (ঐ- পৃঃ ৭)

"কবি সঙ্গীতের ঢোল ও কাঁসির প্রচণ্ড হট্টগোলের নীচে সমসাময়িক প্রাচীনপন্থী কাব্যের মন্দিরা ও নূপুরধ্বনি চাপা পড়িয়া গিয়াছিল।" (ঐ- পৃঃ ৮)

"উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে আনুপাতিক হিসাবে মঙ্গলকাব্য রচনা, পুরাণাদি অনুবাদ প্রচেষ্টা, গাথা, কাহিনী, আখ্যায়িকা প্রভৃতির সংখ্যা অধিকতর। একটা মজার কথা এই যে শ্রীরামপুর মিশন প্রকাশিত গদ্য বাইবেল তেমন সমাদৃত না হওয়ায় মিশন প্রাচীন পাঁচালী ভঙ্গির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। 'খ্রীষ্টবিবরণামৃত।' এবং 'নিস্তাররত্নাকর' নামে প্রাচীন ছাঁচে দুইখানি পদ্য পাঁচালী মিশন হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল।" (ঐ- পৃঃ ৯)

[প্রাচীন পাঁচালী রীতি গ্রহণ করা হয়েছিল খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের জন্য। এক্ষেত্রে দেখা যায় এদেশে লৌকিক ধর্ম প্রচারের ক্ষেত্রে যেমন পাঁচালী রচনা হয়েছিল সেই রীতিই মিশনারীরা গ্রহণ করেছিল। গীতি প্রধান ধারা কীর্তনাদির মত নানা বিশিষ্ট সুরের খাতে প্রবাহিত হইয়াছে এবং অনেকগুলি বর্তমানকাল পর্যন্ত উত্তীর্ণ হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে প্রেরণা বা উৎস কে নহে। ইহা কোথাও হইতেছে বাউল, মালসী, সঙ্কীণার্থে কীর্তন, দেহতত্ত্বাদির মত নির্দিষ্ট ধর্মীয় মতবাদ বা সাধনার ক্রম; কোথাও বা সারি, ভাটিয়ালী প্রভৃতির মত বিশেষ স্থানের বা বিশেষ শ্রেণীর নিজস্ব ভাবধারা ও ঐতিহ্যানুবর্তী প্রকাশ।" (ঐ- পৃঃ ১০/১১)

বিভিন্ন পারিপার্শ্বিকের চাপে ও নানা জনপ্রিয় সঙ্গীতের পরোক্ষ প্রভাব ও প্রত্যক্ষ সংমিশ্রণে পাঁচালীর রূপ ক্রমশঃ যে পরিবর্তিত হয়েছিল তা অনুমান করা চলে।

কবি গান

কবিগান বাংলার একান্তই নিজস্ব সম্পদ। যান্ত্রিক যুগে সাধারণ মানুষের কাছে এ গানের কদর অনেক বেশী। কবি গানের প্রতি বাঙালীর একটা স্বাভাবিক মমতা আছে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। পূর্ববঙ্গে একটা প্রবাদই আছে ঃ

"শোনলে পরে কবির কথা
ঠেইল্যা ফেলায় গায়ের কাঁথা।"

শ্রদ্ধেয় পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে, 'বাঙালীর বিশিষ্টতার মধ্যে কবিগান অন্যতম।' এই কবিয়ালরা গ্রাম বাংলার সাধারণ মানুষ। এরা মুখে মুখেই গান রচনার প্রতিভা

ধরে এবং আসরের পরিবেশ অনুযায়ী তাৎক্ষণিক গান রচনা করে শ্রোতাদের মুগ্ধ করার ক্ষমতা রাখে।

অনন্য পালাগানের মত কবি গানের তেমন সুনির্দিষ্ট নিয়মে বাঁধা কোন পালাগান নেই। যে কোন বিষয়ই এ গানের বিষয়বস্তু হতে পারে যেমন, ধর্ম, দর্শন, পুরাণ, সামাজিক, অর্থনৈতিক রাজনৈতিক বিষয় ইত্যাদি। অশ্লীল ও ব্যক্তিগত কুৎসাও কবিগানের ভাষা থেকে রেহাই পায় না। কবিগানের আসর বসে সাধারণতঃ গ্রাম বাংলার বারোয়ারী পুজো মণ্ডপে বা ঐরকম কোন সর্বজনীন অনুষ্ঠানে। আসরে দুই দলে কবিরা থাকেন। প্রশ্ন তুললে অন্যদলকে তার প্রত্যুত্তর দিতেই হয়—না দিতে পারলে তাকে পরাজয় বরণ করতে হয়। বিজয়ী দল আসরে সম্মানিত হন—উদ্যোক্তা বা শ্রোতার পক্ষ থেকে তাকে টাকা অথবা পদক দিয়ে পুরস্কৃত করাও হয়। এক পক্ষ হার না মানা পর্যন্ত চলে কবির লড়াই। আসর চলার নির্দিষ্ট সময়ে সেই আসরের পরিসমাপ্তি ঘটে দুই দলের মিলনের মধ্যেই। এই প্রচেষ্ট শ্রোতা বা উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকেই হয় শেষ মিলন। ঢোল ও কাঁসি কবিগানের সহায়ক বাদ্যযন্ত্র। সঙ্গে থাকে দোহার বৃন্দ। কবি দলের মূল গায়ককে পূর্ববঙ্গের কোন কোন অঞ্চলে "সরকার" বলে।

এক সময় পশ্চিমবঙ্গই ছিল কবিগানের মূলকেন্দ্র। উনবিংশ শতাব্দীতে এখানেই জন্মগ্রহণ করেন, রাম বসু, ঠাকুর, এন্টনি সাহেব, লালু, নন্দলাল গোপাল উড়ে, ভোলা ময়রা প্রভৃতি কবিয়াল। সেই কবিগানের চলে পশ্চিমবঙ্গে বেশ ভাটা পড়েছে, কিন্তু পূর্ববঙ্গে এই ধারা সগৌরবে বহাল রয়েছে। একালের কবিয়ালদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মুশিদাবাদের শেখ গুমানি দেওয়ান, বীরভূমের লম্বোদয় চক্রবর্তী, এবং পূর্ববাংলার রামু মালি, কুন্দ দত্ত, শরৎ বৈরাগী, রমেশ শীল, নকুলেশ্বর সরকার, নারায়ণি বালা প্রভৃতি।

এক পক্ষ প্রশ্নতুলে যদি কোন গাছকে বলে "কলাগাছ", অপর পক্ষ জোর করেই বলবে "তালগাছ"। এই থেকেই শুরু হয় আসরসভা বন্দনা। গানের মধ্য দিয়ে ঃ—

বন্দে মাতা সুরধনী পুরাণে মহিমা শুনি
তুমি মাগো অগতির গতি।
তুমি মা বাজাও বীণা হয়ে তুমি পদ্মাসীনা
চোরেরে সাধু করি দেও তাকে শুভমতি ॥
কালিদাস ভবভূতি অবনী উপরে আছে নাম
অবনী উপরে আছে নাম
তোমার প্রসাদ পেয়ে আনন্দে কবি গেয়ে
রাজেন যেন যায় দিব্য ধাম ॥

পুরুষ কবিয়াল যেমন আছেন। মেয়ে কবিওয়ালীও তেমন আছেন তবে মেয়ে দলের সংখ্যা কম। এরা পুরুষ কবিয়ালের মতনই অনুসঙ্গী নিয়ে দল ঘোরেন। কবিত্ব শাক্তিতে এরা পুরুষের চাইতে নিকৃষ্ট তো ননই, বরং উচ্চস্তরের বলা চলে। এখানে পুরুষ কবিয়ালের মধ্যে প্রশ্ন ও উত্তরের একটা নিদর্শন উদ্ধৃত করা হল ঃ—

প্রশ্নকর্তা ঃ—

শুনেন সব ভদ্র জন
বিচার করতে বইছেন যখন
(ও) ব্যাটা বইল্যা কইছে মোরে

পিতার আসন নেই
শাস্ত্রে আছে, পঞ্চমাতা, সপ্ত পিতা
তার মধ্যে উনি হইলেন শিক্ষাদাতা
সেই সুবাদে শিক্ষা পিতা
জিজ্ঞাসি এখন

(ঐ) বাতাস যখন পুরান বয়
ধান কি তখন বাইরে রয়
যখন যেমন, তখন তেমন
বইলাছেন জ্ঞানী জন।
নারী প্রগতির যুগ চইল্যাছে
নারী জাগরণ
কবিরা সব লেইখ্যা দিচ্ছেন,

কবিগান—২

নারী হইল বসুমাতা
আদ্যা শক্তি জ্ঞান দাতা
চিরদিন আগে রয় শুনহ এখন।
লোহার বেড়ি পড়াইয়া পায়
বন্দী রাখ লোহার খাঁচায়
কবি বইলাছেন,
সচল হইয়াও অচল তাম্মরা
বস্তার চাইতে ভারী
মানুষ দ্যাশের এই নারী।

দত্তমশাই জবাব দেন ঃ-

এত কথা বোঝার মতন
বুদ্ধি তোমার নাই
কবির কথায় একটি প্রশ্ন
কইর‍্যা যামু ভাই।
কও দেহি ভাই আশী টাকার খাসীভাল?
জলে পইড়্যা মইল,
বিরাশীডা শাকুনে খাইল
কতটুকু কইর‍্যা পাইল?

চক্রবর্তী মশাই পাল্টা প্রশ্ন করেন ঃ-

যাক্ যাক্ যাক্ ভাই
আর অধিক কথার দরকার নাই
কবির সুরে দত্তের পো-র
উত্তর দিয়া যাই।

(ঐ) আকাশে রবি জ্বলে শীশে
বলি তোমার যে প্রশ্ন যোগাইছে
তার জিহ্বা জম্মাইল কিসে?

বিজয়লক্ষ্মী দত্তের গলায় বরমাল্য পরালো দত্ত মশাই-এর দোহার বৃন্দ ঢোল কাঁসি বাঁশী সব যন্ত্রাসহ গেয়ে উঠল ঃ-

কথার জবাব দিলানা বন্ধু।
জবাব দিল না।
হইয়া গিয়া কাবু হইলা
কবি জান না।

দত্তমশাই এবার তর্কের মীমাংসা করলেন ঃ-

শোন, শোন, শোন ভাইরে
শোন কবির কথা
কবির নামে দিব্যি লাগে
না শোনে যে মোর কথা।
কবির নিয়ম জানে না ভাই
কবি গাইতে আইছে

(দোয়ার বৃন্দ) ঃ কবির নিয়ম জানেনা ভাই
কবি গাইতে আইছে
আহা কবি গাইতে আইছে—
জল নাই, স্থল নাই নাই ত্রিভুবন
তার মধ্যে আছে দেখ অনন্ত শয়ান।
অনন্ত শয়নে আছেন দেব নারায়ণ
যাহার সৃষ্টিতে চলে এ বিশ্ব ভুবন।
প্রকৃতি, মানুষ আদি কীট, পতঙ্গ
ভূমণ্ডল মাঝে আছে আরও যতজন
দৃষ্টি মাত্র সৃষ্টি যার চক্ষের নিমিষে
আমার প্রশ্নে জিহ্বা জন্মাইল শেযে।
আর কত কথা ভাই বলিব তোমায়
গুরুজীর নামে তোমায় প্রণাম জানাই।
এসো মাগো ত্রিনয়নী, কৈলাস বাসিনী
অধমেরে দয়া কর, তুমি মা বিপদ তারিণী।

কবিগান বাঙলার নিজস্ব সম্পদ। এ গানের গায়কী অঙ্গে আছে চারটি 'তুক' যেমন— (১) প্রথম স্তবক চিতান (২) দ্বিতীয় স্তবক অন্তরা (৩) তৃতীয় স্তবক পরচিতান (৪) শেষ স্তবক ধূঁয়া। গানের সুরে আছে ভাটিয়ালী বা ঝিঝিটি রাগের মিশ্রণ।

গানের কথা সরকার আগে বলে সুর করে গায়। পরে দলের লোকেরা গায়। আর একটি কবিগান উদ্ধৃত করা হল।

চিতান অংশ ঃ সুখ ভার্যাতে ভার্যা সনে—
সুপালঙ্কে ছিলেন গৌরাঙ্গ।
হায় হায়, না হইতে নিশি ভোর
না হইতে শশী ঘোর
সোনার গৌরাঙ্গ করলেন, নদের লীলা সাঙ্গ।

ধুঁয়া অংশ ঃ উষা বল-বল তুমি কি দেখেছ বল
আমার প্রাণ নাথ—
আজ কেন এমন দেখি
নাচিছে দক্ষিণ আঁখি,
আমার হৃদয় পিঞ্জিরের পাখি
বুঝি গেছে উড়ে,
শিরে বজ্রাঘাত—
দুঃখের কথা বলব কারে।

অন্তরা অংশ ঃ প্রতিদিন কোকিল করে কুহু কুহু
আজ কেন প্রভাতে করে উহু উহু
মুহুর্মুহু শোনা যায়।
সেই ভ্রমরের গুণ গুণ কৃষ্ণ গুণাগুণ
আগুন আগুন বলে আগুন দিচ্ছে গায় ॥

পরচিতান অংশ ঃ গত জন্মেতে করেছিলাম পাপ
পতিত পাবন পতি বলে
আমি গঙ্গাজলে দিব ঝাঁপ ॥

সপ্তদশ শতকের শেষ ভাগে কবিগানের উদ্ভব হয়েছিল। প্রথম কবি গোজলা গুঁই এবং তার রেশ চলে উনবিংশ শতকের প্রথম পাদ পর্যন্ত। কবিগানের চারটি অঙ্গ প্রচলিত ছিল। প্রথমে গাওয়া হ'ত দেবী বিষয়ক গীত, পরে সখীসংবাদ, তারপর বিরহ শেষে খেউড় লহর। এগুলিকে ছন্দোবদ্ধ করা হয়েছিল, নির্দিষ্ট করে বোঝার জন্যেই চিতেন, পরচিতেন, ফুকা, মেলতা, মহরা ইত্যাদি ছন্দক্রমে। চিতেন অংশ সবার আগেই গাওয়া হ'ত।

কবিগানের কয়েকটি নিদর্শন দেওয়া হইল ঃ-

মহড়া ঃ ওগো, তারা গো মা
এবার দুর্গমাতে রক্ষা কর দক্ষ নন্দিনী।
আমি এসেছিলেম ভবের হাটে,
চল্লেম ভূতের বেগার খেটে, মরি সংকটে,
আমার সঞ্চিত বিষয় বারাভূতে খেলে সব লুটে।
পঞ্চভূতের ভাঙ্গবে এঘর, নাভিপদ্মে দিয়ে দুকর,
হৃদিপদ্মে দেখি যেন ঐ চরণ দুখানি ॥

খাদ অনন্তরূপিনী ও মা অন্তর্যামিনী।

ফুঁকা এবার ভবের আশা মিথ্যা হলো ওগো তারা মা
আমি দারাপুত্রের মায়ার বশে, ডুবেছিলাম বিষয় বিষে

উপায় কি আজ করি, পাপে অঙ্গ হল ভারি,
হাল ছেড়েছে মন কাণ্ডারী, তরঙ্গে আতঙ্কে মরি,
বল মা কিসে তারি।

মেলতা মা তোমা বই দীনের পক্ষে অন্য গতি কই
আমায় কালভয়েতে অভয় দিয়ে রাখ ত্রিগুণ ধারিনী।

১ চিতেন মা অনাদ্যে ভবের কর্ণধার।
ভক্তি ভাবে যেজন তোমায় শিবে মা,
সে জীবে করগো উদ্ধার ॥

ফুঁকা কিসে মুক্তি পাব ওগো তারা মা।
আমি এসে এবার ভবের কূলে, ডাকি দুর্গা দুর্গা বলে,
তবে দুর্গা এ কপালে কৈ গো দয়া হলো ॥

অন্তরা ব্রহ্ম সনাতনী তুমি ভয়হারিনী বেদে শুনি।
শ্রীমন্ত মশানে মরে তুমি রক্ষা করেছিলে তারে
ব্রাহ্মণীর বেশ ধরে।
তোমায় চিনবে কেবা অচিন্তেময়ী চিন্তামনির শিরোমণি

২ চিতেন মা প্রসন্ন অন্নপূর্ণা হলে কাশীতে
শক্তিরূপা মুক্তিরূপা, বহুরূপা মা কত রূপ ধর জগতে ॥

ফুঁকা সবাই জানে তুমি জগতমাতা ওগো তারা মা,
তুমি গঙ্গারূপে মহীতলে সাগর বংশ উদ্ধারিলে
তোমার অপার লীলে ॥
আবার সীতা উদ্ধারিতে, অভয় দিলে অকালেতে
লংকাপুরে রঘুনাথে আপনি সদয় হলে ॥

মেলতা এই অধমে দয়াময়ী করগো নিস্তার।
তাই রঘু বলে নিদেন কালে দিও মা পদতরণী ॥

[রঘুনাথ দাস]

২। সখীসংবাদ ঃ

মহড়া এ কি অকস্মাৎ ব্রজে বজ্রাঘাত
কে রথ আনিল গোকুলে।
রথ হেরিয়ে ভাসি অকুলে।
অক্রুর সহিতে কৃষ্ণ কেন রথে
বুঝি মথুরাতে চলিলে,
রাধায় চরণে ত্যজিলে
রাধানাথ কি দোষ রাধার পাইলে ॥

খাদ শ্যাম ভেবে দেখ মনে, তোমারি কারণে,

ব্রজাঙ্গনাগণে উদাসী
নাহি অন্য ভাব, শুনহে মাধব
তোমার প্রেমের প্রয়াসী ॥

১ চিতেন নিশাভাগ নিশি, যথা বাজে বাঁশী, আসি গোপী সকলে।

পাড়ন দিয়ে বিসর্জন কুলশীলে।

ফুঁকা এতেই হোলেম দোষে কি হে ত্যজিলে ॥

অন্তরা শ্যাম যাও মধুপুরী, নিষেধ না করি
থাক হরি যথা মুখ পাও।
একবার হাস্য বদনে বংকিম নয়নে
ব্রজগোপীর পানে ফিরে চাও ॥

২ চিতেন জনমের মত শ্রীচরণ দুখানি হেরি হে নয়নে শ্রীহরি।
পাড়ন আর হেরিব আশা না করি ॥
ফুঁকা হৃদয়ের ধন তুমি গোপিকার
মেলতা হৃদে বজ্র হানি চলিলে ॥

[হরু ঠাকুর]

৩। বিরহ ঃ

মহড়া এ বসন্তে সখি পঞ্চ আমার কাল হল জগতে।
করে পঞ্চ দুখে দাহ, পঞ্চভূত দেহ পঞ্চত্ব বুঝি পাই পঞ্চবাণেতে
পঞ্চ যাতনা প্রায় নিশি পঞ্চ প্রহরেতে।
যদি পঞ্চামৃত করি পান,-নাহি জুড়ায় প্রাণ, হৃদে বেঁধে পঞ্চবাণ
দেখ পঞ্চানন তুন ভস্ম করেছিলেন যার
এখন সেই দহে দেহ পঞ্চ শরেতে

চিতেন পঞ্চাক্ষর নাম মকরধ্বজ বধব্য বিরহী রাজ্যে রাজন।
সহ সহচর পঞ্চশর রিপু হল ভ্রমর কোকিলাদি পঞ্চজন ॥
ভ্রমর কোকিলাদি পঞ্চস্বর, রাজা পঞ্চস্বর অঙ্গে হানে পঞ্চশর
তাহে ঊনপঞ্চাশত মলয় মারুত সই
আবার ভানু দহে তনু পঞ্চ যোগেতে ॥

অন্তরা সই গ্রন্থ প্রকাশিলে পঞ্চম মঙ্গল ফুলঘ্রাণ যেন পঞ্চবাণ ॥
পঞ্চদশ দিনে হ্রাসবৃদ্ধি যার, তার কিরণেতে দহে প্রাণ ॥
চিতেন পঞ্চম দ্বিগুণ বদন যার রাক্ষসের যে প্রধান
তার চিতা-সম জ্বলিছে সখি পঞ্চম দুখেতে প্রাণ ॥
যদি দ্বিপঞ্চ দিকেতে চাই, পঞ্চরিপু পাই, পঞ্চ সহকারী নাই
কেবল পঞ্চম সাধ্যে পঞ্চ রিপুমধ্যে
আমি থাকি যেন সখি পঞ্চ তপেতে ॥

অন্তরা সই পঞ্চপাণ্ডবেরা খাণ্ডবকানন জ্বালায়ে ছিল যেমন
তেমনি এ দেহ জ্বালাচ্ছে সখি বসন্তের চর পঞ্চজন ॥
পঞ্চম দ্বিগুণ দ্বিগুণ করে করিতে চাহি ভক্ষণ
তাহে প্রতিবাদী হয়গো আমি, প্রতিবাসী পঞ্চজন।
বলে পঞ্চরিপু গেছে, প্রাণে সয়েছে, এ পঞ্চ কদিন আছে।
কিন্তু এ পঞ্চ যাতনা প্রাণে আর সহে না
সই, এবার পঞ্চ মিশায় বুঝি পঞ্চ ভাগেতে ॥

[রাম বসু]

৪। লহর ঃ

আমি মগধপতি জরাসন্ধ বটি হে কংসের শ্বশুর।
ওহে কংসের ভাগ্নে কৃষ্ণ, তুমি নাতি আমার, সম্বন্ধ মধুর ॥
তোমার সঙ্গী দুটি পরিপাটি নামে ভীমার্জুন,
কৃষ্ণ, ভাল করে আজ আমারে দাও উহাদের পরিচয়।
উহার কোনটি তোমার পিসতুতো ভাই, কোনটি ভগ্নীপতি হয়?
ভদ্রঘরের মেয়ে বটে, সুভদ্রার বুদ্ধি ভাল নয়,
ওহে ভাইকে পতি করতে গেলে তোমার মত কে আর হয়?

কবিগানের গঠন শৈলীর বিভিন্ন পর্যায়ক্রম ঃ কিরূপ অন্তর্নিহিত ব্যাখা প্রকাশ করে তা নিম্নে দেখান হলো

(১) **মহড়া/মাহড়া ঃ** মহড়া অর্থে যুদ্ধাদিতে সম্মুখে অবস্থান করে যে যোদ্ধা যুদ্ধ শুরু করেন। অর্থাৎ যে কবিয়াল সামনে বা প্রথমে কবিগান বা কবির লড়াই শুরু করেন বা চাপান দেন বা প্রশ্নবাণ নিক্ষেপ করেন।

(২) **চিতেন ঃ** কবিগানে মহড়ার পরের অংশ, যা উচ্চকণ্ঠে গাওয়া হয়।

(৩) **পরচিতেন** কবিগানের তৃতীয় স্তর, যা চিতেনের পরবর্তী পর্যায়।

(৪) **ফুকা ঃ** কবিগানে কবিওয়ালা মহড়ার পর থেকে ক্রমশঃ উচ্চৈঃস্বরে চিতেন, পরচিতেন থেকে ফুকা পর্যায়ে বা পর্বে এসে কবিগানের টেম্পো তোলেন, চাপান বা উতোর-এ।

(৫) **মেলতা ঃ** এই পর্যায়ে কবিগানের একপক্ষের সঙ্গে প্রতিপক্ষের প্রশ্ন ও উত্তরের মিলন ঘটে বা বলা যায় মিলনের একটা ক্ষণ তৈরি হয়।

(৬) **খাদ ঃ** এই পর্যায়ে কবিওয়ালা অন্যপক্ষ বা প্রতিপক্ষকে চাপান বা উতোরের সুযোগ করে দেয় এবং স্বাভাবিক কারণেই মহড়ার পর ক্রমশঃ উচ্চকিত স্বরক্ষেপণ তার-সপ্তক থেকে খাদে বা মন্দ্র-সপ্তকে নেমে আসে।

অ্যান্টনী ও যজ্ঞেশ্বরীর কবির লাড়াই

কবিগান ঃ

জয়া যোগেন্দ্র-জায়া, মহামায়া, অসীম মহিমা তোমার
একবার দুর্গা, দুর্গা দুর্গা বলে যে ডাকে তোমায় —-
—তাকে তুমি কর, ভবসিন্ধু পার, ভবসিন্ধু পার, ভবসিন্ধু পার॥

অ্যান্টনী ঃ শুক ব'লে শারী রে তোর রাধার খবর বল।
ছল করে সে কখন ঘাটে আনতে যাবে জল রে, আনতে যাবে জল ॥

যজ্ঞেশ্বরী ঃ শারী বলে, ওরে শুক প্রশ্ন বটে তোর।
যার লাগি 'রাই' চুরি করে সেই সে বলে চোর রে, সেই সে বলে চোর ॥

অ্যান্টনী ঃ এই জানি ওরে তোর 'রাধা' যে দিন কে করে রাত।
(আবার) চোরের ওপর গোঁসা করে, মাটিতে খায় ভাত লো মাটিতে খায় ভাত॥

যজ্ঞেশ্বরী ঃ নিলাজ, নিঠুর কৃষ্ণ নাগর চালক চতুর খুব
আমার 'রাই'- কে ক'রে কলঙ্কিনী, রস-সাগরে ডুব দেয় রস সাগরেডুব ॥

অ্যান্টনী ঃ এই খবরদার 'শ্যাম' কে আমার দিস্‌নে রে দোষ খালি
মনে রাখিস, এক-হাতেতে বাজে নাকো তালি, ওলো বাজেনাকো তালি ॥

যজ্ঞেশ্বরী ঃ জেনে রাখিস কেষ্ট যে তোর ভীমরুলেরই হুল
(আমার) 'রাই'-কমলের মধু খেয়ে ভাঙলো 'রাই'-এর কুল, রে ভাঙলো 'রাই'-এর কুল ॥

অ্যান্টনী ঃ আরে একথাতো সবাই জানে হয়লো মধু ফুলে, কেন হয়লো মধু ফুলে
তোর 'রাই' ঘোমটা দিয়ে নাচ্‌বে খ্যাম্‌টা জাতও যাবে ছুঁলে আবার জাতও যাবে ছুঁলে

যজ্ঞেশ্বরী ঃ সবাই জানে কেমন রে তোর 'শ্যামের' ভালোবাসা
পিরীতি নয় পদ্মপাতায় ও যে ব্যাঙের-বাসা, ওলো ওযে ব্যাঙের-বাসা ॥

অ্যান্টনী ঃ বর্ষাকালে, ব্যাঙ ডাকিলেই 'রাধার' পোয়া বারো
চলতে পথে নূপুর-ধ্বনি যায়না কানে কারো, ওরে যায়না কানে কারো ॥

যজ্ঞেশ্বরী ঃ শারী বলে প্রেমের কথা তুলিসরে তুই যদি
মনে রাখিস্ পুরুষেরই প্রেম যে মজা নদী, ওরে প্রেম যে মজা নদী ॥

অ্যান্টনী ঃ শুক বলে মজা-নদীর ওইতো মজা হায়
হেথায় ঝাঁপ দিয়েও তো তোর 'রাধিকা'র জীবন বেঁচে যায়, হেথায় জীবন বেঁচে যায়।

যজ্ঞেশ্বরী ঃ জেনে রাখো সর্ব্বজনে আমায় দোষ দিও না শেষে।
এই ফিরিঙ্গিটা বেজায় ট্যাটা আমায় জ্ঞান দিচ্ছে এসে ॥

অ্যান্টনী ঃ আরে অন্য কথা বলিস ক্যানে আসল কথা ছেড়ে
যজ্ঞেশ্বরী, ডুবলো তরী, মরলি যে তুই হেরে—রে মরলি রে তুই হেরে ॥

অ্যান্টনী ও ভোলাময়রার কবির লড়াই

তখনকার দিনে ভোলাময়রা ও অ্যান্টনী ফিরিঙ্গীর মধ্যে কবিগানের লড়াই দেশজুড়ে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল। কোন আসরে এঁরা দু'জনে আসছেন সংবাদ পেলে দূরবর্তী স্থান থেকে লোকজন ছুটে আসতো। নিচে ভোলাময়রা ও অ্যান্টনী কবিয়ালের লড়াই-এর অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করলাম ঃ-

অ্যান্টনী ঃ যে শক্তি হতে উৎপত্তি সেই শক্তি পত্নী কি কারণ
কহ দেখি ভোলানাথ এর বিশেষ বিবরণ ॥
জান নাকি শিব! আমি তোমার শিবানী
তোমায় গর্ভে ধরে আমি, এখন হ'লেম তোমার রমণী ॥
সমুদ্র মন্থন কালে বিষপান করেছিলে,
তখন ডেকে ছিলে দুর্গা বলে, রক্ষাকর আপনি।
চলেছিলে বিষপানে, বাঁচালেম স্তন্য পানে,
সেই দিন কি ভুলে আমায় বলেছিলে জননী?

অ্যান্টনীর চাপানের উত্তর এড়িয়ে ভোলা ময়রা বল্‌লেন ঃ
ওরে, আমি সে ভোলানাথ নই, রে
আমি সে ভোলানাথ নই,
আমি ময়রা ভোলা, হরুর চেলা
বাগবাজারে রই।
ভোলার চরণ সবাই পূজি
আমার চরণ পূজে কই?

অ্যন্টনী ঃ ভজন পূজন জানি না মা
জেতেতে ফিরিঙ্গ।
যদি দয়া করে কৃপা কর
হে শিবে মাতঙ্গী ॥

ভোলা ময়রার উত্তরে ঃ
তুই জাত ফিরিঙ্গী জবরজঙ্গী
আমি পারব নাক তরাতে।
তোকে পারব নাক তরাতে।
শোনরে ভ্রষ্ট বলি স্পষ্ট
তুইরে নষ্ট, মহাদুষ্ট
তোর কি ইষ্ট কালী কেষ্ট
ভজগে যা তুই যিশুখৃষ্ট
শ্রীরামপুরের গির্জাতে ॥

অ্যান্টনীর পাল্টা উত্তর ঃ

সত্য বটে আমি জাতিতে ফিরিঙ্গী
ঐহিক লোক ভিন্ন ভিন্ন
অন্তিমে সব একাঙ্গী ॥ **স্বঃ লি—১৫**
নিজধর্মত্যাগ করে হিন্দুভাবাপন্ন
হওয়ার জন্যে ভোলাময়রা
অ্যান্টনীকে ভর্ৎসনা করে।
তারই উত্তরে অ্যান্টনী গাইলেন ঃ
খৃষ্টে আর কৃষ্টে কিছু প্রভেদ নাইরে ভাই
শুধু নামের ফেরে মানুষ ফেরে এও কোথা শুনি নাই।
আমার খোদা যেই, হিন্দুর হরি সেই
ঐ দেখ শ্যাম দাঁড়িয়ে রয়েছে।
আমার মানব জনম সফল হবে
যদি রাঙা চরণ পাই ॥

মুর্শিদাবাদ জেলার কবিগানের ইতিবৃত্ত

মুর্শিদাবাদ জেলার নওদা থানার বহরমপুর মহকুমার অধীন আলামপুর নামক একটি গ্রাম যার ডাকঘর শব্দরনগর। এই গ্রামে আজ অন্ততঃ পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসের সাত তারিখ থেকে এগার তারিখ পর্যন্ত্য অম্বুবাচি উপলক্ষে গ্রাম্য সংস্কৃতির ভাব ধারার উপর দাঁড়িয়ে একটি মেলার আয়োজন করা হয়। মেলাটি সরকার বাহাদুর অনুমোদিত মেলা। মুর্শিদাবাদ জেলার কয়েকটি মেলার মধ্যে এটিও একটি স্বীকৃত মেলা।

বাংলার লোক সংস্কৃতির কবিগান, গ্রাম্য মানুষদের একটি প্রিয় গান। কারণ এই কবিগানের মাধ্যমেই গ্রামের নিরক্ষর মানুষেরা ধর্মশাস্ত্রের অনেক বিষয় এবং নানান ধরনের চরিত্রের গুণাবলীর সঙ্গে পরিচিত হন।

এই মেলাটির প্রতিষ্ঠা এই কবিগানকে কেন্দ্র করেই। তখনকার গ্রামের মানুষ হয়ত এই ভাবে জ্ঞান আহরণের জন্য প্রতি বছর আষাঢ় মাসের অম্বুবাচির অবসর সময়টিকে বেছে নিতেন কবিগানের লড়াই শোনার জন্য। তাই অম্বুবাচিতে মন্দিরে লক্ষ্মীনারায়ণ প্রতিষ্ঠা করে শুরু হ'ল কবিগানের আসর। এবং আজ পর্যন্ত সেই পুরাতন ঐতিহ্য বহন করে চলেছে গ্রামের সমাজ শিক্ষা কেন্দ্রের সভ্যগণ। বাংলার বিশিষ্ট চারণ কবিদের প্রায় সকলেই এই আসরে এসেছেন। এবং বিশিষ্ট চারণ কবি মুর্শিদাবাদের দেবেন্দ্র নাথ চৌধুরি মহাশয় মৃত্যুর আগে পর্যন্ত দীর্ঘ চল্লিশ বছর এই আসরে গান করেছেন। তাঁর সঙ্গে বাংলার বিশিষ্ট কবিয়ালগণ পাল্লা ধরেছেন। যথা লম্বোদর, গুমানি, দেবেন ডোম, কিশোরী রায়, কিশোরী কোঁড়া, চাঁদ মহম্মদ, কমলা কান্ত ঘোষ ইত্যাদি।

এই কবিগান মূলত দু'জনের কবিতার লড়াই। দু'জন পাল্লাদার দুটি চরিত্রকে অবলম্বন করে তাদের পালা গান। চরিত্রগুলো বেশীর ভাগ আমাদের ধর্মশাস্ত্র থেকে নেওয়া। এইগান চরিত্রকে অনুসরণ করে বাক বিতণ্ডার লড়াই। উপস্থিত বুদ্ধির দ্বারা তর্ক বির্তকের মাধ্যমে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া এবং তাৎক্ষণিক অবস্থা অনুযায়ী গানের ছন্দ করে তাল সহযোগে পরিবেশন করা।

কবিগান কি ধরনের হয় তার সামান্য কিছু অংশ তুলেধরা হল।

ঢাকের রেলা ঃ

একবার হরি কথা আলাপন
ওগো হরি বল মন।
(দোয়ারকিরা একসঙ্গে ধরে)

হরি নাম ছাড়া এ জগতে আর কোন জিনিসই নাই ; হরি নামই সত্য আর বাকি মিথ্যা তাই কবি বলেছেন ঃ

ও হরি নামই যে সত্য রে
মন জপ নিত্য
মানব চিত্ত বলে হরিরে।

হরি কথা আলাপন ....(দোয়ারকি)
হরি নাম আরাধনা কলিযুগের সাধনা
বাজে কথার মান বাঁচাইতে মাতাল সেজ না।
বাজে কথায়.......সেজনা (দোয়ারকি)

হরি নামের মাতাল হয় যে জনা
ও তার হরি কুলে হয় গমন।
হরি কথা আলাপন.....(দোয়ারকি)
ও আছেন দেব দেবী যত
হরির নামে অনুগত
ওগো হরিনাম বিনা পবিত্র হয় না
যাগযজ্ঞ যত।

আজ আমাদের এই ভারতভূমে যত সমস্ত দেবদেবী আছে বা আছেন কালী পূজায় বলুন দুর্গা পূজায় বলুন সরস্বতী পূজায় বলুন না এর মধ্যে হরি নাম ছাড়া কোন দেব দেবীর পূজা হচ্ছে না। কেন? সর্বপ্রথমে পূজা মণ্ডপে পুরোহিত মশাই পূজায় বসছেন এবং মন্ত্র বলছেন ঃ

নমঃ বিষ্ণু নমঃ বিষ্ণু নমঃ বিষ্ণু
নমঃ পবিত্র অপবিত্র বা সর্বাবস্থান গত হরি
বা যৎ স্মরি নিত্যং পুণ্ডরী কাক্ষং
সর্বোত্তম করঃ সূচী
নমঃ মাধবঃ নমঃ মাধবঃ (নমঃ মাধবঃ)
সর্ব কার্যে সু-সাধব
নম শ্রীহরি।

এর পরে সমস্ত পূজা অর্চনা করার পর শেষে বলছে ঃ

এতৎ কর্মফলাং শ্রীকৃষ্ণায় সমর্পয়েষু ॥

তাহলে প্রথমে হরি পূজা এবং পূজার অন্তেও সেই হরি পূজা ছাড়া পৃথিবীতে আর কোন পূজা নেই। তাই কবি বলেছেন ঃ

ও আছেন দেব-দেবী যত
হরি নামে অনুগত
হরিনাম বিনা পবিত্র হয়না
যাগযজ্ঞ যত ॥ (দোয়ারকি)

এ নামে ষড়রিপু জানি হয় বশীভূত
আর রবি সুত হয় গমন।
হরি কথা আলাপন....(দোয়ারকি)

তাই, ও যার জন্ম যে কুলে
জন্ম-মৃত্যুরও কালে
শুভযাত্রা হইবে রে ভাই
এই হরি বোলে (দোয়ারকি)
ও তাই পঞ্চউপপদ দলে ওগো হরি বলা প্রয়োজন।
হরি বলা আলাপন..... (দোয়ারকি)

সে শমনে নাই-রে বাঙালি
উচ্চধনের কাঙালি
সেথায়, ঘুষ দিয়ে দোষ কাটিয়ে নেবে
যাবে ধন খালি। (দোয়ার কি)

পেয়ে পরশমণি সেদিন দিলেন ফেলি
নামটি বাদ্‌শা রুধির সনাতন।
হরি কথা আলাপন......(দোয়ার কি)
ও তাই আমার দ্বারা হ'ল না
হায় হায় মরি মরি আমার দ্বারা হ'ল না।
আমার দ্বারা কি হল না গো?
এমন মধু মাখা নাম ভজনা
আমার দ্বারা হ'ল না।
আমার মানব জনম বৃথায় গেল
আমার দ্বারা হ'ল না ॥

ঢাকের বোল ঃ

তার তা ধীনা তা ধীনা তাক্ তাক্
ধী ধী না তা খেনে তা খেনে তাক্ তাক্
তাক্ তা থেয়া তা - খেড়ে খেড়ে
তাক্ তা থৈয়া তা তা থৈয়া

থৈ তা তা কেটে তাক্ তাক্
কেটে তিনা কেটে তিনা কেটে তিনা কেটে তিনা
খেড়ে খেনা ধা - খেড়ে খেনা ধা
খেড়ে খেনা ধা - তাক্ তা তা কেটে
তে তেটে তাকেড়ে তেটেতে
ধা ধীন্ না কেটে তা তেরে কেটে
তে টেতে ধা ধীন না কেটে ধা
তা খিন না কেটে ধা - তাখিন্....

আমার মানব জনম বৃথায় গেল
আমার দ্বারা হ'ল না
আমার ভজন পথে দিল বাধা
আমার দ্বারা হ'ল না
(একবার হরি বলুন সকলে)
যাক্ এবার আমাদের কবিগান
ওগো, বাংলা মায়ের রাখিতে মান
আমাদের সেই কবি গান।
এই যে মোদের কবির গান
এ গান আদি হইতে বর্তমান
আমারা গেয়ে থাকি বাঙালি
আমরা বাংলা মায়ের বাংলা ভাষায়
— হইয়া কাঙালি
এই যে কবি বাউল কীর্তন
এটা বাংলা মায়ের নিজস্ব ধন
বাংলা মায়ের নিজস্ব সংস্কৃতি
সেই বাংলা মায়ের মান বাড়াইতে
আর সমাজ কে সম্মান দিতে
করে থাকি বাংলা মায়ের সেই আরতি
তাই এই যে মোদের কবি গানে
আমরা প্রধানত দুটি জনে
গেয়ে থাকি সেই কবির গান
তাই কবিগান গাইবার তরে
দুই জন দু'টি নাম ধরে
আমরা আসরেতে দাঁড়াইব এখন।
তাই কবি গান (দোয়ার কি)
ওরে, সুধী সমাজের রাখিতে মান
কবি গান.........(দোয়ার কি)
তবে এই কবিগান গাইতে গেলে

জানেন আপনারা ছয়টি অস্ত্র হয় গো
করতে হয় খাড়া।
সেই ছয়টি অস্ত্র কিনা দিব পরিচয়
এক এক ক'রে আপনাদের চরণেতে
জানাইব নিশ্চয়।

ভাব চাই ভাষা চাই বাক্ চাই বিতণ্ডা চাই
আর চাই মোদের জল্পনা
তাহার মধ্যে প্রধান যেটা কলির কল্পনা
এই ছয় প্রকার অস্ত্র ভাবুন মনে
কিন্তু একটাও আমার নাইকো পুজি
বলবো না বা কেনে,

তবে আপনারা বলিবেন কুল কেমনে রায়
এক এক করে দশের কাছে প্রমাণ দিয়ে যাই,
আমার পিতার তুল্য আছেন যাঁরা
ওগো মহাশয়,
পুত্র জ্ঞানে কিঞ্চিৎ আর্শীবাদ করিবেন নিশ্চয়।
আমার মায়ের তুল্য আছেন যারা ওগো মহামায়া,
আজ পুত্র জ্ঞানে কিঞ্চিৎ করিবেন দয়া।
জ্যেষ্ঠদাদার তুল্য আর কনিষ্ঠ ভাই,
এই ভায়ের প্রতি কিঞ্চিৎ আর্শীবাদ চাই ॥

তবে, কিছু কিছু বলিব (দোয়ার কি)
আমারা বিষয়ের ভাব তুলিব
কিছু কিছু (দোয়ার কি)
তাই শাস্ত্রের মাঝে নামে ধরিতে
মোদের এখন চাই গো (দোয়ার কি)

কারণ, স্বনামেতে চ'লে না কবি
জানে তা সবাই গো (দোয়ার কি)
কিছু সাজা সাজি করিতে হবে'
ওরে সাজার মাঝারে হইবে মজা
সাজা সাজি (দোয়ার কি)
তাই সাজিলাম সাজিলাম
আমরা কবিগান গাইবার তরে
সাজিলাম (দোয়ার কি)

মিলন গীতি ঃ

প্রথম জন (হরি সাধন দাস) ঃ
তাই, যাও ফিরে যাও চিকন কালা
আজ আর কুঞ্জের দ্বারে এসনা (দোয়ারকি)
দ্বিতীয়জন (গঙ্গাধর হাজরা) ঃ

আমি প্রণাম করি বিঘ্ননাশ, ওগো, মোর বিঘ্ননাশ, আসরে এস প্রভু নিবঞ্জন পরমাধ্য করিতে যখন রক্ষা কর বাক্য সমরে। ইন্ধনের বাখাম বর বিশ হাজার বাঘামবর আরম্ভর আমি কেবল মাত্র, গণপতি যদুকর অজ্ঞান তিমির হর ওরে মোর গৌরী পুত্র। নমামি কালী- কে কপাল মালিকে শিরে নিবদ্ধ ধারিনী শিবে শব পড়া অতি ভয়ঙ্করা মাগো তুমি অশুভ সিদ্ধি সরোবরে, যিনি নীলোৎপল বিকশিত নীল শশী প্রদাক্ষিণ করে, তব মঞ্জির মুখর অতি খরতর উরতি তোর কদলি নিতম্ব সুঠাম যখন অনুপম থাকে শুধু চতুর্বলী। ওমা চারি চরা করে বরাভয় হ'য়ে, অরকা তারকা জ্বালো, বিগলিত কেশি ঘোরতর বেশি চর্চিতা মল্লিকা মালো। যত মুনিগণ করিছে স্তবন নমাতৎ হয়ে সকলে, ঘরাই চর্চিত চরণ অর্চিত চন্দন শ্রীফল দলে। আজ করি কৃপা দান হও মা অধিষ্ঠান শুন নিজ লীলা গীত, শ্রী কবি রতন করে নিবেদন গুরু নিমাই এ হও মা সুকৃত ॥

ওহে ভগবান দয়াময় হে
আমি ভবে এসে ভুলেছি তোমারে (দোয়ারকি)

—হে ভগবান? হে বিশ্বপতি? হে জনার্দ্দন? আমি এই ভবের মাঝে এসে আজ আমি তোমাকে হারিয়ে ফেলেছি, তোমাকে ভুলেছি, একদিন তোমাকে দেখেছি, একদিন তোমাকে পেয়েছি।

তবে একদিন, তোমায় দেখেছিলাম হে
মায়ের গর্ভ কারাগারে
ওহে ভগবান........(দোয়ারকি)
আজ আমি কোথায় ছিলাম, আর এসিছি কোথায়, আবার কোথায় যাব!
আমি কোথায় ছিলাম
কোথায় এলাম
মাতৃদুগ্ধ সুধা পেলাম
তোমার সনে হারাইলাম হে
ও আমি তোমার সনে হারাইলাম হে (দোয়ারকি)
তোমা সনে হারাইলাম হে
এসে মায়ার(ই) সংসারে
ওহে ভগবান......(দোয়ারকি)

আজ মায়ার সংসারে মাতৃ দুগ্ধ সুধা পান করে আমি আজ তোমাকে ভুলেছি, দিনে দিনে দিন যত আপপত হচ্ছে আমার যখন কৈশোর কেটে গেল, এইবার কৈশোরের সময় হল কি না

যৌবন এল বাল্য গেল।
হায় যৌবনে যুবতীর চিন্তায়
মরছি যে জ্বলন্ত চিতায় হে
আমি মরছি.......(দোয়ারকি)
ও কীট পতঙ্গ আকারে
ও ভগবান......(দোয়ারকি)
তাই কবি বলেছেন কি?
জ্ঞান কিশোরীর বিনয় বাণী
যতই আছে মাধবীনি
করুণ একবার উলুধ্বনি গো
এসে আসরের মাঝখানে।
ওহে ভগবান........(দোয়ারকি)
তাই আমার গতি কি গতি কি
একবার প্রভু আমায় বলদেখি
গতি কি......(দোয়ারকি)
আমারে পাঠালে প্রভু......
প্রভু, এ ভব বাজারে
এযে বাজার বড় মজার বাজার
দেখলাম নজর প'রে
তাই বাজারের আগে প্রান্তরে
আমি বাধলাম নূতন ঘর
তাতে সারে তিন কোটি খুঁটি দিল্লাম
দেখতে মনোহর!
আর তার বর্গা জান্‌লা কপাট
কেটে করলাম নবদ্বার
সদর গেটে দুই প্রহরী রহিল আমার
তার মধ্যে একজন পুরুষ আর একজন রমণী
পাহাড়া দিতেছে তারা দিবস রজনী
আমার মালখানাতে বস্তায় পোড়া ঠাকুর ছিল রত্নধন
এ বাগে পেয়ে ছয় দস্যু তা করেছে হরণ
আমার, এই দেহ জমি লাখেরাজ করে খাস করবে যমরাজ
এ জমির মালিক আমি নই, আমার দিলে হাজার বিষয়
আবাদ করতে পাইনা আমি সত্য কথা তোমার কাছে কই, এজমির তিন অংশের
দুই অংশে গেল আমার মাতৃ ঋণের দান বেদখল হয়েছে জমি নিজ দখলে নাই।
বাকি অংশ টুকু আমার জলে গেল ভেসে
এখন জঙ্গল করে রেখেছে ঠাকুর উলো আরকেশে ॥
আমি আবাদ করতে পারি নাই.......(দোয়ারকি)

ফলতো আবাদ করলে ফলতো সোনা আবাদ করতে........(দোয়ারকি)

এবার কবিগান কবি গান

আজ আমাদের কবিগান

এগান বাংলার নিজস্ব গান

আজ আমাদের কবি গান ....(দোয়ারকি)

মাপ করবেন আমি সর্বপ্রথম সেই ভুল বলেছি কেন না আজ আমাদের কবি গান আমাদের কবিগান তো নয় আমাদের বাবারও কবিগান নয়, কবি একজন আছেন তাঁদের গান আমরা বিতরণ করে বেড়াচ্ছি। তা কবি কে?

আমি প্রণাম করি স্বয়ং হরি —

আমি প্রণাম করি কবিগুরু বাল্মীকির চরণে

যিনি, চিতা ভাঙের মহিমা গান লিখলেন রামায়ণে

প্রণাম করি স্বয়ং হরি কৃষ্ণ দ্বৈপায়নে

যিনি কৃষ্ণ কথা ব্যক্ত করলেন অষ্টাদশ পুরাণে

জৈমিনি পা চণ্ডাল মুনি আর বাদরায়ণে

বাবা বসন্ত মুনি শ্রী ন্যায়ের ভাসি ব্যাসের নন্দনে

আমি প্রণাম ভাবি ভক্ত কবি দ্বিজ চণ্ডিদাসে

যিনি সহজ ভজন দেখিয়ে গেলেন গানের প্রেম রসে

মহামতি বিদ্যাপতি জয়দেবের চরণে

যিনি মহা প্রসাদ পেয়েছিলেন গীত গোবিন্দের গানে

গোবিন্দ দাস শেখর বাসুদেব ঘোষে

উত্তমে তাং অনুনয়ে কাং জং জর নাশে

বাউলে বাংলা যাদবেন্দ্র কবি লোচন দাসে

যারা কৃষ্ণ কথা ব্যক্ত করলেন সুললিত ভাসে

আমাদের সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্য প্রকাশে

বাবা ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর গিরিশচন্দ্র ঘোষে

ঈশ্বর গুপ্ত ঈশ্বর গুপ্ত ব্যক্ত প্রভাকরে

আমরা যার প্রভাবে কবি প্রকাশ্যে অম্বরে

কবি নজরুল ইসলাম্ মোস্তাফা গোলাম কুমুদ রঞ্জনে

আমি ভুলে গেছি মায়ের ভক্ত রামপ্রসাদ সেনে

আমি প্রণাম করি কবিগুরু রবীন্দ্র ঠাকুরে

যিনি, তাপিপ্রাণে শীতল করেন গীতাঞ্জলী সুরে

অনুরাগে খুদিরাম যিনি এ্যান্টনি পল্টনে

মহেন্দ্রনাথ তরল মরণ হরি নারায়ণে

ওলট ধরে জীবন ওরে কবি ঋষিকেশে
সৃষ্টি ধরা লম্বদ্বরা রজনীকান্ত দাসে।

আমার প্রণাম রহিল..........(দোয়ারকি)
এই গুরুদের চরণে আমার প্রণাম রহিল।

প্রথমজন ঃ

যাও ফিরে যাও ও ললিতে
যাও ফিরে যাও ও কালাচাঁদ
আর কুঞ্জের দ্বারে এসনা
সারা রাতি কোথায় ছিলে
বল ওহে চিকন্ কেলে (দোয়ারকি)
তোমার কথা ছিলো সন্ধ্যা কালে
কেন এলে বন্ধু আজ সকালে
গোপন মায়রী করো না
যাও ফিরে যাও চিকন্ কালা
কুঞ্জের দ্বারে এসো না (দোয়ারকি)

দ্বিতীয় জন ঃ

আমি আসব বলে এলাম চলে
রাস্তার মাঝে পড়লাম ভুলে
আজ আমারে ফিরিয়ে দিলে
ভালো দেখো হবে না
যাও ফিরে যাও............(দোয়ারকি)

প্রথমজন ঃ

হে ঠকুরা হে গোবিন্দ? সারা জীবনটাই কি এমনি করে তোমাকে কাটাতে হয়।

চির দিনের চোরা কালি
সব জানি হে বনমালি
কত জনার কুলে দিলে কালি
আমাদের কেও ছাড়লে না
যাও ফিরে যাও........(দোয়ারকি)

দ্বিতীয়জন ঃ

কালি দিই নাই কারো কুলে
তাদের নিয়েই আছি ভুলে
আমি যাদেররেখেছি হৃদ কমলে
তাদের ভুলতে পারিনা
যাও ফিরে যাও...........(দোয়ারকি)

প্রথম জন ঃ

আর ছলনা করো না ঠাকুর

কারণ ঃ প্রমাণ পাইয়া হাতে হাতে
দেখিলাম আমি স্বচক্ষেতে (দোয়ারকি)
প্রমাণ দিচ্ছে তোমার হাতে মুখে
আরনা নিয়ে তা দেখো না
যাও ফিরে যাও ....(দোয়ারকি)

ঢাকের রেলা ঃ
ধেড়েকেটে ধেড়েকেটে ধা ধেড়েকেটে ধা
ধেড়েকেটে ধেড়েকেটে ধা।

দ্বিতীয় জন ঃ

প্রমাণটা কোথায় তানা আমার হাতে মুখে। দেখবো কিসে আয়নায় তা আয়নাতো নাই. এ ললিতে, 'আয়না একবার আয়না'
ও ললিতে আয়না
আমি তোদের ছেড়ে কোথাও যাইনা
ও ললিতে আয় না.......(দোয়ারকি)

প্রথমজন ঃ

হে ঠাকুর আয়না, আয়না কোথায় পাবো বলো? এই সামনে যমুনার জল আছে, তুমি যমুনার কুলে গিয়ে একবার নিজে নিজের মুখটা দেখ তবে শোনো, ব্যাপারটা কী!
ও তোমার নয়নের কাজল লেগেছে বয়ানে
কেমনে রাখিবে গোপনে।
এ তো হাঁড়ি খাওয়ার লক্ষণ বটে
যেমন চোরা কুকুরের এমনই ঘটে
হাঁড়ি খাওয়ার বন্ধু লক্ষণ বটে (দোয়ারকি)

ওহে ললিতে এর জন্য কোন চিন্তা নাই, কারণ আমার নয়নের কাজল বয়ানে লেগেছে আমি কাল যখন বসতে গিয়েছিলাম তখন মা বেশ সাজিয়ে গুছিয়ে পাঠিয়ে ছিলেন কিনা! চোখে কাজল দিয়েছে আমি চোখটা রোগরিছি।
তাতে গালে লেগেছে (দোয়ারকি)
বলি তাতে কি আর দোষ হয়েছে
গালে লেগেছে (দোয়ারকি)
আমার রাতে রগরিয়ে দেওয়ার আছে
তাতে কি আর দোষ হয়েছে।

প্রথম জন ঃ

ওহে তোমার মা তোমাকে কাজল দিয়ে সাজিয়ে পাঠিয়ে দিলো আর চোখের জ্বালা করে তাতে। হ্যাঁগো মায়েরা যখন চোখে কাজল দেয় তখন চোখটা একটু জ্বালা করে আর ছোট ছেলেরা এমনি দেখবেন হাত দিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে। আচ্ছা বন্ধু তাই যদি হোলো তোমার হাতে তো বন্ধু কালি লাগে নাই! যাইহোক শোনো —
তোমার হৃদয়ের মাঝে

দেখিলাম যাহা
(ওহে) নখাঘাতের চিহ্ন হেরি হে।
দ্বিতীয়জন ঃ
ওরে বনে বনে ঘুরিতে ঘুরিতে
শিয়া কুলের কাঁটা ফুটেঁছে।
প্রথমজন ঃ
ওহে থামো থামো বুঝেছি বুঝেছি বন্ধু!
সে আকুলে ধরেছে (ওগো)
আর কত করবে বন্ধু ছলা কলা
তুমি সে আকুলে ধরেছে।
হ্যাঁ বুঝতে পেড়েছি রাস্তায় আসতে আসতে কোনো নারীর মোহে পড়েছো আর সে তোমাকে আকুলে ধরেছে।
দ্বিতীয়জন ঃ
হে ললিতে নারীর মুখ নয়. নারীতে ধরে নাই, বনে বনে ঘুরতে ঘুরতে বনে তো শিয়াকুলের কাঁটা আছে —
প্রথমজন ঃ
যাক্ শোনো ঠাকুর! এটা না হয় কেউ আকুলে ধরেছে, শিয়া কুলের কাঁটা ধরেছে মেনেনিলাম, কিন্তু বন্ধু বলতো?
আজকে বন্ধু পড়েছো ধরা (দোয়ারকি)
এবার, পড়েছে বন্ধু আজকে ধরা (দোয়ারকি)
ওহে দাদার শাড়ি ছেড়ে দিদির শাড়ি পরা
আজকে বন্ধু পরেছো ধরা।

এতো দিদির শাড়ি নয়, যেমন কটক মেলি একটা মিলের নাম ॥
চন্দ্রাবলী মিলের শাড়ি
তোদের মধ্যে দেখি সন্দেহ ভারি
চন্দ্রাবলীর মিলের শাড়ি।
প্রথমজন ঃ
হ্যাঁ হে গোবিন্দ আমি বলছি কি এটা গড় মিলের শাড়ি, তোমাদের মিল ভালো হয়েছে কারণ আজকে নানান মিল উঠেছে টাটামিল অরবিন্দ মিল জোতির্ময়ী মিল কিন্তু সে কালে তো কোনো মিল ছিল না তবে তুমি যেমনি এই শাড়ি পড়েছো এটা গড়মিলের নয় মিলের ই বটে। যাইহোক ঃ-
এখন সত্যকরে প্রকাশ করে
ওহে তুমি নটবর (দোয়ারকি)
আসল তুমি দাও খবর
কাউকে আমি বলব না।
যাও ফিরে........(দোয়ারকি)
দ্বিতীয়জন ঃ

এ ললিতে সত্যি কথাই,
আমি কালকে যখন এলাম চলে
আমি সত্য কথাই বলছি খুলে
আমার পদ্মাবতী দেখতে পেয়ে
সে আমায় আর ছাড়লো না
যাও ফিরে.......(দোয়ারকি)

প্রথমজন ঃ

কথায় বলে সেই তো ভাত খসালে বন্ধু লোককে কেন হাসালে? ধরা তো দিলে তাই এতখন পড়ে যাইহোক শোনো —

এখন রাধারানি আজ করেছে যে মান
ওগো কালো মুখি নাহি হেরিলে
একবার সত্যি করে তুমি বলো হে বন্ধু
কি বাই করা যাবে।

ও ললিতে তোর হাতে ধরি
আমি আরযে থাকতে নারি
ওরে যে কোনো উপায়ে
আমায় দেনারে মিলায়ে
যেথা আছে মোর প্যারী।

প্রথমজন ঃ

একবার শোনো শোনো হে ও কালাচাঁদ
একটা মনে মনে আমি আঁটিলাম ফাঁদ
শোনো শোনো হে ও কালাচাঁদ ॥

কী ব্যাপার জানো ঠাকুর? রাধারানি যে মান করেছে সে মান আর ভাঙবে না তবে একশর্তে তোমাকে আমি যোগাযোগ করিয়ে দিতে পারি তবে তার আগে আমার একটি শর্ত, শর্ত হচ্ছে আমি যে তোমার এত ঘটকালি কোরবো এর বিনিময়ে —

আমায় তুমি কি বা দেবা
আমি ঘটকালি যে ভাই করে যাইব
আমায় তুমি কি বা দিবা।

হে ললিতে তোর যা মনের বাসনা সেটাই মিটিয়ে দেব।
আমারা যুগল চরণ মাথে দিব
ও তোর গোপী জনম সফল করিব
আমার যুগল চরণ মাথে দিব।

প্রথমজন ঃ

তবে একটা কাজ করহে গোবিন্দ তুমি

ওই বেশে যাওয়া চলবে না ওহে চিন্তামণি
আজ ঐ ধুতি ছেড়ে পড় শাড়ি
ওহে ধরো নাপিতিনির বেশ
হাতে একটা নাও নরুন
আলতার বাটি নাও ধীরে ধীরে করহ প্রবেশ।

দ্বিতীয়জন :
আমি কোথায় পাবো এখন শাড়ি
কোথায় নরুনি পাই
কোথায় বা আলতার বাটি
বল দেখি আমায়।

এ কি বলছ ঠাকুর হে গোবিন্দ শ্যাম রসময়
তোমার ইচ্ছায় এ জগতে কি না হয়?
ওগা নাম যাহার যোগমায়া ভেবে দেখ মনে
যাহার যোগাযোগ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চলে অনেকে তাজানে,
সেই যোগমায়াকে করহে স্মরণ
পরাইবে সে জন বসন
তোমায় নারীরূপে সাজাইয়ে দেবে
এবার ধীরে ধীরে গিয়ে তুমি রাধার চরণে
পা কামাইয়া দেবে ॥

দ্বিতীয়জন :
এবার যোগমায়া কে করলাম স্মরণ এসেছে যোগমায়া
ওরে নাপিতিনি সাজিয়ে দিল সে যে মহামায়া
আমি নাপিতিনির বেশে এবার কুঞ্জের বনে যাই
রাধারাণির পায়ে বেয়ে বেয়ে আমি কৃষ্ণনাম লেখাই
তাই দেখে রাধারানি আর তো থাকতে নারে
এমত সময়ে পদ্মাবতী এসেছে এবারে
তাই পদ্মাবতী বলে ওহে বধু
তুমি সারারাত্রি ছিলে তন্দ্রা কুঞ্জে ভাই
আসবার সময় পায়ের নূপুর এনেছ সেই দুটোই চাই।

প্রথমজন :
এই বার হলো কি রাধারাণির মান না ভাঙিল
পা কামাইয়া কালাচাঁদ আমার বাহিরে এলো
বাহিরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে করছে ক্রন্দন ভাই
আর প্রভুর কান্না দেখে আমরা থাকতে পারছিনাই

আমি গিয়ে বললাম ও রাধারানি
এত মান ভালো নয় তোমার
কারণ কাঁদাইলে কাঁদিতে হবে
জানা নাই তেমার
বাইরে বাইরে কানছে আমার সাধনার ধন
একবার চেয়ে দেখরে ও রাধা তোর ও যুগল চরণ।
এই বলে রাধারানি আপন চরণ হেরিল
যুগল চরণে কৃষ্ণনাম যেমনি দেখিল
আর কি সে থাকতে পারে হইল পাগল পাড়া
এনে দে লো এনে দেলো ললিতে আমার সেই ননিচোরা
এই বলে কাঁদিতে কাঁদিতে যখন পাগল প্রায় হয়
আমি তখন প্রভুকে নিয়ে যুগল করলাম মহাশয়
এই খানে রাধারানির মিলন হয়ে যায়
ওহো আমরা যত গোপিগনে সেই মিলন বন্ধন
দেখে আনন্দের সীমানায়
সেই গন্ধ যখন নাসারন্ধ্রে গেল
আমরা গোপিজনে আনন্দে উল্লাস করিতেছি ভালো
এইখানে আমাদের বোল সমাধা হয়
একবার প্রেমানন্দে সকল মিলে হরি বলুন মহাশয় ॥

বাংলার তরজাগান

প্রহেলিকা জাতীয় প্রশ্নোত্তর মূলক ছড়াগান অর্থে তরজা শব্দের ব্যবহার মধ্যযুগীয় একাধিক, কাব্যে। যেমন বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবতে, কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্য চরিতামৃতে' জয়নারায়ণ ঘোষালের 'করুণা নিধান বিলাসে' তরজা শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়।

তরজা (আরবী শব্দ তরজ-ই বন্দ) আরবী ও পারসিক ঐতিহ্যের পথধরে মোগল যুগে আর্যা শব্দের সঙ্গে ধ্বনিসাম্যে ছড়া প্রহেলিকা।

তরজা ও কবিগান প্রায় এক জাতীয় হলেও ঠিক এক জিনিস নয়। তরজা গাওয়া হয় প্রধানত বেদ, পুরাণ ও উপনিষদের কাহিনী নিয়ে। কবিগান কিন্তু তা নয়। তরজায় যেমন প্রশ্ন ও উত্তরে সীমাবদ্ধ। কিন্তু কবিগান ঠিক তার বিপরীত। কবিগানের প্রশ্ন ও উত্তরে সীমাহীন।

তরজা গানের বাদ্যযন্ত্রে, কবি গানের বাদ্য যন্ত্রের মতোই। তরজাগানের প্রধান বাদ্য যন্ত্র বলতে ঢোল ও কাঁসি।

এগানে, কবিগানের মত দুটি পক্ষ থাকে। এক পক্ষের মূল গায়েন প্রশ্ন করে, অপর পক্ষের মূল গায়েন উত্তরে দেয়। একেই চলতি কথায় 'চাপান উতোর বা উত্তোলন' বলে।

তরজা গানের ইতিহাসখুব বেশি দিনের নয়। উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে হাওড়ার শালকিয়া অঞ্চলের মধুঠাকুর ও তারকপাল নামক দুজন রসিক মানুষই বাংলায় প্রথম তরজাগানের প্রচলন করেন। এবং এঁারা দুজনেই এক সময় যাত্রাদলের দোহার ছিলেন। ফলে

মধু ঠাকুর ও তারক পাল প্রবর্তিত তরজাগানে বেদ পুরাণের কাহিনী ও সাবেক যাত্রার ঢঙে সুরের এবং গায়কীর প্রত্যক্ষ প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

হাওড়া থেকেই তরজা গান ক্রমশঃ কলকাতা, হুগলী, বর্ধমান, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, ২৪ পরগনা উত্তর ও দক্ষিণ প্রভৃতি বিভিন্ন জেলায় ছড়িয়ে পড়ে। এবং বেশ কিছু মানুষ তরজা গানকে জীবিকা করে নেন।

তাছাড়া অল্প খরচে, স্বল্প পরিসবে, এমন সর্বজনীন বিনোদন মাধ্যম হাতের নাগালে এসে পড়ায় অল্প সময়েই তরজার ব্যাপক প্রচার ও প্রসার ঘটে।

তরজা যে শুধু পুরুষদের গান তা নয়, বহু মহিলা তরজাওয়ালীরও সন্ধান পাওয়া যায়। সে সময়ে পুরুষ তরজাওয়ালাদের মধ্যে হেম সিংহ, নবীন গোস্বামী, কালী ঘোষ, দাশু সর্দার, হাজারীলাল বিশ্বাস এবং নারী তরজাওয়ালীদের মধ্যে রমা দেবী ও বিন্দুর নাম প্রসিদ্ধ। আধুনিক কালে অন্নদা মণ্ডল, দশরথ, নন্দরানী ও আবিরা দাসী বেশ প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

এবার আসা যাক তরজার গঠন শৈলীতে। তরজার আসর শুরু হয় দেবস্তুতি, তারপর গুরুবন্দনা ও সংক্ষিপ্ত সভাবন্দনা দিয়ে।

তারপর এই সভা বন্দনার সঙ্গে সঙ্গেই একপক্ষ অপর পক্ষকে প্রশ্ন করে গান ও কথার মাধ্যমে। অপর পক্ষও ঠিক একইভাবে গীত কথার মাধ্যমে জবাব দেয়। শুরু হয়ে যায় তরজার লড়াই। এই লড়াইকে প্রাণ দান করে বিশেষ ধরণের ঢোলের সঙ্গত। এই ঢোলের বায়া বাজানো হয় কাঠি দিয়ে এবং ডাইনা বাজায় চাপড়ে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই খেমটা বা দাদরা তালে খুবই মিষ্টি করে নেচে নেচে বাদক ঢোলের সঙ্গত করেন। মাঝে মাঝে ঢোলের লহরা বাজান হয়। সঙ্গে থাকে দুটো কাঁশর যাকে বলা হয় কাশী।

তরজার আসর ছোট। এবং এর সবই সংক্ষিপ্ত। ক্রমানুসারে একটি তরজার বর্ণনা দেওয়া হ'ল।

দেবস্তুতি/দেববন্দনা

'ও আমার অবোধ মন
মায়ের চরণ নিলে শরণ
কালের ভয় আর রবে না।
অসতী সে হবে সতী
মুর্খ হবে মা সরস্বতী
বেদের ছেলে পেয়ে মতি (মা)
ছুঁড়ে ফেলে ধনুক বাণ
কোন ভারনা রবেনা।
হাতীর মাথায় ভেকের লাথি
বলন কথা অতি সম্প্রতি
গাছের ডালে বসে কপোত-কপোতী
তারা করছে কত গান দেখ না।
ও আমার অবোধ মন
ভগবানের চরণ শরণ নে না

মায়ের চরণ নিলে শরণ কালের ভয় আর রবে না।'

তরজাওয়ালার সওয়াল

'আজি সবারে জানাই
তরজা শুনবেন যতেক বাবু মহাশয়।
তুমি আমার জোটের জুটি পরিপাটি
একটি কথার জবাব দিয়ে যাও
কোন্ পুরাণে লেখা আছে
জামাই এসে পুরুত সাজে
রাজার দেশে পুরুত নাই।
রাজা কি তবে এক ঘরে হ'ল
বলনা শুনি ভাই।
বেদ পুরাণের কথা যে ভাই।
বাজে কথা কিছু বলব না,
কালের ভয় আর রবে না।'

প্রতিপক্ষ তরজাওয়ালার জবাব

'আছে কালীঘাটে কালী মা গো
কৈলাসে ভবানী
মায়ের ওই চরণে শরণ নিয়ে
ডাকলাম বীণাপাণি।
আজি তরজা গাইতে এসে মা গো
ঘটল বিষম দায়.
ওমা কোথায় আছ মা শংকরী
ঠেকলাম বিষম দায়। আমার ওই জোটের জুটি পরিপাটি
অন্নদা বাবু মহাশয়,
(কটা প্রশ্ন করেছেন, বলতে হবে
কোন্ রাজা পুরুত বিনে
জামাইকে ডেকে যজ্ঞ করায়
শোনেন সব বাবু মহাশয়।
(একটা মজার কথা)
একটা জবাব কথা, রং তামাসা।
বলব শুনেন সকলে,
বেদ পুরাণে লেখা আছে
সেইসব বৃত্তান্ত সমূলে' ॥

'অযোধ্যাতে ছিল রাজা দশরথ তার নাম,
তিনটি রাণী যে ছিল, রাজার পুত্র চারিজন।

রাজার এক কন্যা ছিল, শুনেন সব বাবু মহাশয়
আমার ওই জোটের জুটি অন্নদাবাবু
তার নাম জানেন ত নিশ্চয়।
ও সেই দশরথ বুড়ো রাজার যদি কন্যা এক রয়,
সতী শান্তা নাম তার ছিল গো নিশ্চয়।
সেই না কন্যার রাজা বিবাহ যে দিল,
ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি তবে জামাতা যে হইল।
পুত্রেষ্টি যজ্ঞ রাজা যদি করিবারে চায়
পুরোহিত নির্বাচনে রাজা কুল নাহি পায়।
ঋষিগণ বলে রাজা একটি কার্য কর,
ঋষ্যশৃঙ্গ সেরা মুনি তারে বরণ কর।
ছলে বলে নানা কলে রাজা তবে কন্যাকে আনিল,
জামাতা বাবাজী তবে সঙ্গেতে আসিল।
ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিযজ্ঞ সমাধা হইল নির্বিঘ্নে।
এই তো তোমার কথার জবাব
দিয়ে দিলাম বাবু মহাশয়
রামায়ণে লেখা আছে, কথা মিথ্যা নয়।
তুমি আমার বন্ধু বটে দেখে দুঃখ হয়
তোমায় ছেড়ে চলে যাব কাঁচড়া পাড়ায় ॥

উল্লিখিত তরজার সওয়াল জবাবটি
অন্নদাদাস ও কাঁচড়া পাড়ার যোগীন্দ্র কুণ্ডু
মশায়ের তরজা লড়াই থেকে সংগৃহীত।

তরজা গানের আসরের বর্ণনা

বন্দনা গান দিয়ে আসর শুরু করলেন বীরেন খাঁটা মহাশয়।
বন্দনা ঃ আমি কি তোর গাইতে পারি গুণ
ওমা ত্রিগুণধারিনী।
কে বোঝে মা তোমার অন্ত
ও অনন্ত রূপিনী ॥
ভাদ্র মাসে জনম নিলে
আশ্বিনে অম্বিকা বলে
কার্ত্তিকেতে কালী বলে
অঘ্রাণে জগদ্ধাত্রী রূপিনী ॥
আমি কি তো........ত্রিগুণ ধারিনী ॥
পৌষে হও পূর্ণ লক্ষ্মী
মাঘেতে হও সরস্বতী

ফাল্গুনে শিব-চতুর্দশী
চৈত্রে রাধারানী ॥
আমি কি তো.........ত্রিগুণ ধারিনী ॥
বৈশাখে হও বসুধারা
জৈষ্ঠ্যেতে হও দশহরা
আষাঢ়ে রথ বাহ্নিনী তারা
শ্রাবণে ঝুলন দোলায় আপনি ॥
আমি কি তোর......ত্রিগুণ ধারিনী ॥

আর একটি বন্দনা গান ঃ

মা গো মা শিব সারদা বাগ্বরদা
কোথা ও মা শিবানী।
মম কণ্ঠে বসে মন উল্লাসে
বলাও গো তরজা বাণী ॥
কৃপায় আজকে সভায়
বন্দনা করিবো
সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর-আদি
বিশেষ বর্ণিব।
আদি দেব নিরঞ্জন শিয়রের শরণ
নিরাকার নির্বিকার ব্রহ্ম সনাতন।
বরাহ মুরতি বন্দ দেব দামোদর
যে রূপেতে হিরণ্যরে করিলে সংহার ॥

বন্দ রাম গুণ ধাম অযোধ্যার ঠাকুর
গোলোক পুরী পরিহরি সেই লংকা পুর।
সংক্ষেপেতে এ পর্যন্ত বন্দনাটা সারি
শিক্ষা গুরুর শ্রীপাদপদ্মে আমি প্রণাম করি।
আমার তরজা গুরু কল্পতরু যেনার নাম হ'ল নিমাই
তেণার কাছে তরজা শিক্ষা সভাতে জানাই ॥
নামটি আমার বীরেণ ঘাঁটা দিলাম গো ঠিকানা
মাজু গ্রামে বসত বাটী জে. বি. পুর হয় থানা ॥
পোষ্ট অফিস মাজু গ্রামে আমি বলে যাই
হাওড়া হল জেলা আমার মিথ্যা বলছি নাই ॥
ব্রাহ্মণের মান বাড়িয়ে দিল আপনি কালো সোনা
ভৃগু মুনির পদ চিহ্ন বক্ষে আছে জানা।
ও পর্যন্ত সংক্ষেপেতে বন্দনাটা গেল
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের শ্রীপাদ পদ্মে

অবোধ মনটি চল

এ দিক ওদিক এপর্যন্ত বোল সমাধা করি
গৌর প্রেমানন্দে সকলেতে বলুন হরি হরি ॥

প্রশ্ন/(১) ঝিয়ের পেটে মায়ের জন্ম আমি বলে যাই
এর আদি অন্ত গোড়ার খবর যেন, তোমার মুখে পাই।
সঠিক কথা জান যদি বলবে সভায় ভাই
আদি অন্ত বল মুখে মিথ্যা বোল নাই ॥

(২) ঘর আছে তার দুয়ার নাই লোক আছে তার বাক্য নাই

উত্তরে নিমাই বিলুই বললেন।

উত্তর/(১) প্রথমে কচু যখন রোপণ করা হল।
তা থেকে মুড়োর সৃষ্টি মা হয়ে যে গেল।
(২) ঘর আছে তার দুয়ার নাই মশারি যে হ'ল
লোক আছে তার বাক্য নাই একটা হাবা লোক হল ॥

বিলুমাই-এর প্রশ্ন ঃ

লালন ফকির ডেকে বলে মায়ে ছুঁলে ছেলে মরে
বায় কথার না অর্থ জানলে চলে না তার ফকিরি ॥

উত্তর দেন ঘাঁটা মশাই ঃ

মায়ে ছুঁলে ছেলে মরে আমি বলে যাই
বারি হতে লবণের সৃষ্টি বারি, ঠেক্‌লে আর সে ছেলে নাই ॥
তাহলে মায়ে ছুঁলে ছেলে মরে এই খানেতে হ'ল
সব কথার উত্তর আমার সমাপ্ত হইল ॥

ঘাঁটা মশাই প্রশ্ন করেন ঃ

ছয় মাসের এক কন্যা ছিল নয় মাসে তার গর্ভ হল।
এগার মাসে তিনটি সন্তান কোনটা করে ফকিরি ॥

বিলুই মশাই উত্তর দেন ঃ

ছয় মাসের এক কন্যা ছিল আমি বলে যাই।
সে যে, আদ্যাশক্তি মহামায়া তুমি জান নাই ॥
এগার মাসে তিনটি সন্তান যেমন শোনা গেল।
ব্রহ্মা, বিষ্ণু মহেশ্বর কেনাজানে বল "

যুগল মিলন ঃ

এ পর্যন্ত এই খানে তরজা সাঙ্গ হল
রাধা গোবিন্দের স্মরণ করে
সকলে হরি হরি বল ॥

আর একটি তরজা গানের নমুনা দেওয়া হল ঃ
'বন্দনা' দিয়েই আসর সুরু।

বন্দনা

প্রথম পক্ষ গায় ঃ

সর্ব আগে বন্দিলাম আমি ধর্ম নিরঞ্জন
চন্দ্র সভা ইন্দ্রসভা দেব হুতাশন
নমঃ নমঃ নারায়ণী গণেশ ও জননী
ভক্তের স্মরণে এসো এসো সীমন্তিনী।
দুর্গা মাতার প্রতি আমার বন্দনা তো হল
সরস্বতীর দিকে একবার অবোধ মন রে চলো ॥
কোথায় মা সর স্বত্যং নমঃ নিত্যং দেবী সরস্বতী
তোমার ও চরণে আমার অসংখ্য প্রণতি।
এবারে পিতা মাতার চরণেতে প্রণাম জানাই
পিতা মাতার প্রতি আমার প্রণাম করা হল
শিক্ষা গুরুর দিকে একবার অবোধ মনরে চলো ॥
আমার শিক্ষা গুরু কল্পতরু মহাদেব নাম
হাওড়া জেলায় বসত বাড়ি বাড়বেড়িয়া গ্রাম
গুরুদেবের চরণেতে প্রণাম করা হল
এবারে প্রতিপক্ষের দিকে একবার অবোধ মনরে চলো ॥
অমূল্য বাবুর সঙ্গে আমার তরজা লড়াই হবে
আর প্রশ্নমালা দিচ্ছি আমি শুনে রাখ তবে ॥

বন্দনা শেষে প্রথম পক্ষ প্রশ্ন রাখেন।

প্রথম পক্ষের প্রশ্ন ঃ

তিনটি নারীর গর্ভে এক ছেলে
একথা শাস্ত্রে লিখেছে খুলে
আবার মহানন্দে আনন্দেতে আনন্দ করে সবাই মিলে
তারা তিনজনা নারী, পুত্র কামনা করি
অমাবস্যায় নিরামিষ্য খায় যে তরকারী
আবার এমন তাদের কপাল হেরি
দুঃখ ছাড়া সুখ নাহি মেলে ॥

দেখে ওই ছেলের পিতা
মর্মে পেলেন বড় ব্যথা
মোর কপালে লিখলো কি যে নিঠুর বিধাতা
আবার ঘুচতে আমার মনের ব্যথা
যদি হোত তিনটি ছেলে ॥
তাহলে বলতে পারেন অমূলব্যবু
তিনটি নারী কেবা ছিল
কিবা তাদের নামটা একবার স্পষ্ট করে বল
এবং ছেলেটা যে কেন অমন হল

একবার বলা যে গো চাই
তোমার মুখে পরম সুখে শুনিবে সবাই
ছেলের বাবাটি যে কে বা ছিল
একবার বল না যে ভাল
অমূল্য বাবু উঠবে এবার হরি হরি বল ॥

দ্বিতীয় পক্ষ ঃ

'বন্দনা' দিয়ে আসর সুরু করেন।

"বন্দনা"

সর্ব আগে বন্দিলাম কালীমাতার চরণে
তার পরে বন্দিলাম আমি মুষিক বাহনে
পেচক পৃষ্ঠে বন্দিলাম লক্ষ্মীনারায়ণ
যার একদন্ত গজদন্ত দেব গজানন
বলি সরস্বতীর মাতার প্রতি প্রণাম করা হল
পিতা মাতার দিকে একবার অবোধ মনরে চলো
পিতা মাতার চরণেতে প্রণাম করে যাই
গুরুদেবের চরণখানিক আমি যেন পাই
একে একে সংক্ষেপেতে বন্দনা তো হল
আসরের দিকে একবার অবোধ মনরে চলো
আর যে গো বন্দিলাম ঢুলি আর কাঁসি
আর এই আসরে আছেন যত মা আর মাসি
এই পর্যন্ত সংক্ষেপেতে বন্দনা তো হলো
প্রশ্নমালার দিকে একবার অবোধ মনরে চলো
তিনটি মেয়ের পেটে নাকি একটি ছেলে হলো
আর খেঁদির বেটা পদ্মলোচন প্রশ্ন করে গেল

দ্বিতীয় পক্ষ উত্তর দেন ঃ

ছড়া

যে কথাটা বলে গেছে সেটাতো মিথ্যা কথা নয়
মহাভারতে আছে লেখা বাবু মহাশয়।
পৌষ রাজা নামে ভাইরে একটি রাজা ছিল
ছেলে হয় না বলে সে যে তিনটি বিয়ে করলো।
অমলা, কমলা, বিমলা নামটি তাদের হল
ছেলে হয় না বলে তারা দুঃখ যে গো পেল।
রাজা মনের দুঃখে বনে হরিণ শিকার করতে গেল
আর বনের মাঝে একটাও দেখতে নাহি পেল।

কথাচ্ছলে ঃ

[রাজা একটা বট বৃক্ষের নীচে বিশ্রাম করছেন এমন সময় আদ্যাশক্তি মহামায়া ব্রাহ্মণের বেশে রাজাকে বলছেন রাজা বাড়ি ফিরে যা—যে কাজে এসেছিস সিদ্ধিলাভ হবে না। তখন রাজা বললো আমার সন্তান হয় নি এই ভিন দেশে আপনি কি করে জানলেন ব্রাহ্মণ দয়া করে যাতে আমার সন্তান একটি হয় তা বলে দিন—এই বলে রাজা কাঁদিতে লাগলো।]

ছড়া

রাজার চোখে জল দেখে ব্রাহ্মণ থাকতে না পারিল
একটি আম এনে রাজার হাতে দিয়ে যে দিল।
এই আমটি খাবে যে তার একটি সন্তান হবে
তিনজনাতে খেলে কিন্তু বিপদ ঘটে যাবে।
এই বলে ব্রাহ্মণ হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল
রাজা তখন বাড়ির দিকে রওনা হইল ॥

গল্পচ্ছলে ঃ

রাজা বাড়ি ফিরে বড় রাণীকে বলছে দেখো রাণী তোমার জন্য একটা আম এনেছি। এক ব্রহ্মণ আমায় বললো এই আমটি খেলে তোমার একটি সন্তান হবে। তুমি স্নান করে এসে আমটি খেয়ে নাও। আমি রাজসভায় যাচ্ছি।

ছড়া

এই বলে রাজা যে গো রাজ সভাতে গেল
আর তিন রাণীতে যুক্তি করে আমটি খেয়ে নিল
কারণ এক মায়ের পেটেতোরা তিন বোন ছিল
হিংসা বলে কারো মনেনাহি যে রইল।

গল্পচ্ছলে ঃ

তারা কিছুদিন পরে জানতে পারলো তিনজনেই গর্ভবতী হয়েছে। দশমাস দশদিন পরে তারা প্রসব করলো। বড় রাণী অমলা প্রসব করলো মাথাটি মেজ রাণী কমলার পেট থেকে বেরিয়ে এলো দুটো হাত আর ধড়। আর ছোট রাণী বিমলার পেট থেকে দুটো পা বেরিয়ে ছটফট করছে।

ছড়া

তখন তিন জনাতে দেখে শুনে কাঁদতে লাগলো
হায়রে বিধি আমাদের মরণ নাহি হলো।
তখন আদ্যাশক্তি মহামায়া থাকতে না পারিল
ব্রহ্মণ বেশে সেইখানেতে উপনীত হলো।
কমণ্ডুলের জল নিয়ে ছিটিয়ে গো দিল
আর এসি কারেন্টের মতো যে গো জোড়া লেগে গেল ॥
আম খেয়ে ছেলে হল তাই অম্বরীশ নামটি

ব্রাহ্মণ যে দিল
আর খানিক পরে ব্রাহ্মণকে দেখতে নাহি পেল ॥
তাহলে ব্রহ্মণ হল আদ্যাশক্তি মহামায়া
ছেলেটি হল অম্বরীশ
বাবার নাম পৌষ রাজা
মায়ের নাম অমলা, কমলা, বিমলা।

ছড়া

এই তো তোমার কথার জবাব মিটে মাটে গেল
গৌর প্রেমানন্দে একবার হরি হরি বল ॥

আর একটি তরজা গানের নমুনা ঃ

প্রথম গায়ক ঃ

কে নাম রেখেছে মা তোর চঞ্চলা,
তোমায় চিনতে নারি ও শঙ্করী, যুগে যুগে নূতন লীলা।
কে নাম রেখেছে মা তোর চঞ্চলা ॥
শিব রূপেতে তোমার প্রতি হয় শ্মশান বাসী
শক্তি রূপে তুমি মা গো ধরেছো অসি,
আবার কৃষ্ণ রূপে বাজাও বাঁশী, গোপীনীদের মন ভুলাও,
কে নামা রেখেছো...............................চঞ্চলা।
ভক্তিভাবে রাবণ রাজা তোমায় পূজেছে,
তার স্ববংশেতে নিধনহল শাস্ত্রেতে আছে।
তাই জানাই মা তোমার কাছে,
তোমার যুগে, যুগে কত লীলা।
কে নাম রেখেছে মা তোর চঞ্চলা ॥
অধম অজিত চন্দ্র ডেকে বলে,
স্থান দিও মা চরণ তলে,
ডাকি তোমায় মা, মা বলে,
দিও চরণের ভেলা ॥

বন্দনা ঃ

আমি প্রথমেতে প্রণাম করি ভগবানের পায়।
তার পরেতে প্রণাম করি পিতা আর মাতায় ॥
শিক্ষা দীক্ষা গুরুর পদে প্রণাম করা হলো।
বায়েনের ঢোল বন্দ কাঁশী বন্দ রইলো ॥
তেত্রিশ কোটী দেবদেবীকে প্রণাম করে যাই।
শ্রোতাবৃন্দ সবাইকে প্রণামও জানাই ॥

নামটি আমার অজিত মান্না, শুনেন সর্ব্বজন।
হাওড়া জেলা, শ্যামপুর থানা বলে যাই এখন ॥
জন্মভূমি রেঙ্গাড়া মিথ্যা কথা নয়।
নাউল হলো পোষ্ট অফিস শুনেন মহাশয় ॥
নামধাম পরিচয় সকল দেওয়া হলো।
একটি প্রশ্ন মালা দিয়ে যাচ্ছি, সহদেব বাবু বলো ॥

প্রশ্ন ঃ

আসতে পথে আচ্মবিতে আমার দেখা হলো।
একটি কুঁড়ে ঘরে গর্ভবতী মেয়ে বসে ছিল ॥
কাদের একটি ছেলে গিয়ে হাত খানা ধরেছে।
আমার সঙ্গে চলো তুমি, বলছি তোমার কাছে ॥
টানা, টানির ফলে মেয়েটা তখন পড়ে গেল।
সেই সময়ে একটি ছেলে প্রসবও করিল॥
ছেলেটা হয়ে পড়ে, লোকটির দিকে যেই মাত্র দেখিল।
সেই লোকটা সেইখানেতে ভস্ম হয়ে গেল॥
ছেলেটিকে কোলে লয়ে মা কাঁদিতে লেগেছে।
তার চোখের জলে একটি নদী সেই খানে হয়েছে॥
সেই নদীটির নাম কিবা আমি শুনতে চাই।
মেয়েটা বা কেবা হলো তোমার বলা চাই॥
এই পর্যন্ত প্রশ্ন মালা আমার দেওয়া হলো।
জাঁক জমকে সবাই মিলে হরি, হরি বলো ॥

দ্বিতীয় গায়ক ঃ

সোনার বাংলা ছেড়ে যাস্‌নে মাগো, বাংলার জননী,
বাংলা ছেড়ে চলে গেলে, বাঁচবে না বাংলার প্রাণী।
সোনার বাংলা..............বাংলার জননী।
বাংলা ছেড়ে চলে গেল, নেতাজী সুভাষ,
তাইতো মাগো সোনার বাংলায় ঘটে সর্বনাশ।
আমি করে যাই মা আজকে প্রকাশ, দিও চরণ দুখানি।
সোনার বাংলা .... বাংলার জননী ॥
তোমার চরণ স্মরণ করে, রাম জয়ী হয় লঙ্কাপুরে।
রক্ষবংশ ধ্বংস করে, আনলে জনক নন্দিনী।
সোনার বাংলা..........বাংলার জননী।
সহদেব আজ ডেকে বলে, স্থান দিওমা চরণতলে
ডাকি আমি মা, মা বলে, পূজব চরণ দুখানি ॥
সোনার বাংলা...........বাংলার জননী ॥

বন্দনা

প্রথমে বন্দীলাম গুরু ধর্ম্ম নিরঞ্জন।
জলধি শয়নে বন্দি লক্ষ্মীনারায়ণ ॥
আদিগুরু পিতামাতায় প্রণাম করা হলো।
শিক্ষা দীক্ষা গুরুর পদে নিলাম চরণ ধুলো ॥
তেত্রিশ কোটী দেব দেবীকে প্রণাম করে যাই।
শ্রোতাবৃন্দ সবাইকে প্রণাম করে যাই ॥
বায়েনের ঢোল বন্দ, কাঁশী বন্দ হলো।
নামটি আমার সহদেব মণ্ডল শুনে যান সকল।
হাওড়া জেলা, শ্যামপুর থানা নাউল গ্রামে বাড়ী।
একটা প্রশ্নমালা দিয়ে গেল, শুনুন পুরুষ, নারী ॥

ঠেস টপ্পা ঃ

দেখে প্রাণ বাঁচে না, ত্রিনয়না
ভেবে হলাম সার।
ফুটবে অমাবস্যায় চাঁদের, পূর্ণিমায় চাঁদ অন্ধকার।
দেখে প্রাণ .... ভেবে হলাম সার।
একটা চাঁপা নটের গাছে মশায় ফুটবে চাঁপা ফুল।
আমগাছে ধরাবে কাঁঠাল, বাঁশ গাছে বকুল।
আবার ময়নার বুলি বলবে বুলবুল,
এসব নূতন সৃষ্টি বিধাতার।
দেখে প্রাণ...............ভেবে হলাম সার ॥

ভালো মজা বেঁধে গেল, আজ মজা বেধে গেল।
অজিত বাবু একটা কথা জিজ্ঞাসা করে গেল ॥
এক কথাতে জবাব দেব, অভাব কি তার আছে।
সকল কথা বলে যাব ভদ্র দশের কাছে ॥
ভৃগু মুনির স্ত্রী দেখুন পুলমা সুন্দরী ঘরে বসে ছিল।
পুলমা নামেতে দানব হাতটি ধরে ছিল ॥
যে ছেলেটি গর্ভে ছিল, চবনমুনি হলো।
ছেলে কোলে নিয়ে মা যখন কাঁদিল ॥
চোখের জলে তখন একটি নদী হয়ে গেল।
সেই নদীর নাম বধূসরা সবাই জেনে গেল ॥
এইতো তোমার কথার জবাব, কথায় কথায় হ'ল
গৌর প্রেমানন্দে সবাই হরি হরি বল ॥

প্রশ্ন ঃ

একটি কথা অজিত বাবু জিজ্ঞাসা করে যাই,
তার করে খাঁটি পরিপাটী জবাব দেওয়া চাই।

হনুমানের কোন সময়ে ছ'পা হয়েছিল,
সেই কথাটি এই খানেতে স্পষ্ট করে বলো।
এই পর্যন্ত হলো জাঁকজমকে সবাই মিলে
হরি হরি বলো ॥

পাল্টা গায়ক ঃ

জল দেখে জাল ফেলনা এমনি জেলে,.
ধরবে যদি রুই, মৃগেল কেন জাল ফেল অল্প জলে ॥
রুই, মৃগেল মাছের সেরা, অগম জলে থেকে থেকে
মেলে এক সাড়া।
তারা তো জেলের জালে দেয় না ধরা
তাদের গাঁথতে হবে হুইলে ॥

পয়ার ঃ

এবার শুনুন সবে ভক্তি ভরে সভায় বলে যাই
যে কথাটি জিজ্ঞাসিল শুনে যান সবাই।
বলে হনুমানের কোন সময়ে ছ'পা হয়ে ছিল
দেব কথার জবাব এখানেতে অভাব কিবা বলো।
পাতালেতে মহিরাবণ, রাম, লক্ষ্মণে চুরি করে
পাতালেতে লয়ে গেল ভাই,
হনুমান সেই সময়ে মক্ষিরূপে গিয়েছিল তাই
ঐ সময়ে হনুমানের ছ'পা হয়েছিল।
এই তো তোমার কথার জবাব কথায় মিটে গেল.
এই পর্যন্ত সারি প্রেমানন্দে সবাই মিলে
হরি হরি বলো ॥

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কৃষ্ণযাত্রা/শ্রীকৃষ্ণ লীলা

কৃষ্ণলীলা কথাটা ব্যাখা করতে গেলে বলতে হয় শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের সময় তাঁর উদ্দেশ্যে যে সব গান ও গীত রচিত হয় সেগুলি একত্রিত হয়ে শুরু হয় কৃষ্ণ যাত্রা।

কৃষ্ণ যাত্রার সঙ্গে পরিচিত হয়ে দেখা যায় শ্রীকৃষ্ণের জীবনের বিভিন্ন দিকের ঘটনাকে কেন্দ্র করে রচিত হয় শ্রীকৃষ্ণযাত্রা যা পুরোপুরি যাত্রা বা গীতি কোনটাই নয়। কৃষ্ণযাত্রায় বাণী (কথা) এবং গীতি সম পরিমাণে থাকে।

কৃষ্ণযাত্রা এবং কৃষ্ণলীলায় বেশ কিছু পার্থক্য আছে। কৃষ্ণযাত্রা বাণী প্রধান আর কৃষ্ণলীলা গীতি প্রধান। কৃষ্ণযাত্রার ভাষা মার্জিত, সভ্য সমাজের পক্ষে উপযুক্ত। কিন্তু, কৃষ্ণলীলার ভাষায় একেবারে গাঁ গঞ্জের খাঁটি চাষাভুষার ভাষা। এতে না আছে ব্যাকরণ জ্ঞান, না আছে শব্দলালিত্য। তবু কৃষ্ণলীলা কৃষ্ণযাত্রার চেয়ে বহুগুণে শ্রেষ্ঠত্বের দাবী রাখে সে শুধু রসসৃষ্টি করার ক্ষমতায় এবং শ্রোতাদের মনোরঞ্জন করার কৃতিত্বে। পরবর্তী কালে কৃষ্ণযাত্রা পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন জেলায় ছড়িয়ে পড়ে এবং খ্যাতি অর্জন করে।

কৃষ্ণযাত্রার কয়েকটি পালা বিশেষ উল্লেখযোগ্য যেমন ঃ

(১) নৌকা বিলাস (২) মানভঞ্জন (৩) কলঙ্ক ভঞ্জন (৪) সুবল মিলন (৫) কংস বধ (৬) গোষ্ঠ লীলা

(১) মানভঞ্জন ঃ

রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলায় একটি দৃশ্য। হঠাৎ একদিন শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকার কুঞ্জে যেতে গিয়ে চন্দ্রাবলীর কাছে ধরা পড়েন। ফলে শ্রীকৃষ্ণের আর সেদিন শ্রীরাধিকার কাছে যাওয়া হল না। এদিকে কানু অদর্শনে শ্রীরাধিকা মানের সাগরে গা ভাসান। প্রেমিক মাত্রই প্রেমিকার মান ভাঙ্গাতে তৎপর হয়ে ওঠে। কিন্তু, শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাদূতীর মারফৎ শোনেন, শ্রীরাধিকা নাকি বলেছেন 'কালো বদন আর হেরব না'—

শ্রীকৃষ্ণ ছদ্মবেশ ধারণ করেন ঃ

রাধার মান ভাঙ্গিতে হরি, হলেন এক রসের নাগরী
নানামতে করিল সাজন।
চলল ধনি কুঞ্জবনে দেখা হয় কুটিলার সনে
কুটিলা তাই জিজ্ঞাসে তখন ॥
তুমি কার রমণী কার ঘরণী বল বল সত্যবাণী
ফের ধনি কিসের লাগিয়া
ধনি আমি তোমায় জিজ্ঞাসা করি, বল বল ও সুন্দরী
তোমার কিগো হইয়াছে বিয়া ॥

(তখন শ্রীকৃষ্ণের উত্তর ঃ)

শুন ওহে চাঁদ বদনী বলি আমি সত্যবাণী
ফিরি আমি বঁধুর লাগিয়া।
বয়েস হয়েছে বছর ষোল যৌবন আমার বয়ে গেল
এ পর্য্যন্ত না হল মোর বিয়া ॥
কুটিলা কয় ও সুন্দরী চল তুমি আমার বাড়ী
চিন্তা কর কিসের লাগিয়া।
আমার দাদার রূপ যেমন দেখা যায় কার্ত্তিকের মতন
তার সাথে আজ তোমার দিব বিয়া।
নাকেতে নলক দিব পায়ের পাতা মল লাগান
আমরা সবাই দেখব প্রেমের ঘটা।
ফিতা পাইরা শাড়ী দিব হাতে সোনার চুড়ি দিব
খোঁপায় দিব চিরণ আর কাঁটা ॥

(তখন শ্রীকৃষ্ণ উত্তর দিচ্ছে ঃ)

তোমার দাদার বাড়ী যাব তোমার দাদার নারী হব
তোমার দাদা পুরুষও নয় সোজা।
যদি তোমার দাদায় পুরুষ হইত মুখে তবে দাড়ি গজাইত
তোমার দাদা হবে বুঝি খোজা ॥

(কুটিলা রাগে উত্তর করে ঃ)

আমার দাদা খোজা হইল একথা তোরে কে বলিল
দেখনা ধনি দুই একদিন শুইয়া।
থাকলে আমার দাদার ঘরে ছেলে হবে তোর উদরে
আমার দাদার রূপে ভুলিয়া ॥

(নারীবেশী শ্রীকৃষ্ণ উত্তর দেয় ঃ)

তোমার দাদা এত পারে রাধা কেন জ্বলিয়া মরে
রাধা হল কুলের কুলবধু।
তোমার দাদার ঘরে রইল নারী. হইল ধনি রাই কিশোরী
নন্দের বেটা খাইল টাটকা মধু ॥

(মানভঞ্জন পালা) (নির্বাচিত অংশ)

[কৃষ্ণের বিরহে রাধা মুর্চ্ছাগেছে তখন বৃন্দে সখী রাধার কানে কৃষ্ণ নাম জপকরতে লাগল রাধার মুর্চ্ছা ভাঙ্‌ল।]

রাধা ঃ বৃন্দে তবে কি সত্যই আমার প্রাণ বন্ধু চলে গেছে?
(গীত) তোরা তো সব ছিলিস সখী
আমি না হয় মানে ছিলাম।
বৃন্দে ঃ দেখ্ রাই তখনি বলেছিলাম—
(গীত) মান করে মান হারাসনে রাই

মানের শেষে কাঁদতে হবে
মান করে মান হারস্‌নে রাই ৷৷

রাধা ঃ (গীত) বৃন্দে গো তোর পায়ে ধরি
এনে দে সেই বংশী ধারী।

বৃন্দে ঃ দেখ রাই আমি যদি কানুকে এনে দিই তবে তোদের যুগল চরণ আমার মস্তকে দিবি বল?

রাধা ঃ হ্যাঁ বৃন্দে আমি পায়ে ধরে তার কাছে ক্ষমা চাইব আর আমাদের যুগল চরণ তোর মস্তকে দিব।

বৃন্দে ঃ তবে আমি চল্‌লাম।

(গীত) চরণ ধুলি দেগো মাথায়
যাই চলে যাই মথুরাতে।

(উভয়ের প্রস্থান)

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকার সাথে মিলতে চলেছেন। শ্রীরাধিকা এদিকে শ্রীকৃষ্ণ দর্শন বিনে কাহিল। গতরাত চন্দ্রাবলীর কাছে শ্রীকৃষ্ণ কাটিয়েছেন খবরটি তার জানা, তাই বুঝি প্রাণ কাঁদে ঃ

একদিন শ্যামসখী রাই কমলিনী এমন শোকে উন্মাদিনী
বঁধুর শোকে পড়িল ধরায়।
তখন আসিয়া সকল নারী সদ্য ঘর সহচরী
কেন সখী ধুলাতে লুটাও।
সখী বন্ধুর জ্বালা সয়না প্রাণে গৃহ ধর্ম্ম নাহি মানে
বন্ধুর জন্য বিষাদে মগন।
বন্ধুর জন্য দিবানিশি গলে দিয়া প্রেম ফাঁসী
দেখ সখী নিকটে মরণ ৷৷
বন্ধুর জ্বালা সয়না প্রাণে গৃহ ধর্ম্ম নাহি মানে
বন্ধুর জন্য কাঁদি অনিবার।
আমার জ্বলে প্রাণ দিবানিশি গলায় দিয়া প্রেম ফাঁসী
নাহি সখী দুঃখের পারাপার ৷৷
আমি কুলের কুল ছাড়া প্রেম করিয়ে ঘটল জ্বালা
এই জ্বালা কেমন করে সই।
সখী বন্ধু যদি আমার হত তবে কি আমায় ছেড়ে যেত
মিছে বন্ধু আমায় পাগল করে তাই ৷৷
সখী বনের আগুন সবে দেখে মনের আগুন কেউনা দেখে
বন্ধুর প্রেমাগুনে মরি আমি পুড়িয়া।
আমি যখন যাইও জলে কুকিল ডাকে ডালে ডালে
আমার মনের কথা লয় সব কাড়িয়া ৷৷
যখন সখী কলসী কাঁখে চলি আমি যমুনার ঘাটে

কলসী আমার ভরে অশ্রুজলে।
সখী বন্ধু যদি আমার হত, অবশ্যই সে দেখা দিত
আর আসিবে কি আমি মইলে ॥

শ্রীকৃষ্ণ জানেন রাধার কাছে যাওয়া সহজ নয়। তাই আবার নারীবেশ ধারন করে আয়ান ঘোষের বাড়ীর কাছে যেতেই কুটিলার মুখোমুখি পড়ে গেলেন —

কৃষ্ণ রাধার মান ভাঙ্গিতে রমণীর বেশ ধরে
নানামতে করিল সাজন।
নিয়ে বাম করে ফুলের ডালা বিনা সুতায় গাঁথা মালা
হাতে নিয়ে অগুরু চন্দন ॥
কৃষ্ণ সাজিয়ে নবরূপসী মুখে মৃদু মধুর হাসি
কুঞ্জ পথে করিল গমন।
দেখা হয় কুটিলার সনে ব্যাধ যেন মৃগ সনে
কুটিলা তাই বলিছে বচন ॥
তুমি কার কামিনী মন-মোহিনী সত্য কথা কও শুনি
কি নাম তোমার কোথায় বসতি।
বল কেবা মাতা পিতা হয় দেহ সত্য পরিচয়
আর এ সংসারে কেহ নয় মোর পতি ॥
তখন কুটিলা কয় হাস্য করি, শুন শুন ও সুন্দরী
বয়স হইয়াছে বছর পনের ষোল।
আমার দাদা যেন গৌর বরণ দেখায় যেন বিজ্ঞের মতন
তার সনে তোর বিয়ার কথা রইল ॥
তখন কৃষ্ণ বলে শোনলো সই, তোরে দুটা কথা কই
তোর দাদারে বিয়া করতে আপত্তি কিছু নাই।
আমি যুবতী মাইয়া খোজার সঙ্গে আমার বিয়া
এমন কার্য্যে আমার ইচ্ছা নাই ॥

শ্রীকৃষ্ণ তখনকার মত বিদায় নেয়। কুটিলা বাড়ী ফিরে রাগে ঝাল-ঝাড়তে শুরু করল শ্রীরাধিকার উপর। শ্রীকৃষ্ণ সামনে কিছু বলতে না পেরে রাধার উদ্দেশ্যে শুরু করল ঃ

কেঁদে কুটিলা তাই বলে
ও বউ বলি যে তোরে
জল আনিবার ছলা করে
যাইস না লো কদম্বতলে,
পাড়ার লোকে কত মন্দ বলে তাই।
আমার দাদা বড় সাদা
সাদা মনে দিলি কাদা
ওহে কলঙ্কিনী রাধা।

মাথায় কেটে টেরী-পাকা-রাস্তা।

(ও) দাদা ব্যথাপেতে থাকে
বাড়ীর খবর সে কিছু না রাখে
দাদার আপন জমি পরে চষে
দাদা মধুর মধুর হাসে,.
আমার এসব দুঃখের কথা
কইবা কারই কাছে।

এতে রাধাকে আটকে রাখা যায়? "ঘরে গুরুজন, ননদী দারুণ তাই বিলম্বে বাহির হৈনু" ব্যাপার। কুটিলার গালমন্দে তার কিবা আসে যায়? শ্রীরাধিকা এরপর বিলাপ শুরু করে :

কোন বনে বাঁশী বাজায়
চল সখী দেখে আসি
বাঁশী বাজে যেথায়।
নিদেন কহিব কথা
ঘুচাব মনের ব্যথা
বাঁশী ডাকে প্রাণসখী
আমার প্রাণ বুঝি যায়
কোন বনে বাঁশরী বাজায় ॥
বাঁশী বাজে একই তানে
যার যেমন সেই শোনে
চল সখী দেখে আসি
বাঁশরী বাজে যেথায়

কৃষ্ণের দেখা না পেয়ে শ্রীরাধিকা এবার বিলাপ নয়, শুরু করে প্রলাপ —

আর ত নিষ্ঠুর নাই
সখী আমার প্রিয়ার মত
আরত নিষ্ঠুর নাই।
ওগো কালিয়া কালিয়া বিষম কালিয়া
কে বলে কালিয়া ভালো
কালিয়ার সনে পীরিতি করিয়া
কাঁদিতে জনম গেল।
(ওগো) সুবর্ণ বলিয়া করাত যেমন
আসিতে যাইতে কাটে।
(ওগো) কালিয়ার পীরিতি শুন বৃন্দাদূতী
কহিতে মরম ফাটে ॥
(ওগো তাইতে তাকে নিষ্ঠুর বলি)
ওসে নিঠুর কুলের শিরোমণি

তাইতে তাকে নিঠুর বলি।

শ্রীকৃষ্ণ এসেছে। চাঁদবদনী রাধার দেখা মিলেছে। কিন্তু, রাধা মান করে বসে। কোন জবাব দিতে পারে না। সখীরাও দেয় না! শ্রীকৃষ্ণের মোহন বাঁশী সে সময়ে বিষাদ সাগরে ডুব দিয়ে ওঠে ঃ

রাধা রাধা বলে বাজ রে আমার সাধা বাঁশী
একদিন বাঁশী বেজে ছিলে বাজত বাঁশী রাগিনী ধরে।
স্রোতে বয়েছিল উজান কুলে
বাজত বাঁশী রাধা বলে।
বাঁশীতে করেছি রাধা নাম সার—
রাধা নামে তাই বাঁধা মোর প্রাণ।
প্রেম ভরে উচ্চৈস্বরে
বাজত বাঁশী রাধা বলে।

শ্রীরাধিকার মান ভীষণ। সেও ব্যথা দিতে জানে! মুখ ফিরিয়ে থাকে। তখন শ্রীকৃষ্ণকে বাধ্য হয়ে বলতে হয় ঃ

তবে আমি যাই, যাইগো রাধে
আর ত দেখা হবে না গো।
যাই বলে জন্মেরই মতন
তবে আমি যাই গো যাই।
তোমার সাথে আমার সাথে
দেখার কথা লেখা নাই
আর ত দেখা হবে না গো
দেখে নাও জন্মেরই মতন ॥

পূর্ববঙ্গের প্রচলিত 'কৃষ্ণলীলা' পালা গানগুলি জনপ্রিয়তা পায়। রাধা কৃষ্ণের মান অভিমানের পর উভয়ের মিলনের পর্বটি লক্ষণীয়। শাশুড়ী জটিলা আর ননদ কুটিলার খর দৃষ্টির মধ্যে [illegible]কে শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের কাছে কি ভাবে যাবে তাই সমস্যা।

তখন শ্রীকৃষ্ণের বয়স তের কি চোদ্দ। নন্দঘোষের বেটা ক্ষীর ননী, ছানা মাখন চুরি করে খাওয়ার দুরন্তপনায় অস্থির পাড়া পড়শী। মাঠে গরু চরায় ব্রজ রাখাল বালকগণ। এক সুপ্রভাতে তার হাজির শ্রীকৃষ্ণ নিয়ে যাবার জন্য ঃ

বসিয়া মায়ের কোলে
ননী খেতে খেতে দোলে
ও হেন কালে শ্রীদাম গিয়ে
বলে কানাই রে।
চল বনে যাই, বনে যাই
মোরা গোধন চরাতে
চল বনে যাই, বনে যাই
ও প্রাণ কানাইরে ॥

তখন নন্দরাণী বলে বাণী শ্রীদামে রে
যেতে দিব না, যেতে দিব না
আমার প্রাণগোপাল আমি
যেতে দিব না ॥
আমি কুস্বপ্ন দেখেছি রাত প্রভাতে
যেন প্রাণ গোপাল হারা হ'য়ে
কাঁদি আমি পথে পথে।
যেতে দিবনা, আমার ননীর পুতুলি গোপাল
বনে যেতে দিবনা — আমি যেতে দিব না।

তখন শ্রীদাম বলে, —
হে মা নন্দরাণী, তোর নীলমণি সামান্য নয়
কত লীলাখেলা দেখিবে মা কদম্বতলায়।
শ্রীদাম কহিছে বাণী
শুন গো মা নন্দরাণী
নিতি নিতি যাই মোরা বনে (মা গো)
ও তোর কানাইর সনে মোরা
বনে যে যাই গো।
মোহন মুরলী স্বরে
তোর গোপাল গান করে
এমন গান আর কখনও
শুনিনি মা গো।

শুনিয়া বাঁশীর গান
যমুনা-জল বহে উজান
মুনিগণে ক্ষতি করে ধ্যান
তারা ধ্যান যে করে না
মাগো তোর গোপালের গানে
তারা ধ্যান যে করে না।

শ্রীদামের কথা শেষ না হতে ব্রজরাখালগণ বলে উঠল সমস্বরে ঃ
স্বর্গ হতে ঐরাবতে
ব্রজ হতে স্বর্গপথে
কোন্ দেবতা চিনতে না পারি মা গো।
আসিয়া গোপালের আগে
স্তব করে কত ভাগে

কোন্ দেবতা চিনতে না পারি মাগো।
চতুর্ম্মুখ একজন
হংসপৃষ্ঠে আরোহণ
কোন্ দেবতা চিনি না কখনও মাগো,
ও তোর গোপাল চেনে, তুমি চিন না কী মা?
আমরা তাকে চিনি না
(ও) তারে আমরা কেউ চিনি না।

নিমাই সন্ন্যাস ঃ

শ্রীচৈতন্যদেবের সন্ন্যাস যাত্রা উপলক্ষ্য করে রচিত। শ্রীচৈতন্যকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরই অংশোদ্ভুত বলেই আমরা মনে করে নিয়েছি। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে একই আসনে বসিয়ে তাঁকে পূজো করি। সেজন্য কৃষ্ণলীলা গানগুলির মধ্যে শ্রীগৌরাঙ্গকে শ্রীকৃষ্ণের রূপে দেখানো হয়েছে। তাই —

হরি নামে ভোলা
অঙ্গে মাখে ধুলা
(কেবল)বোল হরি বোল হরি
হরি হরি বল
(ওসে) ঔষধে মানে না
ভাবেরই পাগল।

রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি একই আসনে বসে আছেন। বিবেক এসে গান ধরে ঃ

আইজ ক্যানে গো নিধুবনে কিশোর কিশোরী সনে
পুষ্পনিদ্রায় সুখ নিদ্রা যায় গো।
মেঘের আড়ে সৌদামিনী কোটি চাঁদের রিনিঝিনি
পুষ্প শয্যায় সুখনিদ্রা যায় গো।

চৈতন্যদেবের বাল্যলীলা থেকে সন্ন্যাসযাত্রা পর্যন্ত শুরু হয় পালাগান। নবদ্বীপের বিখ্যাত পণ্ডিত ব্রাহ্মণ জগন্নাথ মিশ্রের ঘরে চৈতন্যদেব জন্মগ্রহণ করেন।

বাল্যকাল তার শ্রীকৃষ্ণের মতই দুরন্তপনায় কাটে। গঙ্গার ঘাটে কুমারী মেয়েদের সূর্য পূজা, নারায়ণ পূজা করার সময় নিমাই এসে হাজির হয়। তাদের নৈবেদ্য থালা থেকে টপাটপ তুলে মুখের ভিতরে পুরে দেয়। ব্রাহ্মণরা বলে, ঃ

এইটা বুজি সেইটা হবে
জগন্নাথ মিশ্রের কুপুত্রটা
এইটা বুঝি সেই টা হবে।

ওরা আরও বলল, ওরে বাপু এগুলো ত গিললে, কিন্তু ভগবানকে নিবেদন করে দিয়েছ ত?

অপর এক ব্রাহ্মণ উত্তর করে ঃ

ও সে সন্ধ্যা পূজা দূরের কথা
নিবেদনই জানে না।
নিমাই-এর বন্ধুবর নিতাই উত্তর দিল
ও সে নিজে হইল নারায়ণ
কারে করবে নিবেদন?

এভাবে বাল্য কাটল, কৈশোর ছেড়ে যৌবন এল। শচীমাতা ছেলেকে রূপসী মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিলেন। ছেলে সংসারী হবে। কিন্তু, জগতের মানুষজন থেকে কীটপতঙ্গ পর্যন্ত তাকে সর্বক্ষণ কাছে ডাকে। সংসারের মায়া তাকে ধরে রাখতে পারে না। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই নিমাই সন্ন্যাসী হবার চিন্তায় বিভোর হল। অথচ দুঃখিনী মা এবং যুবতী স্ত্রীকে ফেলে যেতেও মন চায় না। নাটকীয় এই মুহূর্তটিকে পল্লীকবি বিবেক চরিত্র সৃষ্টি মারফৎ শ্রোতা ও দর্শকদের কাছে উন্মুক্ত করেন ঃ

একদিনেতে নিমাই চাঁদ, বলে শচী
শুন মাগো আমারি বচন।
মাগো আমি যাবো সন্ন্যাসেতে
বিদায় দাও গো ভাল চিত্তে
আমার মনে এই আছে আকিঞ্চন ॥
তখন ইহা শুনি শচীরাণী
হইলেন যেন পাগলিনী
আঁচল দিয়া মুছে দুনয়ন।
বাছা তোমারে বিদায় দিয়া
কেমনে ধরিব হিয়া
তুইরে আমার জীবনেরই জীবন ॥
(ওগো) একদিনেতে রজনীতে
নিমাই চলে সন্ন্যাসেতে
খুলিল সব অঙ্গের আভরণ।
তখন রাখিয়া সব বসনগুলি
মাথায় বেঁধে নামাবলী
মনের সুখে করিল গমন ॥
(ওগো) নিমাই যখন বাহির হ'ল
বিষ্ণুপ্রিয়া ঘুমে ছিল
উঠে প্রিয়ে করে হাহাকার।
প্রিয়ে শিরে হানে করাঘাত
কোথা গেল প্রাণনাথ
সোনার নদে করে অন্ধকার ॥
(ওলো) তোরে আমায় আনাথিনী
ছেড়ে গেছে বনমালী

মম ভাগ্যে এই ছিল বিধাতা।
শিরে হানে করাঘাত
কোথা গেল প্রাণনাথ
শচীমাতা বুঝায় কত কথা ॥
তখন বিষ্ণুপ্রিয়া শচীমাতা
কাঁদিয়া ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছাগত হয়।
ডাকে রাণী নিমাই নিমাই
প্রতিধ্বনি নাই নাই
ইহা শুনে পড়িল ধরায় ॥

গভীর রাত। দুধে ধোয়া জোছনার রাতের থমথমে ভাব। আবাল্যের বাসভূমি, জননী ও যুবতী স্ত্রীকে ছেড়ে যেতে গিয়েও ফিরে আসার অর্ন্তদ্বন্দ্ব ভাবটা পল্লীকবির গানের মধ্যে অপূর্বভাবে ফুটে ওঠে—

আমি যাই যাই মনে করি
যাইতে না পারি
মায়া মোহ রূপ মোরে
পিছনেতে ধায়—।

কিন্তু, অন্তর্দ্বন্দ্বে জয়ী হয়ে নিমাই শেষে বেরিয়ে আসেন বাইরে। বাইরে আকাশ বাতাস মিলে মিশে অভ্যর্থনা জানায় সম্মিলিত কাকলীতে।

ভোরের আলো ফুটতে বাড়ীতে ওঠে কান্নার রোল। বিষ্ণুপ্রিয়া ও শচীমাতার আকুল কান্নায় পাড়ার লোক জড়ো হয়। গাছের পাখিরা সমবেদনা জানায় তাদের সুরে। শচীমাতা বিষ্ণুপ্রিয়াকে বুকে জড়িয়ে বেদনা বিধুর হয়ে ভেঙ্গে পড়েন।

বিষ্ণুপ্রিয়া অভাগিনী। এ জনমে শুধু নয়। সত্য ত্রেতা দ্বাপর এবং এই কলিকালেও একই রকম তার দুঃখ কষ্ট। বিষ্ণুপ্রিয়ার সেই মানসিক বিপর্যয় অবস্থা পল্লীকবির ভাষায় বর্ণিত হয় ঃ

শচীমাতাগো, আমি চারি যুগে হই
জনম দুঃখিনী।
আমার দুঃখে দুঃখে জনম গেল
কভু না হলাম সুখিনী ॥
সত্যযুগে ছিলাম আমি মাগো
সত্যনারায়ণী।
দুর্ব্বাসার অভিশাপে আমি
হইলাম মর্তবাসিনী ॥
শচীমাতাগো আমি চারিযুগে হই
জনম দুঃখিনী।
আমার দুঃখে দুঃখে জনম গেল
কভু না হইলাম সুখিনী ॥

ত্রেতা যুগে ছিলাম আমি মাগো
রামের ঘরণী।
বাদী হইল কৈকেয়ী মাতা
(আমায়) করল বনবাসিনী ॥
শচীমাতাগো আমি চারি যুগে হই
জনম দুঃখিনী।
দুঃখে দুঃখে জনম গেল
আমি কভু না হইলাম সুখিনী ॥
দ্বাপরেতে ছিলাম আমি মাগো
আয়ান ঘরণী।
শাশুড়ী ননদী বাদী আমায়
করল কৃষ্ণ কলঙ্কিনী ॥
শচীমাতা গো........................
কলিযুগে হইলাম আমি মাগো
গৌরাঙ্গ ঘরণী।
অকালে ছাড়িল পতি মাগো
আমি বড় মন্দ ভাগিনী ॥

অপূর্ব ছন্দে গাথাঁ বিষ্ণুপ্রিয়া ও শচীমাতার জন্য সমবেদনা মূলক গীতি আমাদের মনকে আপ্লুত করে।

সুবল মিলন ঃ

কৈশোর কাটিয়ে যৌবনের দ্বারে এসে শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর বন্ধু বান্ধবের একসময় নজরে পড়ে সুবর্ণ কলসী কাঁধে রাধিকা সুন্দরী শতাবধি সখী নিয়ে চলেছে যমুনার ঘাটে। তখন শ্রীকৃষ্ণ, সখা সুবলকে ডেকে বলছেন ঃ

চেয়ে দেখ দেখরে সুবল
কার বা কুলের কুল বউ
কলসী লয়ে যায় যমুনায় (রে)।
কোন নিঠুর পাঠায়েছে হেথায়
দয়া নাই কি তার হিয়ায়
ও তার রূপ সায়রে উজান বয়ে যায় (রে) ॥
ও সে কলসী কাঁখে চলে যখন
বৃক্ষের তলে বসে তখন
বাজাই আমার সাধের বাঁশী।
রাধা আমার প্রাণ প্রেয়সী ॥
চেয়ে দেখ দেখরে সুবল
কার বা কুলের কুল বউ
কলসী লয়ে যায় যমুনায়।

শ্রীকৃষ্ণ রাধার জন্য উতলা এই ভাবটা বিবেক সব সময় পদ্যেই প্রকাশ করে থাকে ঃ

গহন কাননে সুবলেরই সনে
করিত বিনোদ খেলা
আনিয়া সুবল চম্পকেরই দল
মনোহরে গাঁথে মালা ॥
মালা করি করে কহে গিরিধরে
নেরে নেরে ফুলমালা
অতি অনুপম চম্পকেরই দাম
পরবে কানু গলে ॥
গহন কাননে সুবলেরই সনে
করিত বিনোদ খেলা।
ওগো তুষেরই অনল জ্বালালি সুবল
ব্যথা জাগাইলি মনে ॥
একবার তারে এনে দে ভাই
রাধা বিনে প্রাণ যায় গো
একবার তারে এনে দে ভাই ॥
আমি চিরদাস হবো
একবার তারে এনে দে ভাই ॥

শ্রীকৃষ্ণের যখন 'রাধা বিনে প্রাণ নাহি বাঁচে' অবস্থা। সেসময় সুবল এক ফন্দি এটে একটা বাছুর নিয়ে আয়ান ঘোষের বাড়ীর ভিতর ঢুকে পড়ল। তাতে ফল কি হল ঃ

সুবল ভাবিয়া ভাবিয়া বৎস কোলে নিয়া
মহাল ভিতরে চলে।
দেখিল তখনি আছে সুবদনী
বসিয়া রন্ধন শালে ॥
ওগো কুটিলা তখন কে রে কে রে করি
ধাইল সুবল পানে,
'ও তুই কে রে?'
মোদের বউকে নিতে এলি বুঝি
'ও, তুই কে রে?'
দূর চলে যা—
দূর চলে যা—

সুবল কিন্তু সহজে যায় না। বাছুরকে না নিয়ে সে যাবেনা। কুটিলা ভীষণ রেগে মা জটিলাকে ডাকতে গেলে রাধাও প্রস্তুত। সুবলের হলদে কাপড় চট করে পরে ধেনুসহ বাইরে চলে যায়। যেখানে প্রতীক্ষায় বসে শ্রীকৃষ্ণ গুণমনি। এদিকে সুবল রাধার লাল কাপড় পরে মাথায় ঘোমটা দিয়ে রাধা সেজে রান্নাঘরে বসে। জটিলা কুটিলা ফিরে এসে দেখে রাধাও নেই, সুবলের বাছুরও নেই। তার বদলে সুবল রাধা সেজে বসেছে। মা আর মেয়ের

মধ্যে চলে বাক বিতণ্ডা। জটিলা কুটিলাকে দোষ দিতে শুরু করে ঃ

ও তোর কুটিলতা ছাড় কুটিলে
কুটিলতা ছাড়।
তুই কুটিলে জানিস ফন্দি
তার চেয়ে যে ওর বিষম সন্ধি
(ও তুই কুটিলতা ছাড়)।
সুবল সেজে রাধা গেল—
কি করলি তার?
ও তুই কি করলি তার?
(ও তুই কুটিলতা ছাড়)।

শ্রীরাধা হল কুলের কুলবধু। শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছে যায় শ্রীরাধিকাকে স্নানরত অবস্থায় দেখবে। তাই সে কদম গাছের ডালে বসে বাঁশী বাজাতে শুরু করে। ব্যাপারটা কুটিলার নজর এড়ায় না। বাড়ী এসে রাধাকে নিষেধ করে যমুনার ঘাটে না আসতে। যমুনায় ভারী অদ্ভুত জীব এসেছে। শিশু কিংবা বৃদ্ধা স্ত্রীলোক গেলে কিছু বলবেনা। যুবতী স্ত্রীলোক গেলে আর রক্ষে নেই। তখনি তাকে জলের মধ্যে টেনে নিয়ে যাবে। পল্লী কবি কুটিলার মনের ভাব প্রকাশ করেছেন ঃ

একদিন শ্যাম নীল দলে রাধা বদন হেরব বলে
ধীরে ধীরে চলে শ্যাম রায়।
গিয়ে যমুনার কদম্ব মূলে দাঁড়াল কুতুহলে
কুটিলা তাই দেখিবারে পায় ॥
কুটিলা কয় শোনলো বউ জল আনতে যাইশনা লো কেউ
ব্রজের যত আছে ব্রজাঙ্গনা।
কাল কুম্ভীর এল যমুনাতে দেখে এলাম স্বচক্ষেতে
তাইতে তোদের যেতে করি মানা ॥
কে দেখেছে কোন কালে কুম্ভীরেতে মানুষ পেলে
কখনও কি কেউরে ছেড়ে দেয়।
সে যে বাইছা বাইছা করে আহার তাই দেখে লাগে চমৎকার
বাল্য বৃদ্ধা কিছু নাহি খায় ॥
পুরুষ যদি যায় যমুনায় অমনি কুমীর ভয়েতে পালায়
আড়ালে থাকিয়া লক্ষ্য করে।
যায় যখন যুবতী বালা অমনি এসে ধরে গলা
নিয়ে সে হরিষ অন্তরে ॥
তোরে নিত্য নিত্য করি মানা জলের ঘাটে মোটেই যাইশ না
আমার কথা শুনিশ না বউ মোটে।
তোরা নয় জনাতে যুক্তি করে সন্ধ্যাকালে যমুনাতে

জল আনতে যাস কদম তলার ঘাটে ॥
আছে ঐ পাড়ার ঐ কতকগুলি কুলে মানে দিচ্ছে কালি
সেই দলে বউ করিস আনা গোনা।
কত ছেদার গোদার বেতাল দলে, লেংটা হয়ে নামে জলে
ও বৌ চোখ থাকতে হ'স কেন কানা ॥
বশীকরণ মন্ত্রের জোরে ভুলায়ে আমার দাদারে
আমারে ভুলান বড় দায়।
ভেবে নলিনী কয় যুক্ত করে রাধা রূপে জগৎ ভরে
গঙ্গার জলে শুয়ে লোহায় ॥

কলঙ্ক ভঞ্জন ঃ

শ্রীকৃষ্ণ কেমন ভাবে শ্রীরাধিকার কলঙ্ক মোচন করেছিলেন সেই নিয়ে কলঙ্ক ভঞ্জন পালা। শ্রীরাধিকা কুলের কুল বধু হয়ে অপর পুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে ভালবেসেছিলেন তবু জগতের কাছে তিনিই হলেন শ্রেষ্ঠ সতী।

শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণ দরশন মানসে সাজ সজ্জা করে বের হচ্ছেন ঠিক সে সময় ননদী কুটিলার কাছে ধরা পড়ে গেলেন।

কদিন পর রাধা কৃষ্ণের মিলন। দুজনে দুজনের মনের কথা বলতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন এমন সময় বৃন্দা দুতী হাজির হয় ও পরিহাসচ্ছলে বলে,

বলিতেছি শুন রাধে কোথা কেবা শোভে চাঁদে
বিপরীত হেরিতেছি তাই কানু বিবাদে ॥
তোদের ভাবের গতি বুঝতে নারি।
তোরা কোন ভাবেতে বিভোর হলি ॥
শুন বলি রাই।
চন্দ্র বিনা কুমুদিনী
শোভা নাহি হয় যেমনি
নীল বিনা নীলমণি
শোভা পায় কি রাই।

শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে অভিমান করে বসে রয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণ কদম তলায় বসে বাঁশী বাজাতে থাকেন। বৃন্দাদুতী রাধার সংবাদ নিয়ে হাজির হয় ঃ

কে আছ, কে আছ তুমি দাঁড়িয়ে কদম্ব মূলে
দেখলে তোমার ও চাহনি জ্ঞান হয় না লো ভাল বলে।
কি আছে তব অভিপ্রায় ভাবে বোঝা যায়
নইলে কেন থাকবে একা কদম্ব তলায়
তোমায় ছাড়িব পরিচয় পেলে।

অন্যদিকে শ্রীরাধিকা শ্যাম বিরহে বিরহিনী। দিন আর কাটে না দয়িতের তরে। বৃন্দা দুতীর কাছে শোনা ঃ

নানা জাতি ফুলে কুঞ্জ বন করে আলো
(সখী) বিফলে সকলি গেল
বিনা সে চিকন কালো।
সখী আর কি আসিবে শ্যাম ॥
কৃষ্ণ বলে কাঁদতে কাঁদতে
কৃষ্ণ সেবায় দাসী হয়ে
দিন কি আমার এমনই যাবে।

শ্রীরাধিকার যখন এমনই আকুল অবস্থা, কুঞ্জবন ব্যথায় ব্যথিত, শুক-শারী গান গাহে না, বাতাস মৃদু ভাবে বহে না, তরুলতা নিম্নমুখী, সব কেমন নীরব, স্থাবর জঙ্গম সব একাকার হয়ে নিস্তব্ধতায় বিরাজ করছে, সেসময় শ্রীকৃষ্ণের উদয় কুঞ্জ পথে ঃ

গঙ্গা কেন বিমুখী আজ
সাগর সঙ্গমে।
শুকের মুখ দেখে না শারী
সুখ নাই তার মরমে ॥
ময়ূর ত্যজে ময়ূরিণী
ভ্রমরা ত্যজে ভ্রমরিণী
মেঘ ত্যজে চাতকিনী
কি ব্যতিক্রমে ॥

রাধিকার ঘরে শাশুড়ী ননদিনীর জ্বালা যন্ত্রণায় সবাই বলে ঃ

(আমায়) সবে বলে রাধা কলঙ্কিনী।
কভু বৃন্দাবনে খেলি বৃন্দাসনে
দেখে দেখে হাসে আর
পোড়ারমুখী ননদিনী।

ব্রজধামে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা সর্বজন বিদিত। কিন্তু, এমন করে ঘরে দিনের পর দিন কষ্টে কাটান অসম্ভব ব্যাপার। শ্রীকৃষ্ণ শেষ পর্যন্ত ঠিক করলেন যে ভাবেই হ'ক রাধাকে জগতের মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ সতী প্রমাণ করবেনই। একদিন তাই এক কঠিন অসুখের ভান করে ঘরে পড়ে রইলেন। পাড়া শুদ্ধ লোক এসে হায় হায় করতে লাগল। নন্দরাণী কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। জটিলা কুটিলা রাধার শাশুড়ী ননদের মুখে হাসি, তাদের মনস্কামনা সিদ্ধ ঃ

এমন দিন আর কি হবে
কালীর কৃপায় আমোদ ভারী।
চলে গেছে আপদ বালাই
কেষ্টা গেল যমের বাড়ী ॥
মা গো মা কি বুকের পাটা
বাধিয়ে ছিল কম কি লেঠা
ছুঁড়ীগুলো ছুটত ভাটা
বাজলে বনের পাপ বাঁশরী ॥

নন্দরাণী হায় কি নাকাল
রাখালগুলো হল বেহাল
নন্দ মিনসে পথের কাঙ্গাল
দেখে মাইরি হেসে মরি ॥

সংবাদ পেয়ে মাঠ থেকে ছুটে এল রাখাল বালকগণ, নন্দরাজ, প্রতিবেশী রোজা ও বদ্যি কেউই বাদ নেই। কিন্তু অসুখ ভাল হবার কোন লক্ষণই দেখা যায় না। নন্দরাণী হায় হায় করে ওঠেন। নন্দ ঘোষ শোকে অধীর। এমন সময় ঘটনাস্থলে এসে হাজির হয় এক নতুন বৈদ্য। তিনি সব শুনে এক নূতন বিধান দিলেন, সহস্রাধিক ছিদ্র কোন কলসীতে করে যমুনার ঘাট থেকে যদি কোনো সতীনারী জল নিয়ে আসতে পারে, তবে সেই জলে স্নান করে কৃষ্ণ রোগ মুক্ত হবে।

প্রথমটায় কেউই রাজী হয় না। একে এক নন্দরাণী থেকে পাড়া প্রতিবেশী সবাই চেষ্টা করে। কিন্তু ফল একই। তখন খোঁজ পড়ে পাড়ার ডাঁক সাইটে সতী জটিলা ও কুটিলার। কিন্তু তারাও হার মানে। সবাই বলা বলি করে দৈবজ্ঞের অসম্ভব কথা নিয়ে।

দৈবজ্ঞ-বৈদ্যকে আবার গুণতে বসতে হয়। তিনি গণনা করে বলে দিলেন, এ গ্রামে রাধা নামে যদি কোন নারী থাকে তবে তাকে আনা হোক, সেই জল অনতে পারবে। দৈবজ্ঞের কথায় সব চাইতে রুষ্ট হয় রাধার শাশুড়ী ননদ। কিন্তু, তবু দৈবজ্ঞের কথায় তাকে ডাকতে হয়।

এদিকে শ্যাম বিরহানলে জ্বলে মরছে শ্রীরাধা। সে বসে বসে আক্ষেপের সঙ্গে বৃন্দার কাছে গান করছে —

আমি তারে পেলেম কই
জ্বলে মলাম সই।
শ্যাম বিরাহানলে
আমি ঘরে জ্বালা সই।
সই, আর পাব কি প্রাণ গেলে
আমার সকল জ্বলায় শান্তি হত
শান্তিময়ের চরণ পেলে।

শ্রীরাধিকা এ খবর পেয়ে উন্মাদের মত ছুটতে ছুটতে এসে হাজির হয় ঘটনাস্থলে। অথচ হাব ভাবে গোপন রাখার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করে সে। দৈবজ্ঞের আদেশ অনুসারে নীরবে শ্রীরাধিকা ছিদ্র কলসী নিয়েই চলে যমুনার তটে। আর চিন্তায় অস্থির হয়ে পড়ে সহস্র ছিদ্র কলসীতে কি করে জল আনবে? ভরসা মাত্র শ্রীমধুসূদন। তাই যমুনার ঘাটে বসে আকুল আবেগের সঙ্গে গান ধরে ঃ

আমি বইস্যা রইলাম
যমুনার কিনারে, কানাইরে।
পার কর অবলা রাধারে ॥
আমি ছিদ্র কলসী নিয়া আইলাম
তোমারই ভরসাতে।

আমার মনবাঞ্ছা পূরণ কর
বাঁচুক প্রাণনাথে ॥

শ্রীরাধিকার পক্ষে জল সত্যি আনা সম্ভব হল ঐ ছিদ্র কলসীতেই। শ্রীকৃষ্ণ সেই জলে স্নান করে আরোগ্য লাভ করলেন। জটিলা কুটিলার মুখে চুনকালি পড়ল শ্রীকৃষ্ণ লীলা খেলার মাধ্যমে শ্রীরাধিকার কলঙ্ক ভঞ্জন করে 'শ্রেষ্ঠ সতী' হিসাবে জগতে প্রমাণিত করেন।

কংস বধ ঃ

দৈত্যরাজ কংসকে নিধন করার জন্য শ্রীকৃষ্ণের মর্ত্যে আগমন। দৈত্যরাজ কংস শ্রীকৃষ্ণ জন্মের পর থেকেই তার প্রাণ সংহারের চেষ্টা করে আসছেন। কিন্তু, তার সমস্ত চেষ্টাই বিফল হয়ে পড়ছে। রাজদরবারে বসে তিনি গভীর চিন্তায় পড়লেন, কি করে এই কাজটা সমাধান করবেন। এমন এক চরম মুহূর্তের গান ঃ

আমি বলতে পারি ব্রজের সমাচার
তুমি যা ভেবেছ, তাই হয়েছে
চমৎকার ব্যাপার।
আমি বলতে পারি ব্রজের সমাচার
প্রাণের ভয়ে ভীত হয়ে
হৃদয় ভরা হিংসা লয়ে
জলে দেবকীর পুত্র লয়ে
তবু বাঁচিল অষ্টম সন্তান।
তোমাকে বধিবেন যিনি
গোকুলেতে আছেন তিনি ..
শুধু প্রাণটুকু নিয়ে তিনি
যাবেন স্বর্গদ্বার।
আমি বলতে পারি ব্রজের সমাচার ॥

কংস রেগে অগ্নিশর্মা। আর ধৈর্য্য রাখতে না পেরে নন্দগোপের পুত্র কৃষ্ণকে এক মল্লযুদ্ধে ডেকে আনতে আদেশ করেন। ডাকসাইটে মল্লবীর চানুর এবং মুষ্টিক শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মল্লযুদ্ধে অবতীর্ণ হল।

মহাধার্মিক ঋষি অক্রুর শ্রীকৃষ্ণকে আনতে যাবেন। অক্রুর কিন্তু সহজ সরল মানুষ। শ্রীকৃষ্ণ ব্যাপারটা আগে থাকতে জানতেন। তিনিও সুযোগ খুঁজছিলেন এই অছিলায় বৃন্দাবন ছেড়ে চিরদিনের জন্য মথুরার দিকে যাবেন। শ্রীকৃষ্ণ অক্রুরের রথে চড়ে রওনা দিলেন মথুরার [illegible] সে খবর বৃন্দাবনের ঘরে ঘরে আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল। দেশ বিদেশের লোক [illegible] এল শ্রীকৃষ্ণকে শেষবারের মতন চোখের দেখা দেখতে। শ্রীরাধিকার কানে এই [illegible]দায়ক মর্মান্তিক খবরটি পৌঁছতে তিনিও খুবই ভেঙ্গে পড়লেন। শ্রীরাধিকা বুঝতে পারলেন, শ্রীকৃষ্ণ তাকে জন্মের মত ছেড়ে চলেছেন। শ্রীরাধিকার মনের অবস্থা এবং সমগ্র বৃন্দাবনের অবস্থা কি রকম হয়েছিল, পল্লীকবি তার সরল সহজ ছন্দে শ্রীকৃষ্ণের এই বিদায় দৃশ্য যে ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তা এক মাত্র পদাবলী সাহিত্যের সঙ্গে তুলনীয় —

একদিন অক্রুরের রথে চড়ি শ্রীকৃষ্ণ যায় মধুপুরী
বৃন্দাদূতী বলিছে রাধায়।
রাইগো তোমার প্রাণের বন্ধু গোপীশ্বর জগবন্ধু
(আজি) রথে চড়ে গেল মথুরায় ॥
পেয়ে খবর কমলিনী সঙ্গে নিয়ে সব গোপিনী
উদয় হল যথা দয়াময়।
গিয়ে রাধিকা কয় বিনয় করি যাও যদি শ্যাম মধুপুরী
(ব্রজ) গোপিনীর কি হবে উপায় ॥
সব গোপিনী করযোড়ে বলে সারথি অক্রুরেরে
ব্রজের জীবন নিওনা নিওনা।
মুনি এখানেতে রথে বসি দেখাও মোদের জীবন পাখী
প্রাণের পাখী বিনে প্রাণত বাঁচেনা ॥
ব্রজে আমরা যত গোপনারী সবাই ঐ পদের ভিখারী
পূজি মোরা ঐ যুগল চরণ।
আমরা ফুল চন্দনে সাজাইব হিয়ার মাঝে বসাইব
দেখব বঁধুর ও চন্দ্রবদন ॥
বলতে বলতে গোপীগণে ধরে রথের চাকা টেনে
রথের অশ্ব ধরে কমলিনী।
বলে বন্ধু তোমার বাঁশরী সুরে রমণীর মন হরণ করে
বঁধু জন্মের মত বাজাও একবার শুনি।

শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গিয়ে কংসকে নিধন করে সেখানকার রাজা হলেন। বৃন্দাবন লীলা শেষ।

কংস বধ গীতিনাট্যের এখানেই পরিসমাপ্তি।

গোষ্ঠ লীলা (কৃষ্ণযাত্রার গান)

কৃষ্ণ (গীত) ঃ দে দে আমায় সাজায়ে দে মা
গোষ্ঠে যাবার সময় হ'ল
দে দে আময় সাজায়ে দে মা
গগনে উঠিল ভানু
চূড়া বেঁধে দে নূপুর বেঁধে দে
হাতে দে মা মোহন বেনু ॥
ডাকিছে সুবল ডাকিছে সুদাম
শ্রী মধু মঙ্গল দাদা বলরাম
দুয়ারে দাঁড়িয়ে ডাকে—
অবিরাম নবলক্ষ ধেনুগণ

দুয়ারে দাঁড়িয়ে ডাকে ॥

বৃন্দের গান ঃ লাটাই ধরে টান দেনা রাই
টানে টানে আসবে কানাই ॥

বৃন্দে ঃ রাধে রাধে কেন কাঁদিস সখী তোর বন্ধু এল বলে।

(গীত) ওই তো শ্যামের বাঁশী বাজে
ও ধনি, তুই কান পেতে শোন্
ওই তো শ্যামের বাঁশী বাজে ॥

রাধার গান ঃ কেবা তার পর নাহি তার উপর
(কুটিলাকে) পরাৎ পর পরম ব্রহ্ম তুমি।
যে ভাবে পর সেই হয় পর
পর নহে তার কেহ ॥

(রাধার হাতে মালা কৃষ্ণকে পরাবে)

রাধার গান ঃ আমায় পাগল করেছে বনমালি।
মুরলীর তানে কবে আনমনে
আপ্নারে দিয়েছি ডালি।
পাগল করেছে বনমালি ॥
পাতায় পাতায় বাজে ঐ সুর
আমার হৃদয় ওই নামে ভরপুর।
দিশেহারা হয়ে আমি খুঁজি হে হৃদয় স্বামী
নিশিথে নয়ন দুটি ঝুরে ॥
আমায় পাগল করেছে বনমালি ॥
প্রেমময় ও বনমালি ॥
তোমারি চরণে আমার জীবন
আপনারে দিয়েছি ডালি ॥
প্রেমময় ও বনমালী ॥

কৃষ্ণযাত্রার গান (কেষ্টযাত্রা)

কৃষ্ণের গান ঃ মন মাতান মোহন বাঁশী
বাজরে ব্রজের ঘরে ঘরে
দিবা নিশি সাধি তোরে
রাধা নামটি বাজাবার তরে ॥

রাধার গান ঃ ও তোমার সেবা করে আমার সাধ মেটে না

দোঁহার ঃ আমার সাধ মেটে না

রাধা ঃ আমার কত আশা জাগে মনে।

(গোষ্ঠের গান)

কৃষ্ণের গান ঃ গোষ্ঠের মাঠে নেবে নেবে আমি ধেনু চরাবো

বাজিয়ে বাঁশী সুর তুলিব
চোরা ধেনু চরাইব।

সুবলের গান ঃ পর ভাই প্রাণের কানাই
ধর সখা সখা বলে—।
বনফুলের মালা গেঁথে
পরাবো আজ তোমার গলে ॥

(আখর) ঃ মানাবে ভাল
বন ফুলের মালা মানাবে ভাল।
সখার গলে মালা মানাবে ভাল। (জুম)

ললিতার গান ঃ দেখলো বৃন্দে রাধা আঁখি ভাসে
বহে যেন সুরধ্বনি।
অবিরাম গতি তাহে কুঞ্জের স্মৃতি
ডুবে যায় বুঝি লেখনি ॥

নৌকা বিলাস ঃ

১ম দৃশ্য (কৃষ্ণ, সুবল ও শ্রীদাম)

কৃষ্ণ ঃ আয় আয় ভাই সুবল শ্রীদাম, গোপিনীরা ওই ননী রেখে চলে গেছে। আয়, আমরা সকলে মিলে ননী খেয়ে পালাই।

সুবল ঃ ওরে না ভাই কানাই, ননী খেয়ে কাজ নাই, চলো আমরা পালিয়ে যাই।

কৃষ্ণ ঃ আগে ওই ননী পাড়ি তারপর সকলে মিলে একসঙ্গে গোষ্ঠে যাব ভাই।

শ্রীদাম ঃ তাই তো ভাই কানাই কি উপায়ে ওই ননী পাড়া যায় বলতো?

কৃষ্ণ ঃ তাইতো আমিও ভাবছি কিভাবে ননী পাড়া যায়। (কিছুটা চিন্তা করে) ও ভাই সুবল শ্রীদাম আমার একটি উপায় মনে পড়েছে।

সুবল ঃ তোমার কি উপায় মনে পড়েছে ভাই?

কৃষ্ণ ঃ তুই এখানে পিঠ পেতে দাঁড়া আর আমি তো পিঠের উপর দাঁড়িয়ে ওই ননী পাড়ি। তারপর ননী খেয়ে সকলে মিলে একসঙ্গে গোষ্ঠে যাব।

(সুবল পিঠ পেতে বসল এবং কৃষ্ণ তার পিঠের উপর দাঁড়িয়ে ননী পাড়িল)

সুবল ঃ ও ভাই কানাই, আমার পিঠের উপর ননী পড়ছে কেন?

কৃষ্ণ ঃ আহাঃ পাড়তে গিয়ে একটু চলকে পড়ে গেছে ভাই।

সুবল ঃ তবে আমি এবার চিৎকার করে বলে দিই, "ওগো তোমাদের সব ননী খেয়ে ফেলল"।

কৃষ্ণ ঃ আহা! বলিসনা ভাই সুবল শ্রীদাম। বলিসনা। আয় ভাই সকলে মিলে এক সাথে ননী খাই। *(পিঠ থেকে নেমে পড়ল)*

শ্রীদাম ঃ আমায় একটু ননী দাও ভাই কানাই।

সুবল ঃ আমায় একটু ননী দাও ভাই কানাই।

কৃষ্ণ ঃ ও ভাই শ্রীদাম তোমার ননী খাওয়া হয়েছে তো? তাহলে তুমি এখন শীঘ্র করে

পাহারায় যাও দেখ গোপিনীরা আসছে কিনা। *(শ্রীদাম দরজার বাহিরে পাহারায় দাঁড়াইল)*

শ্রীদাম ঃ ও ভাই কানাই? আর আমাদের ননী খেতে হবে না। ওই দেখ গোপিনীরা এই দিকেই আসছে।

কৃষ্ণ ঃ বলিস কি ভাই শ্রীদাম? গোপিনীরা এই দিকেই আসছে। ওরে চল্ চল্ আমরা পালিয়ে যাই। *(সকলের প্রস্থান)*

গোপিনীদের প্রবেশ —

গোপিনী ঃ (গীত) ঐ বুঝি চোর পালিয়ে গেল ভাণ্ড ভেঙে ননী খেয়ে ঐবুঝি চোর পালিয়ে গেল। *(গান থামার পর)*

গোপিনী ঃ আমি যাচ্ছি। ওদের মায়েদের কাছে। ওদের মাকে বলে আচ্ছা করে শাসন করে দিতে বলব (প্রস্থান)

কৃষ্ণ, সুবল ও শ্রীদামের প্রবেশ—

কৃষ্ণ ঃ আয় আয় ভাই সুবল, শ্রীদাম, আর যেটুকু ননী আছে সকলে মিলে খাই।

(পুনরায় ননী পেড়ে খেতে লাগল)

সুবল ও শ্রীদাম ঃ আমায় একটু দাও ভাই কানাই, আমায় একটু দাও।

কৃষ্ণ ঃ ও ভাই শ্রীদাম তুমি শীঘ্র করে পাহারায় যাও। দেখ, গোপিনীরা আসছে কিনা। যদি গোপিনীরা আসে তুমি আমাদের বলে দেবে। আর যদি না বল, তাহলে গোপিনীরা এসে আমাদের ঝেঁটিয়ে বিদায় করবে।

শ্রীদাম ঃ বলি ও ভাই কানাই আর আমাদের ননী খেতে হবে না। এই দিকে চেয়ে দেখ. গোপিনীরা তোমার মাকে সঙ্গে করে নিয়ে এই দিকেই আসছে।

কৃষ্ণ ঃ বলিস কি ভাই শ্রীদাম! গোপিনীরা আমার মাকে সঙ্গে নিয়ে এই দিকে আসছে? ওরে চল চল, তবে আমরা পালিয়ে যাই। তোরা আগে চল আমি তোদের পিছু পিছু যাচ্ছি। *(সুবল ও শ্রীদামেব প্রস্থান)*

(গোপিনী ও যশোদার প্রবেশ)

যশোদা ঃ *(কৃষ্ণকে দেখিয়া)* হ্যাঁরে অবোধ ছেলে! এসব কি শুনছি রে?

কৃষ্ণ ঃ মা, আমি তোমার পায়ে পড়ি মা এমন কাজ আর কখনো করব না।

গোপিনী ঃ মা আমরা আপনার দুঃখিনী প্রতিবেশিনী। আমাদের এমন ভাবে ক্ষতি করলে আমরা কেমন করে বাঁচব মা?

যশোদা ঃ শোন মা দুঃখিনী প্রতিবেশিনী। তুমি কিছু মনে কর না। আমার গোপাল তোমাদের যা ক্ষতি করেছে সব ক্ষতি আমি পূরণ করে দেব।

কৃষ্ণ ঃ *(গোপিনীকে উদ্দেশ্য করিয়া)* দূর হয়ে যা বলছি এখান থেকে।

যশোদা ঃ গোপাল আজ আমি তোকে বেঁধে রাখব।

কৃষ্ণ ঃ এমন কাজ আমি আর কখনও করব না মা। তুমি আমাকে বেঁধো না।

গোপিনী ঃ মা, তোমার গোপালের কথা শুনে আমার মনটা বড় ব্যাকুল হয়ে উঠল। বলি শোন, গোপাল আমাদের ভাগ্যে যাই থাক, তুমি এমনই করে নেচে নেচে আমাদের বাড়ী থেকে রোজ ননী খেয়ে যাবে। তবে আমি এখন আসি মা (প্রস্থান)

যশোদা ঃ আচ্ছা এসো বাছা। (তারপর কৃষ্ণের দিকে তাকিয়ে) দুষ্টু ছেলে! আজ আমি তোর কোন কথা শুনব না। যেমন দুষ্টু হয়েছ তেমনই এই শৃঙ্খলে বাঁধা থাক।

(বিবেকের প্রবেশ গান করিতে করিতে)

গীত ঃ ও কে বাঁধিস না মা, বাঁধিস না মা, বাঁধিস না মা, বাঁধিস না মা, বাঁধিস না। ওকে বাঁধলে পরে যাবে চলে, আর তো ফিরে আসবে না মা, আর তো ফিরে আসবে না।

(রশি দ্বারা বাঁধিতে লাগিল)

যশোদা ঃ না না! আমি কারও কথা শুনব না। যেমন দুষ্ট ছেলে তুমি ঠিক শাসন হয়েছে।

বিবেক-এর পুনরায় গীত

বাঁধন খুলে পূজা দে মা
কঠিন বাঁধন বাঁধা আছে
খুলে দে মা, খুলে দে মা
কঠিন বাঁধন বাঁধা আছে খুলে দে মা। *(প্রস্থান)*

যশোদা ঃ আজ আমি কারও কথা শুনব না, যেমন দুষ্টু ছেলে তোমার এবার ঠিক শাস্তি হয়েছে।

কৃষ্ণ ঃ মা গো, আমার খুব লাগছে মা তুমি আমার বন্ধন খুলে দাও মা। বলিতে বলিতে গান গাহিতে লাগিল—
আমায় খুলে দে মা, খুলে দে মা বন্ধন জ্বালা সহিতে নারি খুলে দে মা

যশোদা ঃ না না! তুমি যেমন আছ তেমনই থাক।

কৃষ্ণ ঃ (গীত) আঁটিয়া বেঁধেছ মা গো
বন্ধন জ্বালা আর সহিতে নারি
খুলে দে মা খুলে দে মা।

যশোদা ঃ না না, আমি তোর কোন কথা শুনব না।

কৃষ্ণ ঃ (অন্য দিকে মুখ করিয়া বলিতে লাগিল) তাই তো মা আমার উপর যে ভাবে রেগে আছে মা আমার কথা শুনতে চাইছে না। এখন আমার মাকে মায়ার ছলে ভুলাতে হবে। নইলে মা আমার হাতের বন্ধন কিছুতেই খুলে দেবে না। আচ্ছা দেখি মা তুমি আমার বন্ধন খোল কি না। (মায়ের দিকে মুখ করিয়া প্রকাশ্যে বলিতে লাগিল)
মা গো মা, আমায় ধর মা। আমার জীবন যায় জীবন যায়

(বলিতে বলিতে কৃষ্ণ শুইয়া পড়িল)

যশোদা ঃ গোপাল, গোপাল তুই অমন করছিস কেন বাবা? কথা বল্ বাবা। সোনা যাদু আমার! কি হয়েছে বল্ বাবা। একি নীরব কেন? গোপাল কোন উত্তর দিচ্ছিস না কেন? ওগো কোথায় আছো একটি বার বলে দাও আমার গোপালের কি হয়েছে?

(সুবল, শ্রীদামের প্রবেশ)

সুবল ঃ আমরা বলে দিতে পারি মা তোমার গোপালের কি হয়েছে।

যশোদা ঃ সুবল, সুবলরে আমার গোপাল এমন করছে কেন বাবা?

সুবল ঃ তোমার গোপালের হাতে বন্ধন কেন মা?

যশোদা ঃ বন্ধন কেন শুনবি বাবা। আমার গোপাল রোজ রোজ গোপিনীদের ঘরে ঢুকে ননী চুরি করে খেয়ে পালিয়ে আসে। গোপিনী আমায় জানাতে আমি গোপালকে বেঁধে রেখেছি। গোপাল আমার ক্ষুধা ক্ষুধা বলে চীৎকার করে মাটিতে অচৈতন্য হয়ে পড়ে গেল। এখন কি হবে বাপ্ সুবল শ্রীদাম? *(বাঁধন খুলিয়া দিল)*

সুবল ঃ তুমি এত অস্থির হয়ো না মা। তুমি একটু ধৈর্য্য ধর।

যশোদা ঃ বাবা সুবল, আমার একমাত্র সবেধন নীলমনি মাটিতে অচৈতন্য হয়ে পড়ে আছে আমি কেমন করে ধৈর্য্য ধরে থাকবো বাবা?

সুবল ঃ তুমি এখন একবার গৃহের ভেতরে যাও মা। আমরা দেখি তোমার গোপালের চৈতন্য আসে কি না।

যশোদা ঃ তবে দেখিস বাবা। তোরা থাকতে আমার গোপালের যেন কোন অমঙ্গল না হয়। *(প্রস্থান)*

সুবল ঃ তোমার গোপালের কোন অমঙ্গল হবে না মা। তুমি গৃহের ভেতরে গোপালের খাবার ব্যবস্থা কর মা। তোমার গোপাল এখনই উঠে পড়বে।

শ্রীদাম ঃ ভাই কানাই কানাই, ওঠ ভাই। চল, আমরা ধেনু লয়ে মাঠে খেলতে যাই। তাইতো ভাই সুবল, ভাই কানাইয়ের তো কোন সাড়া পাচ্ছি না। এখন কি করা যায় বলতো?

সুবল ঃ এখন রাধা নামে গান করলে আমাদের ভাই কানাই এখনই উঠে পড়বে।

(উভয়ে গান গাহিতে লাগিল)

(গীত) জয় রাধা গোবিন্দ, শ্রীরাধা গোবিন্দ

রাধা গোবিন্দ রাধে।

রাধা গোবিন্দ রাধে।

কৃষ্ণ ঃ কে কে আমায় রাধা নাম শোনালে? একি ভাই সুবল শ্রীদাম। তোমরা এখানে? আমার বলাই দাদা কোথায় ভাই?

সুবল ঃ বলাই দাদা তো এখানে আসে নি ভাই। কানাই, তুমি শীঘ্র করে তোমার মায়ের কাছে চল। তোমার মা তোমার জন্য বড় চিন্তিত আছে ভাই। চল, তোমার মায়ের কাছ হতে গোষ্ঠে যাওয়ার বিদায় নিয়ে আসি। তারপর আমরা তিনজনে একসঙ্গ গোষ্ঠে যাব।

কৃষ্ণ ঃ তাই চল ভাই, তাই চল। *(সকলের প্রস্থান)*

২য় দৃশ্য

যশোদার প্রবেশ (হাতে খাবারের থালা নিয়ে)

যশোদা ঃ তাইতো আমার গোপাল না আসা অবধি আমার মনটাকে আমি আর কিছুতেই স্থির রাখতে পারছি না। আমার গোপাল এখনও আসছে না কেন? বাপ্ গোপাল! গোপাল!

কৃষ্ণের প্রবেশ

কৃষ্ণ ঃ মা, মা, এই যে আমি এসেছি মা। আমার যে বড় ক্ষুধা পেয়েছে মা। আমায় কিছু খেতে দাও।

যশোদা ঃ এই যে বাবা, সোনা আমার। আমি তোমাদের জন্য খাবার এনেছি। হ্যাঁ বাবা গোপাল? সুবল শ্রীদাম কোথায় গেল বাবা?

কৃষ্ণ ঃ সে কথা পরে বলব মা। আমার বড় ক্ষুধা পেয়েছে তুমি আমাকে এখন কিছু খেতে দাও।

যশোদা ঃ আমি তোমার জন্য ক্ষীর সর ননী এনেছি বাবা। তুমি আমার কোলে বসে পেট ভরে ননী খাও।

কৃষ্ণ ঃ *(গীত)* ননী দে মা, ননী দে মা যেমনই তেমনই করে আমায় ননী দে মা ননী দে মা। সারা দিনের মত আমায় ননী দে মা।

যশোদা ঃ হ্যাঁ বাবা গোপাল? সুবল শ্রীদাম কোথায় আছে বাবা?

কৃষ্ণ ঃ সুবল শ্রীদাম আমার জন্য ওই অদূরে অপেক্ষা করছে মা। তুমি আমাকে একবার রাখাল সাজ সাজিয়ে দাও মা আমি এখন গোষ্ঠে যাব।

কৃষ্ণ ঃ *(গীত)* দে মা দে রাখাল সাজ সাজিয়ে দেমা এখনই
ডাকছে আমার বলাই দাদা
গোষ্ঠে আয়রে নীলমণি।

যশোদা ঃ না বাপ গোপাল। আজ আমি তোমায় কিছুতেই গোষ্ঠে যেতে দেব না। (সুবল শ্রীদামের প্রবেশ)

উভয়ের ঃ *(গীত)* আয় আয় কানু
বাজাইয়া বেণু
আয় ভাই কানাই গোষ্ঠে যাই।
আমরা যে তোর প্রাণেরই সখা।
দুয়ারে দাঁড়িয়ে রয়েছি তাই।

কৃষ্ণ ঃ ভাই সুবল শ্রীদাম তোমরা আজ ফিরে যাও ভাই। মা যে আমায় গোষ্ঠে যাবার বিদায় দিচ্ছে না ভাই।

সুবল শ্রীদাম ঃ *(গীত)* তুমি নাহি বনে গেলে
বাঁশি না বাজালে
আর বিপদ হলে কে দেখিবে
রাখালেরই দলে।
কে দেখিবে? বিপদ হলে ভাইরে
কে দেখিবে?

যশোদা ঃ বাপ্ সুবল শ্রীদাম তোমরা আজ ফিরে যাও বাবা। গোপালের আজ আর গোষ্ঠে যাওয়া হবে না। কেন তোমরা ওকে নিয়ে যেতে চাইছে।

সুবল শ্রীদাম ঃ *(গীত)* ক্ষুধা তৃষ্ণা দূরে যায় মা
কৃষ্ণ মুখ হেরি

আর সেই কারণে নিয়ে যাই
মা শ্যাম বংশীধারী,

যশোদা : আচ্ছা বাবা সুবল শ্রীদাম আমার গোপালকে তোমাদের সাথে নিয়ে গিয়ে তোমাদের কি সুবিধা হবে বাবা?

সুবল শ্রীদাম :
আপনি ফিরে মা
ফিরাইতে হয় না ধেনু—
আপনি ফিরে মা।
ছোট বড় ধেনুরা সব আপনি ফিরে মা

যশোদা : তবে দাঁড়াও বাপ সুবল শ্রীদাম তোমাদের ভাই কানাইয়ের গোষ্ঠে যাওয়ার সাজ আমি এখনই এনে দিচ্ছি। *(প্রস্থান)*

শ্রীদাম : যাও মা আর বেশী দেরী কর না।

(বাঁশী নুপুর নিয়ে যশোদার পুনঃ প্রবেশ)

যশোদা : এই নাও বাপ সুবল শ্রীদাম। তোমাদের ভাই কানাইকে তোমরা মনের মত করে সাজিয়ে নাও।

সুবল শ্রীদাম : *(গীত)* শিখা চূড়া পর দেখি ভাই
বাঁশি নাও হাতে
আর গোষ্ঠে যাওয়ার বেলা বয়ে যায়
চলনা রে ভাই গোষ্ঠে।
গোষ্ঠে যাওয়ার বেলা বয়ে যায় ॥

(গান করতে করতে সাজ পরাইল)

সুবল : তবে আমরা এখন আসি মা।

যশোদা : এস বাবা। *(সকলের প্রস্থান)*

৩য় দৃশ্য

রাধা বৃন্দের প্রবেশ

রাধা : *(গীত)* কালার বাঁশি পড়ল মনে গোকুল দাসীর
হায় হায়
জল ফেলে জল আনতে যাব
আমি যমুনায় ॥

বৃন্দে : (গীত) হোঃ হোঃ পূর্ণ কলসী ঢালিয়া রাধে
ছল করে যায় জলের ঘাটে
পূর্ণ কলসী ঢালিল রাধে।

কুটিলার প্রবেশ

কুটিলা : বেরিয়েছ বেরিয়েছ পোড়ার মুখী? আবার সকলকার চোখে ধূলো দিয়ে আবার জলের ঘাটে বেরিয়েছো? কুলে কালি দিতে বেরিয়েছ?

রাধা : *(গীত)* অকূলেতে কূল পেয়েছি
আমি কূলের ভয় করিনা।

কুটিলা : কি তুমি কুলের ভয় করনা? আজ দাদাকে বলে ঝেঁটিয়ে বিষ ঝেড়ে দিতে বলবো।

রাধা : *(গীত)* ঐ তোরা তো কুলিনের মেয়ে
থাক তোর কুল নিয়ে
আমি কুলের ভয় করিনা
আমার কূলে কৃষ্ণ আছে
আমি কুলের ভয় করি না।

কুটিলা : কি বলব ছাই আমার তা মনেও পড়ে না। দুটো কে হাতে নাতে ধরতে পারলে দুটোর হাড় একসঙ্গে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতাম

ছদ্মবেশে কৃষ্ণের প্রবেশ—

কৃষ্ণ : *(গীত)* খুব হয়েছ বুদ্ধি সেরা
যে যেমন সে তেমনই
ভাবে এ জগতে কার আনা গোনা

কুটিলা : হাঃ হাঃ হাঃ যত পাগল এ গোকুলে আর মরবার জায়গা কোথাও নাই গা?

কৃষ্ণ : *(গীত)* কোন কূলে যাবরে আর ছেড়ে এ গোকুলে
সারা জগৎ ঘুরে ফিরে এসেছি এই গোকুলে

কুটিলা : দূর হয়ে যা বলছি মুখপোড়া?

কৃষ্ণ : *(গীত)* কারে দূর করবি রে তুই নিজে হবি দূর
নিজেব বুকে হাত দিয়ে দেখনা করতেছে দুর দুর

কুটিলা : কি আমি মরব? আমি দূর হব? তুই মর্ তোর চোদ্দপুরুষ মরুক। এখান থেকে বের বলছি মুখপোড়া। *(কৃষ্ণের পিছনে পিছনে কুটিলার প্রস্থান)*

রাধার : *(গীত)* আমি ঘাটে যাওয়া ছেড়েছি
শ্বাশুড়ি ননদীর জ্বালায় ঘাটে যাওয়া ছেড়েছি

বৃন্দে : বলি ও রাধে ঘাটে যাওয়া ছেড়েছিস কেন?

রাধা : তবে শুনবি বৃন্দে?

বৃন্দে : হ্যাঁ শুনবো। বলতো রাধে?

রাধা : ঐ আমি যখন উঠিপথে বধূ তখন ঘাটের মাঝে।

বৃন্দে : বলি কেন গো? তাতে কি হয়েছে?

রাধা : *(গীত)* কানা কানি করে গো।

বৃন্দে : বল কারা গো?

রাধা : *(গীত)* পাড়ার যত ছেলে মেয়েরা
কানাকানি করে গো

বৃন্দে : বলি কেন গো?

রাধা : *(গীত)* কলঙ্কিনী রটিবে তাই।

(দূর হইতে বাঁশীর সুর)

রাধা : কে বাঁশি বাজাচ্ছে বৃন্দে?

বৃন্দে ঃ *(গীত)* কান পেতে শোন
ও ধনী তুই কান পেতে শোন।
বাজলো লো তোর বধূর বাঁশি
ও ধনী তুই কান পেতে শোন

রাধা ঃ *(গীত)* অমন ধারা বাঁশী আর বাজিও না
বাজালে কি আর সরলা বাঁচে
অমন ধারা বাঁশি আর বাজিও না।

বৃন্দে ঃ *(গীত)* দোষ নাই দোষ নাই
যেমন বাজে তেমনই বাজবে
দোষ নাই দোষ নাই।

বৃন্দে ঃ দেখ্ দেখ্ রাধে তোর বঁধূ সুবলের কাঁধে হাত দিয়ে গোষ্ঠ হতে কেমন হেলে দুলে ফিরে যাচ্ছে দেখ।

রাধা ঃ *(গীত)* ঐ সুবলেরই কাঁধে হাত
ঐ যায় আমার প্রাণনাথ
ঐ যায় ঐ যায়
হেলে দুলে নেচে নেচে ঐ যায় ঐ যায়।

বৃন্দে ঃ তবে চল রাধে তোর বঁধূ কতদূরে গেল আমরা দেখে আসি চল।

(রাধা বৃন্দের প্রস্থান)

জটিলা কুটিলার প্রবেশ

(কুটিলা ঝাঁটা ও জটিলা লাঠি সহ প্রবেশ করবে)

কুটিলা ঃ তোর জন্যই তো আমাদের বৌয়ের এত আসকারা? বৌকে কিছু বলিসনি।

(জটিলাকে ঝাঁটা দিয়ে মারল)

জটিলা ঃ আহ্ মারিস না মা কুটিলে। তোর হাতের মার খেয়ে খেয়ে আমার সারা জীবনটা কেটে গেল। কই একটা দিনতো কেষ্টাকে আর বৌকে একসঙ্গে দেখাতে পারলি না?

কুটিলা ঃ *(গীত)* তুই বুড়ি ঢাক বাজালি
পাড়ায় পাড়ায় সব জানালি
তুইতো বুড়ি ঢাক বাজালি।

জটিলা ঃ (গীত) কে বাজালে? কে বাজালে?
আমি কি পাড়ায় বেড়াতে যাই?

কুটিলা ঃ বলি তুই, তুই, তুই তোর জন্য ঐ কেষ্ট ছোঁড়া আর আমাদের বৌ সতর্ক হয়ে গেছে। ওদের ধরা যাচ্ছেনা?

(ছদ্মবেশে কৃষ্ণের প্রবেশ)

কৃষ্ণ ঃ (গীত) ও কুটিলা মাসী, ও কুটিলা মাসী তুই আমায় ধরবি নাকি?

কুটিলা ঃ বলি মা গো মা, যশোদার সেই কালো ছোঁড়াটা আবার এসেছে।

জটিলা ঃ যশোদার সেই কালো ছোঁড়াটা আবার এসেছে?

কৃষ্ণ ঃ ও জটিলা বুড়ি, তুই আমায় ধরবি নাকি?

(কৃষ্ণের প্রস্থান)

জটিলা ঃ ওরে ও শীতলার বকরি? ওরে ও কালীর পাঁঠা? তুই মর, তোর মা বাছা বাছা করে কাঁদুক রে মুখপোড়া। তোকে আজ ঝেঁটিয়ে বিষ ঝাড়বো। ও মা কুটিলে তুই আমার সঙ্গে আয়। দেখি মুখ পোড়ার কি ব্যবস্থা করতে পারি। *(উভয়ের প্রস্থান)*

চতুর্থ দৃশ্য

(রাধার বাড়ী রাধা বৃন্দের প্রবেশ)

রাধা ঃ বৃন্দে তুই আমায় গরল এনেদে ভাই, আমি গরল খেয়ে মরব।

বৃন্দে ঃ *(স্বগত)* তাই তো রাই কিশোরীর যা মনের অবস্থা আজ যদি মাধবের দেখা না পায় এ জীবন আর রাখবে না। এখন দেখছি আমাকে ওদের দূত গিরি করতে হবে নইলে ভাঙা পিরীত কিছুতেই জোড় লাগবে না।

(কুটিলার প্রবেশ)

কুটিলা ঃ তাইতো আমাদের বৌয়ের মত এই দিকে কে কথা কইল নয়? না আমায় দেখচি ভাল করে দেখতে হল। বলি এই যে এখানে কাপ করে বসে বসে ধ্যান করছ না কি?

বৃন্দে ঃ ধ্যান করেনা গো ধ্যান করে না। তুমি তো ওকে বিষ খাইয়েছো।

কুটিলা ঃ ওমা! এ মাগী আমায় বলেকি? বলি চোখ খাকী পোড়ার মুখী আমি কখন বৌকে বিষ খাওয়ানু লা?

বৃন্দে ঃ আরে তুমিই তো খাওয়ালে।

কুটিলা ঃ বৃন্দে, আমি তো ভাই বিষ খাওয়াই নি। তুই আমায় কেন মিছামিছি দোষ দিচ্ছিস বৃন্দে?

বৃন্দে ঃ *(গীত)* রাই আমাদের সোনার বরণ।
কেন বরণ কালো হল
রাই আমাদের সোনার বরণ।

কুটিলা ঃ বৃন্দে। সোনার অঙ্গ কেমন করে কালো হলো ভাই?

বৃন্দে ঃ কাল সাপে কেটেছে, নইলে কেন কালো হবে রাই কালসাপে কেটেছে।

কুটিলা ঃ হারে বৃন্দে! কাল সাপে কাটার কোন ওষুধ নাই না কিরে?

বৃন্দে ঃ ওষুধতো আছে কিন্তু যে ওঝা ঐ ওষুধ দিতে পারে তুমি যদি তাকে আনতে পারো তাহলে বৌয়ের রোগ এখনি সেরে যাবে।

কুটিলা ঃ বৃন্দে, কোথায় ধাম, কিবা নাম তার? দেখতে কেমন?

বৃন্দে ঃ *(গীত)* দেখি দেখি স্বরবর্ণ মেঘেরি বরণ
আর পরিধানে পীত বসন, নানা আভরণ ॥
(আমি) চেনা বলে দিলাম গো, আড় নয়নে চায় সে
চেনা বলে দিলাম গো।

কুটিলা ঃ তা হলে আমি কোন পথে যাব?

বৃন্দে ঃ *(গীত)* সোজা পথে যেয়ো গো।
ডাক দিলে ডাক শুনতে পাবে
সোজা পথে যেয়ো গো।

কুটিলা ঃ দেখ ভাই বৃন্দে, তুই তার নামটা আমায় বলে দে?

বৃন্দে ঃ তার নামটা আমি ভুলে যাচ্ছি গো।

কুটিলা ঃ আমায় মনে করে বলে দে ভাই।

বৃন্দে ঃ মনে পড়েছে। তার নাম কালাচাঁদ ওঝা। সে সকল রোগ ভালো করে। তাড়াতাড়ি যাও, বিলম্ব করো না।

কুটিলা ঃ আচ্ছা বেশ, আমি সেই ওঝাকে আনতে চললাম। তুই ভাই, আমাদের বৌয়ের কাছাকাছি থাকিস। *(প্রস্থান)*

বৃন্দে ঃ রাধে, দেখ্ দেখ্ তোর মাধব এসেছেরে? চেয়ে দেখ?

রাধা ঃ কই কই বৃন্দে আমার মাধব কই?

বৃন্দে ঃ দেখ রাধে. আমি সেই কুটিলা মাগীকে ছল করে তোর মাধবকে আনতে পাঠিয়েছি। তুই এখন কি করবি লো। আমার সঙ্গে চলে আয় ॥

(উভয়ের প্রস্থান)

৫ম দৃশ্য

(কৃষ্ণ ও সুবলের প্রবেশ)

কৃষ্ণ ঃ ভাই সুবল আমাদের গাভী সকল কোন দিকে গেল ভাই আর আমাদের সাদা বাছুরটা হাম্বা হাম্বা করে এই দিকে এলো নয়?

সুবল ঃ হ্যাঁ ভাই কানাই. আমিও তাইতো দেখলাম কিন্তু সে গেল কোথায়?

কৃষ্ণ ঃ ভাই সুবল আমার বড় জল পিপাসা পেয়েছে। আমায় একটু জল খাওয়াতে পার?

কৃষ্ণ ঃ (গীত) কৃষ্ণ ভক্তেরে জল খাওয়াইও অভক্তের জল হয় না যেন ভাইরে কৃষ্ণ ভক্তের জল খাওয়াইও।

সুবল ঃ (গীত) অনুরাগে অন্তরে খনন করা আছে দিঘী
সেই জল খাওয়াবো
খনন করা আছে দিঘী
সেই জল খাওয়াবো।

কৃষ্ণ ঃ ভাই সুবল কুটিলা মাসীর মত এই দিকে কে আসছে নয়? তুই আমার পিছনে থাকিস।

(কৃষ্ণ ছদ্মবেশ ধারণ করিল)

সুবল ঃ হাঁ ভাই কানাই কুটিলা মাসীর মত এই দিকে কে আসছে, *(কুটিলার প্রবেশ)*—

কুটিলা ঃ হ্যাঁ বাবা, আমি সেই কালা চাঁদ ওঝার বাড়ী যাব কোন পথটা আমায় বলে দিতে পার?

কৃষ্ণ ঃ কি বললে? তুমি কালাচাঁদ ওঝার বাড়ী যাবে? আচ্ছা কেন কালাচাঁদ ওঝাকে খুঁজছ তা খুলেই বল না।

কুটিলা ঃ কি আর বলব বাছা। ঐ সে নিজেই বিষ খেয়েছে আর বৃন্দে পোড়ার মুখী আমার নামে মিছা মিছি দোষ দিচ্ছে গা।

কৃষ্ণঃ কে বিষ খেয়েছে গো? কই তার নাম তো বল্লে না?

কুটিলা ঃ না বাছা তার নাম বলতে নিষেধ আছে।

কৃষ্ণ ঃ তাহলে মেয়ে আমার কোন দোষ নেই। আমি হলাম সেই কালাচাঁদ ওঝা।

কুটিলা ঃ অ্যাঁ? তুমি সেই কালাচাঁদ ওঝা? (একটু দেখিয়া) হ্যাঁ তুমিইতো হবে বাছা। তোমারি মত গায়ের রং-এর কথা বলেছিল বটে। দেখি তোমার পরনের ধুতি খানা?

কৃষ্ণ ঃ তা তুমি দেখতে পার।

কুটিলা ঃ হ্যাঁ বাছা, তুমি তাহলে এবার আমাদের বাড়ী চল।

কৃষ্ণ ঃ আরে আমিতো আগেই বলেছি তার নাম না বললে আমি কিছুতেই যাবনা। আমি যেখানেই রোগী দেখতে যাই না কেন আমাকে আগে রোগীর নাম বলতে হয়।

কুটিলা ঃ দেখ বাছা আমি তার নাম কিন্তু বলব। তোমার পিছনে একটি ছেলে আছে, ওকে এখান থেকে চলে যেতে বল। তার পর আমি রোগীর নাম বলব।

কৃষ্ণ ঃ ভাই সুবল এখান হতে চলে যা। আমার মনে হয় কুটিলা মাসী আমায় গুপ্ত কথা বলবে। তুই থাকতে সব কথা খুলে বলবে না।

সুবল ঃ ভাই কানাই কুটিলা মাসী তোমায় যা কথা বলবে সব কথা আমায় খুলে বলবে তো?

কৃষ্ণ ঃ হ্যাঁ ভাই সুবল কুটিলা মাসী আমায় যা বলবে আমি তোমায় সব কথা খুলে বলব, তুই এখান হতে চলে যা!

(সুবলের প্রস্থান)

কৃষ্ণ ঃ কই গো মেয়ে? তুমি ওদিকে মুখ ফিরিয়ে কি দেখছো? তাহলে তুমি তার নাম বলবে না? তবে মেয়ে আমার কোন দোষ নাই।

কুটিলা ঃ নানা বাছা, তুমি যেওনা।
আমি তার নাম বলব।

কৃষ্ণ ঃ আরে ভারী জ্বালাতনে পড়েছি তো। যা বলবে তাই বলনা?

কুটিলা ঃ দেখ বাছা, আমি যা বলব খুব সংক্ষেপে।

কৃষ্ণ ঃ যা বলবে তাই বল না।

কুটিলা ঃ *(গীত)* ওই 'ব'-এর নীচে বিন্দু দাওনা
'ব' টাকে 'র' করে নাও না
ব-এর নীচে বিন্দু দাও না।

কৃষ্ণ ঃ আমি তো কিছুই বঝতে পারছি না। আমি তোমার মত অত বিদ্বান নই যে কথাটা আমি ফস করে ধরে নেব। তুমি যতক্ষণ না খুলে নাম বলবে আমি যেতে পারব না। আমি চললাম।

কুটিলা ঃ না না বাছা। তুমি যেওনা। আমি এইবার তার নাম ভাল করেই বলব।

কৃষ্ণ ঃ ভারি মুস্কিলে পড়েছি তো। যা বলবে ভাল করেই বল।

কুটিলা ঃ *(গীত)* 'ব' এর নীচে বিন্দু দাও না
মোদের বৌ-এর নামটি ওই
'ব'-এর নীচে বিন্দু দাও না।

কৃষ্ণ ঃ সে কি গো মেয়ে। 'ব'-এর নীচে বিন্দু দিলে সে তো 'র' হয়ে গেল। 'র'-এ রাজা হয়, রাণী হয় আরও অনেক নাম হয়। না, তুমি যখন তার নাম ভালভাবে বললে না আর আমি কিছুতেই থাকব না। আমি চললাম।

কুটিলা ঃ না না বাছা যেওনা। এবার তার নাম ভাল করে বলছি

কুটিলা ঃ *(গীত)* ঐ সে রায়ের নন্দেরই বাঁধা
মোদের বৌ-এর নামটি রাধা।

কৃষ্ণ ঃ *(গীত)* বল বল তুমি আবার বল
ঐ নাম আমি বাসি ভাল।
বল বল তুমি আবার বল।
জয় রাধা শ্রী রাধা বল
বল বল তুমি আবার বল।

কুটিলা ঃ *(স্বগত)* ওমা একি সেই মুখপোড়া না কি গো। *(কৃষ্ণের দিকে চাহিয়া)* বলি কি গো বাছা। তার নাম তো শুনলে তাহলে এইবার আমাদের বাড়ী চল।

কৃষ্ণ ঃ হ্যাঁ মেয়ে তাই চল।

কুটিলা ঃ হ্যাঁগো ওঝা মশাই তুমি কত টাকা দক্ষিণা নেবে?

কৃষ্ণ ঃ তোমরা আমায় কত টাকা দেবে বলতো?

কুটিলা ঃ দেখ বাছা আমরা হচ্ছি গয়লার মেয়ে বেশী কিছু দিতে পারবো না। কিছু কম করে নিও।

কৃষ্ণ ঃ আমি টাকা কড়ি চাই না এক মন হলে পরে টাকাকড়ি চাই না।

কুটিলা ঃ বেশ, তাহলে একমন দই খাবে না হয় এক মন ঘোলখাবে।

কৃষ্ণ ঃ বলি ঘরে আছে তো? আমার পেট কিন্তু খুব বড়। দেখে ভয় পাবে না তো?

কুটিলা ঃ ভয় আর কিসের বাছা। আমরা হচ্ছি গয়লার মেয়ে। আমাদের ঘরে দই, ঘোল অফুরন্ত।

কৃষ্ণ ঃ তাহলে চল। তবে তুমি আমার আগে আগে চলে যাবেনা আমি তো সারা পথ জানিনা।

কুটিলা ঃ তবে এস আমার সঙ্গে।

(সকলের প্রস্থান)

৬ষ্ঠ দৃশ্য

রাধা ও বৃন্দের প্রবেশ

রাধা ঃ কই কই সখী, আমার প্রাণবন্ধু এখনও তো এল না।

বৃন্দে ঃ দেখ্ রাধে সে হচ্ছে নিষ্ঠুর নির্দ্দয়। তার জন্য তুই ভাবিস কেন?

রাধা ঃ *(গীত)* এমন কথা আর বলোনা
বঁধু নিন্দা প্রাণে সহে না
এমন কথা আর বলো না।

বৃন্দে ঃ ও রাধে, তুই শীঘ্র করে শুয়ে পড়। তোর শ্যামচাঁদ আর কুটিলা এই দিকেই আসছে। তোকে আমার সঙ্গে দাঁড়িয়ে কথা বলতে দেখলে মহা বিপদ হবে। *(রাধা শুইয়া পড়িল এবং বৃন্দে তাকে হাওয়া করিতে লাগিল)* কুটিলাও কৃষ্ণের প্রবেশ।

কুটিলা ঃ ঐ দেখ ওঝা মশাই, ঐ আমাদের রোগী শুয়ে আছে। ভাল করে দেখ

কৃষ্ণঃ ঃ এই সেই রোগী নাকি। আচ্ছা আমি দেখছি তুমি একটু বাতাস কর।

কৃষ্ণঃ ঃ *(রাধার কাছে বসিয়া)* খানিকটা চিন্তা করে বলিল—ও মেয়ে, এ রোগী যে কেমন কেমন করছে গো।

কুটিলা ঃ অ্যাঁ সেকি। আমাদের বৌ তাহলে আর বাঁচবে না নাকি গো? হায় হায় আমি দাদাকে গিয়ে কি বলব গো। *(কুটিলা কাঁদিতে লাগিল)*

কৃষ্ণঃ ঃ আহা মেয়ে তুমি আমার সামনে অমন করে কাঁদছ কেন? আমাকে ভাল ভাবে দেখতে দাও। *(খানিকটা ফুঁক দিয়া)* ওরে বাপরে! একে যে মস্ত বড় কালসাপে কেটেছে।

কুটিলা ঃ সেকি! তাহলে তুমি কি ভাল করতে পারবে না? তোমার ঝোলায় ও সব কি আছে?

কৃষ্ণঃ ঃ (গীত) আছে সব রোগের ঔষধ আমার
এই ঝোলার ভিতরে
আমার ঝোলার ভিতরে
সাপে কাটা, ডাইনে খাওয়া
জল পড়া দেওয়া
আবার ওলাউঠা কলেরা আমি
ঝাড়াই ফুঁক দিয়ে
আমার ঝোলার ভিতরে
আছে সব রোগের ঔষধ আমার ঝোলার ভিতরে।

কুটিলা ঃ তাহলে তুমি একটু ভাল করে দেখ।

কৃষ্ণঃ ঃ দেখ মেয়ে। আমার একটি কথা রাখতে হবে।

কুটিলা ঃ কি কথা বলনা বাছা?

কৃষ্ণঃ ঃ তোমাদের দুজনকে একবার কিছুক্ষণের জন্য বাইরে যেতে হবে।

কুটিলা ঃ কি আমাদের ঘরের বৌকে একা তোমার কাছে রেখে আমাদের বাইরে যেতে হবে? না। তা হবে না বাবু।

কৃষ্ণ ঃ তাহলে মেয়ে আমাকে দোষ নিও না। আমার পক্ষে এ রোগী দেখা সম্ভব নয়। আমি চললাম। *(যাইতে উদ্যত)*

কুটিলা ঃ না না বাছা, তুমি যেওনা। আমরা দুজনে এখনই বাহিরে যাচ্ছি।

বৃন্দে : কি হে ওঝা মশাই, আমি থাকলেও চলবে না?

কৃষ্ণ : না, তুমি থাকলেও চলবে না। *(উভয়ের প্রস্থান)*

কৃষ্ণ : *(গীত)* আজি নীরব বাঁশরী রহে বার বার
নাহিসে যমুনার জল, নাহি কো সে
রাধা ॥ জয় রাধে, জয় রাধে,

(রাধা চমকাইয়া উঠিয়া পড়িল)

রাধা : তুমি এসেছ নিষ্ঠুর! তুমি দূর থেকে কেন আমাকে বাঁশী বাজিয়ে কাঁদাও?

কৃষ্ণ : *(গীত)* যার বাঁশী তার মুখে বাজে
অন্য মুখে বাজে না বাঁশী রাধে
যার বাঁশী আর মুখে বাজে।

রাধা : আমি যে আর শ্বাশুড়ী ননদীর জ্বালা সহ্য করতে পারছিনা প্রাণ নাথ?

কৃষ্ণ : *(গীত)* হাতে কর গৃহকর্ম, মুখে বল হরি হরি
অনায়াসে চলে যাবে, ভবসিন্ধু পারে।

পার হয়ে যাবে গো, সেই হরি নামের গুণে তুমি পার হয়ে যাবে গো।

কৃষ্ণ : ঐ দেখ রাধে, কুটিলা আর বৃন্দে এই দিকে আসছে। তুমি শীঘ্র শুয়ে পড়। দেখতে পেলে মহা বিপদ হবে।

(রাধা শুয়ে পড়ল)

কুটিলা : কি? তোমাকে রাধা মন্ত্রের উপসনা দেব? বের বের বলছি মুখপোড়া।

(বলিতে বলিতে কৃষ্ণ সহ প্রস্থান)

বৃন্দে : ও রাধে, তোর প্রাণনাথ তো চলে গেল। তুই এখন কি করবি। আমার সঙ্গে চল্।

(রাধা বৃন্দের প্রস্থান)

৭ম দৃশ্য

ঢেঁড়াদারের প্রবেশ

ঢেঁড়াদার : কাল মথুরায় একটা নতুন হাট বসবে। সেই হাটে যে যা জিনিস বিক্রয় করতে যাবে সব জিনিষ উচিত মূল্যে বিক্রয় হবে। আর যদি বিক্রয় না হয় তাহলে মহারাজ কংস উচিত মূল্যে সমস্ত জিনিস ক্রয় করিবেন।

(রাধা ও বৃন্দের প্রবেশ)

বৃন্দে বলি ওগো ও ঢেঁড়াদার? তুমি কিসের ঢেঁড়া দিচ্ছো গা?

ঢেঁড়াদার হারে, দেশের সবাই শুনতে পেল, আর 'তোমরা দুটি সুন্দরী শুনতে পেলে না?

বৃন্দে একটি বার বলনা গা। কিসের ঢেঁড়া দিচ্ছো গা?

ঢেঁড়াদার বলি তোমরা কোন দেশের মেয়ে গা?

বৃন্দে আমরা এই দেশের গয়লার মেয়ে।

ঢেঁড়াদার হারে, ফস করে বলে ফেললে আমরা এই দেশের গয়লার মেয়ে। তবে মন দিয়ে শোন, আমি আর একবার বলব। ভাল করে কান পেতে শোন। কাল মথুরায় একটি নতুন হাট বসবে সেই হাটে যে যা জিনিস বিক্রয় করতে চাইবে সব জিনিস উচিত মূল্যে বিক্রয় হইবে। যদি বিক্রয় না হয় তাহলে মহারাজ সেই

সব জিনিস ক্রয় করিবেন।

বৃন্দে ঃ হ্যাঁ গা তোমাদের রাজার নাম কি বললে?

ঢেঁড়াদার ঃ আর পারবোনা, আর পারবনা। এই তো বললুম।

বৃন্দে ঃ একটি বার বল না গা? তোমাকে পান খেতে কিছু ঘুষ দেব।

ঢেঁড়াদার ঃ হেঁ হেঁ হেঁ। এই সুন্দরীরা বলে কি? আমাকে ১৬ খানা জেলার লোক কেহ ঘুষ দিয়ে বস করতে পারে না। আর এই সুন্দরী দুটো আমাকে ঘুষ দিয়ে বস করবে। তবে শোন, আমাদের রাজার নাম কংস।

বৃন্দে ঃ ও রাধা বুঝতে পেরেছিস, তোর সেই নাগরের মামা মথুরায় হাট বসিয়েছে লো। চল্ চল্ আমরা ঐ হাটে দই আর ঘোল নিয়ে বিক্রি করতে যাই।

রাধা ঃ বৃন্দে আমরা ঘোল আর দই কোথায় পাবো?

বৃন্দে ঃ বলি ওগো ট্যাঁড়াদার? আমরা ঘোল দই কোথায় পাব?

ঢেঁড়াদার ঃ তোমরা হচ্ছো গয়লার মেয়ে। আর আমি তোমাদের বলে দেব তোমরা কোথায় ঘোল দই পাবে?

বৃন্দে ঃ ও রাধে আমার মনে পড়েছে। আমাদের ঘরে এক হাঁড়ি দই আর এক হাঁড়ি ঘোল আছে। চল্ আমরা সেই ঘোল দই নিয়ে মথুরার হাটে বিক্রয় করতে যাই চল। *(রাধা বৃন্দের প্রস্থান)*

টাঁড়াদার ঃ আরে হে হে হে। জানেন মশায় ঐ যে পিছনের মেয়েটি নীল শাড়ী পরা ও আমাকে দেখে ফিক ফিক করে হাসছে। ঐ হাসির ভেতরে যা হোক কোন গূঢ় রহস্য আছে। নইলে আমাকে দেখে হাসবে কেন? যাক বাবা. যে যার মনের গতি সে তাই করুক। আমি তো মাত্র পাঁচ সিকে পয়সা মাইনের চাকরি করি। আর কতক্ষণ ডিউটি বজায় করব। আর দু একবার ঢেঁড়া দিয়ে এখান থেকে খসে পড়তে পারলে বাঁচি। কাল মথুরায় —

চণ্ডাল ঃ (দূর থেকে) কে রে কে? কে হাঁকে?

ঢেঁড়াদার ঃ ওরে বাপরে। এ আবার কে রে বাবা? (চুপি চুপি বলতে লাগল) আমি তোমার বাবা। যাক. আর দুএক বার বলে এ স্থান থেকে কেটে পড়ি। কাল মথুরায়—

(চণ্ডালের প্রবেশ)

চণ্ডাল ঃ আবার রে শয়তান? আবার চীৎকার করছিস। *(ঘাড় ধরিল)*

ঢেঁড়াদার ঃ আজ্ঞে বাবু, আমার ঘাড়টা ছেড়ে দিন। সরু ঘাড় হয়তো ভেঙে যেতে পারে।

চণ্ডাল ঃ আরে শয়তান। আমি যা বলি তাই শোন। এই চণ্ডাল বাবুর আদেশ এই বৃন্দাবনে আর কখনও ঢেঁড়া দিতে আসবি না।

ঢেঁড়াদার ঃ এই চণ্ডাল বাবুর আদেশ এই বৃন্দাবনে পারি তো আবার ঘুরে ফিরে ঢেঁড়া দিতে আসব।

চণ্ডাল ঃ তবে রে শয়তান? যে মুখে তুই ঢেঁড়া দিয়েছিস তুই নিজে বল, এই বৃন্দাবনে আমি আর কখনও ঢেঁড়া দিতে আসবনা।

ঢেঁড়াদার ঃ চণ্ডাল বাবুর আদেশ এই বৃন্দাবনে কখনও কেহ আর ঢেঁড়া দিতে আসবে না।

চণ্ডাল ঃ চলরে শয়তান। তোকে বৃন্দাবনের বাহিরে করে দিয়ে আসি *(উভয়ের প্রস্থান)*

(নৌকা সহ সুবল ও কৃষ্ণের প্রবেশ এবং রাধা ও বৃন্দে ঘোল দইয়ের হাঁড়ি মাথায়

করে প্রবেশ।

রাধা ঃ দেখ বৃন্দে! ঐ দুরে মাঝি দেখা যায়। আমাদের পার করবে কি তুই জিজ্ঞাসা কর।

বৃন্দে ঃ ও মাঝি ভাই। আমরা পারে যাব। আমাদের পার করতে কত কড়ি নেবে।

কৃষ্ণ ঃ পার করতে ষোল আনা কড়ি চাই।

রাঝা ঃ বৃন্দে তুই বল। আমাদের কাছে এক আনা কড়ি আছে তাই দিয়ে পার করবে কি জিজ্ঞাসা কর?

বৃন্দে ঃ *(গীত)* এক আনা দেব কড়ি
পার করে দাও তাড়াতাড়ি
ঐ দুরে চাহিয়া দেখ বেলা
চলে যায় ॥

কৃষ্ণ ঃ এক আনায় পার করি না গো ষোল আনা ষোল আনা না ভজিলে এক আনায় পার করি না গো।

রাধা ঃ বৃন্দে, বল আমরা দু আনা কড়ি দেব।

বৃন্দে ঃ দুই আনা দেব কড়ি পার করে দাও তাড়াতাড়ি
ঐ দুরে চাহিয়া দেখ বেলা চলে যায় ওগো।

কৃষ্ণ ঃ দু আনায় পার করিনাগো
ষোল আনা ভজিলে দু আনায় পার করি না গো।

বৃন্দে ঃ চার আনা দেব কড়ি পার করে দাও তাড়াতাড়ি
ঐ দুরে চাহিয়া দেখ বেলা চলে যায়।

কৃষ্ণ ঃ চার আনায় পার করি নাগো ষোল আনা ভজিলে চার আনায় পার করি না গো।

রাধা ঃ বল্ বৃন্দে, আমরা না হয় আট আনা কড়ি দেব।

বৃন্দে ঃ আট আনা দেব কড়ি পার করে দাও তাড়াতাড়ি
ঐ দুরে চাহিয়া দেখ বেলা চলে যায় ওগো।

কৃষ্ণ ঃ আট আনায় পার করি না গো ষোল আনা না ভজিলে আট আনায় পার করি নাগো।

রাধা ঃ বল বৃন্দে আমরা ষোল আনাই দেব। আমাদের বেলা বয়ে যায়।

বৃন্দে ঃ ষোল আনা দেব কড়ি
পার করে দাও তাড়াতাড়ি
ঐ দুরে চাহিয়া দেখ বেলা চলে যায় ওগো।

কৃষ্ণ ঃ এই তো ষোল আনা হয়ে গেল। তবে এক আনা নাও, দু আনা নাও ওরকম কথা বলছিলে কেন?

বৃন্দে ঃ কই মাঝি, নৌকা কাছে নিয়ে এস। আমরা নৌকায় উঠি।

কৃষ্ণ ঃ (নৌকা কাছে নিয়ে আসিল)। আহা! তোমরা দুজনে একসাথে নৌকায় উঠছ কেন? একা একা ওঠ। আমার ভাঙা নৌকা এক সঙ্গে দুজনের চাপা হবে না।
(গীত) একে আমার ভাঙা নৌকা
দুজনায় বই ধরে না

তোমরা হচ্ছো দমে ভারী
আমার নৌকায় হবে না
একে আমার ভাঙা নৌকা দুজনায় বই ধরে না।

রাধা ঃ বৃন্দে, তুই নাবিককে জিজ্ঞাসা করে দেখ্। আমরা যদি কেহ্ একমনের কম হয়ে থাকি তাহলে ঐ নাবিক কি করবে?

কৃষ্ণ ঃ পূরায়ে নেব গো
এক মনের কম হলে
পূরায়ে নেব গো
প্রেম অনুরাগের মাঝে
পুরায়ে নেব গো।

রাধা ঃ তুই জিজ্ঞাসা করে দেখ এক মনের বেশী হলে কি করবে?

কৃষ্ণ ঃ সুখায়ে নেব গো
সুখায়ে নেব গো
জৈষ্ঠ্য মাসের রৌদ্রে ফেলে
শুকায়ে নেব গো।

রাধা ঃ ঠিক আছে। আমরা এখন নৌকায় উঠবো তো?

কৃষ্ণ ঃ বেশী নড়াচড়া করো না।
নোকায় জল উঠতে পারে।

রাধা ঃ দেখ বৃন্দে, ঐ দূরে একটা নীলা মেঘ উঠেছে। হয়ত এখনই ঝড় উঠতে পারে।

কৃষ্ণ ঃ ঐ দূরে নীল মেঘ উঠেছে
নীল শাড়ী তুমি খুলে ফেল ধনী
ঐ দূরে নীল মেঘ উঠেছে।

বৃন্দে ঃ রাধা, যে ভাবে মেঘ উঠেছে তাতে এখনই ঝড় আসতে পারে হয়ত নৌকা ডুবে যেতে পারে তুই এখন কি করবি?

রাধা ঃ (গীত) আমি নাবিকের গলা ধরিব
গলা ধরিয়া প্রাণ বাঁচাব
আমি নাবিকের গলা ধরিব ॥

(রাধা কৃষ্ণের গলা জড়াইয়া ধরিল এবং নৌকায় রাধা কৃষ্ণের মিলন হইল)

বৃন্দে ঃ (গীত) এই তো যুগল মিলন হল ॥
রাধা কৃষ্ণ গলা ধরিল ॥
এই তো যুগল মিলন হল ॥

রাম যাত্রা
রামের বনবাস

ওঁ নটনাথায় নমঃ

ওঁ কোমলাঙ্গ বিশালাক্ষমিন্দ্রনিল সমপ্রাভাম্
দক্ষিণাংশে দশরথং পুত্রাবেষ্টন তৎপরম্
পুষ্টতো লক্ষণ ধন্যি বামে জানকী শোভা।
পদতলে মারুতি যস্য তংনমামি রঘুতমম্।।

চরিত্র লিপি

পুরুষ

১। জনক
২। ভৃগুরাম
৩। দশরথ
৪। সুমন্ত
৫। রাম
৬। লক্ষ্মণ
৭। চক্রধর — তৎকালিন তেজস্বী ব্রাহ্মণ।
৮। পেটুক — অযোধ্যার জনৈক ব্রাহ্মণ।

স্ত্রী চরিত্র

১। যুথিকা মিথিলার
২। মালতি সীতার সখিগণ
৩। সীতা
৪। কৈকেয়ী — দশরথের দ্বিতীয় স্ত্রী
৫। মন্থরা --- কৈকেয়ীর ধাত্রী

প্রথম দৃশ্য

মিথিলার প্রাসাদ

সীতার পরিচারিকাগণ রাম সীতাকে বরণ

যুথিকা বরণ পাত্র হাতে নিয়ে বরণ শেষ — একি সখি তোমার চোখে জল, বলি অকারণে কেন কর অশ্রুবরিষণ।

সীতা ঃ কেমনে বোঝাব তোমাদের, (মালতীকে ধরিয়া) সখি তোমাদের সবার ভালবাসা উপেক্ষা করে, চায় নাকো যেতে মন, পুণ্য তীর্থ অযোধ্যায়!

জনকের প্রবেশ

জনক ঃ যুথিকা মালতী তোদের বরণের কাজ শেষ হল! ওদিকে ওরা সবাই রথে আরোহণ করেছে।

সীতা ঃ বাবা বলিয়া সীতা জনককে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল, — না বাবা না তোমাকে ছেড়ে আমি কোথাও যাবোনা।

জনক ঃ ওমা তাকি হয়, আজ আর কাঁদতে নেইমা, মেয়ে হয়ে জন্ম নিয়েছিস থাকার জন্য নয়, ভাঙ্গা গড়া এতো তোদেরি খেলা (অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে) স্বর্গ থেকে তোর মা তোকে দুহাত ভরে আশীর্ব্বাদ করবে, আর আমি বলবো তোমার অনুরোধ আমি রেখেছি। এতদিন আমার ছিলি মা কিন্তু আজ থেকে তুই রামের।

রাম সীতা উভয়ের জনককে প্রণাম — আয়ুষ্মান ভবঃ

রাম, মা হারা মেয়েটাকে তোমার হাতে তুলে দিলাম। আজ থেকে ওর দায়দায়িত্ব তোমার।

দশরথের প্রবেশ

দশরথ ঃ ওদিকে সময় অতিবাহিত হতে চলেছে। বৈবাহিক, যথা সময়ে মহেন্দ্র পর্ব্বত অতিক্রম করতে না পারলে হয়ত আমাদের বিপদ হতে পারে।

যুথিকা-মালতী সখিগণের রাম সীতাকে নিয়ে প্রস্থান।

জনক ঃ আসুন আসুন বৈবাহিক, আপনাকে বলার আমার কিছু নেই! আজ যদি ওর মা বেঁচে থাকত তাহলে আমার এত দুঃখ হতনা।

দশরথ ঃ জনকের হাত ধরে সান্ত্বনা, রাজর্ষি এর জন্য আপনি দুঃখ পাবেননা. আপনী অপুত্রক, আজ পুত্র পেলেন. আর আমি কন্যা থেকেও নেই। মাতৃহারা সন্তান আমি, এতদিন পরে ফিরে পেয়েছি হারিয়ে যাওয়া মাকে আমার।

জনক ও দশরথ উভয়ে হাঃ-হাঃ-হাঃ হাসতে হাসতে প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

মিথিলার পথ

রথ প্রস্তুত সারথি সুমন্ত!

রাম-সীতা, লক্ষ্মণ-উর্মিলা দশরথ জনক রাজা ও সীতার পরিচারিকাগণ রথের সামনে দাঁড়িয়ে সখিগণ কর্ত্তৃক শঙ্খ ধ্বনি, রাজা দশরথ তাঁর পুত্র ও পুত্র বধূগণকে নিয়ে রথে আরোহণ করলেন। রথ ছাড় সুমন্ত, অযোধ্যা অভিমুখে রথ রওনা হল। রাম সীতার জয়ধ্বনিতে ভেঙ্গে পড়ল সমগ্র মিথিলার প্রজাগণ।

তৃতীয় দৃশ্য

ভৃগুরামের সাধনা

মহেন্দ্র পর্ব্বতের পাদদেশ

ভৃগুরাম শিবের কাছ হতে ধনুক এনে রেখে ছিলেন মিথিলার রাজা বাজর্ষি জনক এর প্রাসাদে এবং বলেছিলেন এই ধনুকে যে জ্যারোপ করতে পারবে সেই তোমার সীতা নামে কন্যাকে বিবাহ করতে পারবে।

অপর দিকে দশরথ ভৃগুরামের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ রাম নামে কোন সন্তানের নাম করণ করা চলবেনা। ওদিকে সীতা রামের জয়ধ্বনি দিয়ে রথ নিয়ে দশরথ অযোধ্যায় ফিরে যাচ্ছেন।

ভৃগুরাম ঃ একি কোথা হতে ভেসে আসে সীতা রামের জয়ধ্বনি? কে, কেরে অবর্চীন সীতা রামের দিয়ে জয়ধ্বনি মহেন্দ্র পর্ব্বতের পাদদেশ দিয়ে রথ নিয়ে চলে যাস আপন রাজ্যে তোর, যাও চক্রবন রথ রজ্জু কর কর্তন। প্রস্থান

দশরথ ঃ কে, কেরে পামর আমার রথের গতি করিয়া রোধ শমনে আনিলি ডাকিয়া।

ভৃগুরামের প্রবেশ

ভৃগুরাম ঃ শমন? হাঃ হাঃ হাঃ

দশরথ ঃ গুরুদেব, আপনি?

ভৃগুরাম ঃ বল রাজা কোথায় গিয়েছিলে তুমি?

দশরথ ঃ মিথিলায় গুরুদেব,

ভৃগুরাম ঃ বিস্ময় — মিথিলায়?

দশরথ ঃ হাঁ, গুরুদেব, রাজর্ষি জনকের প্রাসাদে,

ভৃগুরাম ঃ কিন্তু কেন?

দশরথ ঃ রাজর্ষি জনক করেছিল পণ, হরের ধনুকে যে জ্যারোপ করতে পারবে, সীতা নামে কন্যাকে তার হাতে অর্পণ করবে, তাইতো আমার চার পুত্র জনকের গৃহে পদার্পণ করে জনকের দুই কন্যাকে করেছে লাভ সীতা পতি রাম উর্মিলা পতি লক্ষ্মণ, আর—

ভৃগুরাম ঃ আর —

দশরথ ঃ জনক ভ্রাতা কুশধ্বজ কন্যা মান্ডবী পতি ভরত শ্রুতকীর্ত্তিপতি শত্রুঘ্ন। উভয়ের চার কন্যাকে পুত্র বধূ রূপে করিয়া গ্রহণ জ্যেষ্ঠ পুত্র মোর রাম সেই রাম নামে দিয়ে জয়ধ্বনি চলেছি স্বরাজ্যে মোর.

ভৃগুরাম ঃ স্তব্ধ হও রাজা! ভুলে গেলে সেদিনের কথা, তোমারি স্বজাতি কার্ত্তবীর্য অর্জ্জুনের হীন আচরণ করেছিল নিরীক্ষণ জননী আমার, যার জন্য পিতৃসকাশে দ্বিচারিণী. কলঙ্কিনী, নামে পেল আখ্যা জননী আমার, তাইতো ভয়াল পরশু করে পিতৃ আদেশ করিতে পালন মাতৃশির করিয়া কর্তন, করিলাম প্রতিজ্ঞা ক্ষত্রিয় রাখিবনা ধরাধাম মাঝে।

দশরথ ঃ শান্ত হন গুরুদেব, আপনি শান্ত হন।

ভৃগুরাম ঃ তাহলে এনামের হোক পরিবর্তন।

দশরথ ঃ এ কি করে সম্ভব, কুলগুরু বশিষ্ঠ গণনা কার্য করে জেষ্ঠ পুত্রের নাম করণ করেছেন রাম।

ভৃগুরাম ঃ বল রাজা, নামের পবিবর্তন করবে কি না?

দশরথ ঃ অসম্ভব, অসম্ভব গুরুদেব রাম নামের পরিবর্তন করতে আমি পারবোনা।

ভৃগুরাম ঃ তাহলে মৃত্যুই তোমার ললাট লিখন। জাগো জেগে ওঠ ভৃগুরাম, ভয়াল পরশু করে ক্ষত্রিয় নিধনে গর্জ্জে ওঠ আজ।

দশরথ ঃ ভৃগুরামের পদতলে বসিলেন ঃ আপনি রাম আর আমার পুত্র রাম এই পবিত্র রাম নামে যদি আমার মৃত্যু হয় সে মৃত্যু হবে গৌরবের!

ভৃগুরাম কুঠার উত্তোলন দশরথের শির লক্ষ্য করে এমনবস্থায় লক্ষ্মণের প্রবেশ

লক্ষ্মণ : শান্ত হন, শান্ত হন ভার্গব।
ভৃগুরাম : কে তুমি যুবক?
লক্ষ্মণ : রামানুজ লক্ষ্মণ।
দশরথ : প্রণাম কর, প্রণাম কর লক্ষ্মণ উনি তোমার পিতৃগুরু।
লক্ষ্মণ : যে গুরু শিষ্যের প্রাণ নিতে যায় তিনি কেমন গুরু।
ভৃগুরাম : রসনা সংযত কর লক্ষ্মণ।
লক্ষ্মণ : কেন কি করবেন?
ভৃগুরাম : একই সাথে পিতা পুত্রে পাঠাবো শমন ভবনে,
লক্ষ্মণ : সে শক্তি আপনার নাই, গুরুদেব।
ভৃগুরাম : হাঃ হাঃ হাঃ কারে দেখায় রে ক্ষত্রিয় নন্দন শক্তির গরিমা, ঐ ভৃগুরাম একদিন মুষ্ট্যাঘাতে গজাননের দন্ত করেছিল ভঙ্গ, শুধু কি তাই, একি চপেটাঘাতে দেব সেনাপতি কার্ত্তিকেয়কে রক্ত বমন করিয়েছি।
লক্ষ্মণ : আর কিছু আছে?
ভৃগুরাম : শুধু তাই নয় সৌমিত্রি. পিতৃ আদেশে মাতৃশির করেছিলাম কর্তন।
লক্ষন : থাক্ থাক, আর শক্তির গরিমা দেখাবেন না, আমার দাদা ভগবান রামচন্দ্র বিশ্বের মানব জাতির কল্যাণের জন্য যা করেছেন তাহলে আপনার পায়ে লুটিয়ে দিতাম আমার উন্নত শির।
ভৃগুরাম : রসনা সংযত কর লক্ষ্মণ।
লক্ষ্মণ : আমার দাদা ভগবান রামচন্দ্র বালক বয়সে শৃঙ্গবের পুরে পদার্পণ করে গুহক চণ্ডালে দিয়ে কোল জাতি বৈষম্যের প্রাচীর ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়ে প্রমাণ করেছেন, মানুষ হল অমৃতের সন্তান।
ভৃগুরাম : সৌমিত্রি!
লক্ষ্মণ : বালক বয়সে রাম তাড়কা রাক্ষসী কে করিয়া সংহার আর্য ঋষিদের যাগযজ্ঞ রক্ষা করেছেন। শুধু তাই নয় রামের পায়ের ছোঁয়ায় শাপভ্রষ্টা মাতা অহল্যার পাষাণ মুক্তি, রামের পদ রজপান করে কুৎসিৎ ধীবরের রূপের পরিবর্তন। রামের পায়ের ছোঁয়ায় নাবিকের ভগ্নতরী স্বর্ণে রূপান্তরিত। আমার দাদা শ্রীরাম চন্দ্র মিথিলার প্রাসাদে পদার্পণ করে হরের ধনুক ভঙ্গ করে মাতা জানকীর বরমাল্য করেছেন গ্রহণ।
দশরথ : লক্ষ্মণ ক্রোধ নিবারণ কর পুত্র।
ভৃগুরাম : বহুদিন ছিল গচ্ছিত, হরের ধনুক মিথিলার প্রাসাদে, তাই জীর্ণকায় হয়েছিল তাহা, তাইতো রাম অবহেলে হরের ধনুক ভঙ্গ করে সীতার বরমাল্য করেছে গ্রহণ।
দশরথ : গুরুদেব, অপেক্ষা করুন, ভাগ্যহীন দশরথের প্রণাম নিন (প্রস্থান)
ভৃগুরাম : আমি দেখতে চাই প্রমাণ করতে চাই কত শক্তির অধীশ্বর তোমার পুত্র রাম।

রাম রথ হতে নামিয়া পিতার কাছে উপস্থিত হলেন

রামের প্রবেশ

রামের অঙ্গ হতে সুবিপুল তেজ রাশি বহির্গত হতে দেখে পরশুরাম স্তম্ভিত হলেন। ও

রাম কর্তৃক পরশু রামকে প্রণাম

রামচন্দ্র : প্রণাম গুরুদেব।

পরশুরাম : আয়ুস্মান ভবঃ, কি নাম তোমার?

রামচন্দ্র : রাম

ভৃগুরাম : তুমিই হরের ধনুক ভঙ্গ করে, সীতার পাণি গ্রহণ করেছো?

রামচন্দ্র : সে তো আপনার আশীর্ব্বাদে।

ভৃগুরাম : না হয় বিশ্বাস আমার।

রামচন্দ্র : বলুন, কি করলে আপনি বিশ্বাস করবেন।

ভৃগুরাম : আমার হাতের এই ধনুক যদি ভঙ্গ করতে পার তবেই জাগিবে প্রত্যয় সত্যই হরের ধনুক ভঙ্গ করেছ।

পরশুরাম নিজ হাতের ধনুক রামচন্দ্রকে দিতে গেলেন রাম চন্দ্র তাহা নিজ বাম হাতে ধারণ করলেন। এই নাও রাম। মরুক রাম আমার এই বিষ্ণু ধনুকের চাপে।

রামচন্দ্র : গুরুদেব, ধনুক যখন দান করলেন, শর প্রদান করুন।

ভৃগুরাম : এই নাও রাম। *(শর প্রদান)*

রামচন্দ্র : *শর গ্রহণ* — অহংকারীর গর্ব্বচূর্ণ করতে অর্দ্ধ শক্তি করিলাম হরণ!

ভৃগুরাম : একি অপুর্ব্ব মুরতি দুনয়নে যা বিশ্ব প্রেমের অমিয় নির্ঝর রক্ত উৎপল ওষ্ঠপুটে মৃদু মধুর হাসি চিকন চিকুর কেশ প্রশস্ত ললাট যুগ্ম ভুরু তবে তবে কি তুমি সেই —

রামচন্দ্র : চেয়েদেখুন ভার্গব চিরতরে সাধনায় যাবার পথ রুদ্ধ হল আজ।

ভৃগুরাম : দুই রামে হোক পুনর্মিলন। পুরাতনের পতন নতুনের অভ্যুদয়! বল বল রাম তোমার সাথে কবে হবে সাক্ষাৎ!

রামচন্দ্র : এই ত্রেতা যুগ এ যুগে আপনি আমার পিতৃগুরু, এ যুগের হবে অবসান, আসবে দ্বাপর। দ্বাপরে আপনার সাথে আমার সাক্ষাৎ হবে কুরুক্ষেত্রের মাঠে। দ্বাপর শেষ হবে আসবে কলি। কলি যুগে সম্ভবল গ্রামে বিষ্ণুযশা বিপ্রের আলয়ে তৎ পত্নি মাতা সুমতির গর্ভে আমি জন্ম নেবো। অত্যাচার, অনাচার ব্যভিচার ম্লেচ্ছ উদ্ধারিতে কল্কি অবতারে আমি আসবো অস্ত্র বিদ্যা ও বেদভ্যাসের জন্য আপনার কাছে যাবো আমি। সেদিন দেব গুরু দক্ষিণা।

রাম লক্ষ্মণ ভৃগুরাম প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

অযোধ্যার প্রাসাদ

নহবতের সুর সমগ্র অযোধ্যাকে মাতিয়ে তুলেছে ওদিকে কৈকেয়ীর চিন্তা। রাজা তার পুত্র ও পুত্র বধুগণকে নিয়ে এখনো এলনা!

কৈকেয়ী : ছোট এই ছোট কোথায় গেলি?

সুমিত্রা : যাই দিদি, বল কি বলছিলে।

কৈকেয়ী : কি, আর, বলবো রথ আসার সময় হয়ে গেছে। বরণের আয়োজন কর।

সুমিত্রা : ওমা! তুমি তাহলে এক খেয়ালে আছো বল, তোমার রামকে বরণ করবে বলে তাইনা? শোন রথ এসে গেছে। ভরত শত্রুঘ্নকে বড়দি বরণ করে তুলে নিয়েছে।

কৈকেয়ী : তাহলে আমার রাম আসেনা কেন?

দশরথ : বলি আসবে কি করে রাম তোমার বড় আদরের সে বলেছে আমার মা না এলে আমি যাবো না।

কৈকেয়ী : ওঃ ছোট শুনছিস, নে চল পুরনারীদের ডাক আমার রাম কে বরণ করতে যাবে।

গাইটছড়া বাঁধা অবস্থায় রাম-সীতার প্রবেশ

কৈকেয়ী : *রাম সীতাকে বরণ — মিষ্টিমুখ, কৈকেয়ী কর্তৃক নব বধুকে অলংকার দান — পুত্র পুত্রবধু কৈকেয়ীকে প্রণাম।* বৌমা, আমি তোমাকে আশীর্বাদ করি মা এই রাজ্যের মা মহারাণী শৈব্যার সমদর্শী হও! রাম আমি তোমাকে আশীর্ব্বাদ করি পুত্র, মহারাজ হরিশচন্দ্র সম প্রজা পালক হয়ে প্রজা পালন করবে ছড়িয়ে পড়বে বিশ্ব মাঝে তোমার খ্যাতি।

রামচন্দ্র : মা আজ ঐ আনন্দের দিনে সবাইকে দেখছি কিন্তু

কৈকেয়ী : ওঃ বুঝেছি তোর দিদিমা আমার মন্থরা মাকে দেখতে পাসনা এইতো? ঔ দেখ সে অভিমান করে প্রাসাদ অলিন্দে বসে রয়েছে।

রামচন্দ্র : বলি এত বড় সাহস যে তোমার উপর অভিমান করেছে দেখনা আমি যাচ্ছি, কেমন করে আনতে তা আমি জানি। *প্রস্থান*

কৈকেয়ী : বৌমা, আজ থেকে এই বিশাল পরিবারের দায়িত্ব তোমার হাতে তুলে দিয়ে আমি একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলব। চল মা, কথায় কথায় বিলম্ব হয়ে গেল।

কৈকেয়ী নববধু সীতাকে নিয়ে প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য

রাজসভা

সুমন্ত লক্ষ্মণ দশরথ

সুমন্ত ও লক্ষ্মণ কর্তৃক দশরথের জয়ধ্বনি — জয় মহারাজ দশরথের জয় ... জয় ... জয় ...

দশরথের প্রবেশ

দশরথ : জবা কুসম সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম
ধান্তারিং সর্ব্ব পাপঘ্নং প্রণতোহস্মি দিবাকরম।।
ওগো আমার পূর্ব্বপুরুষ তোমার আলোক ছটায় দেখাও আমাকে সত্যের আলো, অন্তরের কালিমা কর দূরীভূত, *(রাজসিংহাসনে উপবেশন)*
এই যে সুমন্ত, লক্ষ্মণ ও আছো, শোন লক্ষ্মণ আমার আদেশ তোমাদের বিবাহের জন্য আমি মনস্থ করেছি এক প্রীতিভোজের আয়োজন করতে চাই, কি বল সুমন্ত?

সুমন্ত ঃ তাহলে এই সুখবরটা পৌচে দিতে আমিই যাই, অযোধ্যার প্রজাদের গৃহে।

লক্ষ্মণ ঃ না পিতা ঐ আদেশটা আপনি আমাকে দিন, আমি যাই প্রজাদের কাছে।

দশরথ ঃ ঠিক বলেছ লক্ষ্মণ তুমি যাও, হাঁ আর একটা কথা শুনে যাও রাম সীতার বিবাহের উপলক্ষে সপ্তাহ দিন কোষাগার উন্মুক্ত থাকবে। *(প্রস্থান)*

সুমন্ত ঃ কি আনন্দ, কি আনন্দ, আজ আমি অপুত্রক হলেও রামকে সন্তানের ন্যায় ভালবাসি। হে ঈশ্বর তোমার কাছে আমার প্রার্থনা এই আনন্দের সাগর থেকে তুমি যেন কোন দিন বঞ্চিত করোনা, তুমি যেন কোন দিন বঞ্চিত করোনা। *(প্রস্থান)*

লক্ষ্মণ ঃ ভাগ্যবান, ভাগ্যবান, লক্ষ্মণ রত্নাগর্ভা মায়ের গর্ভে জন্ম নিতে পেরেছে আমার জীবন সাথী। ওগো করুণাময় মিনতি চরণে তোমার বঞ্চিত যেন কোনদিন করোনা তোমার পূজারী ব্রাহ্মণে। *(প্রস্থান)*

ষষ্ঠ দৃশ্য

অন্তঃপুরের একাংশ

কুঁজি মন্থরা রাম

কুঁজি মালা গেঁথে রামেব অপেক্ষায় রয়েছে পরনে সাদা থান। পাকা চুল পিঠে কুঁজ হাতে লাঠি।

কুঁজ ঃ রাম রাম আর রাম সবার মুখে একি কথা। বলি আজ একবার আসুকনা। কথাতো বলবই না; এমন শাস্তি দেব —

পিছন থেকে রাম গিয়া কুঁজি মন্থরার চোখ টিপিয়া ধরিল বলিল আমার সাথে মস্করা হচ্ছে। তবেরে হতচ্ছাড়া, (লাঠি তুলিল রাম চোখ খুলিয়া দিল)

রামচন্দ্র ঃ কি হল বলি হলটা কি,

কুঁজি ঃ *অবাক হয়ে রামের মুখের দিকে তাকিয়ে রহিল* বলি হবেটা কী তুই যে কথা দিলি দিদিমা আমি হবো তোমার বর, আর তুমি হবে আর বউ, নে মালাটা পরেনে। *বলে রামের গলায় মালা পরাইতে গেল মালা মাটিতে পড়ে যাওয়া রাম কর্তৃক মালা তুলে নেওয়া।*

রামচন্দ্র ঃ দিদিমা, বলোতো তোমার কি আশা?

কুঁজি ঃ আমার আশা, আমার হাতের গাঁথা মালা তোর গলায় পরিয়ে স্বামী রূপে পেতে চাই।

রামচন্দ্র ঃ দিদিমা, তুমি আমার মেজ মায়ের মা সম্মানীয়া, পূজনীয়া, তুমি যে একথা বলবে এ আমি জীবনে কোনদিন আশা করতে পারিনি, তথাপি তুমি যখন বলছো তোমার আশা নিশ্চয় পূর্ণ হবে, তবে এযুগে নয়।

কুঁজি ঃ তবে কোন যুগে?

রামচন্দ্র ঃ আগত দ্বাপর যুগে অন্ধকার কারাগারে মাতা দেবকীর কোল আলো করে জন্ম নেবো, নাম হবে কালাচাঁদ। পিতা বসুদেবের সাহায্যে চলে যাবো দূর নন্দালয়ে যমুনা পুলিনে গোপবালাসনে। খেলিব প্রেমের খেলা। হাতে নিয়ে মোহন বেণু গোঠে গোঠে চরাইব ধেনু। ধেনুগণ ডাকিবে হাম্বা হাম্বা রবে। মহা মুনি অক্রুর

চালাইয়া রথ কংসের ধনুর যজ্ঞে করিতে আমন্ত্রণ। কৃষ্ণ সমীপে রোহিনী নন্দন ভাই বলরামের হাত ধরে ধনুর যজ্ঞে করিব অংশ গ্রহণ। সেই দীন ধরা ধামে বৃন্দাবন মাঝে জন্ম নেবে তুমি। রাধারে দিয়ে ফাঁকি তোমার কুঞ্জে কাটাইব নিশি। নাম হবে তোমার চন্দ্রাবলি। *প্রস্থান*

কুঁজি ঃ কি, এতদুর, এখন একযুগ আমাকে অপেক্ষা করতে হবে, শোন তবে রাম আমিও তোকে সুখে সংসার করতে দেবোনা আমার চোখের সামনে তোকে আমি সুখভোগ করতে দেবোনা। *প্রস্থান*

সপ্তম দৃশ্য

চক্রধর মিশ্রের বাড়ি

চক্রধর তামাক খাচ্ছে এমন সময় পেটুক এর প্রবেশ

পেটুক ঃ চক্রধর বাড়িতে আছো নাকি? চক্রধর?

চক্রধর ঃ আরে এসো ভায়া এসো - সাত সকালে কি মনে করে?

পেটুক ঃ তুমি তাহলে গাঁয়ের কিছু সংবাদ রাখনা দেখছি ঃ

চক্রধর ঃ বলি হয়েছে কী?

পেটুক ঃ হবে আবার কী, হয়ে বসে আছে।

লক্ষ্মণের প্রবেশ

লক্ষ্মণ ঃ অন্যকিছু নয়, আমরা চার ভাই মিথিলার প্রাসাদে পদার্পণ করে রাজকন্যাদের বিবাহ করেছি তাই আমার পিতা এক প্রীতিভোজের আয়োজন করেছেন। শুধু তাই নয়। সপ্তাহ দিবস কোসাগার মুক্ত থাকবে। আরো বলেছেন। ঐ কদিনের জন্য যে যা প্রার্থনা নিয়ে যাবে তার আশা পূর্ণ করার আশ্বাস দিয়েছেন!

চক্রধর ঃ তাই না কি। ওহে পেটুক এই কদিন আগে তুমি বলে ছিলেনা তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে

পেটুক ঃ দীর্ঘ নিঃশ্বাস - হাঁ ভাই সেকথা বলতে

লক্ষ্মণ ঃ আপনারা আমার প্রণাম নিন। (প্রস্থান উদ্যত, হাঁ আর একটা কথা বলে যাই যথা সময়ে কিন্তু উপস্থিত হবেন। *প্রস্থান*

পেটুক ঃ ওহে চল চল এই সুখবরটা সবাইকে জানিয়ে আসি আরে ভাই খাব। বাঁধবো নিয়ে আসবো।

চক্রধর ঃ সে কথা বলতে - উভয়ে হাসতে হাসতে হ্যাঁঃ হ্যাঁঃ হ্যাঁঃ প্রস্থান।

অষ্টম দৃশ্য

সীতার কখ্য

সীতা ও মন্থরা

সীতা ঃ গান - মদন মোহন হে প্রভু কৃপা কর
কি আছে আমার বলহে।

জানিনা ভকতি পুজা
আমি অভাগিনী
আঁখি জল করিয়াছি সম্বলহে
কি আছে আমার বলহে
মদন মোহন হে প্রভু কৃপা কর
এই দেহ এই প্রাণ করেছি যে তোমায় দান
সব দিয়েছি প্রভু রাঙ্গা চরণে
মদন মোহন ....

বড় ভাগ্যবতী আমি দেবতার মত স্বামী পেয়েছি আর শ্বশুর শ্বাশুড়ী, ওনাদের তুলনা আমি বলতে পারবোনা, যা চেয়েছি তা পেয়েছি, ওনাদের বিচার করতে আমি কোন দিন পারবোনা!

কুঁজি ঃ বলি ও নাত বৌ, বলি; কি; বলতে পারবিনা।

সীতা ঃ কে আপনি?

কুঁজি ঃ ওমা আমি? আমিইত সব

সীতা ঃ কোথা থেকে আসছেন। বলি কি মনে করে

কুঁজি ঃ (অন্তরালে) এতরূপ সীতার এই সীতাকে সরাতে না পারলে রামকে কোনদিন স্বামীরূপে কাছে পাবোনা! থাক কথায় কথায় অনেক কথা শ্বাশুড়ির সেবা করতে জানো।

সীতা ঃ শৈশবে সখিদের সাথে আনন্দে দিন কেটে গেছে আপনি যদি শিখিয়ে দেন -

কুঁজি ঃ ওমা খেয়েছ আর সখিদের নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছো। শোন বাছা তোমার শ্বাশুড়ী যখন বলবে বৌমা আমি অসুস্থ আমার পদ সেবা করে দাও, তখন কী করবে জান,

সীতা ঃ কি করবো?

কুঁজি ঃ কি করবে আবার তোমার মাথার সোনার কাঁটাটা নিয়ে পেক. পেক, করে ফুটিয়ে দেবে।

সীতা ঃ আপনার এই শিক্ষা শুনে আমার মনে হচ্ছে এ বাড়ির আপন জন আপনি নন। নিশ্চই এ বাড়ির দাসী!

কুঁজি ঃ শোন. শোন সীতা, এই পরিবারে যা কোনদিন কেউ বলতে পারেনি, সে কথা নিজ মুখে আমাকে দাসী বলে বাঙ্গ করলি সবাই ক্ষমা করলে আমার নিঃশ্বাস থেকে কোন দিন পরিত্রাণ পাবিনা। শোন - সীতা আমি যদি শুদ্ধ সতী হই স্বামীর হাত ধরে চোখের জল ফেলতে ফেলতে একই বস্ত্রে সর্ব্বসুখ ত্যাগ করে তোদের চলে যেতে হবে কন্টকাকীর্ণ পথে। *প্রস্থান!*

ভূলুণ্ঠিতা সীতা রামের প্রবেশ

রাম ঃ সীতা সীতা,

সীতা ঃ আর্য্য পুত্র।

রাম ঃ তোমার চোখে জল? কেন কি হয়েছে?

সীতা ঃ না - না কিছু না!

রাম ঃ তবে কি মিথিলার জন্য প্রাণ কাঁদছে!

সীতা ঃ (দুঃখভাবে) জানো, রঘুনাথ আমি স্বপ্ন দেখেছি। আমরা দুইজনে অযোধ্যার সর্ব্বসুখ থেকে বঞ্চিত, হয়েছি।

রাম ঃ স্বপ্ন আবার কোন দিন সত্যি হয় নাকি।

সীতা ঃ হয় রাজকুমার, এক বৃদ্ধা আমার কাছে এসেছিলেন, আমাকে বললেন শ্বশুর শ্বাশুড়ীর সেবা করতে জান?

রাম ঃ তার বিনিময়ে তুমি কি বললে,

সীতা ঃ রাজ পরিবারে সখিদের সাথে খেলা করে মহাআনন্দে দিন কেটে গেছে, মা হারা মেয়ে আমি কে শেখাবে আমাকে, আপনি পূজনীয়া আপনি যদি শিখিয়ে দেন আমি নিশ্চই শ্বশুর-শাশুড়ীর সেবা করতে পারবো,

রামচন্দ্র ঃ কি বললেন তিনি।

সীতা ঃ আমায় বললেন শোন বাছা। তোমার শাশুড়ী যখন বলবে বৌমা আমি অসুস্থা আমার পদ সেবা করে দাও তখন তুমি কি করবে জান, তোমার ঐ মাথা বাঁধা সোনার কাঁটা মাথা থেকে তুলে তোমার শাশুড়ীর পায়ে ফুটিয়ে দেবে।

রামচন্দ্র ঃ সীতা,

সীতা ঃ তখন আমি বলেছি এ পরিবারের আপনি আপন জন হলে একথা বলতে পারতেন না। নিশ্চই আপনি এ বাড়ির দাসী।

রামচন্দ্র ঃ তবে কি কুজি মন্থরা বল সীতা বল। আর কি বলেছে

সীতা ঃ আমাকে বলেছে। দাসী বলে যখন আমাকে বাঙ্গ করলি আমার অভিশাপে স্বামীর হাত ধরে চোখের জল ফেলতে ফেলতে অযোধ্যার সর্ব্বসুখ ত্যাগ করে তোদের চলে যেতে হবে এযদি মিথ্যা হয় চন্দ্র. সূর্য্য, মিথ্যা হয়ে যাবে মিথ্যা হবে সতী মন্থরার অভিশাপ।

রামচন্দ্র ঃ এ তোমার মনের ভুল ধারণা।

সীতা ঃ ভুল, ভুল যদি কোন দিন, ফুল হয়ে ঝড়ে পড়ে আমাদের জীবনে সেদিন আমরা কোথায় যাবো আর্য্য পুত্র?

(গান- সীতা)

আমরা আমরা দুজনে
মাটির ভুবনে
হতে চাই দুজনায়
হতে চাই দুজনার
তুমি মোর প্রিয়া
আমি প্রিয়তম
তাই ডাকি বারে বার
হতে চাই দুজনায়
তোমারি ভরালো
ভরালো জীবন

চির সাথী হয়ে রব
তোমার সারাটি জীবন
রামচন্দ্র ও সীতা উভয়ের (প্রস্থান)

নবম দৃশ্য

রাজসভা

সুমন্ত দশরথ

সুমন্ত ঃ আনন্দ আনন্দ কি আনন্দ আজ অযোধ্যার চতুর্দিকে আনন্দের হিল্লোল বয়ে চলেছে। মুনিঋষিগণ রাম সীতাকে আশীর্ব্বাদ করে যাচ্ছে, প্রজারা কাতারে কাতারে আসছে, ও দিকে মহারাজ সবাইকে দান ধ্যান করছেন, রাজা দশরথের জয়ধ্বনি

দশরথ ঃ সুমন্ত, বল সমগ্র প্রজাগণ কি বলতে চায়,

সুমন্ত ঃ মহারাজ, ভয়ে বলবো না নির্ভয়ে বলব,

দশরথ ঃ তুমি আমাকে ভয় করনা কী?

সুমন্ত ঃ ভয়ও করি শ্রদ্ধাও করি, অযোধ্যার প্রজাগণ বলতে চায় আমরা রামকে রাজা রূপে দেখতে চাই, *(প্রস্থান)*

দশরথ ঃ কী বললে, সুমন্ত? আমারও মনের আশা রামকে রাজসিংহাসনে বসিয়ে আমার এই বাকি জীবনটা বাণপ্রস্থে কাটিয়ে দিতে চাই!
(তোরণ দ্বারে প্রজাদের জয়ধ্বনি ঃ রামকে রাজা রূপে দেখতে চাই! লক্ষ্মণ তাদের বন্দী করে রাজ সভায় আনে চক্রধর মিশ্র, পেটুক, লক্ষ্মণ)

চক্রধর ঃ জয় মহারাজ দশরথের জয়।

দশরথ ঃ অযোধ্যার তোরণ দ্বারে কাদের জয়ধ্বনি সুমন্ত?
লক্ষ্মণের প্রবেশ

লক্ষ্মণ ঃ রাজদ্রোহী প্রজাদের পিতা।

দশরথ ঃ রাজদ্রোহী! যাও লক্ষ্মণ রাজদ্রোহী প্রজাদের রাজ সভায় নিয়ে এস,

লক্ষ্মণ ঃ যথা আদেশ পিতা!
(লক্ষ্মণ, চক্রধর ও পেটুক, উভয়ে বন্দী, ও রাজসভায় যাওয়া)

দশরথ ঃ বল প্রজাগণ আমি তোমাদের কাছে কি অন্যায় করেছি, কবে কোন দিন অবিচার করেছি, যে আমার পরিবর্তে আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র রামকে রাজা রূপে দেখতে চাও।

চক্রধর ঃ মহারাজ আপনার অবদান আপনার ভালবাসা আমরা কোন দিন ভুলতে পারবোনা. তবুও আমাদের মনের ইচ্ছা। আমরা রাম রাজত্বে বাস করতে চাই!

পেটুক ঃ হ্যাঁ মহারাজ রামচন্দ্র রাজ সিংহাসনে বসবে বামে থাকবে মা সীতাদেবী মহা আনন্দে আমরা বসবাস করবো!

দশরথ ঃ কি, এতদূর, তোমাদের মনের অভিপ্রায় আমি বুঝতে পেরেছি, বয়সে বালক রাম নাহি আছে রাজনীতি জ্ঞান। তাকে রাজসিংহাসনে বসিয়ে তাকে নিয়ে তোমরা পুতুল খেলা করতে চাও;

প্রজাগণ, চক্রধর ও পেটুক উভয়ে—মহারাজ

জশরথ তোমরা যা অন্যায় করেছ এরজন্য তোমাদের শাস্তি পেতে হবে?

চক্রধর ও পেটুক উভয়ে ঃ আমাদের শাস্তি

দশরথ অসি উত্তোলন - তোমাদের শাস্তি

লক্ষ্মণ এদের শাস্তি দেবার আগে আমাকে শাস্তি দিন পিতা।

দশরথ তাহল কী জানবো এ প্রজা বিদ্রোহের নায়ক তুমি লক্ষ্মণ?

লক্ষ্মণ আমারও মনের ইচ্ছা পিতা দাদা রাজসিংহাসনে বসবে মা জানকী থাকবে বামে আর আমি দক্ষিণে স্বর্ণছত্র ধারণ করবো।

দশরথ লক্ষ্মণ, তুমি কী একবার চিন্তা করে দেখেছ
এ সিংহাসনে তোমার সমস্ত ভায়েদের অধিকার, যাও প্রজাগণ তোমাদের আশাপূর্ণ হবে। লক্ষ্মণ ভাগ্য বলে তোমাদের পুত্ররূপে পেয়েছি আমারও মনের আশা রামকে রাজ সিংহাসনে বসিয়ে তোমার মায়েদের নিয়ে আমি তীর্থে চলে যাবো। যাও লক্ষ্মণ প্রজাদের নিয়ে রাজ সভা ত্যাগ করো। হ্যাঁ আর শোন, কুলগুরুকে জিজ্ঞাসা করো রামকে রাজারূপে কবে অভিষিক্ত করা হবে। *(প্রস্থান)*

লক্ষ্মণ ঃ চল ভাই। আমরা সবাই রামচন্দ্রের রাজ সিংহাসনে বসার আয়োজন করি।

চক্রধর ও পেটুক উভয়ে রামের জয়ধ্বনি দিতে দিতে রাজসভা ত্যাগ জয় শ্রী রামচন্দ্রের জয়। লক্ষ্মণ, চক্রধর, পেটুক প্রস্থান

দশম দৃশ্য

অন্তঃপুর

কৈকেয়ীর কক্ষ

কৈকেয়ী ঃ ওগো ভগবান তোমার চরণে প্রার্থনা করে আজ আমরা চারবোন, সন্তানের মা হতে পেরেছি। রামকে করেছি আপন। তাই অভাগিনী কৈকেয়ীর প্রার্থনা যে চাঁদের হাট আমি বসিয়েছি এ হাট যেন কোনদিন ভেঙ্গে দিও না।

দশরথের প্রবেশ

দশরথ ঃ কৈকেয়ী কৈকেয়ী

কৈকেয়ী ঃ বলি হয়েছে কী?

দশরথ ঃ হবে আবার কী হয়ে বসে আছে।

কৈকেয়ী ঃ তুমি কি বলছো, আমি কিছুই বুঝতে পারছিনা।

দশরথ ঃ তোমার পুত্র লক্ষ্মণ,

কৈকেয়ী ঃ লক্ষ্মণ, কি করেছে কি.

দশরথ ঃ সমস্ত প্রজাগণকে আমার বিরুদ্ধে খেপিয়ে তুলেছে, যে আমার পরিবর্তে রামকে রাজা রূপে দেখতে চায়

কৈকেয়ী ঃ ঐকথা। এতো আমারও আশা রাম রাজা হবে আমি রাজ মাতা হবো।

দশরথ ঃ কিন্তু, কৈকেয়ী তুমি কি এক বার চিন্তা করে দেখেছ আমি তোমার কাছে প্রতিশ্রুতি বদ্ধ তোমার গর্ভজাত সন্তান হবে রাজা। ভরত হবে অযোধ্যার রাজা।

কৈকেয়ী ঃ না তা হয় না প্রতিশ্রুতি থেকে আমি মুক্তি দিলাম। আমার রাম থাকতে ভরত রাজা হতে পারেনা।

দশরথ ঃ কৈকেয়ী এখন সময় আছে চিন্তা করে দেখ। রাম রাজা হলে —

কৈকেয়ী ঃ কিসের চিন্তা রাম রাজা হলে বড়দি রাজ মাতা হবে একথা। ওগো তবুও আমি ধন্যা। রামকে রাজারূপে দেখে আমি যদি স্বর্গে যেতে পারি আমি নিজেকে ধন্য মনে করবো। না না আমি যাই রামের রাজ্যাভিষেকের আয়োজন করি! *প্রস্থান*

দশরথ ঃ ওরে কে আছিস - না না আমি নিজেই যাবো রাজ গুরু বশিষ্ঠের কাছে বিধান জানতে রাম রাজসিংহাসনে বসবে মুনি ঋষিরা আশীর্বাদ করবেন।
(দৈববাণী অন্ধমুনি অভিশাপের কথা রাজা দশরথ আমার নয়ন মনি সিন্ধুকে আমার বুক থেকে কেড়ে নিয়েছো একবিন্দু জলের জন্য আমি যেমন প্রাণ হারিয়েছি তুমি রাজা একবিন্দু জলের জন্য হা রাম কোথা রাম বলে অশ্রু বরিষণ করবে কাছে নাহি পাবে রামে প্রাণ হারাবে)
হাঃ হাঃ হাঃ কে, কে তুমি মহা মুনি অন্ধ ক্ষমা কর ক্ষমা কর ব্রাহ্মণ। রাম আমার রাজা হবে রামকে রাজ সিংহাসনে বসিয়ে আমি বাণপ্রস্থে চলে যাবো। আমি বাণপ্রস্থে চলে যাবো। *প্রস্থান*

একাদশ দৃশ্য

রাজ সভার একাংশ বশিষ্ঠ। দশরথ

রামচন্দ্র! সীতা! লক্ষ্মণ। সুমন্ত। কৈকেয়ী! মন্থরা

রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক একে একে আশীর্বাদ করলেন কৈকেয়ী আশীর্ব্বাদ করবেন এমন সময়

বশিষ্ঠ ঃ রামচন্দ্র দীর্ঘ আয়ু লাভ কর বৎস, তোমার আদর্শ তোমার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ুক পৃথিবীর বুকে!

দশরথ ঃ রাম অযোধ্যার সিংহাসনে আমার পিতামহগণ বসে প্রজা পালন করে বৈরাগ্য লাভ করেছেন, সেই সিংহাসনে বসে তুমি প্রজা পালন করবে। তোমার আদর্শ স্থান পাক ভারতের মাটিতে।

কৈকেয়ী ঃ রাম আমি তোমাদের আশীর্ব্বাদ করি বাবা-মহারাজ হরিশ্চন্দ্র সমদর্শী —

মন্থরার প্রবেশ

মন্থরা ঃ কৈকেয়ীর হাত ধরিয়া টানতে টানতে আনা
সমগ্র অযোধ্যায় বিষাদের ছায়া
রাম ও সীতাদেবীকে নিয়ে সুমন্ত লক্ষ্মণ কক্ষচ্যুত হলেন।

দশরথ ঃ গুরু দেব? একি হলো আজ আমি তো কিছুই বুঝতে পারছিনা

বশিষ্ঠ ঃ রাম তোমার একার নয় দশরথ রাম বিশ্বের রামকে তুমি বেঁধে রাখতে পারবেনা কোনদিনই না *প্রস্থান*

দশরথ ঃ রামকে আমি বেঁধে রাখতে পারবোনা, কে বলে কে বলে রামকে আমি বেঁধে রাখতে পারবোনা? রাম হবে রাজা। ঐ আনন্দের দিনে যে যা চাইবে আমি তাদের দু হাত ভরে দান করবো। দুহাত ভরে দান করবো। *প্রস্থান*

দ্বাদশ দৃশ্য
অন্তঃপুরের একাংশ

কৈকেয়ী ঃ বল মা তুমি আমাকে টানতে টানতে রাজসভা থেকে নিয়ে এলে কেন?

মন্থরা ঃ বলি আনবনাটা কেন? রামকে আশীর্ব্বাদ করতে যাচ্ছিস। একবার আমার দাদু ভায়ের কথা চিন্তা করেছিস।

কৈকেয়ী ঃ তুমি কার কথা বলছো মা,

মন্থরা ঃ কার কথা আবার আমার ভরত দাদু ভায়ের কথা বলছি। জানিস রাম যদি রাজা হয় কৌশল্যা হবে রাজ মাতা। আর তুই হবি কৌশল্যার পদসেবিকা দাসী।

কৈকেয়ী ঃ যা বলার বলেছ দ্বিতীয় বার ঐ কথা বললে আমি তোমার —

মন্থরা ঃ কেন? কী করবি কি একবার কেন হাজার বার বলবো রাম রাজা হলে তুই হবি কৌশল্যার পদসেবিকা দাসী।

কৈকেয়ীর মন্থরাকে গলাটিপতে যাওয়া ও দেবতাদের দৈববাণী—দুষ্ট সরস্বতী কৈকেয়ীর কণ্ঠে বসে বল আজ রাম বন বাস।

. দশরথের প্রবেশ

দশরথ ঃ কৈকেয়ী কৈকেয়ী, একি একি মা, কৈকেয়ী কেন ভূলুণ্ঠিত?

মন্থরা ঃ দেখ বাবা দেখ মেয়েটা *(কান্নার সুরে)*

দশরথ ঃ তুমি যাও মা কোন চিন্তা নেই।

মন্থরা ঃ আমি ঘর ভাঙ্গতেও জানি! আর গড়তেও জানি নাম আমার মন্থরা। *(প্রস্থান)*

দশরথ ঃ বল কৈকেয়ী বল কী হয়েছে তোমার?

কৈকেয়ী ঃ মহারাজ আমার শিরঃপীড়া হয়েছে।

দশরথ ঃ ওরে কে আছিস রাজ বৈদ্য আন?

কৈকেয়ী ঃ থাক মহারাজ রাজবৈদ্য আনতে হবে না। আমার রাজ বৈদ্য তুমি।

দশরথ ঃ কি বলছ কৈকেয়ী,

কৈয়েকী ঃ যা বলছি সব সত্য মহারাজ

দশরথ ঃ বল বল কৈকেয়ী কি করলে তুমি আবোগ্য লাভ করবে!

কৈকেয়ী ঃ মুখের কথায় বিশ্বাস করিনা। মহারাজ!

দশরথ ঃ বল রানী কী করলে বিশ্বাস করবে!

কৈকেয়ী ঃ যদি ইষ্ট দেবতার নামে প্রতিজ্ঞা কর তবে আমার বিশ্বাস হবে।

দশরথ ঃ আমার কুলদেবতার নামে তোমার সঙ্গে অঙ্গীকার করছি তোমায় ব্যাধি মুক্ত করতে তুমি যা চাইবে তোমার প্রাণের বিনিময়ে আমি তাই দেব।

কৈকেয়ী ঃ মহারাজ আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে। যেদিন অসুরের হাত থেকে দেবতা দলকে রক্ষা করতে যান সেদিন ক্ষত বিক্ষত হয়ে ফিরে এলেন। সেদিন আমার পরিচর্যায় আপনি সুস্থ হয়ে আমাকে বর দিতে চাইলেন, —

দশরথ ঃ কৈকেয়ী?

কৈকেয়ী ঃ আমি বলেছিলাম, আজ নয় প্রযোজন হলে আমি চেয়ে নেবো।

লক্ষ্মণের প্রবেশ

লক্ষ্মণ ঃ দিবসে শুনতে পাই পেচকের আর্তনাদ, মাথার ওপর বায়স পক্ষি উড়িছে আজি। স্তব্ধ হয়ে গেল নহবতের সুর। অমানিশায় ঘিরেছে সোনার অযোধ্যা। দাদা - দাদা

রাম সীতাকে দেখে

একী বেশ তোমার? অশ্রুসিক্ত দাঁড়ায়ে কেন গো জননী?

রাম ঃ লক্ষ্মণ চলেছি তীর্থ পর্যটনে

লক্ষ্মণ ঃ নিয়ে চল দাসেরে তোমার।

সীতা ঃ তুমি কোথায় যাবে দেবর।

লক্ষ্মণ ঃ তোমাদের সাথে গো জননী।

সীতা ঃ কাঁদায়ে বোন উর্ম্মিলায় কোথায় যাবে তুমি।

লক্ষ্মণ ঃ উর্ম্মিলা? রাম জ্ঞান রাম ধ্যান যার, তুচ্ছ পত্নী উর্ম্মিলার ভালবাসা সকাশে আমার

কৈকেয়ী ঃ তুমি কোথায় যাবে লক্ষ্মণ।

লক্ষ্মণ ঃ আমি স্ব-ইচ্ছায় যেতে চাই জননী।

কৈকেয়ী ঃ শোন তবে লক্ষ্মণ রাম সীতার সর্ব্ব দায়িত্ব তোমার উপর দিলাম। চতুর্দ্দশ বর্ষ পরে রাম সীতাকে আমার হাতে তুলে দেবে।
রাম, সীতা, লক্ষ্মণ কৈকেয়ীকে প্রণাম, কে আছিস, সুমন্তকে পাঠিয়ে দে

সুমন্তর প্রবেশ

সুমন্ত ঃ যাই মেজ মা - বলি আমাকে ঐ অসময়ে কেন মা *(রাম সীতা লক্ষ্মণকে দেখে একি?)*

কৈকেয়ী ঃ খুব আশ্চর্য্য লাগছে তাই না সুমন্ত। হাঁ শোন রাম সীতা আর লক্ষ্মণ এই তিনজনায় রেখে এস তমসা নদীর তীরে।

সুমন্ত ঃ আমি পারবোনা।

কৈকেয়ী ঃ মনে রেখো তুমি কৃতদাস আর আমি তোমার প্রভু পত্নি।

সুমন্ত ঃ চল, চল রাম, বৃদ্ধ সুমন্তের দাস জীবনের হোক অবসান
(রাম, সীতা, লক্ষ্মণ, সুমন্ত প্রস্থান)

কৈকেয়ী ঃ এতদিন পরে আপদ গেল এইবার নন্দীগ্রাম থেকে ভরতকে এনে সিংহাসনে বসাতে পারলে আমার কাজ শেষ হ্যাঁঃ হ্যাঁঃ হ্যাঁঃ *(প্রস্থান)*

পথ নদীর-তীর

গান ঃ রাম সীতা লক্ষ্মণ
রাম সীতা গেল বনবাসে
কৌশল্যা জননী কাঁদে
মরমে মরীয়া গো
মরমে মরিয়া

সীতা কাঁদে লক্ষ্মণ কাঁদে
কাঁদে প্রজাকুল
তার অধিক কাঁদে ওগো
জগতের জীবকুল
রাম সীতা গেল বন বাসে।
কৌশল্যা জননী কাঁদে
মরমে মরিয়া গো
মরমে মরিয়া
রাম সীতা গেল বনবাসে।

যবনিকা

(রামযাত্রার 'রামের বনবাস' লোক পালাপর্বটি হাওড়া জেলার আমতা নিবাসী কালিপদ অধিকারী মহাশয়ের নিকট হইতে সংগৃহীত)

মেদিনীপুর জেলার লোকনাট্য

ভাঁড়যাত্রার গান

মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল থানার অন্তর্গত বরদাগ্রাম ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের কৃষিজীবী ক্ষেত মজুর, সমাজের নিম্নবর্গের মানুষজনের মধ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয় লোকপালা গান ভাঁড়যাত্রা।

ভাঁড়যাত্রা, রাঢ় অঞ্চলের লেটো গানেরই অনুরূপ এবং আদি রসাত্মক।

ভাঁড়যাত্রার আসর বসে দু দলের মধ্যে। দু দলেরই একজন করে মূল গায়ক ও সঙ্গে থাকে দোহার। এ গানের বাদ্যযন্ত্র হিসাবে বাংলা ঢোল ও কাঁসি ব্যবহৃত হয়। পুরুষেরা মেয়ে সেজে অভিনয় করে। ভাঁড় যাত্রার গানে নাচ অপরিহার্য্য নয়, তবে বৈচিত্র্য আনার জন্য কখনো কখনো নাচের ব্যবহারও চোখে পড়ে।

ভাঁড়যাত্রায় প্রতিযোগিতা চলে দু দলের মধ্যে। বিজয়ী দল মেডেল ও পুরস্কার পায় এবং বিজিত দল পায় এক কাঁদি কাঁচা কলা।

বর্তমানে এই গানের অবলুপ্তি ঘটতে চলেছে তবে এক সময়ে মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বহুল প্রচলিত লোকনাট্য হিসাবে 'ভাঁড়যাত্রা' খ্যাতি লাভ করে।

যায় যাবে মোর জাতি কুলমান
আমি কালার বাঁশি শুনব গো।
বলে পাড়ার প্রতিবেশি
শুনিস না রাই কালার বাঁশি
বাঁশি নয় সে প্রেমের ফাঁসি
কুলে কালি দিবে গো।

আমি কালার বাঁশি শুনব গো।

(২)

আর যাব না জল আনিতে
কদম তলায় দাঁড়িয়ে কালা
যত বলি সরো সরো
ছুঁয়োনা শ্যাম নটবর
তবু কালা হেসে হেসে
আমার গলায় পরায় মালা।
আর যাব না ....
শ্বাশুড়ি ননদি ঘরে
দয়া করে ছাড় মোরে
আমি যে তোমারই রাধা
তুমি আমার হৃদয় আলো।
ছিঃ ছিঃ কালা আঁচল ছাড়ো
একি জানা হলো বল।
বৈকালে এসেছি ঘাটে
দীনমণি অস্ত গেল।
আর যাব না ....

পুং যার জন্য ঘর সেই বাসে বর
ঘর কিসের তরে।
কিনে আনি ভাঙন বাটা
মাছ খায় সে দেয় আমায় কাঁটা
বলতে গেলে অমনি ঝাঁটা
মারে যে মোরে।
যার জন্যে ঘর সেই বাসে পর
ঘর কিসের তরে।

(৪)

সঙ গান

ও পরাণের হুকারে তোর নাম যে ছিল ডাবা
হুকোর ভিতর গঙ্গাজল, নলচের ভিতর' পানি
বিষ্ণুপুরের তামাক সেজে ভুড়ুক তুড়ুক টানি।
ও পরাণের হুকারে ......
হুকা গেল শ্রীবৃন্দাবন
নলচে গেল রাসে
আমি তামাক খাব কিসে
ও পরাণের হুকারে ......

আমি যখন জন্মিলাম ভাই
আমার মা তো জন্মে নাই।
দেখতে দেখতে ভাই জন্মাল
বাবা জন্মায় নাই।
ও পরাণের হুকারে ....

ভাঁড় যাত্রার সঙ গান

আমি কি এমনি ছিলাম রে
খেলে পোড়া জ্বরে জ্বরে
শুয়েছিলাম নিজের ঘরে
পাড়া পড়শী বলে তোর একি হাল হলো রে
আমি কি এমনি ছিলাম রে ....
যখন ছিলাম মোটা সোটা
হাতে বাজু মাথায় কাঁটা
নাকেতে নোলক দুলেরে
আমি কি ....
যখন ছিল মোটা পিছা
আসতো কত ছোকরা লুছা
এখন আমার ঝুলা পিছা
বুড়া লুছা তাও জুটে না
আমি কি ....
যখন ছিল কোঠা বাড়ি
আসতো তখন ঘোড়ার গাড়ি।
এখন আমার ভাঙা বাড়ি
গরুর গাড়ী তাও আসে না।
আমি কি...........

সঙ গান

স্ত্রী ঃ পোড়ার মুখো মিনসে আমার সঙ্গ ছাড়ে না
পুং ঃ বাপের বিষয় সব খোয়ালাম
তবু তোর সঙ্গ ছাড়বো না।
শালি তুই যেমন হাওড়ার পোল
স্ত্রী ঃ তোর মত পুরুষ কত কলকাতায়
বড় বাজারে।
পুং ঃ তোর মত মেয়ে কত সোনাগাছির মোড়ে।
স্ত্রী ঃ তোর মত পুরুষ কত নবগ্রামের হাটেতে
পুং ঃ তোর মত মেয়ে কত ময়রাপুকুরের ঘাটেতে।

(৭)

পুং ঃ তুই আয়না হেথা একটা কথা
তোরে বলে যাই
স্ত্রী ঃ কি কথা বলবি রে ছোঁড়া
তোর কাছকে মরে যাই।
পুং ঃ খেঁদি তোর বিয়ে হয়েছে?
স্ত্রী ঃ নাইবা হলো আমার বিয়ে
তোরে কে বলতে বলেছে।
মাথা বেঁধে দাও মামি মা
চাঁপা ফুল গেঁথে
আসবে তোমার ভাগিনা জামাই
আমায় নিয়ে যেতে।
মাথা বেঁধে .....
বয়েস হলো পনেরো ষোলো
আর কি আমায় থাকতে বল
আমার যোগ্যি তোমার জামাই
ঘুমায় না রাতে।।
মাথা বেঁধে ....

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত

মেয়েলী গীত

বাঙালীর জীবনে বারো মাসে তেরো পার্বণ। এবং এই পার্বণকে কেন্দ্র করে চলে নানান লোকাচার, লোকসঙ্গীত। অর্থাৎ গ্রাম্য বাঙালীর বা বলা চলে বাংলার লোকজীবনের সঙ্গে লোকসঙ্গীত যেন আষ্টে-পৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে নানান পর্যায়ে।

'জন্ম থেকে মৃত্যু' মানুষের জীবনের এক বহমান অধ্যায়। সেখানেও পাওয়া যায় লোকসঙ্গীতকে। এবার আসা যাক 'জন্ম থেকে প্রয়াণ বা মৃত্যু' পর্যন্ত গানের কথায়। এই গানের পর্বে মেয়েদেরই প্রাধান্য বেশি।

মা শিশুকে গর্ভে ধারণ করেন, তারপর পাঁচ মাস, সাত মাস, ন'মাস-এ চলে মেয়েলী আচার 'সাধভক্ষণের পালা'। গর্ভবতী মাকে সে সময় নতুন কাপড়-জামা পরিয়ে শুদ্ধাচারে বিশেষ ভাবে পঞ্চব্যঞ্জন সহ নানা স্ত্রী-আচারের মাধ্যমে সাধ দেওয়া হয়। এ সময় এয়োতীরা গায় সাধভক্ষণের গান। যেমন—

সাধভক্ষণের গান

'চল সখী, রঙ্গ আজি দেখি চমৎকার।
সুভদ্রার সাধ ভক্ষণ আশ্চর্য্য ব্যাপার ।।
নয় মাস হইল সই গো, সুভদ্রা সুন্দরী।
নানা বিধ বাদ্য বাজে, আনন্দিত পুরী।।
পুরনারী সবে মিলি, পুলকিত হইয়া।
উলু ধ্বনি দিয়া সই গো; আইলা যে চলিয়া।।
বিচিত্র আসনে দেবী সুভদ্রা বসিলা।
ধান দূর্বা দিয়া সবে আঘ্রাণ করিলা।।
মণ্ডা মিঠাই লাড্ডু আদি ছানার সন্দেশ সাথে।
সুবর্ণ থালায় করি রাখিলা সাক্ষাতে।।
পেঁড়া, অমৃতি. জাম, রসবড়া, আর।
ক্ষীর, সর, রাবড়ি মিষ্টান্নের সার।।
লুচি, পুরী, নিম্‌কি সই গো একত্র করিলা।
শ্বাশুড়ী ননদী সবে মুখে পুরি দিলা।।

এর পর শিশু যখন জন্মায়, তখনও স্ত্রীআচারের সঙ্গে চলে গান। যেমন—
'জন্মিলা ভবানী দেবী হিমালয়ের ঘরে।
জয় জয় শব্দ হইল হেমন্ত নগরে।।

এই তত্ত্ব জানিয়া আইলা যত দেবগণ।
বেদ মুখে গজপতি আসিলা তখন।।
পাতালের বলী আইলা যতেক দেবতা।
দেবরাজ চলি আইলা শুনহ্ বারতা।।
মনুষ্য বাহনে আইলা কুবের ধনপতি।
মহিষের পৃষ্ঠে যম মৃত্যু অধিপতি।।
মুনিগণে বলিলেন রাজা কর ষষ্ঠী পূজা।
নারায়ণী জন্ম হইলা দেবী দশভূজা।।

এবার নবজাতকের জন্মের ন'দিন, এগারো দিন, তেরো দিন বা একুশ দিন বয়সের সময় লোকাচার বা সামাজিক আচার হিসাবে 'ষষ্ঠী পুজো' করার পর বাচ্চার ও মায়ের আনন্দ অশৌচের সামাজিক সংস্কার হয়। এ নিয়ে গানও অঙ্গীভূত হয় ষষ্ঠী পূজায়।

ষষ্ঠী পূজার গান

আজ, আনন্দিত মন গো সখি আনন্দিত মন।
লব কুশের ষষ্ঠী পূজা মুনির তপোবন।।
জনক নন্দিনী সীতা, দৈব দিন দোষে।
গর্ভবতী সীতায় দিলা রামে বনবাসে।।
পাইয়া বাল্মীকি মুনি আনিলা আশ্রমে।
পরম যতনে সীতায় রাখিলা যতনে।।
দুই শিশু জন্ম লইলা সীতার উদরে।
লব কুশের ষষ্ঠীপূজা বাল্মীকির ঘরে।।
তপোবনের যত মুনি পাইয়া নিমন্ত্রণ।
বাল্মীকির আশ্রমে আসি মিলিলা তখন।।
সন্ধ্যাকালে সন্ধ্যা ষষ্ঠী পূজিলা বাহিরে।
পূজিলা সূতিকা ষষ্ঠী সূতিকা মন্দিরে।।

দেখতে দেখতে বাচ্চার ছ'মাস বয়স হয়ে যায়। এসে পড়ে অন্নপ্রাশন বা মুখেভাতের সময়। এ অনুষ্ঠানেও স্ত্রী আচার ও লোকাচার এবং সামাজিক আচার অনুষ্ঠানের সঙ্গে কুলনারী ও প্রতিবেশী মহিলারা গেয়ে ওঠেন মুখেভাত বা অন্নপ্রাশনের গান।

অন্নপ্রাশনের গান

(১)

'সখি, দেখ নয়ন ভরি।
শ্রীকৃষ্ণের অন্নপ্রাশন গোকুল নগরী।।
শুভক্ষণে নান্দীমুখ করি সমাপন।
যতেক মঙ্গল দ্রব্য করিয়া সাজন।।

উত্তম শালির অন্ন ঘৃতমদ করি।
বিবিধ ব্যঞ্জন আনি থুইলা সারি সারি।।
চতুর্দিকে মঙ্গল করেন যত নারীগণ।
নন্দের কোলেতে বৈসে দেব নারায়ণ।।
শ্রীবিষ্ণু স্মরিয়া নন্দে থালায় দিলা হাত।
নিবেদন করি বলেন খাও জগন্নাথ।।

অন্নপ্রাশনের গান

(২)

আজি কি আনন্দ হইল
গোপালের অন্নপ্রাশন সব সখি সাজিল।
মুকুট চূড়া মাথায় দিলা গলে ফুলের মালা
কানে কানফুল, হাতে বাঁশি, মা মাসি সাজাইলা।
পীত বস্ত্র পরায় মায় পায়েতে নূপুর
অন্নপ্রাশনের যত দ্রব্য আনিলা প্রচুর।
উত্তম কাষ্ঠের পিঁড়ি ভূমিতে পাতিয়া
তাব উপরে বসেন মামা ভাগিনা কোলে লইয়া।
গোপাল চন্দ্র বসিয়াছেন পূর্ব মুখী হইয়া
মুখে অন্ন দিলা মামা জয়ধ্বনি দিয়া।। (ত্রিপুরা)

'হাতেখড়ির গান'

করো মা সারদা দেবী এই আশীর্বাদ।
লেখায় পড়ায় ছাওয়াল আমার
হউক আকাশের চাঁদ
শূল ধরেছে শূলপানি, চক্র চক্রধারী
শিবের পোয়ে তীর ধরেছে সবাই বল হরি।
ঢোল ধরেছে বিশ্বকর্মা বীণা সরস্বতী
ছাওয়াল আমার ধইরে খড়ি
জ্বালবে বংশের বাতি।
তোমরা কইরনাগো বাদ।
ভালো কইরা গাইথা আন্‌রে
গেনদা ফুলের মালা
সরস্বতীর গলায় দিয়া
পাঁচটা বাতি জ্বালা।
কাঁসর ঘন্টা বাজারে ভাই

নাইচা উঠুক গাও
ছাওয়াল অবে বিদ্যাসাগর
(তোমরা) হরি হরি গাও।

সারদা মঙ্গলের অন্তর্গত এই ধরণের গান হাতে খড়ি উপলক্ষে ছেলের পিতা গান করে থাকে। এ'টি পূর্ব বঙ্গের বিক্রমপুর অঞ্চলের প্রচলিত গান। মাঘ মাসের শ্রীপঞ্চমী তিথিতে সরস্বতী পুজার দিনে গাওয়া হয়।

যে শিশু ব্রাহ্মণ কূলে জন্মায়, তার সামাজিক লোকাচার অনুসারে উপনয়নের সময় এসে যায় যাকে পৈতা হওয়া বলা হয়। বয়সটা যখন শিশুর সাত বছর, ন'বছর, এগারো বছর, তেরো বছর, তখনই সামাজিক ভাবে উপনয়ন বা পৈতা দেওয়ার বয়স। সামাজিক আচার অনুষ্ঠানের সঙ্গে গানও হয়ে ওঠে অনুষ্ঠানের অঙ্গীভূত। গানটি হল—

'উপনয়নের গান'

'কি আনন্দ হইল আজি অযোধ্যা নগরে।
সূর্য্য বংশে রামচন্দ্রের উপনয়ন করে।।
দশরথে ডাকিয়া বলে কৌশল্যা গো রাণী।
স্নান করাইয়া আন ত্বরা রাম রঘুমণি।।
স্নান করাইয়া রামেরে পরাইলা বসন।
নবরত্ন অলংকারে করাইয়া সাজন।।
স্নান করাইয়া রামেরে মাখাইয়া আতর।
উপনয়ন দিতে গিলা হিঙ্গুল মন্দির ঘর।।
ছয়গুণ নয় নাল সপ্ত পরিমাণ।
সাবিত্রীয়ে কাটইন সূতা ব্রহ্মায় করইন ধ্যান।।
আনরে মেখলা পৈতা রামরে জুখিয়া।
শ্রীরামের উপনয়ন দিলা গুরু আজ্ঞা পাইয়া।।
লাল বস্ত্র পরিধান নিয়া বস্ত্র মাথে।
মস্তক মুড়াইয়া রামের দণ্ড দিলা হাতে।।
অযোধ্যার যত নারী ভিক্ষা লইয়া আসি।
স্বর্ণ সহিত ভিক্ষা দিলা মা, মাসি, পিসী।।
জ্যেঠী, খুড়ী দিলা ভিক্ষা যত ধন কড়ি।
সুমিত্রায়ে দিলা ভিক্ষা সোনার মদন জড়ী।।
দশরথে ডাক দিয়া কইল কৈকেয়ী যে রাণী।
কৈকেয়ী দেইন ভিক্ষা রাম রঘুমণি।।

বিবাহ অনুষ্ঠানের নানান গান

আবার সধবা ও বিধবা ভেদেও নারীদের গাওয়া লোকসঙ্গীতের মধ্যে বিভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। ঐ পরিপ্রেক্ষিতে সধবা মহিলাদের বিবাহ অনুষ্ঠানে গাওয়া গানগুলি লক্ষণীয় ঃ

কন্যা সাজানোর গান ঃ

এসেছি এসেছি মোরা রাধাকে সাজাতে
সাজা নতুন সাজে অগুরু চন্দনে।
গো অগুরু চন্দনে।।
কপালে টিকিলি দিব কানে কান পাশা,
হাতেতে অনন্ত দিব নাকে নাক্ পাশা।
চন্দন কাজল রাধার মুখেতে পরাব
শ্রীকৃষ্ণেরই বাম ভাগে আদরে বসাব।
গো আদরে বসাব।।
রাধা কৃষ্ণের মিলন হবে সাক্ষী দেবতা।
সতীনারীর কথা যেন না হয় অন্যথা।। ২৪ পরগণা

বিয়ের গান ঃ

(উত্তরবঙ্গ থেকে সংগৃহীত)

হাটের মোদ্দে বাউরার হাট, ধানের মধ্যে কাশী
সেই মতোন দেখু, দাদা, চেংরী মাইয়ার হাসি।

চেংরী মাইয়ার হাসিরে মোর কাকাতুয়ার আও
এ গানে ছড়াছে, দাদা, মোর ট্যানাটার গাও।।

শুভ দৃষ্টির গান ঃ

(ঢাকা অঞ্চল থেকে সংগৃহীত)

হের গো সবে যুগল মিলন
কর সফল নয়ন।।
শ্যামের বরণ কালো রাই করেছে আলো
আবার হেসে চেয়ে আছে মরি কি মোহায়।।
শ্যাম পানে চেয়ে রাধায় আখি হানে গো
হের গো সবে যুগল মিলন।।

নদীর ঘাটে যাত্রাকালে জলভরার গান ঃ

পান দিলাম বিড়ি বিড়ি গুয়া উত্তম ফল
রাজ হংসের ডিম্বা দিলাম গঙ্গার নিমন্ত্রণ।
পড়ন শাড়ী নিলাম্বরী ওড়না দিয়ে গায়
সখির সঙ্গে মনোরঙ্গে জল ভরিতে যায়।
জলছাড়া মেঘনাই রে, রৌদ্র ছাড়া মেঘ
কৃষ্ণ ছাড়া শ্রীরাধিকা বাঁচিবে কত কাল।

জলভরার গান ঃ

আমি ভইরে আইলাম
শীতল গঙ্গার জল
কালার রূপ নেহারী প্রাণ-সজনীর
মন করেছে উতল।
নন্দের বেটা চিকন কালা
জানে কত ছল
সে যে জল ঢালিয়া প্রাণ-সজনীর
ঘাট করছে পিছল।
মন চোরা চিকন কালা
হাসে খল্ খল্
সে যে বারে বারে আঁখি ঠারে
দেখায় কদমতল।। **স্বঃ লি—২৭ (ক)**

কনেকে সাজাতে সাজাতে গান ঃ

সাজ সাজ ধনি, বেঁধে মোহন বেণী
সাজাইব রস বৃন্দাবন।

কখনো গায় ঃ চুল খুলিয়া ফুল তুলিয়া
আবার কেন সাজাও না,
মাইয়ার সাজন ভাল হইল না।
সাড়ী দিয়া সাজাও সাজাও তারে
সেমিজ এখন পরে না।।

কখনো গায় ঃ শাড়ী পর ওগো রাই
তাইতে শ্যামের (বরের) নিষেধ নাই।
সেমিজ পরাতে শ্যামে নিষেধ কইরাছে।

শ্বাশুড়ী আঁচল দিয়ে বরের মুখ মুছিয়ে ঘিয়ের প্রদীপ জ্বেলে বরকে বরণ করে মঙ্গল গীত গায় ঃ

মঙ্গলগীত

জনক নরপতি অতি হরষিতে
রামচন্দ্রে করে দান, দান করে সীতে।
লগ্ন পাইয়া গুরু আচমন করে
বেদ শাস্ত্র পড়ায় তাকে কুল পুরোহিতে।।

কোন কোন অঞ্চলে আবার গায় ঃ

গাও তোল গাও তোল কন্যা হে
পিন্দা পাটের সাড়ী
এই শাড়ী পিন্দায়া কন্যা

যাইবেন শ্বশুর বাড়ী হে।
গাও তোল গাও তোল কন্যা হে।।

বরকে স্নান করানোর গান ঃ
(জলপাইগুড়ি অঞ্চলে)
সিনান ঘাটে বসিয়া না ভাবিও ওরে বাপু
এই সিনান তোর শেষ সিনান রে বাপৈ।
আগৎ যে সিনাই ছিলা বাপৈ
আথারে পাথারে
ভুলি যা এলা সেই গিলা।

বর কনে বিদায় কালে কন্যার ব্যথা ছাপিয়ে ওঠে অশ্রুজলে। তাও আছে গানের কথায় ও সুরে ঃ
পাটির উপর বইসে গিরন চাপালি
কও না দু'টি কথা
পড়ে যায় গিরন চাপালির ভাসা চক্ষের আসু,
ভিজে যায় গিরন চাপালির নূতন ময়না শাড়ী।

হিন্দুদের মতন মুসলমান সমাজেও বিবাহ উৎসবে গানের প্রচলন আছে। মেয়েরা গায় ঃ
ভেরেণ্ডার পাতা চাক চাকা
চারিধারে চিকন রে
আমার লাইলী, কার হাতে সপিব গো?
ভাসুরের হাতে সপে না দিলাম
হলধরা মুনিষ্য গো
বরের হাতে সপে গো দিলাম মনের খুসিতে
লাইলী গো।।

গায়ে হলুদের গান

(১)

তেল না হলুদরে ডগমগ করেরে
আঁচল দিয়া পুঁছো বাছার ঘামোরে।
কাঁহা না গেলোরে কন্যা বিবির মাওরে
সিনা বইহা পড়ে বিবির ঘামোরে।
কাঁহা না গেলোরে বিবির খালা মাওরে
গতোর বইহা পড়ে বিবির ঘামোরে।
কাঁহা না গেলোরে বিবির বড় ভাউজরে
সর্ব শরীল বইহা পড়ে বিবির ঘামোরে।

(২)
হলদি কুটো জলদি জলদি
ও খোলে বারি দিয়া।
আজকা বাদে কাইল বিহানে
আইসবে বেটির বিহা।।
পাড়া পড়সী মিলা জুইলা
গীত কহেকনা সুর তুইলা
গীত শুইনা বেটী হামার
হাসবে ঘোমটা দিয়া।।

সুন্দা হলুদ

ডাকে দোকানী আসিয়া
সুন্দা হলুদ কে লইবাগো, লও আসিয়া।
জামাইর মা বাহির হইলা হাসিয়া হাসিয়া
হলুদ সুন্দার মূল্য কত বল হিসাব কইর‍্যা।
দোকানীরে বলে তবে মুচকি হাসিয়া
সুন্দা হলুদ লওগো রাণী স্বর্ণ-মুদ্রা দিয়া
জামাইর মা সুন্দা কিনি ঘরে চলি গেলা
সখিগণে চারিধারে উলুধ্বনি দিলা।।

সুন্দা হলুদ পিষা

জামাইর মা ডাকছে ব্রজ মাইয়া
গোপালের অধিবাসের হলুদ পিয গিয়া।
গাঁয়ের যত পুরনারী আনন্দে আসিলা
শিল পাথর আনি সবে যতনে বসাইলা।
সাক্ষাতে রাখিয়া সবে সুন্দা হলুদ আনি
সুন্দা হলুদ পিষিলেক ব্রজের গোপিনী।
ক্রিয়া কর্ম অধিবাসের কর সবে আসিয়া
আজ গোপালের অধিবাস কাল হবে গো বিয়া।।

জল সওয়ার গান ঃ

বিবাহাদি, মাঙ্গলিক এবং মেয়েলি অনুষ্ঠানে নদী বা পুকুরের জল অপরিহার্য। বিবাহ অনুষ্ঠানে মেয়েরা জল ভরার গান গেয়ে গঞ্চঘট ভরে এবং সেই জলে বর-কনেকে স্নান করায়। এটি একটি শুভ কাজ বলেই সমাজে গণ্য।

বরণ কুলা আন সখী বরণ কুলা আনো
আমরা শ্যামের ঘাটে যাই
আমরা জল সইতে যাই।।

কনেকে ক্ষীর খাওয়ানোর গান ঃ

সাপা দুধের আতপ চাউল
খীরওয়া রাইন্থা দেওরে—২
ওই না খিরওয়া খাইতেরে বাছার
সর্ব খামোন ঘামেরে।।
কুষ্ঠে গেলো মাও বেদনী
কুষ্ঠে গেলো বাপরে
আইসা দেখো বাছার কামো
খিরওয়া খাইতে ঘামেরে।।

বাসর ঘরের গান ঃ

(হুগলী জেলা থেকে সংগৃহীত)

কনক লতিকা কেন অধোমুখে
ঐ দেখ বধু এসেছে।
অরুণ উদয়ে সোহাগের হাসি
ঐ দেখ ফুটে উঠেছে।
হের সখি, হে শরম পাশর
প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছে।।

বাসর ঘরে পাশা খেলার গান ঃ

(পূর্ববঙ্গের ঢাকা অঞ্চলের)

পাশা খেলে কে গো পাশা চালে কে গো।
পাশা খেলে কিশোর আর কিশোরী।
খেলিতে খেলিতে পাশা হারিলেন শ্রী হরি
রামে চালেন পাশা বারো সীতর চালে তেরো
লক্ষ্মণ উঠিয়া বলে দাদা বুঝি হারো।
রাম যদি হারে পাশা নিব হাতের বাঁশি
সীতা যদি হারে পাশা হব নিজ দাসী
পাশা খেলে কে গো।

নববধূ সজ্জার গান ঃ

সিন্দুর পরো ওলো দিদি ঢেঁকিতে ধান ভানো,
বরণ কুলা আনো সখি, বরণ কুলা আনো।।
ধুয়া ঃ মোরা, শ্যামের ঘাটে যাই, মোরা জল আনিতে যাই,
ঘিয়ের পিদিম জ্বালা সখি ঘিয়ের পিদিম জ্বালা,
কলসী কাঁখে পুরনারী মাথায় বরণ ডালা।
ধুয়া ঃ মোরা শ্যামের ঘাটে যাই, মোরা জল আনিতে যাই।।

ত্যাল-হলদি দূর্বা ধানে সাজা বরণ ডালা
পারুল বকুল কুরচী ফুলে গেঁথো শ্যামের মালা।
ধুয়া ঃ মোরা শ্যামের ঘাটে যাই, মোরা জল আনিতে যাই।।

বিয়ের গানগুলি ত্রিপুরার তেলিয়ামুড়া অঞ্চল থেকে সংগৃহীত

অধিবাস ঃ

তোরা দেখ গো আসিয়া
বেহুলার হইল অধিবাস পূর্বদিকে বসাইয়া
বিচিত্র পাটিতে বসি আনন্দিত মন
তার উপর বসিলা বেহুলা করিয়া যতন।
যতন করি সখিগণে করি আয়োজন
আমপল্লব ঘট বারি রাখিয়া সদন।
চারিদিকে উলুধ্বনি করে বামাগণ
দিতে আইলা অধিবাস বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ,
ক্ষণে ক্ষণে ব্রাহ্মণে করে বেদ উচ্চারণ
কপালেতে দিল ফোটা চাইয়া শুভক্ষণ।
সন্দেশ মিঠাই নানা দ্রব্য হরষিত মনে
বেহুলার মুখে দিল সখী জনে জনে।

পানের খিলি ঃ

তোমরা আইস তাড়াতাড়ি
বেহুলার পানখিলি উজানী নগরী--
আসিলা যত নারীগণ হইয়া আনন্দিত
সবে মিলে নৃত্য করে গায় সবে গীত।।
নূতন পার্টির উপর পাতিয়া আসন
স্বর্ণ থালে পানের খিলির সব আয়োজন।।
চারিদিকে বাজনা বাদ্য বাজে ঘন ঘন।
নারীগণ দেয় উলু আনন্দিত মন।।
বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ আগে হরষিত হইয়া।
সোনা রূপার খিলি দিলা শুভক্ষণ চাইয়া।

কন্যাসাজ

আজি কি আনন্দ হইল
বেহুলা সাজাইতে সবে ত্বরায় আসিল।
আতর চন্দন লাগায় বেহুলার অঙ্গেতে
সোনার জিনিষ লাগায় হরষিত চিতে।
হস্তে দর্পণ আনি সাজায় সব সঙ্গিনী

আনন্দে পুলকিত চিত্ত শাহ্ রাজার নন্দিনী।
বেনারসী শাড়ী পরায় বেহুলার মাঝাতে
সোনার নূপুর পায়ে দিলা ঘুঙ্গুর দিলা তাতে।

জলভরা ঃ

গঙ্গা মাগো দেও তুমি দেও দরশন।
বেহুলার বিয়ার জলভরি সখীগণ।
সখীগন মিলি করে গঙ্গার স্তবন
পুরনারী সকলের হরষিত মন।
তৈল সিন্দুর দিয়া সবে গঙ্গারে নিছিলা
কন্যার মায় যত্ন করি গঙ্গারে বন্দিলা।
ধান্য, দুর্বা ডিম্ব দিয়া গঙ্গারে অর্চিল
চর্তুদিকে সখীগণে উলু ধ্বনি দিল।
সখীগণে সবে মিলি জয় ধ্বনি দিলা
কন্যার মায় আনন্দেতে জল ভরিয়া আইলা।

সপ্ত প্রদক্ষিণ (সাতপাক) ঃ

দেখ পুরনারী গণ
বেহুলাকে বিয়া করে সদাগর নন্দন।
নানা রঙের ফুল দিয়া দিব্য মালা গাঁথি
বরের সাক্ষাতে গিয়া
দাড়ালো যুবতী।
নানা অলংকারে কন্যার অপূর্ব সাজন
ধীরে ধীরে কুঞ্জ মধ্যে আসিল তখন।
লক্ষীন্দরের শ্রীচরণে প্রণাম করিয়া,
সপ্ত প্রদক্ষিণ করে আনন্দিত হইয়া।
সপ্ত প্রদক্ষিণ কর্ম হইল সমাপন
বেহুলা লখাই মালা বদল করিল তখন।
চতুর্দিকে জয় জয় বলে যত সখিগণ
ঘৃতের প্রদীপ দিয়া মুখ করে নিরীক্ষণ।

কন্যা সম্প্রদান

শুন দানের বিধান (২ বার)
হরষিতে শাহ্ রাজা কন্যা করেন দান।
দান করেন শাহ রাজা দুই হস্ত ভরি
ব্রাহ্মণে বান্ধিলা গ্রন্থি দুই হস্তে ধরি।
খাট পালং, থালা, বাটি, আর জলের ঝারি

গ্লাস, কলস, ঘটি, বিছানা, দিল যত্ন করি।
সোনার অলংকার দিলা, না যায় গনন,
নারী জনে উলু ধ্বনি করে ঘন ঘন।।

পাশা খেলা ঃ

তোরা আয় গো সখী শাহ্ রাজার ভবনে
পাশা খেলেন লক্ষীন্দর বেহুলার সনে।
শীতল পাটির উপর বিছানা পাতিয়া
লক্ষীন্দর বেহুলা বসে পূর্ব মুখী হইয়া।।
সরা পাতিল আনিলেন তাতে ধন ভরিয়া
ঘৃতের প্রদীপ রাখিলেন সম্মুখে জ্বালিয়া।
দুই জনে মহানন্দে খেলা আরম্ভিল
সখী গণে সবে মিলি জয় ধ্বনি দিল।।

কন্যা বিদায় ঃ

কান্দে বেহুলার মাগো আকুলিত হইয়া
কেমনে থাকিবে মাগো বেহুলা পাঠাইয়া।
রাত্রি না পোহাইতে পাখী করে রাও।
যাত্রা কালের সময় হইল কন্যাকে সাজাও।
পাড়া পড়শী সখী গণ বেড়িয়া বসিলা
সুন্দর করি বেহুলাকে সকলে সাজাইলা।।
বাবা কান্দে, কাকা কান্দে, কান্দে বড় ভাই
মাটিতে পড়িয়া কান্দে গর্ভ ধারিনী মাই।
সকলেরে প্রণমিতে বেহুলা চলে ধীরে
মাকে প্রণমিয়া বেহুলা চায় ফিরে ফিরে।
আম্র পল্লব চিত্রঘট মাঝ ঘরে বসাইয়া
যাত্রা করলেন জামাই কন্যা শ্রীহরি স্মরিয়া।।

উত্তর-বঙ্গের রাজবংশী সম্প্রদায়ের বিয়ের গান

কনের গায়ে হলুদ দিবার গান ঃ

কন্যা-পক্ষের এয়োতীরা কন্যার গায়ে হলুদ মাখিয়েও সন্তুষ্ট হতেপারছেন না। তার কারণ হলুদ মাখানোর পরে কন্যাকে যতখানি সুন্দর দেখানো উচিত ছিল—তা হয়নি।

(১)

কাঁচো কাঁচো হল্‌দা
অঙে নাহি উঠে গে
ছি গে ছি, নারীর বেটী
ছিরি নাহি উঠে গে।

হলদির জন্ম কান্ঠে গে
হলদির জন্ম বাপো ভাইয়ার ঘরে গে।
ছি গে ছি নারীর বেটী
ছিরি নাহি উঠে গে।

(২)

"বর-কনে" কে স্নান করানোর সময় বরের উদ্দেশ্যে বলা হয় আজকের স্নান তোমার জীবনে একটি স্মরণীয় মুহূর্ত।

আজি সিনানো করি মো হে বাবা,
আগিনারো মাঝে রে বাবা,
আজি সিনানো করি মো হে বাবা,
আথারে পাথারে রে বাবা।
আজকার সিনানে রে বাবা
পাইলেন শেয়ার দোসর রে বাবা।।

(৩)

কন্যা-সাজানী গানটিতে, কন্যাকে শাড়ী গহনা ইত্যাদি পরাবার সময়, এয়োতীরা কন্যার সঙ্গে কৌতুক ও তামাশা করে। গানটিতে তারই আভাস।

উতর পাথেরে আইলোতে
কাশিয়া ভালা গে ফুটে।
সেই না কাশিয়া কাটিয়া গে
বাবা বাঙ্গেলা বান্ধে।

যে হইল্ সে হইল্ বেটী তো,
তোরে নসিবতে;
আর নিকিন ঘুরিবে গে
হোলোদি মাথা দামান।

কুন্‌বা বানিয়ার বেটা
মুঠিয়া গড়াই সে ভালা।
মাগে, সাড়ীয়া ঝনকে ঝোনি জ্বলে।

(৪)

কন্যার গৃহে বরের আগমন এবং বরকে বরণ করার গান কন্যার মায়ের জবানীতে এয়োতীরা বলে, মাথায় টগরের ফুল দিয়ে জামাই পাল্কী চড়ে আসছে।

তিস্তা নদীর ধাই ধাই বালা
ওইঠে শুন মোর বেহাইর গালা;
ও মোর গুণের বেহাই রে।

বন্দরে-শহরে ব্যাড়েয়া দ্যাখোঁ
দামান কতেক দূর
আইসেছে, আইসেছে চ্যাঙ্গেড়া দামান গে
মাথাত টগরের ফুল।।

(৫)

এয়োতীরা বরণডালা নিয়ে বরকে বরণ করার গান ঃ

কি দ্যাখেছিত্ বাপৈ রে চান্নি-কুলার ভিতি।
ওই চান্নি গণাইছে তোর মাও ধাগিরী।।
কি দ্যাখেছিত্ বাপৈরে ঘোট-গছার ভিতি।
ওই ঘোট গণাইছে তোর বহিনি ধাগিরী।।
কি দ্যাখেছিত্ বাপৈরে কিয়া-কাঁকইর ভিতি।
ওই কিয়া গণাইছে তোর কাখী ধাগিরী।।
কি দ্যাখেছিত্ বাপৈরে আয়না-কাঁকইর ভিতি।
ওই কাঁকই গণাইছে তোর পিসাই ধাগিরী।।

(৬)

কন্যা সম্প্রদানকালে পিতার জবানীতে এয়োতীরা কন্যার উদ্দেশ্যে বলে 'আজ থেকে তুমি কুল ও গোত্রের বহির্ভুত হয়ে গেলে।'

সুতা-হরিতকী হাতে নিয়া দয়াল বাবা
করে জোড়ো হাতো রে,
আজি হতে হলো বেটী
কুলেরো বাহিরো রে।
কি ওরে দয়াল বাবা রে।।
ঘাড়ের গামছা হাতে নিয়া
দয়াল বাবা মুছে চোখুর পানি রে,
কি ওরে দয়াল বাবা রে।
আজি হাতে হলো বেটী
গোতের বাহিরো রে
কি ওরে দয়াল বাবা রে।।

(৭)

বর ও কনের মধ্যে কড়ি খেলার গান ঃ

কড়ি খেলাইতে ফেন্নী হারিলো রে
ন্যাম্-ন্যাম্ তোর বাপোর দাড়ী
ডুবালো গো।।
কিয়া খেলাইতে ফেন্নী হারিলো গে,
ন্যাম্-ন্যাম্ তোর বাপের দাড়ী
ডুবালো রে।.......

(৮)

অষ্টমঙ্গলার গান ঃ

জলের ঘাটে বর-কনের গাঁটছড়ার বাঁধন খোলার গান।

সিনানেরো ঘাটে না ভাবেন
বসিয়ারে বাবা,
সিনানেরো ঘাটে সনার চাইলন বাতি।।
যাঁয় তমার মাও-বাবা,
স্যাও হইল দুষ্টারে বাবা,
কালা কইন্যাটা
গলাত বান্ধিয়া দিলে রে বাবা।।

(৯)

কন্যা বিদায় কালে মা ও বাবার মনের বেদনা ফুটেছে গানটিতে ঃ

হাত-পা ধুইয়া ময়না
গেলো বাপোর কাছে
বাবায় তুলিয়া নিলে কোলে ;
এমন সুন্দর মাও মোর
পরায় নিগাবে (লইয়া যাইবে)
ঘর মোর করিয়া যাবে খালি রে
আগোতে খাইসেন বাবা
বাটা ভরা টাকা রে;
এলায় কেনে কান্দেন বাবা
দববারে বসিয়া রে।।... ......

সিলেট অঞ্চলের বিয়ের গান

(১)

বিচিত্র পালংকের উপর শুইয়া নিদ্রা যাই।
শুয়িলে সপনে দেখি শ্যাম লইয়া বেড়াই গো।।
আপন জাইনা প্রাণ বন্ধুরে হৃদয়ে দিয়া ছিলাম ঠাঁই
ছিল আশা দিল দাগা আর প্রেমের কাজ নাই।
বলগো সখী কোন দেশেতে যাই।
ভাইবা রাধারমণ বলে মনেতে ভাবিয়া।
ওগো পাইলে শ্যামে কে ধরবো গলে ছাড়া ছাড়ি নাইগো
বল গো সখী কোন দেশেতে যাই।।

(২)

কে আমারে ডাকে বাঁশীরে বাঁশী আড়ালে থাকিয়া
কাছে আসি কওনা কথা কি দুষ ও জানিয়া।

এপার থাকিয়া বাজাও বাঁশী ওপার থাকিয়া শুনি
আমি তো অবলা নারী সাঁতরও না জানি।
অষ্ট আলো বাঁশের বাঁশীরে বাঁশী গরল বাঁশের আগা
কে তো রে শিকাইলো বাঁশী আমার নামটি রাধা।
আমার বাড়ী যাইতে বাঁশী মধ্যে গোয়াল পাড়া
রাস্তায় রাস্তায় লাগাইয়া লইছে নীল কদম্বের চারা।
যখন তোমার কেউ ছিল না রে বাঁশী তখন ছিলাম আমি।
এখন তোমার সব হইয়াছে পর হইয়াছি আমি।
আবার যখন কেউ থাকবো নারে বাঁশী থাকবো শুধু আমি।
আমার কাছে আসতে হবে জেনে রেখো তুমি।

(৩)

আমার কৃষ্ণ কেন আসলো নারে প্রাণ ললিতে
আমায় ছাড়িয়া প্রাণ নাথ কোথায় রইয়াছে
সাধ করিয়া কদম্ব রুইলাম ডালে ডালে পাত।
ফুল পাড়িতে ডাল ভাঙ্গিল রইলো মনের সাধ।
যাইমুরে ধরমের কাছে কইমু বিবরণ
কতই দিনে হইব আমার বন্ধু দরশন।।

বিয়ের গান

বাঁশী

সখী বন্ধনেতে যায় না আমার মন
অসময়ে শ্যামের বাঁশী বাজলো খনে খন।
আমার গৃহ কর্মে না লয় মন চিত্তে করে উচাটন
অসময়ে .... খনে খন।
বিধিরে তুই কি কর্ম করিলে অবলা সরলার গায় পাখা না দিলে,
পাখা দিলে পরে উড়িয়া যাইতাম করতাম শ্যাম দরশন।
অসময়ে .... খনে খন।
শ্যাম দরশনে গমন চিতে না পুরিল আশা আমার মরণ মঙ্গল।
আমার চিতে না পুরিল আশা আমার মরণ মঙ্গল।
অসময়ে শ্যামের বাঁশী বাজলো খনে খন।।

জলভরা

ভরিয়া তুলো গো বারি বৃষভানু রাজনন্দিনী
শ্যাম নাগরের প্রেম সাগরে কলসী না হয় তল সজনী।
ভরিয়া .... রাজনন্দিনী।
তুমি তো রঙ্গিয়া নাগর রসময় শ্যাম গুণমণি
হেনরঙ্গ করছ কেন পেয়ে পরকুলের রমণী।
ভরিয়া .... রাজনন্দিনী।

কলসীতে ভরিয়া বারি নিরীক্ষে রাই বিনোদিনী
কালাচাঁদের মোহনমূর্তি জলে হেরে মনমোহিনী.
ভরিয়া .... রাজনন্দিনী।
উমেশ বলে চলিলা রাই মাধবে সপিয়া প্রাণ
পাছে পাছে চলে হেরে শত শত কুল কামিনী
ভরিয়া .... রাজনন্দিনী।

জল ভরিয়া আসা

জল ভরিয়া সহচরি চলো গৃহে যাই
পথের মাঝে বিরাজিত নটবর শ্যাম কানাই
চলো গৃহে যাই।
গগনে উদিল ভানু বাজিলো শ্যামের বেনু।
শ্যাম চরণে প্রাণ সপিতে তাতে আমার মানা নাই
চলো গৃহে যাই।
ঘরের কুটি কালননদি সদায় করে প্রেমের বাঁধি।
জলের বেলা গত হলে গৃহে তো না দিবে ঠাই
চলো গৃহে যাই।
দ্বিজেন্দ্র কয় শুন প্যারি নবদ্বীপে ছিলেন হরি
যুগে যুগে অবতরি তুমি বাঁকা আমি রাই
চলো গৃহে যাই।
জল ভরিয়া সহচরি চলো গৃহে যাই।

বিয়ের গান

মেদিনীপুর জেলার কাঁথি অঞ্চল থেকে সংগৃহীত। লৌকিক সুর এবং বাংলা ও উড়িয়া ভাষার সংমিশ্রণে রচিত।

(১)

পাকা দেখার গান ঃ

কিমিতি ধরিব তুমএ মন,
মুহি সেভে যিবি ছাড়ি এবন।
জনম কেনে বা দেল গো মতে.
উছলিব ছাতি মনর কেতে।
এই কি তুমর মনর খিলা,
বিধি কেনে মতে ঝিঅ গোড়িলা।।

(২)

বিয়ের পরের দিনে বর-কনে বিদায়ের পালা। বরকনে পাল্কীতে বসার পরে চার বেহারা পাল্কী কাঁধে তুলে তিনবার পাল্কী ঘোরায় যাতে কনের দিগভ্রান্তি ঘচে। বাপ-মাকে ছেড়ে যাবার জন্যে কনের প্রাণের বেদনা, কান্না হয়ে ফুটেছে গানটির মধ্যে।

বাপ বসিথিলে উঁচ পিঙ্গার,
টংকা গনিলেন কুঁচ কানির।
যঁহু যঁহু টংকা চহক দিশে,
বাপার মনেতে লুভয়ে বসে।।

(৩)

মেয়ের আবদার। পাল্কীতে উঠে বাপ মার কাছে ছোট ভাইয়ের বিয়েতে তাকে যেন নিয়ে আসা হয় আর প্রতি মাসে ভাই গিয়ে যেন তার খোঁজ খবর নেয়।

উঠিলা সুয়ারী বসিলা নাই,
ঘুরি চাঁহিবাকু দিশিলা নাই।
গুয়া গড়ি গলা বালি তলকু,
মকে ঠেলি দেল পর ঘরকু।
কেতে কথা থিলা সো মনর,
সবু হইলা মোহর পর।
মুহি চলি গলি জনম পাঁই,
ঘরেতো রহিলা কটিয়া ভাই।। **স্বঃ লি - ২৭ (গ)**

(৪)

বর ও কনেকে বসিয়ে পাল্কী কাঁধে চার বেহারা আনন্দে গান গাইতে গাইতে চলে ঃ

তরল বাঁশ গুহাল তড়া,
দবত কইচ পড়ুয়া ছড়া।
লড়িয়া গছটী বটিকু ছাই,
মাস গলে দেখা করিব যাই।
কদলি গছর লাগিলা মুশা,
ভাই থাঘরকু রহিলা আশা।। **স্ব- লি—২৭(ঘ)**

চাঁই বিয়ের গান

চাঁই সম্প্রদায় হলো অন্যান্য আদিবাসী সম্প্রদায়ের ন্যায় দলবদ্ধ প্রধানত কৃষিনির্ভর একটি সমাজ। প্রায় দু'হাজার বছর আগে বিহারে বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রধানত গাঙ্গেয় উপত্যকায় এরা বসতি স্থাপন করে। এদের ভাষা প্রদানত বাংলা ও হিন্দীর মিশ্রণে তৈরী। এরা নিজেদের হিন্দু বলে মনে করে এবং সেই মতো মনসার গান, নারায়ণ পূজা ও বিবাহাদি অনুষ্ঠানে হিন্দু নিয়ম ও সংস্কারের পরম্পরা বহন করে। এরা আজ প্রধানত মুর্শিদাবাদ ও আংশিক ভাবে মালদা ও নদীয়া জেলার অধিবাসী। বিয়ের অনুষ্ঠানে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এরা নানা রকম গানের মধ্যে দিয়ে এদের অনুষ্ঠান সম্পন্ন করে থাকে এ গুলিকেই "চাঁই" বিয়ের গান বলা হয়।

নিচে আরো চারটি বিয়ের গান উদ্ধৃত করা হল। হাওড়া জেলার মুসলমান সম্প্রদায়ের বিবাহ উৎসবে কন্যার গায়ে হলুদ মাখাতে মাখাতে মেয়েরা এই গানগুলি গায়।

(১)

শুনত্যা হে শুনত্যা হে
জোড়া জোড়া পালকী আবহে

বহিন বিচারা ভারু দেখে তোহারি বড়াই
শুন্যতা হে শুনত্যা হে
জোড়া জোড়া ঢোল আবহে
মাগী বেচনা ভারু তোহারি বড়াই
(২)
বাবা সোহাগা শিখু বিটি
বাবা সঙ্গ মিলি লা
দুধা কালা খাওয়ালারে
ভারু যাইবা শ্বশুরাল
মাকে সোহাগ শিকু বিটি
মাকে সঙ্গ মিলিলা
দুধা কালা খাওয়ালারে
গ্যা যাইবা শ্বসুরাল।
নেবুতলায় নেবু ফুল ঝুঁকে পড়েছে
তারই তলায় বসে ভাইয়া পাশা খেলিছে।
যদি হার তোমার ভাইয়াজিকে দিবে যে বান্দিতে।
(৩)
লাডু হ্যায় চায়েরে
হাসেগি মনে মনমে
রোয়েগি দিলে দিলমে
সজনী ঘর জানাহ্যায়।
ও লাডু তেরা ছ্যাকালিআয়া
ছক্কে সে নাবোবিদা বারদো, ফুলোসে গদি ভরদো।
সজনী ঘরজানা হ্যায়।
(৪)
বারইঘরের রসপতি জলে নেমেছে
তারই ভিতরে মেছোকুমির হাপাল মেরেছে।
কেউবা তোমাকে হাত উজালা চুড়ি দিয়েছে।
রাজার ব্যাটা বাদশার ছেলে সেই বা দিয়েছে।
আমিহাত দোলায়ে চলে যাবো চেয়ে দেখবে কে?
রাজার ব্যাটা বাদশার ছেলে সেইবা দেখবে যে।
বারইঘরের.......হাপাল মেরেছে।
কেউবা তোমাকে কানউজালা দুল দিয়েছে।
রাজার ব্যাটা বাদশার ছেলে সেই দিয়েছে।
আমি কান দুলায়ে চলে যাব চেয়ে দেখবে কে?
রাজার ব্যাটা বাদশার ছেলে সেইবা দেখবে যে।

কেউবা তোমাকে গলাউজালা হার দিয়েছে।
রাজার ব্যাটা বাদশার ছেলে সেইবা দিয়েছে।
আমি গলা দুলায়ে চলে যাব চেয়ে দেখবেকে?
রাজার ব্যাটা বাদশার ছেলে সেইবা দেখবে যে।
বারইঘরের...................
কেউবা তোমাকে মাথাউজালা টিক্কা দিয়েছে?
রাজার ব্যাটা বাদশার ছেলে সেইবা দিয়েছে।
আমি গলাদোলায়ে চলে যাবো চেয়ে দেখবে কে?
রাজার ব্যাটা বাদশার ছেলে সেইবা দেখবে যে।

(৫)

আমার মাথার কসমগো কামিনী আর কেঁদোনা আমার পালং এ
অতি আদরের বেটিগো আমি তাইতো কাঁদি তোমার পালং এ।
জননী মাঐ বিননীরতরে তাইতো কাঁদি তোমার পালং এ।
কালই ফজরের ওয়াক্তে তোমাকে এনেদেবো তোমার মাকে যে।
আমার শিরের কসমগো কামিনী আর কেঁদোনা আমার পালং এ।
বালাই জোহরের ওয়াক্তে তোমাকে এনেদেবো তোমার. বুবুকে।
আমার ছেলের কসম গো কামিনী কেঁদোনা আমার পালং এ,
কালই আসবে ওয়াক্তে তোমাকে এনেদেবো তোমার আব্বাকে।
আমার মাথার কসম গো কামিনী আর কেঁদোনা আমার পালং এ।
কালই মগরেবর ওয়াক্তে তোমাকে এনেদেবো তোমার ভাইয়াকে।
আমার শিরের কসম গো কামিনী আর কেঁদোনা আমার পালং ও।
কালই এশার ওয়াক্তে তোমাকে এনেদেবো তোমার ছোট বোনকে।

হুগলী জেলার আরামবাগ অঞ্চলে মুণ্ডেশ্বরী নদীর পাড়ে কয়েক ঘর আদিবাসী পরিবারের বাস। তাদের বিবাহ অনুষ্ঠানে কন্যার মা বরের হাতে কন্যাকে সঁপে দেবার একটি ছড়া ঃ

কন্যার মা বরকে বল্ছে ঃ

খাওয়াইলাম্, দাওয়াইলাম্, যতন করিলাম,
এ্যতটুকু থিকে এ্যত বড় করিলাম। শেযে
তুহার হাত সঁপে দিলাম। দেখিস বাপ যতন করিস ......।

বরের উক্তি ঃ

খাওয়াইব, দাওয়াইব, প্রাণ ভরে যতনও
করিব। কিন্তু কু-চাল দেখিলে........

মৃত্যুর গান

মৃত্যু মানব জীবনে এক অবশ্যম্ভাবী লগ্ন। তবুও এক বিশেষ ক্ষণে মৃত্যুএসে নিয়ে যায় অনন্তলোকে। সেই ক্ষণটিতে পড়ে থাকে সবকিছু। ইহলোকের যত চাওয়া, পাওয়া, আশা-আকাঙ্খা।

এই মৃত্যুকে কেন্দ্র করে প্রচলিত নানান লোকাচার, সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান, সঙ্গীত অর্থাৎ লোকসঙ্গীত সৃষ্টি হয়েছে। এই অন্তিম লগ্নে সবাই চায় পারের কড়ি।

বাংলার বাউল গানে 'মৃত্যু-র রূপকল্প তুলে ধরা হয়েছে নানাভাবে, নানা উপলব্ধিতে, নানা দ্যোতনায়। এমন একটি বাউল গান—

'হারালাম দু'কুল একুল, আর ও কূল
কবে ফুটবে আমার বিয়ার ফুল।
যাব চলন করি, বাঁশের দোলায় চড়ি
জাত বেহারার স্কন্ধে চড়ি, সফল হবে ভূল।।
আগে পাছে কাষ্ঠের বোঝা,
ছেড়ে দিয়ে ভবের মজা
শ্বশুর বাড়ী যাব নদীর কূল।
গেলে শ্বশুর বাড়ী, সবে ত্বরা করি
স্নান করাবে মোরে, করি গণ্ডগোল।
বরণ কুলাতে দিবে বর শয্যায় শোয়াইবে
আট কড়া কড়ি দিবে তুলসীর মূল।।
বর-যাত্রীগণ, করাইবে বরণ
জনমের মত দিবে তেনা চারি আঙ্গুল।
উত্তর শিয়রি কৈরে, হাত পা ভাঙ্গিয়া মোরে
অনল জ্বালিয়া শেষে করিবে নির্ম্মূল।।
হয়ে মর্ম্মাহত, জ্ঞাতি বর্গ যত
যোগ্য পুত্র হবে তার অনুকূল।
ঘৃত চন্দনাদি করিবে আহুতি
আগে পুড়িবে আমার মাথার চুল।।
ভাই বন্ধু যত, সব দন্তের মত
শোকেতে কাঁদিয়া হইবে আকুল।
অভাগিনী জননী জনম দুঃখিনী
বুকেতে বাঁধিবে দুঃখেরি বাঁটুল।।
যতেক নাড়ায়রী, সবে গড়গড়ি
ভূমেতে পড়িয়া এলাইবে চুল
(তখন) স্ত্রী গিয়ে পাছ দুয়ারে
কাঁদবে বসে উচ্চৈঃস্বরে
(হায়) কে খাওয়াবে মোরে, গেল জাতি কূল।।
বঙ্কিম বলে ভাই, সকলকে জানাই
এ বিয়া ফিরাইতে লাগবে হুলুস্থুল
যখন আসিবে নিতে, ঘটক রবি সুতে
পারবে না রাখিতে দেখায়ে ত্রিশূল।।

সাঁওতালি বিয়ের গান

অধিবাসের গান

(১) মাঁডওয়া হিল ঃ সুনুম অজঃ সময়
মাখ/মাকহ দেহো মাখ দো
কংকর/কণরে/অনকর তেল মাখে দে
মাখে দেহো। মুখে দো কংকর
চেলে সুরমা তেল মাখ হো ॥

বাংলায় (আত্মীয় স্বজনের উপস্থিতিতে তেল-হলুদ মাখাবার সময় গাওয়া হয়—)
'তেল হলুদ মাখিয়ে দে গো মাখিয়ে দে
কাঁকড় তেল মাখিয়ে দে।
তেল দে গো মাখিয়ে দে।
কাঁকড় তেল সরষে তেল মাখিয়ে দে ॥

(২) মা দেলা বাঁদহো/অকায় জেলে আৎলে
ভোর এদা গেলে লেড হায় ॥ ভোর এনারে
গিদরাকো ডবিরত্তি এদা কামি হো ॥

বাংলায় বিয়ে করতে যাবার প্রাক্কালে এ গান গাওয়া হয়। যেটা স্নানের গান।

স্নানের গান

বাংলা ঃ বাঁধে চান করতে কেই বা বলোছিলো
বহু দুরের বাঁধ, চান করতেই দেরী হয়ে গেল।
ভোর হয়ে গেল, বাচ্চা ছেলে-মেয়েরা উঠে
পড়লো। সমস্ত কাজই অসমাপ্ত থেকে গেল ॥

(৩) কড়িয়া ঃ অডা ঃ বে
করা কুড়ি তাকয়া ঃ বাঙ্গা দীওরী রে
ভরনা/ভোরএনা রে কডিয় দেজ আঃ কান
দীওরীরে দেজ কাতে সিঁদুর দান এ
হাতাও কে ঃ ৎ মেয়ের বাড়িতে এ গান গাওয়া হয়

বাংলা ঃ'ছেলে মেয়েদের ঠাকুরের পিঁড়িতে মেয়ে উঠে বসে।
বিয়ের পিঁড়িতে সিঁদুর দানও গ্রহণ করে।

রাঁড় হড়

(১) মাঁডওয়া লাতাররে/ছামড়া লাতাররে
তড়ে সুডীম/চেতান তলেঃ ৎ লাঙা। - ২

বাংলা মাণ্ডোয়ার মধ্যে ছামড়ার তলায়
তড়ে সুতো দিয়ে আমাদের বেঁধে রাখছে ॥

(২) তড়ে সুতমি দুলড়ি/বাংকানা মায়া/আমারে
জুরি তনল তেকো/তলেঃ ৎ লাঙা ॥ - ২

বাংলা স্নেহময়ী মায়াবতী এতো তড়ে সুতো নয়
এতো বৈবাহিক বন্ধনে বেঁধে রাখছে ॥

(৩) আসমা দীওরী চেতান/ইঞ হ ঘোঁড়া চেতান
সমাজ তালা গেলাং/আতোঃ কানা ॥

বাংলা তুমিও বিয়ের পিঁড়িতে আমিও ঘোড়ায় চড়ে
বিচ্ছিন্নতার পরিবেশ থেকে আমরা
সামাজিক বন্ধনে জড়িয়ে পড়ছি ॥

(৪) টুটুরী অচকমে/সাকাম সাকাম সিঁদুর সাঃ প মে
মা সিঁন্দুরিঞ মে হরাসিরে ॥

বাংলা দেরী না করে ঘোমটা খুলে নাও
পাতার সিঁদুর ধর - দাও ললাটে
আমাকে সিঁদুর পরিয়ে ॥

(৫) সিঁন্দুর দান পুরাও এন/মায়া মায়াম লাং মেনতে
এনতে সেলাং/এলাং/মিলন এনা ॥

বাংলা সিঁদুর দান সমাপ্ত/আমাদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতার
বেড়া ভেঙ্গে রক্ত পর্যন্ত এক হয়ে গেল এবং
আমাদের মধ্যে মিলন হ'ল ॥

(৬) কারচা কেঃ ৎ লাংক/মাঁডওয়া লাতার তালারে
পেড়া গটক মিলন্তিকে ঃ ৎ লাং ॥

বাংলা আমাদের অশুদ্ধতাকে যেন নির্মল করে বহুজনের সাক্ষীতে
আমাদের মিলন ঘটিয়ে প্রণাম করতে বলে ॥

(৭) মাঁডওয়া তালারে/ছামডা লাতাররে
অকয়ার মাঁডওয়া/লিকির লিকির ॥

বাংলা মাণ্ডীদের অন্দর মহলে বিয়ের মণ্ডপের তলে
কার বিয়েতে মণ্ডপ দোলে তালে তালে ॥

(৮) বাঁবুসা ঃ মাঁডওয়া/তড়ে সুতাম ছামডা
অকনা ঃ মাঁডওয়া - ২/নুয়াক মঁজ
সজ আকাৎরে/বিঁ/বাঁবুয়া ঃ মাঁডওয়া
সাজাও অঃ কান।

বাংলা বাঁবুর (খোকন ডাক নাম) বিয়েতে/তড়ে সুতোর মণ্ডপ
কি সুন্দর না সেজে আছে ॥

(৯) বাঁবুজা/বাঁবুয়ায় বাপলা ঃ কানতে/সানাম
হড়ক রাঁস্কাঁরে/বাবা গগ দকিন রাঃ
হমরে ঃ ৎ

বাংলা বাবুর বিয়েতে সকলে আনন্দে ফুর্তি করছে
কিন্তু তার মা-বাবা ছেলের অতীতের স্মৃতিকে স্মরণ
করে কান্না-কাটি করছে ॥

(১০) চাঁন্দ বাবায় হুকু সাকাৎ/নিয়ম লেকা আবয়া ঃ
কামিবন পালাও এদা/পুরীও এদা ৷৷
বাংলা জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সবকিছুই ভগবানের আদেশ
আমরা শুধু উপলক্ষ্য হয়ে কর্ম করি ৷৷

মেয়ে-জামাই বিদায়ের গান

সেদায় দগম/নে নেডা/অকয় মা
সরপেঁ হাঁদমেয়া।
সেদায় দগম মেন লেকা/অকয়
না সরপং ইদিমেয়া/হেঁ গ
এঞ্জেল হোসং গেয়া টামকা টুকুর
বাঁন্দেলাম বাঁন্দ লাতার বাগিয়াম
কানিঞ গো তোয়া দাড়ে।
ইঞ দাঞাম আনা গে জনম দাতা ৷৷
বাংলা মা বহুবার বলেছো তোর মত নোংরা মেয়েকে
কে বিয়ে করবে। দেখ আমাকে কতদূরে,
বহু বাঁধ পার হয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছে, বাঁধের
নীচে - ফেলেই চলে যাচ্ছি লালিত পালিত তোর
মত মাকে ছেড়ে। নতুন করে জনম দাতা
মা-বাবাকে পাচ্ছি ৷৷

ধামাইল

ধামাইল একটি মেয়েলী নৃত্য। কাছাড়, ত্রিপুরা ও শ্রীহট্ট জেলার মেয়েরা বিবাহ ও অন্যান্য আনুষ্ঠানিক উৎসবকে উপলক্ষ করে লোকসঙ্গীত ও নৃত্যসহযোগে গেয়ে থাকে।

প্রধানত ব্রত-আচার অনুষ্ঠানের শেষভাগে এই গান গাওয়া হয়। বৃত্তকার ভাবে নৃত্য পরিবেশন করে হাতে হাতে তালি দিয়ে আর পায়ের মাধ্যমে তাল রক্ষা করে। রাধাকৃষ্ণ সম্পর্কিত আধ্যাত্মিক ও রূপকাত্মক বিষয়বস্তু এই গানের প্রধান অঙ্গ হলেও এতে বিরহ-বিচ্ছেদ বা বৈরাগ্যের অভিব্যক্তি প্রকাশ পেয়েছে।

ধামাইল গান নৃত্যাবলম্বী। শ্রীহট্টের মেয়েরা এক প্রাণবন্ত নৃত্যধারাকে প্রবাহিত রেখেছেন তাঁদের "ধামাইল" নৃত্যে। সেই ধামাইল নৃত্যের সঙ্গে ওতপ্রোত রূপে জড়িত আছে "ধামাইল" গান। (লোকসঙ্গীত সমীক্ষা হেমাঙ্গ বিশ্বাস)। নিচের গানটি লক্ষণীয় তার ছন্দ বিভাগ আর নাচের তালে তালে ঝোঁক। সুরের দিক থেকে ভাটিয়ালী ঘেঁষা।

(১)

আমি, কি হেরিলাম জলের ঘাটে গিয়া নাগরী গো
কি হেরিলাম জলের ঘাটে গিয়া।
আমার জলভরা না হইল কুলে কালী রইল
কাষ্ঠের কলসী যায় ভাসিয়া গো নাগরী।।

আগে না ভাবিয়া পাছে না ভাবিয়া
গিয়াছিলাম জলের লাগিয়া
আমায় ঘিরিয়াছে চান্দে পড়িয়াছি ফান্দে
প্রাণপাখি কান্দে রইয়া রইয়া গো নাগরী।।
ঘরে গুরু জনার ভয়, মন, গৃহ কর্মে নাহি রয়
আচম্বিতে উঠে চমকিয়া,
আমার না চলে চরণ দুই, কি করি গো প্রাণ সই
মনের কথা কার কাছে কই গিয়া গো নাগরী।।
শয়ন মন্দির ঘরে যাই, মন চোরা দেখতে পাই
ক্ষণে ক্ষণে উঠি শিহরিয়া।
অধীন ......চরণ দাসে মনের অভিলাসে
আশার বাসরে থাকি চাইয়া গো নাগরী।।

আর একটি ধামাইল গানের নমুনা তুলে ধরা হল।

(২)

আমার অন্তরের মাইঝে গো
সইগো কি হইল না জানি।
কাল বরণ রূপ আমার লাইগাছে নয়নে গো
সইগো কি হইল কি জানি।।
পুষ্করিনীর চাইর পাড়ে গো
সইগো তোতা ময়নার বাসা
ঝাঁকে উড়ে ঝাঁকে পড়ে
সইগো এ বড় তামেশা গো
সইগো কি হইলা না জানি।।
আমারে দংশিয়া গেল গো
সইগো কাল না নাগিনী।
ঝাড়িলে না নামে বিষ গো
সইগো ধাইল উজানি গো।
সইগো কি হইল কি জানি।।
ঝাইড়া যে নামাইতে পারে গো
সইগো বৈদ্য দেও গো আনি
অন্তরে জ্বলিয়া উঠে গো
সইগো শ্যাম চান্দের আগুনি গো।
সইগো কি হইল কি জানি।।

(৩)

যমুনা পুলিনে শ্যাম নাগর ত্রিভঙ্গ
এমন মধুর মুরলী ধ্বনি দহিতেছে অঙ্গ।

আয় ললিতে আয় বিশাখে,
শ্যামকে এনে দে
যায় যদি রাইর কুলমান
পাই যদি তারে;
আমার মন হইয়াছে উড়াল পাখী
প্রাণে প্রেম তরঙ্গ।
যেই অবধি বাঁশির গান
কর্ণে পশিল
জলবদ্ধ মীনের মত
যে দশা হইল,
অধীন মৃণাল বলে বাঁশির গানে
যোগীর যোগ ভঙ্গ।

জল ধামাইল

সখী আগ্যাইয়া দেখ তোরা
কদমতলায় শুনছি গো মানুষের লড়া চড়া।
সখী গো, হাতে বাঁশি, মুখে হাসি, শিরে মোহন চূড়া।
বিনোদ মুখে বাজায় বাঁশি জয় রাধা বলিয়া।
গো মানুষের লড়া চড়া।।
সখী গো, কুক্ষেণে গো গিয়েছিলাম জলের লাগিয়া
জলের ছায়ায় রূপ হেরিলাম রাধার মন চোরা।
গো মানুষের লড় চড়া।।
ভাইরে রাধা রমণ বলে মনেতে ভাবিয়া
পিরিত করিয়া ছাড়িয়া গেল, দিয়া দ্বিগুণ জ্বালা।
গো মানুষের লড়া চড়া।।

জল ধামাইল

আমি রবো না রবো না গৃহে
বন্ধু বিনে প্রাণ বাঁচেনা (২)।
এমনও সুন্দর পাখী, হৃদয়ে হৃদয়ে রাখি
ছুটলে পাখি ধরা দিবে না।।
না না না গো, বন্ধু বিনে প্রাণ বাঁচেনা।
বাঁকা হেরি কালো রূপ, নয়নে লাইগ্যাছে রূপ
ভিতর কালী ধুইলে ছাড়ে না।
না না না গো, বন্ধু বিনে প্রান বাঁচেনা।।
ঘরে আছে কুলবধু, হস্তে লইয়া সরমধু
কি মধু খাওয়াইল জানি না।
না না না গো, বন্ধু বিনে প্রাণ বাঁচেনা।। **স্বঃ লি—২৭(খ)**

প্রভাতী ধামাইল

ভ্রমর কইও গিয়া শ্রীকৃষ্ণ বিচ্ছেদে রাধার
অঙ্গ যায় জ্বলিয়া।
রে ভ্রমব কইও গিয়া।।
ভ্রমর রে, কইও কইও ওরে ভ্রমর
কৃষ্ণের নাগাল পাইয়া
আর কত দিন রইমু আমি
কৃষ্ণ হারা হইয়া।
রে ভ্রমর কইও গিয়া।।
ভ্রমরে রে, না খাই অন্ন, না খাই পানি
নাহি বান্ধি কেশ,
কৃষ্ণ হারা হইয়া আমি পাগলিনীর বেশ।
রে ভ্রমরা কইও গিয়া।
ভ্রমরা রে, কেয়া না কেতকী ফুলে
বাসরও সাজাইয়া,
সেই সজ্জা বাসি হইয়া দেও জলেতে ভাসাইয়া।
রে ভ্রমর কইও গিয়া।।

প্রভাতী ধামাইল

লতিতা বিশাখা শ্যামকে আনিয়া দেখা।
প্রাণ যায় বিচ্ছেদের জ্বালায়।
আমার মরণ কালে বন্ধু রইল কোথায়।
হায় হায় হায়।
প্রাণ যায় বিচ্ছেদের জ্বালায়।।
যার লাগি বনবাসী হই, সেবা কই আর আমি কই,
বল সই কি করি উপায়।
পন্থপানে চাইতে চাইতে, অধৈর্য হইয়াছে চিত্তে
ও শ্যাম আইল আইল বলিও না আমায়।
হায় হায় হায়, প্রাণ যায় বিচ্ছেদের জ্বালায়।
কেয়া কেতকী ফুল, রঙ্গন আর মালতী বকুল
চুয়া চন্দন রইল কটরায়
ফুলের সজ্জা হইল বাসি, আইল না গো কালোশশী,
এখন কুহু কুহু ডাকছে কোকিলায়।
হায় হায় হায়, প্রাণ যায় বিচ্ছেদের জ্বালায়।।

বৌ-নাচের গান

বৌ-নাচ বা বধুবরণ নৃত্য প্রাচীনকাল থেকেই পূর্ব বাংলায় চলে আসছে। বৌনাচকে বধুবরণ নৃত্য বা বরণ নৃত্যও বলা হয়। এই নৃত্য বধুবরণ উৎসবের প্রধান অঙ্গ হিসাবে গ্রাম্য নারী সমাজের মধ্যে প্রচলিত একটি প্রথা বিশেষ। কোন কোন অঞ্চলে এই উৎসবের জের চলে অনেক দিন। ঐতিহ্য বাহী এই নৃত্যকলা পূর্বাঙ্গের সিলেট তৎসহ আসামের কাছাড় অঞ্চলে বহুল প্রচলিত। নৃত্যের সঙ্গে গানের যোগ নিবিড়। তাই এই গানকে বলা হয় বৌনাচের গান। আসলে এগুলি ধামাইল শ্রেণীভুক্ত গান। সর্বাধিক জনপ্রিয় একটি বৌনাচের গান উদ্ধৃত করা হল।

সুয়াগ চান্দ বদনি দনি নাচত দেকি
বালা নাচত দেকি, ভালা নাচত দেকি।।
এগো, জেমনি নাচইন নাগর কানাই,
তেমনি নাচইন রাই
একবার নাচিয়া বুলাও চাইন দেকি নাগর কানাই
রাই নাগর কানাই।।
এগো, নাচিতে আতের বাশি রাখইন শামরায়
এগো, চাইর দিকে চাইয়া রাইএ বাশিটি লুকাইন
রাইএ বাশিটি লুকাইন।।
এগো, নাচইন বালা সুন্দরীয়ে পিন্দইন বালায় নেত্
জেন, এলিয়া দুলিয়া পরে সুন্দি জালির বেত্
বালা নাচত দেকি।। **স্বঃ লি—২৭(ঙ)**

আর একটি বৌ-নাচের গান যা পূর্ববঙ্গে এক সময় খুবই প্রচলিত ছিল। বৌ-নাচ ও পুতুল নাচ অনেকটা সঙের মত। এরা গান গেয়ে যা অর্থ সংগ্রহ করে তাতে তাদের আনন্দের খরচ চলে যায়। গানটি হ'ল ঃ-

হায়রে মনুয়া মাঝি
তোর, গাঁজার নৌকা পাহাড় দিয়া যায়।
গাঁজা খাইয়া বইয়া থাকি
সেঁতানে পুষ্কর্ণী দেহি।
আবার বাজার দেহি তাল গাছের আগায়।
রে মনুয়া মাঝি .... পাহাড় দিয়া যায়।।
আবার ভ্যাদা মাছে ক্যাদা খায়
পুঁটি মাছে পান চিবায়
আর, পোটকা শালা গাল ফুলাইয়া রয়।
রে মনুয়া মাঝি .... পাহাড় দিয়া যায়।।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

আগমনী ও বিজয়ার গান

শরৎকালে দেবী দুর্গার আগমনকে কেন্দ্র করে বাঙালী সমাজে আগমনী ও বিজয়া গানের উৎপত্তি হয়েছে। এই পূজা বাঙালীর জাতীয় পূজা ও জাতীয় উৎসব বলেই স্বীকৃতি পেয়ে আসছে। বাঙালীর কাছে 'দুর্গা' দেবী নন, কন্যা রূপেই তাকে বরণ করে আসছে বাঙালী।

দুর্গার আগমন যেন, কন্যার, শ্বশুর বাড়ি থেকে বাপের বাড়িতে আসা। তাই বাংলার আবালবৃদ্ধ বনিতা পুজোর আনন্দে মাতে, নতুন বস্ত্র পরিধান করে। আগমনী গানে বাঙালীর মনের কথা ব্যক্ত হয়েছে।

বাংলার শহর ও গ্রামগঞ্জের পথে ঘাটে বৈরাগী বোষ্টমরা খোল ও করতাল বাজিয়ে দেবীপক্ষ থেকে আগমনী গান গেয়ে বেড়ান।

কৈলাস হল দেবীর পতিগৃহ আর পিতৃগৃহ হল বঙ্গভূমি। বৎসর অন্তে কন্যার, পিত্রালয়ে আগমন বার্তায় যেমন পিতৃগৃহ আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে বাঙালী সমাজেও ঠিক তেমনি দেবী দুর্গার আগমনকে কেন্দ্র করে জেগে ওঠে আনন্দের জোয়ার।

মায়ের মন অত্যন্ত ব্যাকুল, অধীর। স্বপ্ন দেখেছেন তিনি যে, দুর্গা খুবই কষ্টে দিন কাটাচ্ছেন। তাই তিনি গিরিরাজকে পাঠাচ্ছেন উমাকে নিয়ে আসার জন্য। কবি কমলাকান্তের এই গানটিতে তার আভাস মেলে।

(১)

'কবে যাবে বল গিরিরাজ
আমার গৌরীকে আনতে
ব্যাকুল হয়েছে প্রাণ উমারে হেরিতে।
গৌরী দিয়ে দিগম্বরে আনন্দে রয়েছ ঘরে
তুমি হে পাষাণ, তাহে না কর মনেতে।
সতিনী সরলা নহে ভোলা যে গো শ্মশানে রহে
কি আছে তব অন্তরে না পারি বুঝিতে।।

আর একটি গানে উমার আগমনে মায়ের আনন্দ আর ধরে না।

(২)

'আয় মা উমা চুমি তোমার চাঁদবদন
গিয়েছিলে আঁধার করে এ গিরির ভুবন।
উমা উমা বলে আমার সদাই আঁখি ঝরে
এই উমাকে পাশরিয়া কেমনে রব ঘরে।
উমার রূপের তুল্য কভু নাহি দেখি

এই উমাকে ছাড়া জীবন কেমনে রাখি।
শুনি স্বামী নাকি শ্মশানে বাস করে
বল্‌না উমা কেমন ছিলি সেই ভিখারীর ঘরে।।

(৩)

জননী আইস্যাছে
রূপেতে ভুবন আলো কইরাছে।
দেখো হে মায়ের কতই শোভা
সিংহ পৃষ্ঠে মহামায়া বামে হেলে রইয়াছে।।

দুর্গার নিমন্ত্রণ

পবন পুত্র হনুমান বলি যে তোমারে
শিব-দুর্গাকে নিমন্ত্রণ কর আসিবারে।
এই কথা শুনিয়া মায়ের আনন্দিত মন
হনু হনু বলি ডাকে অতি ঘন ঘন।
যাইতে হবে শীঘ্র তোমায় কৈলাশ ভুবন
দুর্গা সহ ভোলানাথে কর নিমন্ত্রণ।
হনু যায় আনন্দেতে রাম নাম স্মরিয়া
দরশন দিলা হনু কৈলাসেতে গিয়া।
প্রণাম করিয়া হনু চণ্ডীর চরণ
ভোলা নাথের সহিত মাগো তোমার নিমন্ত্রণ।

মেয়ের শ্বশুর বাড়ির কথা শুনে মায়ের মন ব্যথায় ভরে ওঠে। মেয়েকে আর শ্বশুর বাড়ি পাঠাবেন না অভিমান করে। গিরিশচন্দ্র ঘোষের এই গানটিতে সে কথাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

ওমা কেমন করে পরের ঘরে
ছিলি উমা বল না তাই।
কত লোকে কত বলে, শুনে ভেবে মরে যাই।।
মা'র প্রাণে কি ধৈর্য্য ধরে
জামাই নাকি ভিক্ষা করে
এবার নিতে এলে বলবো হরে
উমা আমার ঘরে নাই।।

দুর্গা পুজোর আগে অর্থাৎ মহালয়ার পরে গ্রামের বাড়িতে বোষ্টম ঠাকুর আসতেন। ঠাকুমা রোয়াকে তাকে আসন পেতে বসতে দিতেন। বোষ্টম ঠাকুর দুর্গার শাঁখা পরানো আখ্যানগীত গাইতে শুরু করতেন। তখন পাড়ার অনেক সধবা, বিধবারা এসে জুটতেন শ্রোতা হয়ে। এমন একটি গানের নমুনা পূর্বেই দেওয়া হয়েছে।

তাছাড়া বোষ্টম ঠাকুর আগমনী গানও শোনাতেন।

(১)

মন করে উদাসী আমার উমার লাগিয়া
যাও গিরিরাজ আনগে উমারে।
বাপের বাড়ী নাইওর আইতে
মন যে কেমন করে।।
ভোলানথের কৈলাস-পুরে
মায়ে আমার কত দূরে গো -
নিশিরাতে স্বপন দেখি উমা কাঁদেরে।।
কত দুখে আছেরে উমা হরের ঘরে
ভিখারী শিব আমার উমায়
আদর না করে।।
বছর পরে বাছা এলে
রাখবো তারে বুকে ধরে গো-
চোখের জলে ভিজাইব মা পার্ব্বতিরে।।

(২)

মা মেনকা কাইন্দো না আর
আইল উমা রাণী।
দুখের রজনী জননী গো
পোহাইল জানি।।
গণেশকে মা সঙ্গে লইয়া
সিদ্ধি আনলো ঘরে বইয়া গো
সুন্দর কার্ত্তিকেরে আনে
ভয় দুঃখ না মানি।।
সরস্বতী জ্ঞান দায়িনী
লক্ষ্মী মা ভাগ্যদায়িনী
লুকায়ে শিব আছে গো মা
যেথায় শিবানী।।

মেয়ে শ্বশুর বাড়িতে গেছে। অনেক দিন হল বাপের বাড়ি আসার সুযোগ হয়নি। অনেক দিন মেয়েকে কাছে না পেয়ে মা-বাবার মন আদরের মেয়েকে কাছে পাওয়ার জন্য দুঃখে, কষ্টে হুহু করছে। অন্তর কাঁদছে কন্যার জন্য। কারণ জামাই বা শ্বশুর বাড়ির লোকজন তত সুবিধের নয়। মা-বাবার মনে সংশয় মেয়ে না জানি কত কষ্টেই দিন যাপন করছে। ঠিক এমনি আভাস ফুটে ওঠে নিচের গানটিতে। এখানে মা মেনকা স্বামী গিরিরাজকে উদ্দেশ্য করে বলছেন -

'আনো গিরি ত্বরায়ে তারা
আমি নয়নে লুকায়ে রাখি।।
হেরিয়ে গগনে তারা, আমার মনে হ'ল প্রাণের তারা

শুনেছি তারাকে নাকি, পাঠাবে না আর তারা।
মায়ের আমার নামটি তারা, তার ত্রিনয়নে তিনতারা
তারা হৃদে তারার ধারা, আমি তারায় দেখে মুদি আঁখি।।
উমা আমার দুধের মেয়ে, কেঁদেছে সে মা মা বোলে
ও পাষাণ গিরি
শিবের নাইকো মাতা পিতা
সে কি বুঝিবে মায়ের ব্যথা
কারে কবো দুখের কথা
আমার স্বর্ণলতা বিধুমুখী'।।

ঠিক এমনি আর একটি গানে পাওয়া যায় মেয়েকে বাপের বাড়ি আনার জন্য মেনকা রূপী গ্রাম্য কোন স্নেহ কাতর' মায়ের কাতর আহ্বান তার স্বামীর কাছে।

'যাও যাও গিরি আনিতে গৌরী
উমা নাকি বড় কেঁদেছে।
দেখেছি স্বপন নারদ বচন
উমা মা মা বলে কেঁদেছে।।
সোনার বরণী গৌরী আমার
ভাঙ্গড় 'ভিখারী' জামাই তোমার
মায়ের আমার যত আভরণ
তাও বেচে নাকি ভাং খেয়েছে।।

স্ত্রীর এত কাতর অনুরোধ, গঞ্জনা শুনে স্বামী অর্থাৎ গিরিরাজ বলেন —

'বৃথা গঞ্জনা রানী, দিও না সব জানি
উমা বিরহে মোরও কাতর অন্তর।
কন্যা বয়স্থা হলে রীতি ভূমণ্ডলে
পিতা-মাতারে ফেলে যায় পতিঘর।।
কে বুঝিবে কায় কব কি ব্যথা প্রাণে
সাধ হয় নাকি রাখি নয়নে নয়নে
মোর কি দোষ তায় সাধ্য নাই নিরূপায়
পাঠাতে নাহি চায় কঠোর শংকর।।
সম্বৎসর পরে যদি বা আনি ঘরে
জানো তো নিতে আসে তিনটি দিন পরে
কত মিনতি করি ধরে দুটি করে
বিদায় দিই ডরে, পাছে রোষেন হর।।

এবার আসা যাক মেয়ে-জামাইয়ের কথায়। বাপের বাড়ি বহুদিন যেতে না পারায় মেয়ের অন্তরও বাবা-মাকে দেখার জন্যে কেঁদে ওঠে। এ নিয়ে মেয়ের সঙ্গে জামাইয়ের বাক্ বিতণ্ডাও বেধে যায়। মেয়ে বাপের বাড়ি যাবার জন্যে স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করতেও দ্বিধা করে না। কৈলাসে হর-গৌরীর বিতণ্ডার মধ্যে যেন ফুটে ওঠে এমনি চিত্র। গানটিতে

গৌরী স্বামী হরকে বলছে —

'তোমারি কারণে কঠিন পরাণে
সম্বৎসর ভুলে আছি হে মায়েরে।
থাকে পিতৃঘর শুন প্রাণেশ্বর
অনুমতি করো তুমি দিনত্রয় তরে।।
সবে মাত্র ভ্রাতা ডুবে সিন্ধু তলে
কত কোরে আমায় পেয়েছে মা কোলে।
তিল-আর্ধে আহা অদর্শন হোলে
সারা হোত মাতা উমা উমা কোরে।।
অচল পিতা নিতে আসিতে না পারে
মাতা জীবন্মৃতা আছেন অন্তরে
দেখেছি স্বপনে সহেনা সহেনা
করো হে করুণা যাচি জোড় করে।।

স্ত্রী গৌরীর কথায় হর তখন উত্তর দিয়ে বলেন —

'দিয়ে প্রেমডুরি কেনরে শংকরী
বাঁধিলি ভিখারী ভোলারে ঘরে।
আমি মুদি ত্রি-নয়ন সমাধি মগন
ব্রহ্মানন্দে বেশ ছিনু গিরিশিরে।।
জানিরে চঞ্চলে চপলার প্রায়
ভালোবেসে এসে কাঁদাতে আমায়
অমর হইয়া যুগ যুগ যায়
যোগে তপোধ্যানে নারি ধরিবারে।।
নয়ন মুদিলে ভাবি বা হারাই
সশঙ্ক অমনি চমকিয়া যাই।
দক্ষ-যজ্ঞ কথা আজো ভুলি নাই
তাই বাজে ব্যথা মরম মাঝারে।।
যাবে পিতৃগৃহে নাহি তাহে মানা
কার সাধ্য রোধে তব ইচ্ছাবিনা
এই ভিক্ষা দেখো পাগলে ভুলো না
সর্বত্যাগী হর শুধু তোরি তরে।।

উপরের গানটিতে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর যে প্রেম তা মূর্ত হয়ে ওঠে।

আর একটি গানে মা মেনকা স্বামী গিরিরাজকে বলছে শ্বশুর বাড়ি থেকে মেয়ে উমা এলে আর তাকে শ্বশুর বাড়ি পাঠাবেন না। উদাসী স্বামীর ঘরে মেনকা-কন্যা উমা অনেক কষ্টে দিন যাপন করছে, এই সংশয়ে মা মেয়েকে আর স্বামীর ঘরে পাঠাতে চান না। নিচের গানটিতে মায়ের সন্তান স্নেহ প্রকট হয়ে ওঠে। গানটি হল —

গিরি এবার আমার উমা এলে
আর উমায় পাঠাবো না
বলে বলবে লোকে মন্দ
আমি কারো কথা শুনবো না।।
যদি এসে মৃত্যুঞ্জয় উমা নেবার কথা কয়
মায়ে-ঝিয়ে করবো ঝগড়া জামাই বলে মানবো না।।
দ্বিজ রামপ্রসাদে কয় এ দুঃখ কি প্রাণে সয়
জামাই শ্মশানে মশানে ফেরে
ঘরের ভাবনা ভাবে না।।

আর একটি গানে মা মেনকার সখি উমার আগমন বার্তা পৌঁছে দিচ্ছে।

'গা তোলো গা তোল বাঁধো মা কুন্তল
ঐ এলো পাষাণী তোর ঈশানী।
লয়ে যুগল শিশু কোলে মা কৈ মা কৈ বোলে
ডাকিছে মা তোর ঐ শশধর বদনী।।
মা তোমার এই কন্যে ত্রিভুবন ধন্যে
কভু এ সামান্যে নয় গো রানী।
আমরা ভাবতাম ভবের প্রিয়ে আজ শুনি তোর মেয়ে
তিনি নাকি ভবের ভয় হারিণী।।
মা তোমার এই তারা চন্দ্রচূড় দারা
চন্দ্র দর্প হরা চন্দ্রাননী।
এমন রূপ দেখি নাই কারো মনের অন্ধকার
হরে মা তোর হ'র মনোমোহিনী।।

দেবীর (উমার) আগমন বার্তা পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গেই মর্ত্যে শুরু হয়ে যায় দেবী আরাধনার অকাল বোধন। অর্থাৎ 'শারদোৎসবে শারদীয়ার বোধন ধ্বনি। একটি গানে দেবীর অকাল বোধন ধ্বনিত। দশরথপুত্র রামচন্দ্র প্রবর্তিত অকাল বোধনই আজ বাংলা তথা ভারতের শারদীয়ার দেবী আরাধনা।

জাগো জাগো যোগেশ্বরী দুর্গে দুর্গতিনাশিনী
অকাল বোধনে জাগো বিল্বমূলে কাত্যায়নী।। (মা)
সঙ্কটে বাসব তোমা বোধিয়া পরমেশ্বরী
অবহেলা ক্রমে রণে বধিলা দুরন্ত অরি।।
রাবণ বিনাশ তরে রাখিতে শ্রী রঘুবরে
অকালে ব্রহ্মা কাতরে ডাকিলা বিশ্বজননী।। (মা)
মহিষাসুর নাশিতে ডাকে কাত্যায়ন মুনি
সন্ধ্যাকালে বিল্বমূলে দেখা দিলে কাত্যায়নী।।
নিরাকার কৃপা করি সাজিলে বিচিত্রানারী
কনক চম্পক গৌরী তেজে কোটী সৌদামিনী।।

পূর্ণেন্দু সদৃশাননা অধরে মধুর হাসি
ভালে অৰ্দ্ধচন্দ্ররেখা সিংহোপরি মুক্তকেশী।।
দশভূজা রণবেশী অঙ্গে মরকতরাশি
ষোড়শী হররূপসী ত্রি-নয়না ত্রিভঙ্গিনী।। (মা)
সংকটে পড়িয়া আজি কাতরে মা ভবপ্রীতা
নিশি মুখে বিল্বমূলে ডাকে গো বিশ্বপ্রসূতা।।
নিবারি সর্ব্ব বিপদে রাখো মা অভয় পদে
জাগো মধুর শরতে শরচ্চন্দ্র নিভাননী।। (মা)

উমা শ্বশুরবাড়ি কৈলাস থেকে বাপের বাড়ি মর্ত্যধামে আসছেন। পুত্র-কন্যাদের সঙ্গে নিয়ে। মর্ত্যে এখন শারদোৎসব। ষষ্ঠীর দিন রাত্রে মা মেনকার উদ্বেগ। বারবার ঘুম ভেঙ্গে যায়।

'নিদ্রা নাহি আসে উঠে আর বসে
চেয়ে দেখে নিশি পোহালো কিনা।
যা শুনে শ্রবণে সবই হয় মনে
ঐ বুঝি উমা এসে ডাকে 'মা'।।
কভু তন্দ্রাঘোরে স্বপনেতে হেরে
আসিতেছে সিংহ আরোহণ কোরে
গৌরী বলে ধেয়ে কোলে নিতে গিয়ে
জেগে দেখে চেয়ে কোথাও কিছু না।।
কভু বা দু আঁখি ফিরায় যেদিকে
দশ দিকে শুধু উমাময় দেখে
বুঝাইলে, মনে প্রবোধ না মানে
বলে সখি একি হলো বলো না বলো না।।
সখি বলে স্থির হও গিরিরানী
দুঃখ হরা দুর্গা আসিবে এখনি
প্রভাত প্রায় নিশা হলো বলে ঊষা
করি বেশ ভূষা আনিবে চলো না।।

উমা এসেছে মায়ের কাছে। মেয়েকে কাছে পেয়ে মা মেনকার সেকি আনন্দ। মেয়েকে কাছে পেয়েই মা বলছেন —

'উমা আমার কেমন ছিলে হরেরি ঘরে
শুনেছি ঈশান নাকি শ্মশানেতে বাস করে।।
সত্য কি মা অন্নবিনা উপবাসী থাকো উমা
দিনান্তে অন্ন জোটে না জামাই নাকি ভিক্ষা করে।।
গঙ্গা নামে সতিনীরে সতত রাখিয়া শিরে
শুনেছি পিনাকী নাকি অধিক যতন করে।।
ছাই ভস্ম মাখে গায় শ্মশানে নেচে বেড়ায়

ভাঙ্ ও ধুতুরা খায় অহি সদা শিরোপরে।।
রাজার নন্দিনী তুমি কেন ক্লেশ সহ শুনি
শুনগো ঈশানী রাণী আর না পাঠাবো তোরে।।

এর উত্তরে মাকে উমা বলছে —

ছিলাম ভালো জননী গো হরেরি ঘরে
কে বলে জামাই তব শ্মশানেতে বাস করে।।
যে ঘরে মা বাস করি বর্ণিতে নারি মাধুরী
নীলকান্ত আদি করি কত রত্ন শোভা করে।।
ষড়ৈশ্বর্য্য আছে যার ভিক্ষা কি জীবিকা তাঁর
অজ্ঞানে না বুঝি সার ভিক্ষাজীবী বলে হরে।।
শিবের ঐ শ্রীচরণে পারিজাত আভরণে
দেবরাজ এক মনে মস্তক নমিত করে।।

গানটির মধ্যে আদর্শ ভারতীয় নারীর স্বরূপটি যেন অতি সহজেই লোককবির কলমে আগমনী গানের মধ্য দিয়ে প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে।

ভারতীয় আদর্শে বা ধ্যান ধারণায় স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক জন্ম জন্মান্তরের এ বিশ্বাস আরো স্বচ্ছ হয়ে ওঠে। তাছাড়া আজও এ ধারণা ভারতীয় নারীর মনে বদ্ধমূল যে পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য। আগমনী লোকগানে তারও আভাস মেলে।

এরপর নাতি-নাতনীদের রূপ গুণ নিয়ে স্বামীকে মেনকা বলছে—

'গিরি গণেশ আমার শুভকারী
পূজে গণপতি পেলাম হৈমবতী
চাঁদের মালা যেন চাঁদ সারি সারি।।
বিল্ব বৃক্ষ মূলে পাতিয়া বোধন
গণেশের কল্যাণে গৌরীর আগমন
ঘরে আনবো চণ্ডী কর্ণে শুনবো চণ্ডী
আসবে কত দণ্ডী জটাজুটধারী।।
মেয়ের কোলে মেয়ে দুটি রূপসী
লক্ষ্মী সরস্বতী শরতের শশী
সুরেশ কুমার গণেশ আমার
তাদের না হেরিলে ঝরে নয়ন বারি।। **স্বঃ লিঃ - ২৮**

এরই মধ্যে মেয়ে এসেছে মায়ের ঘরে। অনেক প্রতীক্ষার পর বৎসর অন্তে ক্ষণকালের জন্য মেয়েকে কাছে পেয়ে মায়ের অভিমান যেন আরো তীব্রতর হয়। নিচের গানটিতে সেই অভিমানের সুর —

'এসো ঘরে নয়ন তারা হারানিধি মোর
আজো শুধু বেঁচে আছি পথ চেয়ে তোর।
দুঃখিনী জননী ফেলে ভালো তো মা ছিলে ভুলে
পাষাণী নন্দিনী বলে এতই কঠোর।।

সুধামাখা হাসি মুখে
জুড়াও পরাণ মা ডেকে
সব দুঃখ ভুলে হই আনন্দ বিভোর।।
মুখ হেরি আঁখি ভরি
স্নেহভরে বুকে ধরি
শান্ত হও চুমি অধর এ চিত চকোর।।

বাবা-মায়ের প্রতি মেয়ের মনেও ক্ষোভ কম জমে না। মেয়ে-কেমন আছে, তার খোঁজ নিতে মা-বাবাও বৎসর অন্তে একদিনও যে মেয়ের বাড়ি যায় না। নিচের গানটিতে মায়ের প্রতি মেয়ের সেই অভিমানের সুর ধ্বনিত।

'তুমি তো মা ছিলে ভুলে
আমি পাগল নিয়ে সারা হই।
হাসে কাঁদে সদাই ভোলা
জানে না সে আমা বই।।
ভাঙ্ খেয়ে মা সদাই আছে
থাকতে হয় মা পাছে পাছে
ভালো মন্দ হয় গো পাছে
সদাই মনে ভাবি তাই।।
দিতে হয় মা মুখে তুলে
নযতো খেতে যায় গো ভুলে
ক্ষেপার দশা ভাবতে গেলে
আমাতে আর আমি নই।।
ভুলিয়ে যখন এলাম চলে
ওমা ভেসে গেল নয়ন জলে
একলা পাছে যায় গো চলে
আমা হারা এমন কৈ।।

মহা অষ্টমী পূজার সন্ধিক্ষণে উমার মহিষমর্দ্দিনী রূপ দর্শন। নিচের গানটি সেই মহিষ-মর্দ্দিনীরূপকে কেন্দ্র করেই। এ যেন মানবী কন্যা উমার লৌকিক দেবী বা দেবীতে রূপান্তর। গানটি হল —

'করী অরিপরে আনিলে হে কারে
কৈ গিরি মম নন্দিনী
আমার অম্বিকা দ্বিভূজা বালিকা
এ যে দশভূজা ভুবন মোহিনী।।
কিবা সে দক্ষিণে গজেন্দ্রবদন
প্রকাশিত যেন প্রভাতী তপন
যড়ানন স্ববামেতে সুশোভন
কমলা ভারতী সহকারিণী।।

দক্ষিণাঙ্গ রাখি মৃগেন্দ্র পরেতে
আর পদ আরোপিয়ে অসুরেতে
দাঁড়িয়ে আছেন কিবা ত্রিভঙ্গ ভঙ্গীতে
জ্ঞান হয় পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতনী।।
শুনেছি পুরাণে ওহে গিরিবর
এই রূপ আরাধিয়ে রঘুবর
বরদার বরে জয়ী লঙ্কেশ্বর
উদ্ধারিয়ে ছিলেন জনক নন্দিনী।।
তারা চাঁদ কহে শুন গিরিরাণী
এই সেই তোমার পরাণ-ঈশানী
নাশিতে ভূভার দশভুজাকার
মহীতে মহিষাসুর মৰ্দ্দিনী।।

আর একটি গানে ঠিক একই কথা ধ্বনিত।

'কোথায় আমার নন্দিনী।
আমার উমা কই গিরিরাজ
এ কোন্ রণরঙ্গিনী।।
কৈলাসে বুঝিবা পথ চেয়ে আছে উমা
শ্রী অঙ্গে পরিয়া সাজ
ভুবন মোহিনী আজ।।
মোর লীলাময়ী চঞ্চলারে ফেলে ...
এ কোন্ দেবী মূর্ত্তি নিয়ে এলে
এ যে মহীয়ষী মহামায়া বামা মহিষমৰ্দ্দিনী।।
মোর মধুর স্নেহে জ্বালতে আগুন
আনলে কারে ভুল করে
এরে কোলে নিতে হয় না সাহস
ডাকতে নারি নাম ধরে।।
কে এলি মা দনুজ দলনী বেশে
কন্যারূপে মা বোলে ডাক হেসে
ও তুই চিরকাল যে দুলালী মোর
মাতৃস্নেহে বন্দিনী।।

এমনই আর একটি গান হল —

'প্রতি অঙ্গে বসি কত পূর্ণ শশী
হাসে যেন আহা শারদগগনে
পুঞ্জে পুঞ্জে অলি ঢলি ঢলি ঢলি

গুঞ্জনে রাঙা কমল চরণে।।
ষোড়শী অতসী কুসুম বরণ
দশ করে ধরে দশ প্রহরণ
ত্রিভঙ্গ সংস্থানে আলোকি ভুবন
করিতেছে রণ অসুরের সনে।।
বামে শিখি পৃষ্ঠে করে ধনুঃশর
ষড়ানন কান্তি অতীব সুন্দর।
সিন্দুর বরণ খর্ব্ব লম্বোদর
গজানন রাজে মুষিকে দক্ষিণে।।
শুদ্ধবরনা শ্বেত পদ্মাসীনা
বামে বাগবাদিনী ঝংকারে বীণা।
দক্ষিণে রমা কনক প্রতিমা
রূপে অনুপমা কমল আসনে।।
দাঁড়ায়ে দক্ষিণপদে সিংহপৃষ্ঠে
মহিষস্কন্ধে বাম পদাঙ্গুষ্ঠে
দৈত্য বক্ষে শূলহানে রোষদৃষ্টে।
বাঁধি নাগপাশে কেশ আকর্ষণে।।
হেরিতে বাহিরে হেন ভয়ঙ্করা
অন্তরে অনন্ত করুণার ধারা
রোষারুণ ত্রিনয়ন স্নেহভরা তুষ্টা
রুষ্টামূর্তি কল্যাণ কারণে।।
ভালে শশীকলা সুন্দর শোভন
জটাজুট শিরে প্রসন্ন আনন
জবা বিল্বদলে পূজ হেরো মন
রাতুল চরণ অতৃপ্ত নয়নে।।

চঞ্চলা মেয়ে উমাকে ঘুম পাড়ানো নিয়েও মা বিব্রত। কোন রকমে, অনেক কষ্টে চঞ্চলা মেয়ে ঘুমিয়েছে, আবার যদি কোন কারণে মেয়ের ঘুম ভেঙে যায়। তাই মা মেনকা গাইছেন —

'আর জাগাসনে মা জয়া অবোধ অভয়া
কত করে উমা এই ঘুমালো।
উমা জাগিলে একবার ঘুম পাড়ানো ভার
মায়ের চঞ্চল স্বভাব চিরকাল।
কাল উমা আমার এলো সন্ধ্যাকালে
কি জানি কি রূপে ছিল বিল্বমুলে
বিল্বমুলে স্থিতি করিয়ে পার্বতী
জাগিয়ে যামিনী পোহালো।।

উপরোধ উমা এড়াতে না পেরে
সারাদিন বেড়ায় প্রতি ঘরে ঘরে
সন্ধ্যাবেলা অবশা হলো ঘুমের ঘোরে
মায়ের মুখের পান মুখেতে রহিল।।
উমার সঙ্গে জয়া যদি করবি খেলা
খেলবি গো জয়া জাগিলে মঙ্গলা
দ্বিজ রাধিকায় বলে উমা না জাগিলে
জগতে কে আর জাগিবে বলো।।

মর্ত্যে দুর্গাপুজোর নবমীর দিন লৌকিক মা মেনকা কন্যা উমাকে উদ্দেশ্য করে বলছেন —

'বলিস দুদিন থাকতে হেথা
কালকে ভোলা নিতে এলে
ক্ষতি কি তায় বলনা আমায়
থাকবে ঘরে ঘরের ছেলে।।
বুঝিয়ে দুটো মিষ্টি করে
ভুলিয়ে তারে রাখিস ধরে
মনের মতন পেলে পরে
থাকবে ভুলে হেসে খেলে।।
সিদ্ধি বাঁটবো আপন হাতে
শুনেছি সে তুষ্ট তাতে
গঙ্গাজল আর বেলপাতাতে
নিত্য মাথায় দেব ঢেলে।।
ঝি-জামাই তো আনে সবাই
আমার মনে সে সাধ কি নাই
কেমন করে আনবো জামাই
তোর দেখা পাই বছর গেলে।।

নবমী নিশি শেষ হতে চলল। এবার উমার বিদায়ের পালা। তাই লৌকিক মা মেনকা মনে মনে বলছে এ নবমী নিশি যেন না শেষ হয়। গানটিতে তারই আভাস —

'ওগো নবমী নিশি তুমি আর পোহাইও না
তুমি গেলে আমার উমা যাবে
এ দুঃখীর প্রাণ-বাঁচবে না।।
সপ্তমী আর অষ্টমীতে ছিলাম মনের সুখেতে
ওরে নবমী তুই মাথা খেতে কেন এলি বল্‌না।।

কিন্তু নবমী শেষ হয়, আসে দশমী। এবার উমার বিদায়ের পালা। সকলের মনে তাই বিষাদের ছায়া —

'দিও না আজ উমায় যেতে ওগো মা মেনকা রানী

আশুতোষে আশু তুষে বিদায় করো গো এখনি।।
হাসি হাসি উমা এলো কেঁদে হলো এলো খেলো
কেন আজি পোহাইল নবমী রজনী।।

দেখতে দেখতে বিজয়া দশমী এসে গেছে। উমার এবার শ্বশুর বাড়ি কৈলাসে ফিরে যাবার পালা। ভোলানাথ এসেছেন স্ত্রীকে নিতে। ভারাক্রান্ত মনে মা মেনকা জামাই ভোলানাথকে বলছেন —

পাঠাতে নারিব উমায়
যাও হে হর যাও হে ফিরে।
মন চায় তো রহো বাবা (কিম্বা)
মেয়ে-জামাই একত্তরে।।
তোমার তো নাই মান-অপমান,
এখান-ওখান সবই সমান
এমন করে শ্মশান মশান
বেড়াও কেন ঘুরে ঘুরে।।
অভাব কিসের বল আমার
যোগাবো যা চাইহে তোমার
ন্যাংটা ক্ষেপা ত্রিসংসার
কাজ কি তোমার ভিক্ষা কোরে।।
যথাই থাকো হরগৌরী
সেই ঠাঁই কৈলাসপুরী
নিজগুণে কৃপা করি
উভয়ে স্থির রহো ঘরে।

মা মেনকা মেয়েকে শ্বশুর বাড়ি না পাঠানোর অছিলায় নানান যুক্তি খাড়া করেন। সেই যুক্তির আভাস মেলে মেনকার এই গানটিতে।

'বল গো উমা কোন্ প্রাণে আজ পাঠাইব হরের ঘরে
থাকে যে শ্মশানে ভূতগণ সনে লাজ ভয় নাই ভবের অন্তরে।।
রাখি আমি তোরে নয়নে নয়নে পলকে প্রলয় হেরি তোমা বিনে
মা ডাক শুনিলে ও চাঁদ বদনে চাহি না কিছুই এ তিন সংসারে।।
বিঁধে যদি কাঁটা তোর রাঙা পায়, বাজে মোর বুকে কে বুঝিবে তায়
মোরে ফেলে তুই যাইবি কোথায়, প্রাণহীন প্রাণে বাঁচিব কি কোরে।।

এর উত্তরে মা মেনকাকে মেয়ে উমা বলছে —

'কি যে স্নেহ ডোরে বেঁধেছো মা মোরে
ছেড়ে যেতে তোমা মন নাহি সরে।
সাধে কি মা যাই ভোলা তোর জামাই
আর যে কেহ নাই একা আমি ঘরে।।
ভাবে বিভোর সদা চান না আঁখি মেলে

খেতেও যান ভুলে খাওয়ায়ে না দিলে
কার্ত্তিক গণেশ এই দুটি ছেলে
অস্থির করেছে যাবো যাবো কোরে।।
নন্দী ভৃঙ্গী ভূত প্রমথ সকলে
যোগীন্যাদি মোরে জানে মা বোলে
আমি যেমন তোমার তারাও তেমনি ছেলে
কেমনে বলো ফেলে থাকি স্থানান্তরে।।
স্থির হও মাগো শান্ত করো মন
বুঝেও কেন হও উতলা এমন
মুদিলে নয়ন করিবে দর্শন
তোমার কোলেই আছি চিরদিন ধরে।।

বিজয়া

এসো মা এসো মা উমা বোলোনা মা যাই যাই
মায়ের কাছে হৈমবতী ও কথা তো বলতে নাই।।
বোলো না মা যাই যাই।।
বৎসরান্তে আসিস আবার
ভুলিস না উমা আমার
চন্দ্রাননে যেন আবার মধুর মা ডাক শুনতে পাই।
এস সবে পুরবাসিনী
আনন্দে দাও উলুধ্বনি
উমা যে অমূল্য মণি
এমন ধন যার ঘরে নাই।।
জ্ঞান বলে গো গিরিজায়া
সর্ব্বত্র রইল তোর হর জায়া
নয়ন মুদলে দেখবে তখন
উমা আছে তোর কাছে সদাই।
বোলো না মা যাই যাই। **স্বঃ লিঃ - ২৯**

তিনদিন পিতৃগৃহে বাস করার পর নবমী নিশি পোহাতেই বিজয়ার সুরে আকাশ বাতাস ভারী হয়ে ওঠে। বাঙালী মনে বিষাদের ছায়া নামে। সেই ব্যথাতুর আবেগ শোনা যায় প্রচলিত বিজয়ার গানে।

(১)

কোথায় যাবে কোথায় যাবে
ও জননী কোথায় যাবে
নিতে আইল ভোলানাথ বৈরাগী
ওমা কোথায় যাবে?

সপ্তমী অষ্টমী তিথি
নবমী কইর‍্যাছো থিতি
মা গো কাল হইল বিজয়া দশমী
ওমা কোথায় যাবে?

(২)

রজনী, জননী তুমি পোহায়োনা ধরি পায়।
তুমি না সদয় হলে উমা মোরে ছেড়ে যায়।।
সপ্তমী অষ্টমী গেল, নিষ্ঠুর নবমী এল
শঙ্করী যাইবে কাল, ছাড়িয়ে দুখিনী মায়।।
তুমি হলে অবসান, আমি হ'ব গত প্রাণ
বিজয়া গরল-পান, করিয়ে ত্যজিব প্রাণ।।

(৩)

কাল এসে আজ উমা আমার
চলে যেতে চায়।
তোমরা বল গো কি করি উপায়
আমি কোন পরাণে উমা ধনে
মা হয়ে দিব বিদায়।।
হয়েছিল বড়ই সুখ
মার কথা শুনে ফাটে বুক
মাগো, তোমরা বলে কয়ে বুঝাইয়ে
ক্ষান্ত কর প্রাণ-উমায়।।
ছ-মাস কিংবা ন-মাস তো নয়
এসে দিন দশেক তো থাকতে হয়,
মাগো, সে দশেতে দশমী হলে
কি হবে আমার দশায়।।
উমা হইল সন্তানের মাতা
কেমন প্রাণ তার বোঝে না তা,
ওগো পরের ছেলে হয় জামাতা
এ প্রাণ কাঁদলে তার কি দায়।।

(৪)

মর্ত্যের যত ঘরবাড়ী যাও মাগো শূন্য করি
গিরিজায়া ও শঙ্করী যাও তুমি কৈলাস পুরী।।
ঘরে ফিরি হেরব কি মা সে দুখের তো নেই কো সীমা
আঁধার করি ত্রি-ভুবনে যাবে তুমি কেমনে।।
গিরিপুর আজ শূন্য হল, কাঁদে যে অন্তর
দুর্গা যাবেন স্বামীর ঘর মোদের করে পর।।



অষ্টম পরিচ্ছেদ

গোষ্ঠ গান

শ্রীকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গে অনেক বৈষ্ণব পদকর্তার রচনায় গোষ্ঠগানের পদ রয়েছে। এই ধরণের গান উভয় বাংলার মানুষজনের কাছে প্রাচীনকাল থেকেই সমাদর লাভ করে আসছে। কৃষ্ণের বাল্যলীলার অনেক বর্ণনাই বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্যে পাওয়া যায়। রাখাল বেশী কৃষ্ণের সঙ্গী সাথী নিয়ে মাঠে ধেনু চরানোর বর্ণনাই এই গোষ্ঠ গানের প্রধান উপকরণ। বাউল ও বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীদের কণ্ঠে এ গান শোনা যায়। এ গানের সুরে একদিকে যেমন কীর্তনের বৈশিষ্ট্যগুলি বর্তমান অন্যদিকে লৌকিক সুরেরও প্রভাব পড়েছে। ফলে একটা প্রভাতী সুরের আমেজ সৃষ্টি হয়েছে এই গোষ্ঠগানে। তাই এগুলি আজ লোক সঙ্গীতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে বহুল প্রচলিত। বৈষ্ণব পদকর্তার পদ অনুসরণ করে লোকসঙ্গীতে অনেক গোষ্ঠলীলার গান সৃষ্টি হয়েছে।

গোবিন্দ দাসের একটি প্রসিদ্ধ পদ "কাঁদিয়া সাজায় নন্দরাণী" —এই পদের অনুকরণে গোষ্ঠগান রচিত হয়েছে ঃ —

রাণী সাজাইয়ে মনের সাধে
নানা ছাঁদে চূড়া বাঁধে। — ইত্যাদি

ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনের 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা' তৃতীয় খণ্ডে মহিলা কবি সুলার "গোপিনী কীর্ত্তন" পালা থেকে গোষ্ঠ গানের একটু নমুনা তুলে ধরা হ'ল —

আয় ভাই - কানাই, যাই গোঠে যাই
বাজায়্যা মোহন বেণু। (ধুয়া)
প্রভাতে উঠিয়া যত ব্রজের রাখাল।
নন্দ ঘোষের দ্বারে আইল লইয়া ধেনুপাল।।
'আবা আবা' — ধ্বনি করে যত রাঁখুয়াল।
শ্রীদাম সুদাম ডাকে আয়রে গোপাল।।
বলরাম শিঙ্গা ধরি ঘন ডাক ছাড়ে।
আয়রে কানাই ভাই, আয় শীঘ্র কোরে।।
নিত্য নিত্য তোরে কেবা সাথে নিব ভাই।
আইসরে গোপাল শীঘ্র গোচারণে যাই।।
তুই না গেলে কানন মাঝে চলে না ধেনু।
কান পাতি আছে যে তারা শুনিতে বেণু।।
শুনিলে বাঁশির গান ধেনু চলে বনে।
দাঁড়াইয়া আছে তারা তোমার কারণে।।

রাখালগণ মা যশোদাকে তাগিদ দেয়.-তাদের হাতে কৃষ্ণকে তুলে দেবার জন্যে—

(১)

যশোদে মা তোর কৃষ্ণ ধনকে
দেনা গোষ্ঠে যাই।

ওমা, সব রাখালে গেছে চলে,
বাকি আছে তোর বলাই-কানাই।।
পূর্বেতে উদয় ভানু
মোদের সঙ্গে দে মা কানু
মোদের কানাই ভাই।।
রাখালে রাখালে দ্বন্দ্ব
কেউ নাকি বইলেছে মন্দ।
ওরে কানাই ভাই।
এবার উচ্চৈঃস্বরে ডাকতেছেরে
ওরে কানাই ভাইরে কানাই।।
কানাই নিয়ে বনে যাব
আমি রাখাল তোমায় সাজাব,
ওরে কানাই ভাই
কত বনের ফল খেতে দেব
আমার মনের বাসনা তাই।।
সখারা কানাইকে ডাকে অনেক বেলা হয়েছে - আর দেরী নয় -

(২)

অনেক বেলা হয়েছে ভাই
চলো গোঠে যাই।
কোথায় গেল প্রাণ সখা
বলাই আর কানাই।
না থাকিলে ওরা দু'জন
মন যে করে কেমন কেমন,
ডাক দেনারে প্রাণ কানুরে
একসাথে সবাই।
গোধন যখন মাঠে চরে
কানাই যে রে বংশী ধরে,
মা-এর দেওয়া খাবার
আমরা, মিলে মিশে খাই।।

যশোদার মনে দুঃশ্চিন্তা। কানাইকে গোষ্ঠে পাঠিয়ে যদি কোন তার বিপদ ঘটে। মাতৃস্নেহের গভীর কোমল রূপটি স্পষ্ট হয়েছে।

(৩)

বলাই যদি যাওরে গোষ্ঠে
কৃষ্ণধনকে রাখিও যতনে।
মায় সে জানে পুত্রের বেদন
অন্যে কি তা জানতে গো পারে,
দশ মাস দশ দিন গো

উদরে ধইরাছি তারে।।
দধি দুগ্ধ সর-নবনী
দিয়াছি অঞ্চলে গো বাঁধি
ক্ষুধা পাইলে সব রাখালে
খাইও রে সমান করে।।
কংসের চরে বনে বনে
কতই ওঠে মায়ের গো মনে
আহারে দারুণ যমরে
আমারে না নিলারে ক্যানে।।
কৃষ্ণ সখা সনে গোষ্ঠে চলেছে মা যশোদা তাই দূর থেকে দেখেন

(৪)

গোপী বাহির হইয়া চায়
রঙ্গিয়া রাখাল মাঠে যায়।
আমরা তো পরের নারী
চিত্তে না ধরাইতে পারি,
কি দিয়া ধরাইব তার মায়।।
গোবর্ধন পর্বতে যায়
ধূলি উড়ে ধেনুর পায়,
চাইয়া থাকে অভাগিনী মায়।।
ধবলী কবলী গাই
লইয়া কানু সঙ্গে যায়
নূপুর বাজে দুটি রাঙা পায়।। স্বঃ লিঃ - ৩০

(৫)

গোপালে জাগায়ে দেমা নন্দরাণী গো
গোষ্ঠে যাবার বেলা হল গোপাল জাগে নাই।।
সুদাম শ্রীদাম বলাই মাগো নীলমণিরে চায়।।
কানুর বাঁশি না বাজিলে গোঠে মাঠে হায়
তৃণ দল মন দুখে শুকাইয়া যায়,
বৃন্দাবনের পথে পথে আনন্দ যে নাই।।
শ্যামলী ধবলী মাগো পথ চলে না
রুণু ঝুনু মধুর বোল ঘণ্টা বলে না।
কৃষ্ণ চূড়া দে শিরে মা হাতেদে পাঁচনী
বন মালা গলে দে মা আর ক্ষীর ননী,
গোষ্ঠ বিহারীর রূপে নয়ন জুড়াই।।

(৬)

আয়রে কানাই তোরে লয়ে যাইরে গোচারণে।
ভাইরে, তুই না গেলে ধেণুর পাল যে চায়না যেতে বনে।।

ধরা চুড়া থুইয়ে ভুঁয়ে
মায়ের কোলে আছ শুয়ে
ঐ দেখ পূব আকাশে উদয়রে ভানু
বিলম্ব আর কেনে।।
গোঠে যাবার যায়রে বেলা
সেজেনে ভাই নন্দ লালা,
করে বেলা দিসনে জ্বালা, আয়রে মোদের সনে।।
নিশি প্রভাত হল রে ভাই
কত আর ঘুমাবি কানাই
ঐ যে বলাই দাদা দাঁড়ায়ে আছে
লয়ে রাখালগণে।।

(৭)

সন্ধ্যাকালে ও মায়ে
ডাকিয়া বলে রে
আয়রে দুঃখিনীর বাছা
আয় মায়ের কোলে।।
ভাত হইল কড়কড়া
ব্যঞ্জন হইল বাসি,
অভাগিনী মায় কাইন্দা মরে
দিনান্তের উপাসী।।
আগে তো কইছিলাম নন্দ
বেচ তোমার ধেনু
গোকুলে মাগিয়া খাবো
কোলে লইয়া কানু।।

(৮)

ও সোনার চাঁদ বদন, বদন পাশরী কেমনেরে
গুণের ভাই কানাইরে।।
ও কানাইরে — যখন ছিলি বৃন্দাবনে রাখাল সনে গোচারণে
পড়ে কিনা পড়ে তোমার মনে।
খাইতিস উচ্ছিষ্ট ফল
কানাই, কেমনে ভুলিলিরে।।
ও কানাইরে — না জানি ঐ কোন রমণী
কেড়ে নিল চোরা বাঁশি
নাগরালী কে সাজালো তোরে।
এখন, তুই যদি না চিনিস কানাই
তোরে আমরা চিনিরে।।

কানাইরে — তুমি রে ভাই বনমালী·
নিধু বনে কৃষ্ণকালী
যোগিনীর বেশে কে সাজাল তোরে।
এখন, তাই দেখে ঐ আমার প্রাণ
কেঁদে কেঁদে উঠেরে।।
গুণের ভাই কানাই রে।।

গোপাল নাচ - ঢাকা

প্রাচীন লোক সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্যই ছিল যে সেগুলি ছিল নৃত্য সমন্বিত। আঞ্চলিক ভাবে এসব নৃত্য সমন্বিত সঙ্গীত নানাভাবে গড়ে উঠেছে। এর মধ্যে বেশ কিছু আছে পূর্ববঙ্গের নিজস্ব। পূর্ববঙ্গের প্রসিদ্ধ নগর ঢাকা শহর। ঐ শহরে হিন্দু ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের বাসই ছিল বেশী। তাদের মধ্যে সাহা, বসাক, পাল, কুণ্ডু ইত্যাদির সংখ্যাধিক্য ছিল। এরা সকলেই ছিল বিত্তশালী এবং কৃষ্ণভক্ত। ঢাকা শহরকে বলা হোত দ্বিতীয় বৃন্দাবন। এই শহরে বিভিন্ন উৎসবে নিজেদের গড়া শৈলীতে গান ও কীর্তনাদি করা হোত। এমন একধরণের লোকগীতি ছিল - গোপাল নাচ। এ নাচের জন্য কয়েকজন বয়স্কলোক কতিপয় বালক নিয়ে সম্প্রদায় তৈরী করেন। বালকদের সাজানো হয় বিভিন্ন সাজে - কৃষ্ণ, রাধিকা, সখী, নন্দ, উপনন্দ, অভিনন্দ, যশোদা, সখাবৃন্দ ইত্যাদি। একজন খোল বাদক, একজন হারমোনিয়ম বাদক, এ দুজন করতালবাদক ও একজন বেহালা বাদক মূলে থেকে ঐ বালকদের দিয়ে গানগুলি করাতেন, অভিনয় করাতেন এবং নাচিয়ে অপূর্ব একটি পরিবেশ তৈরী কবাতেন। এ সঙ্গীত ধারা বহু প্রাচীন। আজ থেকে প্রায় এক শত বৎসর আগে ঐ ধারা লুপ্ত প্রায় ছিল। এই সঙ্গীত ধারার শ্রেষ্ঠ এবং উল্লেখযোগ্য পৃষ্ঠপোষক ছিলেন ঢাকার বসাক শ্রেণী, যাদের মধ্যে ছিলেন হরিলাল বসাক, রাধারমণ বসাক, গোপীনাথ বসাক প্রমুখ। এ গানের এখন অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না তবে বিশেষ অনুসন্ধানে প্রায় দু'শ বছর পূর্বের একটি পুঁথি পাওয়া গেছে। সেখান থেকেই সংগৃহীত হয়েছে নিচের পদ কটি।

(১)

অন্য ভিক্ষার তরে আসি নাই তব দ্বারে।।
হয়েছি উৎকণ্ঠ বড় বৈকুণ্ঠ শূন্য হেরে।।
ছিল মহাফণির বুকে ডরায়েছে বিছা দেইখে আমার মত যোগী কত
যার গুণে উনমত শনির ভয়ে লুকে ছিল গণ্ডকির গহ্বরে। দেখলেম
তব উরে।।
রজত গিরিতে বসে কুবের আমার দাস নহি অন্য অভিলাষী-
অন্নপূর্ণা
আমার দাসী কৃষ্ণদর্শন ভিকারি নয়ন ভৈরে।। এসেছি তব দ্বারে।।
নিকটে আইস না যোগী এই আমি ভিক্ষা মাগিব হর আরাধনে চলে যাও
আশীর্ব্বাদ কৈরে।।
মুচকি মুচকি হাসি প্রদক্ষিণ কৈরে সন্ন্যাসী সিঙ্গানাদ করে চলিলেন
রাম রাম বৈলে।।

(২)

দেখ গো পুরবাসি আমার রতনমণিকে মারছে।। মোড়া।।
বাছা মা বৈলে কেন্দেছে।। চটক।।
সাত পাচ নয় মাত্র এক গোপাল বাঁচিলে হইবে নন্দের গোপাল। কিমোর
কপাল মন্দ গোপাল অরবিন্দ হস্তিনীর মুখে পৈরেছে।। ১।।
আমার কতই যত্তনের এ নিল রতন হর পার্ব্বতীর আরাধনের ধন ঃ সেই হৈতে
বিধির এইনেদিল নিধি ঃ পেয়েছি অবধি ঃ কেবল উৎপাতন।। ২।।
রাজার আবদারদি সহিতে না পেরে গোপাল এনেছি ভরসা কৈরে বৈল কৈ
আশার গোপালের ভরসা ঃ বিধি কি কপালে লেখেছে ।। ৩।।
মোরা পুরবাসি সত্য বলবাসি কে তোমায় মেরেছে। ভাণ্ড ভেঙ্গে ননী খাও
ঘরে ঘরে কখন কিছু কি বৈলেছি তোমারে রাণী করে রোষ মোদের
কর্ম্ম দোষ কারে বিধি বিরসিয়াছে।। ৪।।

(৩)

'নাচ নাচ যাদু মণি বাকা হৈয়ে নাচ খেতে দিব খির ননি।।
দেখিতে না পারে চক্ষের মাথা খাউক আপনি।।
মাথায় বেন্দে চুর বেণী হাতে মুরলী পাচনী।। পায়ে নুপর দিলেন-
কটিতে কিঙ্কিনী।।
সবে করিয়ে মণ্ডলি কেও কেও দিচ্ছে তালি কার হাতে মাখন-
ছানা মুখে জয় ধ্বনি।।

(৪)

'আহা মরি মরি ব্রজ গোপীর ভাবের বালাই লইয়ে মৈরে যাইরে।।
বিধি আনন্দ স্থাপিতে বিধি কৈল নন্দালয়ে।।
যারগুণে নাচে জগ'ত কে আছে তারে অবগত। নারদ, শারদ, বরদা-
কান্ত নাচে সতত উনমত। কিঞ্চিত নবনীর তরে লালসা দেখাইয়ে-
তারে নাচায় গোপী তালি দিয়ে।।

(৫)

'গোপাল কেন্দে বলে আমায় কোলে লও মা।।
আমায় কোলে লও মা নন্দরানি খেতে দে মা ক্ষীর ননি।।
গেছে সারা নিশি বৈসে শয্যায়ে ছিল ঘুমায়ে মা গো কেমন তোমার
কঠিন হিয়ে আছ গৃহকাজে গোপাল ভুমে থুইয়ে।।
তোমার গোপাল গোপাল সে জাননা জাননা গো তোমার প্রেমের —
বসে। সেজে গোলোক পতি। ত্রিলোকের গতি। বিচিত্র মাল্য রসে —
(প্রেমের বসে)।। ত্রিজগতে জানে জানি গোপাল তোমার যাদু মণি।
তার ভাল জানে গর্গ মহামুনি। যার নাম রাখিল ধ্যানে বসে (প্রেমের বসে)।।
মাগো ত্রিলোক বান্ধা যার মায়া ছান্দে। দেখ তোমার আচল ধৈরে কান্দে
(প্রেমের বসে)।। -
বৃন্দাবন চন্দ্র শ্রী গোবিন্দ জনা বন্ধ দৃষ্টি কর সৃষ্টিধর ঐযে তোর

নন্দন স্পর্শাতিত চান্দে নখ কান্দে মার বন্ধন ঠেকে প্রেম কান্দে পৈরে
কাঁন্দে করে ক্রন্দন কৈরে যত্নে কোলে রত্ন ল অযত্নে কি বন্ধন-
তুমি জান না মা ভুলে গেছ কি ক্ষুধায় আকুল তোমার সেইত গোপাল।।
মা গো একদিন ক্ষুধায় ব্যাকুল হৈয়েছিল। তোমার আঙ্গিনার মাটি খাইল।।
মাগো মাটির ছলে কি দেখাইল।। আর একদিন ক্ষুধাতে চঞ্চল।। —
যজ্ঞ মুনির অন্ন নষ্ট কৈল সেইত গোপাল মাগো দামোদর নাম রাখিল।।
বলে রাণী যাদু মনি নাচত গোপাল। তোমায় খেতে দিব ক্ষীর ননী
কটীতে দেব কিঙ্কিনী।। আমার দেহ গেহ সফল কর নেচে নেচে এসে
গলায় ধর।। মার কথা শুনে নাচিতে লাগিল তালি দিয়ে বলে
ভাল ভাল।। বাহু তুইলে নাচ দিনের আকিঞ্চন চরিতার্থ হউক ত্রিভুবন।।
গোপাল নাচিতে নাচিতে আবার বলে কোলে লও মা বৈলনা আর নাচতে —
গোপাল।। শ্রীল প্যারি কিশোর প্রভুর দাসে বলে,
সাধ পুরিল না অনন্তের কোলে।।

(৬)

'রাধিকা রূপকি কবহুম জানি গগন মণ্ডল পর চন্দ্র উদিতা উজ্জ্বল করতা
যামিনি সই শত চন্দ্র যদি গগনা উঝি আওই এক ভানু মলিন করতাহে —
কোটী ভানু যাক্ চরণ নেছাওই ঃ তাক তুলনা দেও কাহে।। দুটা।।
আহা মরি সইরে যাই রাধার রূপের বালাই বালাই লৈয়ে গো।।
নব গৌর চলাবতি শ্রী অঙ্গে শোভয়ে অতি
নিল পট্ট সারি শোভে গায় ভুজঙ্গিনী জিনি বেণী
ফণি বিরাজিত মনি রত্নগুচ্ছ অতি শোভে তায়।
জিনিয়ে উপমা পন তুলনা নাহিক সম
শোভা যার শ্রীমুখমণ্ডল। চৌরস কপাল ঠাম
জিনিয়ে নবীন চাঁদ কস্তুরি তিলক ঝলমল ।।

প্রভাতী গান

বাংলায় প্রভাতী গান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন লৌকিক ধারার সুরের মিশ্রণ ঘটেছে প্রভাতী গানের সুরে। কার্ত্তিক থেকে মাঘ মাস পর্য্যন্ত প্রাতঃকালে এ গান গেয়ে বৈষ্ণব বা বৈষ্ণবীরা গ্রামের লোকের ঘুম ভাঙ্গায়। কেউ কেউ এ জাতির গানকে টহলদারী গান বলে থাকেন। বাউল সম্প্রদায়ের লোকেরাও এ ধরণের প্রভাতী গান করেন। গানের ভাষায় শুকসারীর কথা, বালক কৃষ্ণের কথা অথবা বন্দনার উল্লেখ পাওয়া যায়।

(১)

জাগো জাগো জাগো বাছা নীলমণি
বিভাবরী হইল ভোর।
অলস ত্যাজিয়া বসন পরিয়া
মাখন খাওতো মাখন চোর।।
উপাধান ছাড়ি যাও গড়াগড়ি

ধূলাতে লুটাও ওহে বংশীধারী —
সুবাসিত জলে মুখ ধৌত করি
মাখন খাওতো মাখন চোর।।
দুয়ারে দাঁড়ায়ে, আহা মরি মরি
সখাগণ ডাকে উঠ উঠ হরি
গোধন চরাতে যেতে ত্বরা করি
ডাকছে দাদা বলাই তোর।।

(২)

একবার নাচিয়া নাচিয়া বেণু বাজাইয়া
এসো হে রতনমণি।
বেলা পানে চাও উঠে মাখন খাও
বেঁধে দিব মাথার বেণী।।
শিব আরাধনে মধু বৃন্দাবনে
পেয়েছি নীলমণি।। **স্বঃ লিঃ - ৩১**

(৩)

শুকসারী বলে উঠল কিশোরী
যামিনী অবসান।
কোকিলায় ঘন ঘন কুহু রবে
মধুকরে মধু করে পান।
রতি রসরঙ্গে রসরাজ সঙ্গে
নিশি পোহাইল প্রেম তরঙ্গে
এইতো সমাধান।
ঘরে গুরু কুল জাগিল সকল
মাধব করল পয়ান।।
জলদ নয়নে কমল বরণী
উঠ উঠ ওগো শ্যাম সোহাগিনী
উঠ হে সুন্দর শ্যাম।
অরুণ কিরণ হইল প্রকাশন
দেখে ভয়ে কম্পিত প্রাণ।। **স্বঃ লিঃ - ৩২**

(৪)

জাগিয়া লহ কৃষ্ণ নাম রে নগরবাসী।
প্রভাতে গোবিন্দ নাম সিদ্ধ হবে মনস্কাম
অন্তে হবে বৈকুণ্ঠ নিবাসী।।
বৃন্দাবনের তরুলতা তারাও বলে কৃষ্ণ কথা
তুমি মানব হয়ে হইলে চেতন হারা।
গয়া গঙ্গা বারাণসী ব্রতের মধ্যে একাদশী
ঘরে বসে পূজো মন তুলসী।।

(৫ক)

রাইজাগো রাইজাগো বলে, শুকসারী বলে।
কত নিদ্রা যাও গো রাধে, কালো মাণিকের কোলে।
রজনী প্রভাত হইল, বলিযে তোমারে।
অরুণ কিরণ হেরি, প্রাণ কাঁপে ডরে।।
সারী বলে ওগো শুক গগনে উড়ি ডাকো।
নব জলধরে আনি অরুণেরে ঢাকো।।
শুক বলে শারি মোরা, পোষণীয়া পক্ষী।
জাগালে না জাগে রাই, ধরম কর সাক্ষী।।
জলেতে বসিয়া শুক করে বেদধ্বনি।
চমকি চমকি ওঠে রাধাঠাকুরাণী।।
জগদানন্দ বলে শুক, কি কার্য্য করিলে।
তমালে কনকলতা কেন ছাড়াইলে।

(৫খ)

উঠিয়া বসিল নাগর নিদের আলসে।
দুহুঁ আঁখি ঢুলু ঢুলু অলস আবেশে।।
দুবাহু পশারি ধনি বঁধু নিল কোলে।
সুবাসিত জলে বঁধুর বদন পাখালে।।
যেখানে যা বিগলিত হয়েছিল বেশ।
সাজাওগো বিনোদিনী আনন্দ আবেশ।।
হাসি হাসি কোন সখী বাঁশী করে দিল।
বাঁশী পেয়ে নাগর বড় হরষিত ভেল।।
জ্ঞানদাস কহে লীলার বলিহারী যাই।
এমন দুজনের প্রেম কভু দেখি নাই।।

(৬)

কার কুঞ্জে কাটাইলা নিশি ওগো শ্যাম রায়
ঘুমে নয়ন ঢুলুঢুলু নিশি ভোরে হায়।
কপালের চন্দন তিলক কেন মুছে গেল
কালো মুখে কাজল কালী কেবা' মেখে দিলো
স্মরণ ভরণ নাইকো তোমার মরি লাজে হায়।।
আসবে বলে কুঞ্জে এলে নাতো শ্যাম
নয়ন জলে ভাসলো রাধা বিধি হ'ল বাম।।
কপট নিঠুর শ্যাম নটবর কত রঙ্গ জান।
মুরলীর মধুর তানে সবারি মন টানো
কারে রাখো ঐ চরণে কারে ফেলো দায়।।

(৭)

শুকসারী ঐ ডাকছে ডালে চন্দ্রাবলীর কুঞ্জেতে।
প্রেম বসে ভাসছে দু'জন কৃষ্ণ চন্দ্রাবলীতে।।
কপট নাগর শ্যাম নটবর, একি নিঠুর খেলা
শ্যাম সোহাগী রাধা কাঁদে সারা নিশি বেলা,
কারে হাসাও কারে কাঁদাও কৃষ্ণ লীলার ভঙ্গীতে।।
রাধারাণীর গাঁথা মালা ধুলাতে লুটায় রে
সে মালা বুকে নিয়ে আঁখি জলে ভাসেরে।
আঁখি জলে দেখে যে রাই কৃষ্ণ রূপ ভাসে
চোখের জলে ডাকলে যে শ্যাম প্রাণের মাঝে আসে,
গোপী জনার মন লোভা শোন গো বলি ললিতে।।

(৮)

ঘরে ঘরে নদে বাসী করে মধুর নাম গান,
নিত্যানন্দ আলিঙ্গনে মহাপ্রভু কেঁদে ভাসান।।
ক্ষণে ক্ষণে পাগল প্রায়
হাসে কাঁদে নাচে গায়,
ক্ষণেক ধুলায় লুটায়
রাধা নামে হয় সচেতন।।
তাই দেখে যত মেয়ে
কোলের ছেলে ফেলে দিয়ে
মুখে হরি হরি বলে
গৌর পদে লয় স্মরণ।।

(৯)

ও তোরা দেখে যা, ও নরনারী গো
সুন্দর নাগর যায়।
সুন্দর নয়নে সুন্দর চাহনি
আমার, দেহ রেখে প্রাণ লইয়া যায় - নাগরী গো।
সুন্দর অধরে সুন্দর মুরলী
মুরলী, মধুর মধুর রাধা নাম গায় - নাগরী গো।।
সুন্দর কটিতে সুন্দর কোপিন
ও তাতে ময়ূর পাখা বেষ্টন করা হায় - নাগরী গো।।
সুন্দর চরণে সুন্দর নূপুর
নূপুর, রুণু ঝুণু বাজে রাঙা পায় - নাগরী গো।।
সুন্দর কপোলে সুন্দর তিলক
সুন্দর নামাবলী গায় - নাগরী গো।।

(১০)

রাই জাগো রাই জাগো ব'লে
শুকসারী বলে।
কত নিদ্রা যাওগো তুমি
শ্যাম নাগরের কোলে।।
শুকসারীর রব শুনি
জাগিল রাই বিনোদিনী
আপনি জাগিয়া রাই - কানুরে জাগায়রে।।
নিদ্রার আবেশে রাই ঢুলু ঢুলু করে
হেলিয়া ঢলিয়া পড়ে শ্যাম নাগরের কোলে।।
শুক বলে ওগো সারী কি কার্য্য করিলে
তমালে কনক লতা কেন ছাড়াইলে।।

(১১)

জাগো গো,
বিনোদিনী মনমোহিনী কলঙ্কিনী রাই।।
জাগিয়া দেখ তুমি আরতো নিশি নাই।। (ওগো রাধে)
শ্যাম অঙ্গে অঙ্গ দিয়া
আছ তুমি ঘুমাইয়া
লোক নিন্দার লজ্জা কি গো নাই।। (ওগো রাধে)
শাশুড়ী ননদী ঘরে
আমরা সবাই মরি ডরে
আমরা সকল অষ্ট সখী ফুল তুলিতে যাই।। (ওগো রাধে)।
পূবের আকাশ হইল যে ভোর
মিছে তোমার এই ঘুম ঘোর
জেগে দেখ আর তো নিশি নাই।। (ওগো রাধে)

(১২)

জাগো রে জাগো -
জাগো রাধা মদন মোহন ডাকে শুকসারী।
শাপলা পুষ্প সৌরভ করে রে বলি, আমার সোনো পাখি
অরুণ উদয় কালে সূর্য্যের সনে আসি।।
বকুল পুষ্পে গৌরব করে রে
বলি আমার পাখি রেণু
আমায় নিয়ে খেলা করে নন্দের ঘরের কাণু।।
ভ্রমর কইওরে কালিয়ায়
শ্রীরাধা ক্রন্দন করে কৃষ্ণ হারা হইয়া রে।।

(১৩)

জয় রাধে শ্রীরাধে গোবিন্দ
জয়, রাধে গোবিন্দ জয় রাধে।।
রাতুল চরণে সোনার নূপুর
রুণু ঝুণু রুণু বাজে।।
শ্যাম গলে বনমালা বিরাজে
রাই গলে মতি সাজে।।
সুন্দর ললাটে সুন্দর তিলক
সুন্দর সুন্দর সাজে।।
শ্যামের হাতে মোহন বাঁশি
জয়, রাধা রাধা বলে বাজে।।

(১৪)

জাগো জাগো রাই রজনী পোহাইল
ঘুমাওনা বিনোদিনী নয়ন মেলো।।
আর নিশি নাই হইল যে ভোর
কেন মিছে এই ঘুম ঘোর,
দিনমণি উদয় হলো।
ঘুমাইওনা বিনোদিনী নয়ন মেলো।।
নিলাজ হইলা তুমি যে রাই
লোক লাজের ভয় কি গো নাই
কুলমান হায় সবই গেলো।
ঘুমাইওনা বিনোদিনী নয়ন মেলো।।

(১৫)

প্রভাত সময়কালে শচীর আঙিনার মাঝে
গৌর চান্ নাচিয়া বেড়ায় রে।
একে গোরার নবীন বেশ,
মুড়াইয়া চাঁচর কেশ,
গোরার সোনার অঙ্গ ধুলাতে লুটায় রে।
শোন নি গো শচীমাতা
গৌর আইল প্রেমদাতা
ঘরে ঘরে হরি নাম বিলায় রে। **স্বঃ লিঃ - ৩৩**

(১৬)

কার ঘরে লুকাইল নীলমণি
সে যে চোরের গুরু চোরের শিরোমণি।।
দধি খাইয়া ভাণ্ড ভাইঙ্গা সকল নবনী লইয়া
আহা, দুয়ারে মুইছাছে হাতখানি।।
যশোদার মুখ হেরি, রোহিনী দেখায় ঠারী,

হায় হায়, ওই ঘরে আছেরে চুড়ামণি।।
ছাইড়্যা দেমা পায়ে পড়ি, বন্ধন জ্বালা সইতে নারি,
মা গো, আর তো খাবনা সর ননী।।

(১৭)

উপায় কি সখি তোরা বলে দে আমায়।
কুঞ্জেতে না এলো শ্যামরায়।।
কোটি কোটি জন্মান্তরে না জানি আইলাম কি করে
বন্ধে মোরে সেই জন্যে কাঁদায়।।
থাকতো যদি ভক্তির ডোরী রাখতাম চরণ বন্ধন করি
তবে কি আর বংশীধারী একে ফেলে যায়।।
আইজ আসবে কাইল আসবে বলে, সাজাই কুঞ্জ নানা ফুলে,
প্রভাত কালে ভাসাই যমুনায়।।
বিফল হইল সকল আশা, শ্যাম আসিবার নাইরে আশা
কেন বিধি করে নিরাশা, এই জনমের দায়।।
মনে লয় কাটারি দিয়া, কপাল খানি বিদারিয়া
দেখি কি লিখিল বিধাতায়।।
শ্যাম পীরিতের এমনি ধারা, সেই প্রেমে মজিলি তোরা
পঞ্চানন কয় হইলাম সারা এই জনমের দায়।।

(১৮)

কত সাধ করে কুঞ্জ সাজাইয়া গো ললিতে
মন দুঃখে রইলাম গো বসিয়া।।
কোকিলার কুহু ধ্বনি, শুনিয়া শিহরে প্রাণী গো,
আমার নিশি বুঝি যায় পোহাইয়া।।
যা গো সখি যা গো তোরা, এনে দে মোর মন চোরা গো,
আমি তারে দিব মন প্রাণ সঁপিয়া।।
সুখনয়ে বলে রাধে, বিষাদ না ভাবিও চিতে গো,
দেখ কুঞ্জ দ্বারে কে আছে দাঁড়াইয়া।।

(১৯)

কুঞ্জের দুয়ারে শ্যাম দাঁড়াইয়াছে
মান কইর্য্যো না গো রাধে, মান কইর্য্যো না।।
চন্দ্রাবলীর কুঞ্জ থেকে
ফিরিয়া আইসাছে গো নাগর
মুখে কথা সরে না।।
দাসখত লিখিয়ে নিবি (রাধে)
শ্যাম নামের কলঙ্ক দিবি,
দেহি পদ পল্লব বলবে চরণ ধরে।
মান কইর্য্যো না ....।।

লাজের মাথা খেয়ে কালা
কুঞ্জে কুঞ্জে ধায়
বোঝে না তো রাধা ছাড়া
আর যে গতি নাই।
না ঠেকিলে শিখে না কালা (রাধে)
জানে না তো প্রেমের কি জ্বালা
চরণে নিয়াছে গো ঠাঁই
তারে ছাইড়ো না
মান কইর‍্যো না ....।।

নিমাই সন্ন্যাস

(১)

জাগো জাগো শচীমাতা আর ঘুমাইওনা।
তোমার নিমাই চইল্যা গেল জানতে পাইলা না।।
নদীয়ার চাঁদ ডুইবারে গেল শূন্য চারি ধার ..মাগো
বনে বনে পাখি কাঁন্দে নদে অন্ধকার,
কি কাল ঘুমে পাইলো মাগো, একবার জাগলিনা।।
কেমন কইর‍্যা দেখবি মাগো বিষ্ণু প্রিয়ার মুখ,
পতি থাকতে পতি ধনে হইল সে বিমুখ।
যতই ডাকবি নিমাই নিমাই বাতাস বলবে নাই - মাগো
নদীয়ার ঐ নরনারী কাঁদবে দুঃখে তাই,
মা হইয়া তুই বুকের মানিক রাখতে পারলি না।।

(২)

অমি এই যে ভিক্ষা চাই
বিদায় দেওগো শচীরাণী
আমি সন্ন্যাসেতে যাই।
ঘরে আছে বিষ্ণুপ্রিয়া
তারে রাইখ্যো বুঝাইয়া
মা তোমার চরণে জানাই,
তুমি মনেরে বুঝাইয়া রাইখ্যো গো
তোমার নিমাই নাই।
নদীয়া ছাড়িয়া যাবো
পরের মাকে মা বলিবো
জানবে লোকে নিমাই'র কেহ নাই,
তুমি মনেরে ... তোমার নিমাই নাই।
আমি হইলাম ভেক সন্ন্যাসী

হবো না আর গৃহবাসী
উদাসী কইর‍্যাছেন গোঁসাই
তুমি মনেরে .... তোমার নিমাই নাই।

(৩)

সন্ন্যাসী বানাইলো তোরে কে রে
সোনার বরণ গৌর চান্ রে।।
নিমের তলে থাকো নিমাই
নিমের মালা গলে
জন্মিয়্যা কেন না মরিলি
না লইতাম কোলে রে।।
ভাগবত পইড়্যা নিমাই
পণ্ডিত হইল্যা বড়
সংসারে বুঝাইতে পার
মাকে কেন ছাড়ো রে।।
ঘরের বধু বিষ্ণুপ্রিয়া
জ্বলন্ত অগিনী
কি দিয়া প্রবোধ দিব
বল নিমাই শুনি রে।।

(৪)

নিমাই দাঁড়ারে, দাঁড়ারে নিমাই
দেখিব তোমারে রে নিমাই দাঁড়ারে।।
যখনই জন্মিলি নিমাই নিম্ব তরুতলে
বাছিয়া রাখিলাম নামটি রে (ও নিমাইরে)
ও নিমাই চান্ তোমারে রে।।
কোথা হতে এলো গুরু বসতে দিলাম ঠাঁই
সেই অবধি নিমাই'র মুখেরে (ও নিমাই রে)
নিমাই'র মা বলা ডাক নাই রে।।
দেখো দেখো নগরবাসী দেখো বাহির হইয়া
নিমাই চান সন্ন্যাসে যায় রে (ও নিমাই রে)
ও নিমাই জননী ছাড়িয়া রে।।
ঘরের বধু বিষ্ণুপ্রিয়া জ্বলন্ত অগিনী
আর কতদিন রাখবো তারে রে (ও নিমাইরে)
নিমাই দিয়া মুখের বাণী রে।।

(৫)

শচীমাতা গো, আমি চারযুগে হই,
জনম দুখিনী।
আমার দুঃখে দুঃখে জনম গেল,

কভু না হইলাম সুখিনী।।
সত্যযুগে ছিলাম আমি মাগো
সত্যনারায়ণী
দুর্বাসার অভিশাপে আমি
হইলাম মর্ত্য বাসিনী।।
ত্রেতা যুগে ছিলাম আমি মাগো
রামের ঘরণী,
বাদী হইল কৈকেয়ী মাতা
করল বনবাসিনী।।
দ্বাপরেতে ছিলাম আমি মাগো
আয়ান ঘরণী
শাশুড়ী ননদী বাদী, আমায়
করল কৃষ্ণ কলঙ্কিনী।।
কলিযুগে হইলাম আমি মাগো
গৌরাঙ্গ ঘরনী,
অকালে ছাড়িল পতি মাগো
আমি বড় মন্দ ভাগিনী।।

(৬)

সোনার চান্, চাঁন্দরে
চাঁদ হারাইলাম নদীতে।।
দুধ মিঠা দইও মিঠা আরো মিঠা ননী
আর, তার চাইতে অধিক মিঠারে — বাছা মাও যে জননী।।
নিমের তলে বৈসো বাছা নিমের ছেঁড় পাতা,
আর, কারতরে হরিয়া নিলরে
ও তোর সোনা মুখের কথা।।
নিমের তলে বৈসো বাছা নিমের ছেঁড় কুসি,
আর কার তরে হরিয়া নিলরে, ও তোর সোনা মুখের হাসি।।
বৈরাগী না হইও বাছা সন্ন্যাসে না যাইও,
আর ঘরে বসে কৃষ্ণের নামটিরে
বাছা, মায়েরে শোনাইও।। **স্বঃ লিঃ - ৩৪**

(৭)

একদিনেতে নিমাই চাঁদ, বলে শচী
শুন মাগো আমারি বচন।।
মাগো, আমি যাবো সন্ন্যাসেতে
বিদায় দাওগো ভাল চিত্তে
আমার মনে এই আছে আকিঞ্চন।।
ইহা শুনি শচীরাণী
হইলেন যেন পাগলিনী

আঁচল দিয়া মুছে দু'নয়ন।।
বাছা, তোমারে বিদায় দিয়া
কেমনে ধরিব হিয়া
তুইরে আমার জীবনের জীবন।।
গভীর রজনীতে
নিমাই গেল সন্ন্যাসেতে
সবে ঘুমে রইল অচেতন।।
জাগি, শিরে হানে করাঘাত
কোথা গেল প্রাণনাথ
ভাগ্যে ছিল এমন লিখন।।
তখন, বিষ্ণুপ্রিয়া শচীমাতা
কাঁদিয়া ভাঙ্গে যে মাথা
ক্ষণে ক্ষণে মূরছা মগন।।
ডাকে রাণী নিমাই নিমাই
প্রতিধ্বনি নাই নাই
শচী, ধূলি পরে করিল শয়ন।।

(৮)

বিষ্ণুপ্রিয়া গো
বিদায় দাও, সন্ন্যাসে গমনে।।
তুমি মনের দুঃখ মনে রেখো গো
প্রাণনাথ বিহনে।।
দুখিনী জননী ঘরে
তারে রেখো যতন করে গো
যেন; আমা বিনে না হয় কাতর
ভাসে দু'নয়নে।।
সন্ন্যাসেতে যাব চলে
না ফিরিব মায়ের কোলে গো
আমায় উদাস করেছেন গোঁসাই
কৃষ্ণ দরশনে।।
বিষ্ণুপ্রিয়া ঘুমে রইল
নদের চাঁদ বাহিরিল গো
মাথায় বাঁধে নামাবলী
ত্যজিয়া বসনে।।
যাই যাই মনে করে
পা-দু'টি না সরে গো
না পারে ঠেলিতে নিমাই
গুরুর বচনে।।

বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীদের গান

(১)

গম্ভুর রূপ দেখিয়া হইয়াছি পাগল
ঔষধে আর মানে না,
চল সজনী যাইগো নদীয়ায়।
আবার, গম্ভুর কাঁটা বিষম কাঁটা
ঠেকলে কাঁটা খসান দায়
ও সজনী, প্রাণ সজনী,
গৌরাঙ্গ ভুজঙ্গ হয়ে দংশিয়াছে আমার গায়।।
সাপের বিষে যেমন তেমন
প্রেমের বিষে উজান ধায়
ওরে, বিষে অঙ্গ জরজর
জলে গেলে দ্বিগুণ ধায়।।
পাড়ায় পাড়ায় ঘুইর‍্যা বেড়াই,
লোকে কত মন্দ কয়।
লোকের মন্দ পুষ্প চন্দন,
অলংকার করেছি গায়।।

(২)

মন পাগল হইলরে আমার গৌরাঙ্গ রূপ হেরী।
বিষয় আশয় না লয় মনে. কেটে গেল মায়ার বেড়ী।।
কাঁচা সোনার অঙ্গে গোরার
কৃষ্ণ প্রেমে লাগল জোয়ার
মন প্রাণ দিলাম সখি ঐ রূপ নেহারী।।
রাধা প্রেমে মাতোয়ারা চোখে বহে জল (গোরার)
আকুলি বিকুলি বলে মুখে কৃষ্ণ বল রে, মুখে কৃষ্ণ বল।
যে শুনেছে ঐ হরি নাম
মিটেছে তার সব মনস্কাম,
কি মধুনাম আনলো গোরা প্রেমের লহরী।।

(৩)

গৌরাঙ্গ রূপ দেখলাম সখি
পথে যেতে নদীয়ায়।
ঘরে ফিরে দেখি সখি
আমি, মন দিয়াছি তাহার পায়।।
যে দিন হইতে গৌর নিরখি
হরিদ্রা বাটিনা সখি
হলুদ বরণ গোরা চাঁদে, মনে পড়ে যায়।।
হলুদ বরণ শাড়ি আমি অঙ্গেতে জড়াই গো

গৌর বিচ্ছেদের জ্বালা আমি যে জুড়াই গো।
গৌর বরণ চাঁদ দেখি
নিশি জেগে চেয়ে থাকি,
নদীয়ার চাঁদ মনে পড়ে, বুক ভেসে যায়।।

(৪)

নব গৌর হেরে আমার প্রাণ কি করে গো
মন চলে না গৃহে যেতে পারিনে আর কুল রাখিতে।
আমার বন্ধন ভারি খুলতে নারি গো
ফাঁসি লাগল আমার গলেতে।।
যে অবধি গৌর হেরেছি
সেই অবধি প্রাণ সজনী দায়ে ঠেকেছি,
আমি গৌর প্রেম সায়রের মাঝে গো
সই ঝাঁপ দিব সেই জলেতে।।
যে দেশে গেলে গৌর পাই
সেই দেশেতে যাব সইগো, দেশের কার্য্য নাই,
আমি দেশ ছেড়ে বিদেশিনী হব গো
সই রইব না আর কুলেতে।।

(৫)

গৌর পরশ মণি এলো সোনার নদীয়ায়।
ওসে. হেলে দুলে বাহু তুলে
গোরা হরির নাম বিলায়।।
নামাবলী বাঁধি মাথে
কটিতে কৌপিন পরা গোরার করংগ হাতে:
ওসে. জয় রাধা শ্রী রাধা বলে
গোরা হাসে কাঁদে নাচে গায়।।
গৌর চান্দের পরশ পেলে
বোবায় বলে হরি হরি ঐ দুই বাহু তুলে,
কত অন্ধ আতুর উদ্ধারি গো
উদ্ধারি গো জগাই মাধাই।
রূপে ভুবণ আলো করে
নাম বিলাইতে গোরা চাঁদ ফিরে ঘরে ঘরে,
সঙ্গ গুণে রং ধরে নইদা বাসী
গোরা, ধূলায় গড়া গড়ি যায়।।

নবম পরিচ্ছেদ

কর্মসঙ্গীত

বাংলার গ্রামকে ভিত্তি করেই সৃষ্টি হয়েছে গ্রামীণ কর্মসঙ্গীতগুলি। যা রূপে রসে ভরে উঠেছে সহজ সরল সাঙ্গীতিক ছন্দে।

এই গানগুলি যথাক্রমে ঃ মেঠোগান, ধানকাটার গান, পটের গান, নৌকা বাইচের গান, বা সারি গান, ছাদপেটার গান, নলকূপ বসানোর গান, পাটকাটার গান, মাছ ধরার গান, ভুঁই নিড়ানোর গান, ধান কোটার গান, চিড়া কোটার গান, পাল্কী বাওয়ার গান ইত্যাদি।

কর্মসঙ্গীতে অনেক সময় শুধু কতকগুলি ভাবহীন শব্দই একসঙ্গে গাওয়া হয়। অনেক সময় শব্দগুলি অর্থহীন হয়ে পড়ে। এ গান কর্মে প্রেরণা যোগায়, এইমাত্র। এর কাব্যিক গুণ তেমন নয়, যেমন আছে অন্যান্য লোকসঙ্গীতের মধ্যে।

নারী-পুরুষ উভয়েই কর্মসঙ্গীত গেয়ে থাকেন।

মেঠো গান ঃ (রঙ্গ রসিকতার গান) ঃ

'রঙ্গিলা ভাসুর গো
তুমি ক্যানে দেওর হইলা না।
তুমি যদি হইতারে দ্যাওর
খাইতা বাটার পান
আর রঙ্গ রসে কইতাম কথা
জুড়াইত পরান।।
হাটে যাও বাজারে যাও
আমার একটি কথা
দিদির লাইগ্যা পান সুপারি
আমার আলা পাতা।।' **স্বঃ লি —১৭**

মাঠের গান ঃ মেঠো সুরের গানে প্রেমভাবই প্রধান।

দক্ষিণা বাতাসে নারীর পরাণ কান্দেরে।
কান্দে নারীর পরাণ, বন্ধুর লাগিরে।।
হাইলা গরু কিনিব
নূতন লাঙ্গল বিধিব
সেও না লাঙ্গল চষবে প্রাণের বন্ধুরে।।
বন্ধু আমার তিলক চান্দ
তিল কাটিয়ে লাগায় ধান
সেও না ধান নিল টিকেয় কেইটে রে।।

বাটের গান ঃ গ্রামের পথ চলতে চলতে বৈষ্ণব ভিখারীরা গায়। বিষয়বস্তু রাধা নামের ধনুক কৃষ্ণনামের গুলি। প্রেমবিহ্বলতা জাগানোর ইঙ্গিত গানের পদে রয়েছে ঃ

কে মারিল ভাবের গুলি সই
আমার অন্তর মাঝারে,
গুলি মেরে চইলে গেল
এই দ্যাখলাম, এই দ্যাখলাম নারে,
আমার অন্তর মাঝারে
কে মারিল —।।
একটা ব্যাধ আসিল নদীয়াপুরে
রাধা নামের ধনুকে সে নামের গুলি মারে
গুলি যারে মারে, ঢইলে পরে
সদাই হরি হরি বলে।।
আমার অন্তর মাঝেরে,
কে মারিল —।।

পথ চলতে চলতে সাত আট বছরের রাখাল ছেলেরা পথ চলার ক্লান্তি ঘোচাতে গান যায়। সে গানের বাঁধুনিতে সুরের বৈচিত্র্যও পাওয়া যায়। অর্থ তারা বোঝেনা। ভাল লাগার জন্যেই গায়। আবার অঞ্চল ও সম্প্রদায় ভেদে রুচির ভিন্নতায় গানের শব্দচয়নে ফুটে ওঠে অভিনবত্ব। চিন্তাধারায় প্রকাশ ঘটে ভিন্ন রূপ ও ভঙ্গি।।

পথ ছাড়ো ঘরে চইলে যাই।
ও নিলাজ কানাই রে।।
পথ ছাড় —
ওরে, নারীর অঞ্চল ধরি,
তুমি কর যৈবন চুরি
লজ্জা সরম তোমার কাছে নাই।
ও নিলাজ কানাই রে।।

আবার শ্রীরাধার ভাবে মুসলমান ছেলেদের গাইতে শোনা যায় সম ভাবের গান। এ গানের কথা, সুর ও ছন্দ ভিন্ন। গানটি হ'ল ঃ-

পান্থ ছাড়লো বেজরাণী,
নেতেরি অঞ্চলে, কারে ছাপাইয়াছ
তারে দেইখ্যাছি আমি।
ছোট না রাধিকা বড় না কলসি
হেলিয়া ঢলিয়া পড়ে গায়
কেমন নাগর জলে পাঠাইয়াছে
দরদ নাই শ্যামের চিতে।।

পুতুল খেলার গান ঃ

ছোট ছোট মেয়েরা পুতুল খেলার সময় কখনো কখনো গান গায়। নির্দ্দিষ্ট কোন গান না থাকলেও এই বিষয়ে দুই একটি গানের সন্ধান পাওয়া যায়। তাই নিচে তুলে ধরা হ'ল ঃ-

পুতুল খেলার বিয়ে লো সই
আমার পুতুলটি বর হবে সই।।

তোর পুতুলটি কনে,
আমারা কনের গয়না-গাঁটি নুবো গুণে।।
আমরা বরের মাসি পিসী
লুচি মণ্ডায় হ'ব খুশী
আমরা এয়ো করবো বরণ
ডালা মাথায় নিয়ে।। (মেদিনীপুর)

নলকূপ বসানোর গান ঃ

'সাবাস জোয়ান হেঁইও
মারিরে টান হেঁইও
আরো জোরে হেঁইও'।।

ধান কাটার গান ঃ

ধান্ কাটি কাটি ধান্ ধান্ কাটি - হেই।।
ধান কাটি গোছা গোছা
হাতে লাগে খোঁচা খোঁচা
ভাল কইর‍্যা বাইন্ধা বোঝা
মাথায় লইয়া যাইরে ... হেই।।
বাড়ি যাইয়া ধান ঝাইড়্যা
তুইল্যা রাখি গোলা ভইর‍্যা
বারো মাসের চাউল কইর‍্যা
মনের সুখে খাইরে .... হেই।।
মাটি মোদের খাঁটি সোনা
এ জগতে নাই তুলনা,
সেই মাটি মায়ের চরণ ছুঁইয়া
পেন্নাম জানাইরে ... হেই।। **স্বঃ লি —১৮**

ছাদ পেটার গান ঃ

'বিদ্যাশে কেন গেলি ভাল বাসিয়ারে।
ও পরাণের পরাণ বন্ধুরে
ফুরাইয়া গেল কলমের কালি
তবু না ফিরা আইলা রে।।
বিয়া কইর‍্যা বিদেশ গেলি
আমারে তুই ভুইল্যা গেলিরে
একলা ঘরে শুইয়া থাকি
সপুনে তোমারে দেখিরে।।
সকাল বেলা ফুল তুলেছি
ঘাটে বইশা চুল বেঁধেছি
যদি বন্ধু ফিরা আইশ
একটু আমায় ভাল বাইসোরে।।

তুমি যখন বাজাও বাঁশি
সটকে যায় সে মুখের হাসিরে
তোমার বাঁশি শুইনা আমি
পরলাম গলায় প্রেমের ফাঁসিরে।। (বীরভূম)

পূর্ববঙ্গের একটি ছাদ পেটার গান ঃ

একখানা বোন্দাল বাড়ী, যাইতাম ঘুরি
হারালাম না আর মুই এই খানে।।
হারে কাজ খাইলে কিয়া হারাতাম ছাই;
কত হাঁতে ধরি, হ্যাদ্য করি,
বইচা মাছ দিয়া ভাত খাওয়াই
এখনে কি করমু, কোথায় যাইমু
চিতাল মিঠাই নাই।।
আর, বন্ধু, গুন গুন স্বরে গীত গাইয়া যাও
তখন মুই ঘরের কোনে বইয়ম, বইয়ম
পরাণ পোড়ে ছাই, ছাই।
এখন কি করমু, কোথায় যাইমু
ঘরে চিতাল মিঠাই নাই।।

একতালে পিটুনির আঘাত করতে করতে ছাদ পেটা চলে। একঘেয়ে সুরে একক ও সমবেত ভাবে গান চলে। মূল গায়েন মাথায় ছাতা ধরে অন্যান্য কর্মীরা দোহাররূপে সেই পদের আবৃত্তি করে। রঙ্গরসের অবতারণায় একজন গান ধরে

পতিধন বিনে প্রাণ বাঁচেনা, যৈবন জ্বালায়।

মূল গায়েন গায় ঃ

গাঙের বসন্তকালে ভাইঙ্গে নামায় মাটি,
নারীর বসন্তের কালে, মুখের মুচকি হাসি।।

সমবেত কণ্ঠে গায় ঃ

আকাশেতে নাইরে চন্দ্র কি করে তারে তারায়
ও নারীর সোয়ামী নাইরে - কি করে তারে শোভায়।।

বীরভূম জেলার একটি ছাদ পেটার গান ঃ

(১)

'দালান দিলি মহল দিলি
বাড়ির নীচে পুষ্করিনী
একখানা পানসি দিতে পারনি।
বাঁধা জল কাঁচা পানি সুনহে মিস্তিরী
একটু লবণ দিতে পারনি।।
চাল পেলাম ডাল পেলাম
না পেলাম জ্বালানী

তরকারী সবই হ্ল
খাইনি শুক্তানি।।
ভাত হ'ল ডাল হ্ল
খেলাম না আমানি
দিঘীর ধারে বাগান হ'ল
না হ'ল মালিনী।।
বড় বড় বাবু আছে দুনিয়া ভিতর
এমন মালিক চক্ষে দেখিনি।। স্বঃ লি —১৯

(২)

আমি আর কিছু চাহে নাই বাবু
চাইছি কিছু টাকা।
টাকায় শত্রু টাকায় মিত্র
টাকায় দালান কোটা।।
ও গো টাকা যদি হতো মাটির টান
নয়ে যেতাম ঢাকা।
আবার টাকা পয়সা না থাকিলে
গিন্নী মারে ঝাঁটা।।
তুই লো আমার রস গোল্লা
মণ্ডা মিঠাই ছানা
শীতের কাঁথা তুই যে আমার
রৌদের মিছরী পানা।।
বর্ষাকালে তুই লো আমার
তালপাতার ঐ ছাতি
তোরে পাইলে ফর্সা হয় লো
ঘোর আনন্দের রাতি।।
ট্যাহা পয়সা দিয়া তোরে
কইর‍্যা ছিলাম বিয়া
গাঁইটের ট্যাহা দিয়া।।

পূর্ব্ব বঙ্গের একটি ছাদ পেটার গান ঃ

'চাঁদ বদনী তুই লো আমার
জীবন মরণ কাঠি
তোরে না দেখিলে পরে
মরি লো দম ফাটি।।
তালুক মুলুক তুই লো আমার
তুই লো ট্যাহার তোড়া
নামাবলী তুই লো আমার
তুইলো ভাঙা বেড়া।।

হাওড়া জেলার একটি ছাদ পেটার গানে শ্রমজীবী মানুষের আশা আকাঙ্খা, দুঃখ দুর্দশার কথা ফুটে ওঠে। গানটি হল ঃ-

'নুন আনতে পান্তা ফুরোয়, তপ্ত ভাতে ঘি
কপালে লেখেনি, করি বলো কি।।
পিটনী পেটা সার হল, জনম গেল পুড়ে
দেখিস কিরে কুঁড়ে, দেহ গেল হুড়ে।।
ছাদ পেটা দালান পেটা, পিঠেই পড়ে পিটনী
ঘরে নাই জ্বালানী, ভাতও রাঁধিনী।।
ভাত হল কড়ো কড়ো, ব্যঞ্জন হল বাসি
তবু উপবাসী, দেখে না পড়সী।।
সওয়া গণ্ডা পয়সা দিও, শুন ঠিকাদার
করো উপকার, হয়োনা ব্যাজার।।
চাল, ডাল, নূন কিনবো, তেল আনা আনা
লঙ্কা মেখে খানা, পড়বে পেটে দানা।।

কাছাড় জেলার ছাদপেটার গান (সিলেট অঞ্চলের) ঃ

তালই পালংখে ঘুমাইছে।
সুনা মাওঐ গো
তালই পালংখে ঘুমাইছে।।
ঘুম্ ঘুম্ করে তালই ঘুম্ নাই যে ছাড়ে
চোখ মেলিয়া চাও তালই মাওঐ যাইতা বনে,
সুনা মাওঐ গো.....।।
তালই বাইত বাজার মাওঐ এলাইনা কর
আইওনা গো সুনা মাওঐ সিপাই আহার ভর।
সুনা মাওঐ গো......।।
তালই যাইতা বাজার তাল ঘটিত নাই কড়ি
মাওঐর পরাণ মাঙ্গে বোয়াল মাছের মুড়ি।।
সুনা মাইওঁ গো......।।
বোয়াল মাছের মুড়ি খাইয়া গলাত লাগল কাঁটা
তালই বেটায় মানস করলা জোড়া দুই পাঁঠা।
সুনা মাওঐ গো.....।। **স্বঃ লি —২০**

পটের গান ঃ (মৈমনসিংহের গান)

'হরি বিনে বৃন্দাবনে আর কি ব্রজের শোভা আছে.
জলে কৃষ্ণ স্থলে কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহীমণ্ডলে'।।

অথবা ঃ 'নম মহেশ্বর দিগম্বর ঈশান শঙ্কর
শিব শম্ভু শূলপাণি হর দিগম্বর'।।

কি বা ঃ'চূড়া দিল ধড়া দিল পাঁচুনি দিল তাতে
গোধন চরাতে যাবেন দাদা বলরামের সাথে'।।

এবং ঃ "বড়াই বলে কাজ নাই কানাইয়া
কৃষ্ণ তোমার ভাঙ্গা লা
ডরাইছে গোপের নারী কপালে মারে ঘা"।।

নৌকা বাইচ বা সারি গান ঃ

'বাদাম উড়াইয়া দাও ওরে মাঝি ভাই
এইবার পাড়ি দাও করি কি উপায় হায়।
ঢেউ-য়ের তালে নৌকা চলে আইল পুবাল বাও
সুজন মাঝি আমার বন্ধু বাদাম সামলাও।।
নৌকা চলে ছলাৎ ছলাৎ পানি ওঠে ফলাৎ ফলাৎ
তেমন কইরা উড়াও বন্ধু পরাণ বাঁচাই ভাই।।

পাট কাটার গান ঃ

'পুবের থনে আইল বাতাস নদী অইল তল
দ্যাশ পিরথিমি সাগর ভাইসা চড়ায় নামল জল।। (জোনা বাইরে)
কাঁদি বাগি সঙ্গে লইয়া পাট কাটিতে চল। (")
পুবের থনে বইছে বাতাস নামছে ম্যাঘের ঢল।
এক নিমেষে দুইনা জাহান করব বুঝি তল।। (জোনা বাইরে)
ঝড় বাদলে দিনমজুরী দিব ট্যাহা ট্যাহা।
শিগ্‌রি কইর‍্যা বাইরাওরে ভাই চালাও বিষম ঠ্যাহা।। (")
বিহান বিকাল দিব খাওন পাবদা বোয়াল কই।
তাহার লগে পাইবা আরও হাটের সরস দই।। (জোনা বাইরে)
কাঁচি বাগি সঙ্গে লইয়া পাট কাটিতে চল'।।

বাংলার বিপুল লোকসঙ্গীত সংগ্রহের মধ্যে পাট কাটার গান অন্তর্ভুক্ত। এ গানের মধ্যে রস বা বৈচিত্র্য খুঁজে পাওয়া যায় না। আধুনিক রচনাও হতে পারে. এটা অস্বাভাবিক কিছু নয়; এমন একটি পাট কাটার গান রাজসাহী জেলা থেকে সংগ্রহ। এখানে, উদ্ধৃত করা হল। (বাংলার লোকসঙ্গীত ঃ সুরেন্দ্র নাথ চক্রবর্তী)

পূর্ববঙ্গের চাষীরা ক্ষেতে নিড়ি দিতে দিতে একসঙ্গে গায়। এই কর্মকেন্দ্রিক গানটিতে ভাটিয়ালী সুরের প্রভাব আধিক্য ঃ গানটি —

মহারাজ নন্দকুমার রে
তোর রাজ্যপাট জমিদারী কারে দিলি রে —
নন্দকুমার রায় ছিল, বাঙলার অধিকারী
হেস্টিংস সাহেব আইল, জান কারিবারকারীরে।।
নন্দকুমারের মায় কান্দে গাঙ্গের পানে চেয়ে
আর না আসিবে বাছা জোড়া ডিঙ্গি বেয়ে।

উত্তর বঙ্গের চাষীরাও ক্ষেত নিড়ি দিতে দিতে গান গায়। এদের গানের সুরে ভাওয়াইয়ার ছোঁয়া আছে। গানটি —

কোরা রে হায় হায়
কেন কান্দেন কোরা আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে রে

কোরায় কান্দে ডুব ঃ ডুবঃ রে
মোর নারীর ভাঙ্গে বুক রে।

ভুঁই নিড়ানোর গান ঃ (জমি চাষ করতে করতে বা ভুঁই নিড়াতে নিড়াতে কৃষাণ কৃষাণী গান করে।)

'আয় লো ত'রা ভুঁই নিড়াইতে যাই
ভুঁই মাগো মাতা-পিতা ভুঁই মোর গো পুত
ভুঁই-র দৌলতে মোদের আশী কোঠা সুখ।
এই, পৌষ মাসে দিলাম পূজা বাস্তু দেবতার পায়
মাঘ মাসে বসুমতীর চরণ ছোঁয়ায়।
ফাগুন মাসে দিলাম লাঙ্গল চৈত্রমাসে বীজ
বৈশাখেতে দিক চিহ্নী জ্যৈষ্ঠে ধানের শীষ।
আষাঢ় মাসে সোণার ধান সোণার ফসল ফলে
ছেরাবনে আইস ধান, গেরহস্তেতে তোলে
ভাদ্র গেল আশ্বিন আইল কার্ত্তিক দেয় সাড়া
অঘ্রাণেতে ক্ষেতের পরে দেখরে আমন ছড়া
আমন ওঠে ঘরে ঘরে দুঃখ কিছু নাই
আইস এবার যাবার বেলা চরণ বন্দি তাই।
ওগো সপ্তভিঙ্গা মধুকরে যত ধান্য ধরে
এবার যেন সোনার ধানে আমার গোলা ভরে।। স্বঃ লি —২১

ধান কোটার গান ঃ

নব ঢেঁকিয়ারে সামলে কুটো ধান কুটো ধান
ঢেঁকিয়ায় বলে আমি নারদের নাতি
অষ্টাঙ্গ থাকিতে মোর ল্যাজে মারে লাথি।।
আকশোলাটায় বলে আমি এক রত্তি কাঠ
আমি না থাকিলে ঢেঁকি চিৎপটাং কাত্।।
চুসলিটায় বলে আমার লোহায় বাঁধা মুখ
আমার এঁটো খেয়ে যত চাঁদ পানা মুখ।।
পায়া দুটো বলেরে ভাই আমরা দুটি ভাই
নব ঢেঁকি ধান ভানে আমরা গীত গাই।।
ঝাঁটাটায় বলে আমার কোমরে বাঁধা দড়ি।
নব ঢেঁকি ধান ভানে ঝাঁটায় জড় করি।।
কুলাটায় বলে আমি বাঁশের পাতুলি
নব ঢেঁকি ধান ভানে লিকায় আর পাছুড়ি।। স্বঃ লি —২২

তাঁত বোনার গান ঃ

পূর্ববঙ্গে মুসলমান তাঁতিদের কাপড় বুনতে বুনতে একঘেয়েমী কাটানোর জন্যে ব্যঙ্গ গীতি গাইতে শোনা যায়। এরা কিন্তু নামেই মুসলমান, আচার ব্যবহার হিন্দু ঘেঁষা। তাঁত বুনতে বুনতে তারা এই গানটি গায় ঃ-

মরি হায়রে আল্লা হায়।
আমি কি করিব কোথায় যাব না দেখি উপায়।
কলিকাতা আইসা আমি ঠেকলাম বিষম দায়।
আমি পেরথমে বন্দনা করি, শিক্ষা গুরুর পায়
ঐ, যে গুরুতে হাতে ধরে সিখায় ডাইনে বায়।
দেখেন অন্য দফায় যেমন তেমন, এই দফায় জোম
ঠেইলা নিব এই ভাবে, শনি, রবি, সোম।
হারে, তালিমে বলে ত' মুন্সী চল হাটে যাই
সোলার নৌকার পাখাঁয় উইঠা পরীক্ষা চালাই।
সেবিচ আগুনে না যায় পোড়া, গাইতে না যায় তাল
এমন চীজ দিয়াছে আমায় মুন্সী জোড়া তাল।
এই সোমবারের মধ্যে বাহাত্তর হাজার
নুড়ী বন্দী করলাম এবার তিন শত আট জোড়া।
হয় অযুতের মাঝা মারি হাস্তরে হায়
আছে মা'র চাইর,, বাপের তিন, গুরুর দ্বাদশ
এই আঠার মোকামের খবর, যে জানে মানুষ
মানিবে কেন্ দেবতা মাঝে
মরি হায়রে আল্লা হায়।
আছে সুদ খোর, হারাম খোর, খুনিয়ার জোদ্দার
এই চার মা দিয়া দিলেন দোকানের খুটা।
মুসলমান হইয়া যে বা কেতাব নিন্দা করে,
রাতি হইলে শিয়াল হইয়া হক্কা, হুয়া করে।
আবার আল্লা বান্দা, বাড়ীর বান্দা যে যেখানে থাক,
এমন দিন গেল বিরথা কামে, আল্লা আল্লা বল!
মরি হায়রে আল্লা হায়।

পাল্কী বাওয়ার গান ঃ

নব বিবাহিত দম্পতিকে নিয়ে পাল্কীওয়ালারা ছোটে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। তখনকার যুগে পাল্কী বা নৌকাই ছিল প্রধান যাতায়াতের বাহন। পাল্কীওয়ালারা পরিশ্রম লাঘব করার জন্যে যে সুরে ও ছন্দে কথা বলে তা হল - 'লুলুনারে লুলু না' - আল্লা হা বল। জোরে হে চল। ইনাম মিলবো দুই টাকা। লয়েহে বল। সামনে আছে কালাই খেত কালো না কাটো। পায়ের তলে মান্দার কাঁটা দেইখ্যা হাঁটো।' এখানে দুটি সুর বর্তমান। মানুষের জীবনে অগ্রগতির সঙ্গে জটিলতা যত বাড়ে তাকে প্রকাশ করতে বেশি সুরের কখনো দুই, কখনো তিন বা কখনো চার স্বরের প্রয়োজন হয়।

চিঁড়া কোটার গান ঃ

চিঁড়া কুটি চিঁড়া কুটি বউল গাছের তলেতে,
ও দিদি, কুটুম্ আইস্যাছে বাড়িতে।।
আগ দুয়ারে কুটুম্ আইস্যা পানের বাটা চায়

পিছ্ দুয়ারে বড় বইনে ঘোমটা দেয় মাথায় গো
ও দিদি, কুটুম্ আইস্যাছে বাড়ীতে।।
বড় বইনে চিঁড়া কুটে মাইঝম্ বইনে ঝাড়েরে
ছোট বইনে লড়দা গেল দেইখ্যা আইল কারে রে
ও দিদি, কুটুম্ আইস্যাছে বাড়িতে।।
সন্ধ্যা বেলায় অতিথ্ আইল বসতে দিমু পিঁড়া
আর, জল পান করিতে দিমু শাইল ধানের চিঁড়া গো
ও দিদি, কুটুম্ আইস্যাছে বাড়িতে।। স্বঃ লি —২৩

সিলেট্ অঞ্চলের ধানভানার গান ঃ

বারা বানো মোহন মুরলী।
বৃন্দাবনে বানইন্ বারা রসের কামিনী।।
ঢেকিয়ে উঠিয়া কয়রে মুই বড় সুজন।
আমার উপর নাচইন করেন কামিনী সকল।।
কুলায় উঠিয়া কয়রে মোর বুক খোচ্।
আইতে ফেলাই যাইতে ফেলাই ঝাঁড়িয়া ফেলাই তুষ্।।
সিয়ায় উঠিয়া কয়রে মোর মুখ হাসী।
পঙ্কসিয়ায় বানইন্ বারা চাউল চিবাই আমি।।
চাইনে উঠিয়া কয়রে মোর মুখ চাক্।
ধান ভানার সময় আইলে শুনবায় আমার ডাক্।।
(বারা বানো > ধান ভানা। মুরলী > এক প্রকার ধানের নাম।
সিয়ায় > আঁকশলা। হামী > লোহার চাকা।)

চাপা কলের গান ঃ

ছুঁয়ো না কালা কালো হইবে আমার অঙ্গ
কালো হইবে আমার অঙ্গরে কালা
কালো হইবে আমার অঙ্গ।।
আমরা যে গোপনারী
গোকুলে বসতি করি
হেরি নাকো পুরুষের সঙ্গ।।
পথ ছাড়ো গৃহে যাই
গগনে আর বেলা নাই
ছিঃ ছি হরি একী কর কাণ্ড।।
সমবেত ঃ বাঙাল কাঁদেরে কাঁদে
একক ঃ মারি মারি ঠেলা দাদা না কর হেলা।।
আমার নাম ওই নেড়া বামুন
কোলা পাড়ায় ঘর
শিব পুজো ওই করতে গেলে
করে দণ্ডপাত।

একী হল দায় গো বাপু একী হল দায়
হরের লাঠি মেরে দিলে শংকরের মাথায়। বাঙাল
এটা এমন হতোচ্ছাড়া
বাবা তারকনাথকে দেখে বলে
বাটনা বাটার নোড়া - বাঙাল ....
চটকলের চিমনিকে বলে শ্যামের হাতের বাঁশি
আর কালী ঠাকুরকে দেখে বলে কাবলে ভুতের মাসী
এটা বাঁশ ঝাড়কে দেখে বলে পালং শাকের আঁটী
আর তালগাছকে দেখে বলে বোয়ের দাঁতন কাঠি। বাঙাল ....
পাঁপড় ভাজা দেখে বলে হাওয়া খাবার পাখা
আর জিলিপিকে দেখে বলে গোরুর গাড়ির চাকা। বাঙাল ....

(ঘটির প্রত্যুত্তরে বাঙাল গায়)

সমবেত ঃ ঘটি কাঁদেরে কাঁদে ....
একক ঃ তোমরা যেমন পচা পুকুর আমিও তেমন পানা
তুমি যেমন সিদ্ধের ঢেঁকি আমি বাবলার মনা।। ঘটি কাঁদে
তোমরা যেমন রোগা সন্যাসী আমিও তেমন গাজন
তোমরা যেমন ম্যালেরিয়া জ্বর আমিও তেমন পাচন ঘট.....
তোমরা যেমন ভাঙা নৌকা আমিও ছেঁড়া কাছি
যেদিকে লাগাবে টান সেদিকেতেই আছি।। ঘটি কাঁদেরে কাদে

হাত নাচানো পুতুলের গান

এইখানে আসিয়ে কানন
করিলে আসন
কাজ কম্মো রেখে দেখ
দুই কাননের নাচন
ভাল নাচবি কানন রসের বিনোদী।।
কি তরকারী রাঁধেন কানন
সব করেছে ঝোল
খেতে বসে দুই কাননে
লাগল গণ্ডগোল
ভাল নাচবি কানন.....
পান খেয়েছে পিচ ফেলেছে
ঠোঁট করেছে লাল
আপেল পাথর পরবে কানন
ভাদ্রমাসের তাল
ভাল নাচবি কানন ..... ।।
দুই সতীনের কত কথা
আনার কলি টিপ্ পরেছে
স্টেট বাসের চাকা
ভাল নাচবি কানন .....।।

উত্তরবঙ্গের ধান ভুকানিয়া গান

(১)

হেইসো হেইসো হেইসো
তিলের নাড়ু খাইসো।।
তিল হইল্ গটা
মোর হইল্ বেটা।।
তোর হইল নাতি
ধান ভুখা হাতী।।

(২)

ওই দিয়া যাবে নুটি
তোর চাউল হউক ক্ষুদি।।
ওই দিয়া যারে ভইষ্
মোর বারা হইস্।।
ওই দিয়া গেইল্ বল্দিয়া
মোর চাউল হল্দিয়া।।
ওই দিয়া যায় হাতী
তোর বারা হউক আতি।।
মোর ধান দিয়া যাউক নাড়া
চাউল যাউক মোর কাঁড়া।।

চরকার গান ঃ

সজনী, আরে এত রাইতে
চরকার ঘের ঘেরানি,
চরকা আমার লাতি পুতি
চরকা আমার হিয়া,
চরকার দৌলতে আমার
সাড়ে তিন গণ্ডা বিয়া। মেদিনীপুর স্বঃ লিঃ —২৬

মাছ্ ধরার গানঃ

প্যুষ মাইষ্যা শীতের কাল আতুরি বইলাম চেইয়া গ্রাম
করমখালির দক্ষিণদি বাছাই আইলাম বিহুনদি
জালাং বাজিল ইঢারে বাইল্যা
কোজল বোহাল রে।।
বেঁইল জাল ব্যাচাইলাম রাইক্যে
দেরী হইল খাইতে দাইতে
ধান চিবন্যা আস্তাচার হেই জাগাৎ মাছ্র ঘর
কত রইল কত ধাইলো রে
কত দিলাম ফাল।।
সোনা দিয়ার উত্তর বাঁকে ত্যাইলা কাইস্যা জগদী থাকে

আর থাকে বড় বড় ঝুড়ি, আর আছে মাছুর হুড়াহুড়ি,
মাছ করে টানাটানিরে ফাডি ফেলায় জাল।।
উজান ভাডি নুকা বাইয়া আইলাম রে বিদ্যাশি নাইয়া
লাল দিয়ার নায়ারে ঢেউ উডিলে বড় ডর,
হেই ডরেতে জাইগ্যা ভাইরে মাছুর টানাটানি।। **স্বঃ লিঃ —২৭**

ধান্য রোপন গীতি

প্রথম যেদিন মাঠে ধান বোনা হয় পাঁজি দেখে মহেন্দ্র ক্ষণ বুঝে। চাষী সকালে স্নান করে সিন্দুর, গুয়া (সুপারী) আমপাতা কোদাল ও ধান নিয়ে মাঠে যায়। জমির ঈশান কোনে বিশ ঘা কোদাল কুপিয়ে সার মিশিয়ে মাটী তৈরী কোরে। সিন্দুর গুলে গুয়া উপর দিয়ে ঈশান কোনে বসিয়ে প্রণাম কোরে ধান বুনে গান গায়।

তু তো মা বিনন্দ মাউসী ধান ফলাইবু বিশি বিশি (বেশী বেশী)
বুদ্ধি নাইমা তোর করিত (কাছে) তু তো আছু (আছিস্) মোর ঘর।
দয়া দেই বাঁচাই লবু মোর ছয়াকু কোল দুর
তো গোড়রে কটী মন সুর দোষ মোর নাম। **স্বঃ লিঃ —২৫**

মকরী গীতি

মাছ শিকার করার জন্য সমুদ্রে মাছ ধরতে যায় ধীবর বা জেলে। মাছ যেন বেশী ধরতে পারে তাই মকরী দেবীর পূজা করে পৌষ মাসের শেষ দিনে। যাকে মকর সংক্রান্তি বলে। মকরী দেবীর কাছে মানত করে বেশী মাছ ধরে যেন লাভবান হয়। তাই

মকরী গান ঃ

মকরী গো মকরী তোর পাদরে রহু মান।
মাছ যেহেন পড়ে মাগো অলড়িয়া (বেশী) জিন। (মতন)
থল নাই অথল (বেশী) জল তার সাথর (সঙ্গে) কর্ম মোর।
ছড়ি দেইচি তো গোড়রে (পা) ব্যবসা যিস্তি হয় ঘোর।।
শংকা, পাটিয়া ভাউরী, তাঁপড়ী চিংড়ী মট্‌কা ঢেকরা।
রুলী পামরা এই সুব মাছ পড়ে যিস্তি বুরা বুরা (বেশী)
তল নাই মা সাগর পাণী (জল) তাই জানি সবু দেনি
লা জাল মোর ভলই করি তোর পাদর দেনি। **স্বঃ লিঃ —২৪**



দশম পরিচ্ছেদ

লোকগীতিকা/লোকগাথা

মৈমনসিংহ গীতিকা ঃ

গীতিকা হলো মৌখিক সাহিত্য। পূর্ববঙ্গ বলে পরিচিত (বর্তমানে বাঙলা দেশ) অঞ্চলের সংগৃহীত সাহিত্য। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধানরূপে অধিষ্ঠিত হয়ে আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় কয়েকজনের ওপর নির্ভরশীল হয়ে এই মৌখিক সাহিত্য ভাণ্ডারকে অবলুপ্তি থেকে রক্ষার জন্য আগ্রহী হয়েছিলেন। সেজন্য তিনি চন্দ্রকুমার দে, আশুতোষ চৌধুরী, জসিমুদ্দিন প্রভৃতি ব্যক্তিদের সংগ্রাহকের কাজে নিযুক্ত করেন। তাদের সংগৃহীত বিষয়বস্তুর ওপর নির্ভরশীল হয়েই তিনি 'মৈমনসিংহ গীতিকা' ও 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'- তিনটি খণ্ড, সর্বসাকুল্যে গীতিকা বিষয়ে চারখণ্ড গ্রন্থ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। 'মৈমনসিংহ গীতিকা' কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য তালিকাভুক্ত হওয়ায় কিছু প্রচার লাভ করলেও, তিনখণ্ডে 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা' সহৃদয় পাঠক সমাজে তেমন আলোড়ন তুলতে পারেনি। তার প্রধান কারণ ছিল এই গীতিকা সমুহের ভাষা —যা সাধারণ পাঠকের কাছে ছিল বর্জনীয়।

এছাড়া গীতিকা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে একটা হৈ চৈ পড়ে যায়। অনেক লব্ধ প্রতিষ্ঠ সমালোচক ও বাংলা ভাষায় গবেষণা কাজে যুক্ত অনেকেই এ সব গ্রন্থের মৌলিকতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। সে সময়ে অনেকে অভিমত প্রকাশ করেন যে গীতিকা বা পালাগুলির অনেক স্থলেই মৌলিকতা সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করা হয় নি। সাধারণভাবে মৌখিক সাহিত্যের সংগ্রহ কাজে পাশ্চাত্য দেশে যে উন্নত প্রণালীতে সংগৃহীত বস্তু সমূহ লিপিবদ্ধ প্রক্রিয়ায় কাজ হয় এখানে তা গ্রহণ করতে পারা যায় নি। তবে আচার্য দীনেশ চন্দ্র সেন উপলব্ধি করেছিলেন যে এই মৌখিক সাহিত্য অচিরেই লুপ্ত হবে। তাই কাল বিলম্ব না করে তিনি সত্বর এই কাজে হাত দেন এবং এই কাজে চন্দ্রকুমার দে ও আশুতোষ চৌধুরী যেভাবে তাঁকে সহযোগিতা করেন তা সত্যই প্রশংসনীয়। বাংলা সাহিত্যের মৌখিক সাহিত্য ভাণ্ডার যে এরূপ ঐশ্বর্যশালী ছিল তা রক্ষা করা যেত না তিনি সচেষ্ট ও সঠিক পদক্ষেপ না নিলে।

এ বিষয়ে লব্ধ প্রতিষ্ঠ সঙ্গীতশিল্পী হেমাঙ্গ বিশ্বাস তাঁর 'লোকসঙ্গীত ও সমীক্ষা ঃ বাংলা ও আসাম' গ্রন্থে বত্রিশ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন - "ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন শোষিত শ্রেণীর দৃষ্টিকোণ থেকে অনাবিষ্কৃত জনসমুদ্রের সন্ধান আমাদের দিলেন। তিনি তাঁর সাহিত্যিক গভীরতায় ডুব দিয়ে আমাদের জন্য মুক্তভরা অনেক ঝিনুকের সন্ধান দিলেন। কিন্তু তিনিও সাঙ্গীতিক দিক দিয়ে যেতে পারলেন না। তিনি সঙ্গীতবিদ ছিলেন না এবং সে সময় টেপরেকর্ডারও ছিল না সত্য, কিন্তু তবু তিনি ময়মনসিংহ-গীতিকা ও অন্যান্য পূর্ববঙ্গ গীতিকা কী সুরে গাওয়া হতো তার অতি সামান্য নমুনাও যদি রেকর্ড করিয়ে যেতে পারতেন তবে আমাদের কাজ অনেক এগিয়ে থাকতো।"

এ বিষয়ে তিনি আরও বলেছেন — বাদ্যার গান বা বাদ্যার সুরের সঙ্গে আমরা

পরিচিত। জলের ঘাটে মহুয়া ও নদের চাঁদ ঠাকুরের কথোপকথনের যে সুর গ্রাম্য গায়কের কাছে শুনেছিলেন তখন জানতেন না এ অংশটি মৈমনসিংহ গীতিকার অন্তর্গত। তবে আচার্য দীনেশচন্দ্র সম্পাদিত গ্রন্থে এই অংশটি নেই। যেমন

মহুয়া ঃ পুরুষ বেঙের জাতি ফালে ফালাও পাও
সাপের মাথায় মণি দেইখ্যা হাত বাড়াইতায় চাও।
নদের চাঁদ ঠাকুর ঃ সাপও মারবাম। সাপিনী মারবাম মণি লইবাম হাতে
যমের হাতো প্রাণটি থৈয়া প্রেম করবাম তোর সাথে।

এ সম্পর্কে তার উক্তি লক্ষণীয়। — "ভাটিয়ালীর প্রভাবে আচ্ছন্ন পূর্ববঙ্গের লোকসঙ্গীতের ধারার মধ্যে এই সুরটি এক মৌলিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে ভ্রাম্যমান বেদে জাতিরই যেন সাক্ষ্য বহন করছে। এই সুরের ধারা অনুধাবন করে অগ্রসর হলে দুসান, জ্বাভিতেল প্রমুখ পণ্ডিতদের কাজ অনেক সহজ হয়ে যেতো।"

মৈমনসিংহ গীতিকা ও পূর্ববঙ্গ গীতিকা ঃ

পূর্ব - মৈমন সিংহের সাধারণ জনসমাজ কয়েকটি প্রবল আর্যেতর জাতি দ্বারা গঠিত। এর মধ্যে প্রধান হ'ল কোচ। এরা Indo Mongoloid জাতির অন্যতম। এছাড়া বোরো জাতি থেকে উদ্ভূত — অন্যান্য শাখা গারো, হাজং ও রাজবংশী। এরাও কোচ শাখার মতই এই অঞ্চলের সাধারণ মানব সমাজ গঠনে সহায়তা করেছে। বোরো জাতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল, এরা মাতৃতান্ত্রিক জাতি। এখনও অন্যান্য শাখায় গারো ও খাসি জাতি ভারতের মধ্যে প্রবলতম মাতৃতান্ত্রিক সম্প্রদায়। গারো জাতিরই বাংলা ভাষা-ভাষীরা মৈমনসিংহ জেলার সমতল ভূমির অধিবাসী — হাজং নামে পরিচিত। হাজংদের বাসভূমিই হ'লো মৈমনসিংহ গীতিকার উৎস। এখান থেকে শুরু হয়ে দক্ষিণ দিকে মেঘনা নদীর তীর পর্যন্ত বিস্তৃত।

মৈমনসিংহ পূর্ববঙ্গের একটি অঞ্চল। এই অঞ্চলের লোকসঙ্গীত তথা লোকগাথাই হ'ল 'মৈমনসিংহ গীতিকা'। পল্লী মানুষের সুখ, দুঃখ, হাসি, কান্না, ব্যথা-বেদনার কথাই এই গীতিকাগুলির মধ্য দিয়ে প্রকাশ হয়েছে এবং এই অঞ্চলের লোককবিরা আঞ্চলিক ভাষার কাব্য রচনায় প্রসিদ্ধ হয়েছে। লোকগীতিকাগুলির (লোকগাথা) উল্লেখযোগ্য - মহুয়া, মলুয়া, কঙ্ক ও লীলা, চন্দ্রাবতী ও জয়চন্দ্র, রূপবতী ইত্যাদি। এর মধ্যে 'মহুয়া' পালাগানটি প্রেমের উন্মেষ আর প্রেমের জন্য আত্মত্যাগের এক উজ্জ্বল নিদর্শন রূপে বহুল প্রচলিত। পালার গানগুলি আঞ্চলিক সুরে অর্থাৎ ভাটিয়ালী সুরে প্রভাবিত হয়ে করুণ হয়ে সেখানে প্রাধান্য পেয়েছে।

পালা পাঠ

মৈমনসিংহের নেত্রকোনার চন্দ্রকুমার দে-র সংগৃহীত মৈমনসিংহ গীতিকার ২১ খানি পালার মধ্যে

১। 'মহুয়া' পালাকার ঃ দ্বিজ কানাই।
২। 'মলুয়া' পালাকার ঃ অজ্ঞাত। কেউ কেউ মনে করেন মহিলা কবি চন্দ্রাবতীর লেখা।
৩। 'চন্দ্রাবতী ও জয়চন্দ্র' ঃ পালাকার ঃ নয়ান চাঁদ ঘোষ।
৪। 'কমলা' পালাকার ঃ দ্বিজ ঈশান।
৫। 'কেনারাম' পালাকার ঃ চন্দ্রাবতী

৬। 'রূপবতী' পালাকার ঃ অজ্ঞাত।
৭। 'ঈশা খাঁ দেওয়ান' পালাকার ঃ অজ্ঞাত।
৮। 'ফিরোজ খাঁ দেওয়ান' পালাকার ঃ অজ্ঞাত।
৯। 'মনহর খাঁ দেওয়ান' পালাকার ঃ অজ্ঞাত।
১০ 'দেওয়ান ভাবনা' পালাকার ঃ কেউ কেউ মনে করেন পালাটি চন্দ্রাবতীর লেখা।
১১ 'ছুরত জামাল ও অধুয়া সুন্দরী' ঃ পালাকার ঃ অন্ধকবি ফকির ফৈজু।
১২ 'জিরালনী' ঃ পালাকার ঃ অজ্ঞাত।
১৩ 'কাজল রেখা' পালাকার ঃ অজ্ঞাত।
১৪ 'অসমা' পালাকার ঃ অজ্ঞাত।
১৫ 'ভেলয়া সুন্দরী' পালাকার ঃ অজ্ঞাত
১৬ 'কঙ্ক ও লীলা' পালাকার ঃ রঘুসুত, দামোদর, শ্রীনাথ বানিয়া ও নয়ান চাঁদ ঘোষ।
১৭ 'মদন কুমার ও মধুমালা' ঃ পালাকার ঃ অজ্ঞাত।
১৮ 'গোপিনী-কীর্ত্তন' ঃ পালাকার ঃ স্ত্রীকবি সুলা গাইন।
১৯ 'দেওয়ান মদিনা' ঃ পালাকার ঃ মনসুর বয়াতি।
২০ ন্দির পালাকার ঃ কবি কঙ্ক।
'রামায়ণ' ঃ পালাকার ঃ কবি বংশীদাস কন্যা চন্দ্রাবতী।

এতো গেল মৈমনসিংহ গীতিকার বিশাল পালা সম্ভারের মধ্যে চন্দ্রকুমার দে সংগৃহীত ২১ খানি পালার নাম ও রচয়িতার পরিচয়।

হয়ত এখনো বহু পালা অজ্ঞাতই রয়ে গেল গ্রাম্য পালা গায়কদের স্মৃতির অতলে এই সীমিত সম্ভারের বাইরে।

কিছু কিছু পালার ঘটনাক্রম বা পালাপর্বের আখ্যানে খুঁজে নিতে হবে মৈমনসিংহ গীতিকার কাব্য সম্ভারের রস।

মৈমনসিংহ গীতিকা
মহুয়া

মৈমনসিংহ গীতিকার 'মহুয়া' পালাটি দ্বিজ কানাই-এর লেখা।

মর্মস্পর্শী এই প্রেমাখ্যানটির কাহিনী বা গল্প হ'ল এই রকম ঃ

গারো পাহাড়ে বাস করতো একদল বেদে। তাদের সর্দার হ'ল হুমরো বা হুমরা। হুমরো সর্দার তার দলবল নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে একদিন এসে পৌঁছোলো ধনু নদীর তীরে কাঞ্চনপুর গ্রামে। সেখানে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের ছ'মাসের ফুট্‌ফুটে মেয়েকে হুমরো সর্দার চুরি করে পালিয়ে গেল। মেয়েটিকে হুমরো সর্দার নিজের মেয়ের মত করে মানুষ করতে লাগল। তার নাম দিলো 'মহুয়া'। সে এখন ষোল বছরের কিশোরী। যৌবনের ঢল নেমেছে তার সর্বাঙ্গে। বেদের দলের সঙ্গে সেও ঘুরে বেড়ায়, খেলা দেখায়, গান গায়। এমনি করে ঘুরতে ঘুরতে ভ্রাম্যমান বেদের দল একদিন এসে আস্তানা গাড়লো বামনকান্দা গ্রামে। সে গ্রামের তালুকদার ব্রাহ্মণ যুবক নদের চাঁদ, বেদেদের খেলা দেখতে দেখতে এক সময় মহুয়ার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই তার রূপে মুগ্ধ হ'ল। পরে জমি দিয়ে গ্রামেই তাদের বসতি করে দিল।

এরপর জলের ঘাটে নদের চাঁদ আর মহুয়ার দেখা ঘনঘন হতে লাগল। একদিন নদের চাঁদ সমস্ত দ্বিধা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে মহুয়াকে সরাসরি প্রেম নিবেদন করলো। তাতে মহুয়া কপট রাগ দেখালো। তার মনের প্রেম পাখীটা যেন নদের চাঁদের মনের প্রেম পাখীটার সঙ্গে কথা কয়ে উঠলো। মুহূর্তেই দুটি নর-নারীর হৃদয় এক হয়ে গেল — প্রেমে। দুটি হৃদয়ের কাছে গোপন রইল না মনের গোপন কথাটি।

মহুয়া তার প্রাণসখী পালঙকেও বলল তার প্রেমের কথা। একদিন হুমরো সর্দারের কানেও উঠলো সে কথা। হুমরো মাইনকিয়া বেদের সঙ্গে পরামর্শ করে চলে যেতে চাইল ভিন দেশে। মহুয়া, সে কথা জানাল নদেরচাঁদকে। সব শুনে নদেরচাঁদও সব ছেড়ে মহুয়ার সঙ্গেযেতে চাইলো। মহুয়া তার অন্তরের বেদনার কথা জানিয়ে অনেক মিনতি করে নদেরচাঁদকে নিবৃত্ত করলো।

তারপর একদিন উধাও হয়ে গেল বেদের দল মহুয়াদের চলে যাওয়ার খবর পেয়ে নদের চাঁদ বিমর্ষ হয়ে গেল। একদিন নদেরচাঁদও বেরিয়ে পড়ল তার প্রাণপ্রিয়া মহুয়া সুন্দরীকে খুঁজে পাওয়ার আশায়। ঘুরতে ঘুরতে একদিন কংসাই নদীর ধারে মহুয়ার দেখা পেল সে। অনেকদিন পর মহুয়া তার প্রাণপ্রিয়কে পেয়ে আনন্দে উচ্ছল হয়ে উঠলো। নদেরচাঁদের যথোপযুক্ত সেবা করল।

সেদিন রাতে মহুয়ার বাবা হুমরো সর্দার নিদ্রিত মহুয়াকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তার হাতে বিষ-ছুরি তুলে দিয়ে নদেরচাঁদকে বধ করতে বলল। কিন্তু মহুয়া সে আদেশ না মেনে, নদেবচাঁদকে সবকথা খুলে বলল এবং বেদেদের সকলের অগোচরে দুই প্রেমিক যুগল ঘোড়ায় চেপে পালিয়ে গেল।

ঘোড়ায় চড়ে যেতে যেতে পাহাড়ে এক নদীর কাছে এসে তারা থমকে গেল। তারপর এক সাধুর (বণিকের) ডিঙ্গায় তারা চড়ল, নদী পার হওয়ার জন্য। এদিকে মহুয়ার রূপে লোভী হয়ে উঠল বণিক সাধু। মহুয়াকে পাবার জন্য বণিক পথের কাঁটা নদেরচাঁদকে ঠেলে জলে ফেলে দিল। তখন মহুয়া চীৎকার করতে লাগল পাগলের মত। সাধু মহুয়ার কাছে তার লালসা ব্যক্ত করল। মহুয়া তখন সাধুর সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করে, সাধু ও তার দলবলকে বিষ মেশানো পান সেজে খেতে দিল। তারপর পান খেয়ে সাধুরা সকলেই অচৈতন্য হয়ে পড়লে, মহুয়া ডিঙ্গার কাছি কেটে ফেলে, কুড়ুল দিয়ে ডিঙ্গার তলায় গর্ত করে দিয়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। দেখতে দেখতে সাধু তার অচৈতন্য দলবল সহ ডিঙ্গা নিয়ে জলের তলায় তলিয়ে গেল।

এরপর মহুয়া নদীর ধারে বন-জঙ্গলের মধ্যে নদের চাঁদকে খুঁজতে খুঁজতে একটা ভাঙ্গা মন্দিরের কাছে এসে নদের চাঁদকে মৃত অবস্থায় দেখতে পেয়ে পাগলিনীর মত কাঁদতে লাগল। তখন এক জটাজুটধারী সন্ন্যাসী এসে মন্দিরে ঢুকে মহুয়াকে বলল, বনের এক বিশেষ গাছের পাতা দিয়ে সে নদের চাঁদকে বাঁচিয়ে দেবে। সন্ন্যাসীর কৃপায় নদেরচাঁদ বাঁচল, কিন্তু তার দুর্বলতা কাটতে সময় নিল। ইতিমধ্যে মহুয়ার অন্য বিপদ দেখা দিল। সন্ন্যাসীও মহুয়ার রূপে মুগ্ধ হয়ে তার সঙ্গ কামনা করল। মহুয়া তখন ছলে সন্ন্যাসীকে ফাঁকি দিয়ে, অসুস্থ নদেরচাঁদকে কাঁধে নিয়ে পালিয়ে গেল।

ক্রমশঃ নদের চাঁদ মহুয়ার সেবা-যত্নে সুস্থ হয়ে উঠল। তারপর তারা দুজনে মহা

সুখে পরস্পরের সান্নিধ্যে, স্বেচ্ছায় বনে ঘুরে বেড়াতে লাগল। কিন্তু সুখ তাদের ভাগ্যে বেশিদিন সইল না। একদিন তারা দুজনে ঘুরে বেড়াচ্ছে, এমন সময় দুরের বাঁশির আওয়াজ শুনে মহুয়া চমকে উঠল। সে চেনে ওই বাঁশির আওয়াজ। বাঁশি বাজিয়ে তার প্রাণসখী পালঙ যেন তাকে সাবধান করে দিচ্ছে। তারপর মহুয়ার চোখে পড়ল বেদের দলের শিকারী কুকুর। ঠিক সেই মুহূর্তেই সেখানে হাজির হল হুমরো সর্দার ও বেদের দল। হুমরো আবার মহুয়ার হাতে বিষ ছুরি তুলে দিয়ে নদেরচাঁদকে হত্যা করতে বলল। মহুয়া সেই বিষ ছুরি নিয়ে নিজের বুকেই বিঁধিয়ে দিল। তখন হুমরোর আদেশে বেদেরা নদেরচাঁদকেও হত্যা করল।

এই বীভৎস হত্যা কাণ্ডে নিষ্ঠুর হুমরা সর্দারও অনুতপ্ত হল। পালিতা কন্যা মহুয়ার জন্য সেও বিলাপ করতে লাগল। তারপর হুমরো সর্দারের নির্দেশে মহুয়া ও নদের চাঁদকে সমাধিস্থ করা হল। বেদের দল এরপর সেখান থেকে চলে গেলেও মহুয়ার প্রাণসখী পালঙ গেল না। সে থেকে গেল সেখানেই। তার চোখের জলে মহুয়া নদের চাঁদের কবরের মাটি সিক্ত হয়ে প্রেমের অমলিন সাক্ষী হয়ে রইল কাব্যে যুগ যুগ ধরে।

এবার আসা যাক মহুয়ার পালাপর্বে —

বেদের দলের খেলা দেখতে দেখতে হুম্‌রা সর্দারের যুবতী সুন্দরী মেয়ে মহুয়াকে দেখেই মুগ্ধ হয়ে তার প্রেমে আকুল হয়েছে নায়ক নদের চাঁদ। বেদের দলের বসতি গড়ে দিয়েছে তার তালুকে। একদিন জলের ঘাটে মহুয়াকে দেখে নদ্যার চান্দ (ঠাকুর) গেয়ে ওঠে

(১)

নদ্যার ॥ ...... শুন শুন কইন্যা ওরে আমার কথা রাখ।
মনের কথা কইবাম আমি একটু কাছে থাক ॥
সইন্ধ্যা বেলায় চান্নি উঠে সুরুখ বইসে পাটে
হেন কালেতে একলা তুমি যাইও জলের ঘাটে ॥
সইন্ধ্যা বেলা জলের ঘাটে একলা যাইও তুমি।
ভরা কলসী কাক্কে তোমার তুল্যা দিয়াম আমি ॥ ....

তারপর নদ্যার ঠাকুরের কথা মত মহুয়া গেছে জলের ঘাটে, জল আনতে। ঠিক সন্ধ্যা বেলায়। মহুয়াকে দেখে নদেরচাঁদ কাছে এসে বলে —

নদ্যার ॥ .... জল ভর সুন্দরী কইন্যা জলে দিছ মন।
কাইল যে কইছিলাম কথা আছে নি স্মরণ ॥ ....

মহুয়া ॥ .... শুন শুন ভিন দেশী কুমার বলি তোমার ঠাঁই।
কাইল বা কি কইছিলা কথা আমার মনে নাই ॥ ......

এ যেন সেই বুক ফাটে তবু মুখ ফোটে না। নদেরচাঁদ সে কথা বুঝেই বলে—

নদ্যার ॥ .... জল ভর সুন্দরী কইন্যা জলে দিছ ঢেউ।
হাসি মুখে কওনা কথা সঙ্গে নাই মোর কেউ ॥ .... **স্বঃ লিঃ - ১৬**

মহুয়া - নদেরচাঁদ দুজনেই বোঝে দুজনের মনের কথা। প্রেমের দুর্নিবার টান কেউই উপেক্ষা করতে পারে না।

মহুয়া তার মনের গোপন কথাটি, ব্যথাটি অকপটে তার প্রণয়ী নদেরচাঁদের কাছে ব্যক্ত করে।

মহুয়া ॥ ..... নাহি আমার মাতা পিতা গর্ভ সুদর ভাই।
সুতের হেওলা অইয়া ভাইস্যা বেড়াই ॥
কপালে আছিল লিখন বাইদ্যার সঙ্গে ফিরি।
নিজের আগুনে আমি নিজে পুইর‍্যা মরি ॥
এই দেশে দরদী নাইরে কারে কইবাম কথা।
কোন জন বুঝিবে আমার পুরা মনের বেথা ॥ ....

দিন যায়, মহুয়ার চোখে রাতে ঘুম নেই। সে জেগে স্বপ্ন দেখে, তার আর নদের চাঁদের প্রেম পর্ব — টুকরো টুকরো ছবি। তার এ অবস্থা দেখে, সই পালঙ্ বুঝতে পারে তার মনের কথা, মনের অবস্থা। একদিন মহুয়া পালঙকে সব বলে। পালঙ অনেক করে বোঝায়। কিন্তু মহুয়া, নদেরচাঁদের প্রেমে এতটাই আকুল, যে সে কিছুই বুঝতে চায় না — তার ভাল, মন্দ — কিচ্ছু না। সে আবেগ রুদ্ধ কণ্ঠে সইকে বলে -

মহুয়া ॥ .... চন্দ্র সূর্য্য সাক্ষী সই সাক্ষী হইও তুমি।
নদ্যার ঠাকুর হইল আমার প্রাণের সোয়ামী ॥
বাইদ্যার সঙ্গে আমি যে সই যথায় তথায় যাই।
আমার মন বান্ধ্যা রাখে এমন স্থান আর নাই ॥
বন্ধুরে লইয়া আমি অইবাম দেশান্তরি।
বিশ খাইয়া মরবাম কিম্বা গলায় দিয়াম দড়ি ॥

তারপর হুমরা সর্দার ও বেদের দলের চোখ এড়িয়ে মহুয়া - নদেরচাঁদ পালিয়ে গিয়ে ঘর বাঁধে। ঘটনাক্রম এগিয়ে চলে বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতে। এক সময় উপস্থিত হয় চরম মুহূর্ত।

হুমরা সর্দার বিষমাখানো ছুরি মহুয়ার হাতে তুলে দিয়ে নদেরচাঁদকে হত্যা করতে আদেশ দেয়।

তখন বিষছুরি হাতে মহুয়া একবার প্রাণসখী পালং আর একবার প্রাণপতি নদ্যার ঠাকুরের দিকে করুণ চোখে চেয়ে বলে —

মহুয়া ॥ .... শুন শুন প্রাণপতি বলি যে তোমারে।
জন্মের মতন বিদায় দেও এই মহুয়ারে ॥
শুন শুন পালং সই শুন বলি কথা।
কিঞ্চিৎ বুঝিবে তুমি আমার মনের বেথা ॥
শুন শুন মা ও বাপ বলি হে তোমায়।
কার বুকের ধন তোমরা আইনাছিলা হায় ॥
ছুট কালে মা বাপের কুল শূন্য করি।
কার কুলের ধন তোমরা কইরে ছিলে চুরি ॥
জন্মিয়া না দেখলাম কভু বাপ আর মায়।
না দোষে এত দিনে প্রাণ মোর যায় ॥ ......

কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই মহুয়া বিষমাখা ছুরি বসিয়ে দেয় নিজের বুকে। ফলে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে মহুয়া সুন্দরী।

প্রেমের জন্য মহুয়ার এ আত্মত্যাগ চিরস্মরণীয় হয়ে আছে মৈমনসিংহ গীতিকার মহুয়া পালায়।

এবার একটু আসা যাক অন্য প্রসঙ্গে —শ্রদ্ধেয় লোকশিল্পী হেমাঙ্গ বিশ্বাস তাঁর 'লোকসঙ্গীত সমীক্ষা' গ্রন্থের ৩২ পৃঃ মহুয়া পালা প্রসঙ্গে বলেছেন — 'জলের ঘাটে মহুয়া ও নদের চাঁদ ঠাকুরের কথোপকথনকে অবলম্বন করে এই সুরটি যখন গ্রাম্য গায়কের কাছে শুনেছিলাম, তখন জানতাম না এটা মৈমনসিংহ গীতিকার অন্তর্গত মহুয়া গীতিকার একটি অংশ। কিন্তু যে কলিগুলি প্রথমে শিখেছিলাম, তার কয়েকটি কলি ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেনের প্রেরণায় চন্দ্রকুমার দে-র সংগৃহীত গীতিকাটিতে নেই। যেমন -

মহুয়া ॥ .... পুরুষ বেঙের জাতি ফালে ফলাও পাও
সাপের মাথার মণি দেইখ্যা হাত বাড়াইতায় চাও ॥

এর উত্তরে নদেরচাঁদ বলে —

নদ্যার ঠাকুর ॥ সাপও মারলাম সাপিনী মারলাম
মণি লইবাম হাতে।
যমের হাতো প্রাণটি থৈয়া
প্রেম করলাম তোর সাথে ॥

এ থেকেই বোঝা যায় মৈমনসিংহ গীতিকার অনেক বিষয়বস্তু ও গান আজও অগোচরেই রয়ে গেছে।

দেওয়ান ভাবনা

মৈমনসিংহ গীতিকার প্রখ্যাতা মহিলা কবি চন্দ্রাবতী রচিত অশ্রুসজল প্রেমাখ্যান 'দেওয়ান-ভাবনা' পালা'টির কেন্দ্রীয় চরিত্র সুনাই (সোনাই) এবং দেওয়ান ভাবনা কাজী।

এই গীতিকাটিকে অবলম্বন করে এক সময় রচিত হয়েছিল 'সোনাই দিঘি' যাত্রাপালা। এবং সে পালার দৌলতে অবিভক্ত বাংলার শহর থেকে প্রত্যন্ত গ্রামের আপামর সাধারণ মানুষ মৈমনসিংহ গীতিকার স্বাদ পেয়ে আপ্লুত হয়েছিল সুনাই (সোনাই) - মাধবের প্রেমের বিয়োগান্তক করুণ রসে। এক সময় গ্রামের যে কোন উৎসবে, পাল-পার্বণে বাজতো 'সোনাই দিঘি' পালার রেকর্ড। ফলে দেওয়ান ভাবনা'র পালা কাহিনীটি প্রায় সকলেরই জানা। এবার আসা যাক পালা পর্বে —

ছোটবেলাটা সুনাইয়ের বেশ সুখে কাটছিল। অভাব থাকলেও বাবা-মা সেটা কেউই বুঝতে দিতেন না সুনাইকে। দেখতে দেখতে সুনাই দশ বছরে পা দিল। তার রূপ-গুণের কথা গ্রাম ছাড়িয়ে পাশাপাশি গ্রামেও ছড়িয়ে পড়ল। ঠিক সে সময় তার বাবা আকালে মারা গেল। বিধবা মা, সুন্দরী মেয়েকে নিয়ে পড়ল অকূল পাথারে। পাশের গাঁ দীঘলাটীতে সুনাইয়ের মামা ভাডুক ঠাকুরের বাড়ি। সংসারে ভাডুক ঠাকুর আর তাঁর স্ত্রী, কোন সন্তানাদি নেই।

ইতিমধ্যে সুনাইয়ের বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে ভাডুক ঠাকুরের বাড়িতে ঘটকের আনাগোনা শুরু হয়েছে। কিন্তু মনোমত সম্বন্ধ না আসায় ঘটক আসে আর ফিরে যায়।

রোজকার মত সেদিনও সুনাই গেছে ঘাটে জল আনতে। হঠাৎ দীঘলাটীর জমিদারপুত্র মাধবের সঙ্গে সুনাইয়ের হ'ল চোখাচোখি।

সুনাই ॥ .... 'গাঙ্গের পারে কেওয়া পুষ্প গন্ধেতে ছাইল

মাধবের সঙ্গে সোনাই'র পরথম দেখা হইল ॥
কোথায় থাকে সুন্দর নাগররে কোথায় বাড়িঘর
মনের কথা কই বা কারে কে দেয় উত্তর ॥
চারি চক্ষু এক অইলরে পরাণ কাইড়া লইল
কোন্ দৈবে মনের মানু ঘরে আন্যা দেখাইল ॥ ....
.... কাজল হইলে রাখতাম বন্ধুরে নয়ান ভরিয়া
তোমার সঙ্গে যাইতাম বন্ধুরে দেশান্তরী হইয়া ॥

সোনাই - মাধব দুজনের মনেই এখন প্রেমের জোয়ার। কিন্তু মুখ ফুটে কেউই বলতে পারে না। একদিন মাধব চিঠি লিখে জানায় তার মনের গোপন কথা। সোনাই সে চিঠি পড়ে গোপনে, সকলের অলক্ষ্যে। একবার, দুবার, বারবার তবু যেন কিছু পড়া বাকি রয়ে যায়। —

মাধব ॥ .... 'পরথমে লেখ্যাছে পত্রেগো মাধব সুন্দর
দেখ্যাছি সুন্দরী কন্যা ঘরে একেশ্বর ॥
গাঙ্গের পাড়ে হিজল গাছলো চিরল চিরল পাতা
জলের ঘাটে যাইও কন্যা গো কইবাম মনের কথা ॥.....
..... তোমার লাগিয়া কন্যা হইলাম যে পাগলা
তুমি আমার মুখের মধু গলার পুষ্পমালা ॥
বাপের আছে ধন-দৌলত কন্যাগো লাখের জমিদারী
তোমারে দিয়াম কন্যাগো অগ্নিপাটের শাড়ি ॥
বাড়ির পাছে বান্ধা ঘাট আছে পুষ্করিণী
তুমি কন্যা জলে যাইতে গো সঙ্গে যাইবাম আমি ॥......
..... ধন দিবাম দৌলত দিবাম আর দিবাম পরাণ
খুশী মনে করলে কন্যা মোরে যৌবন দান ॥..........

আর বুঝি কেউ কারুর কাছেই গোপনতা ঢেকে রাখতে পারে না। সোনাই - মাধব দুজনেই জড়িয়ে যায় প্রেমের বিনসুতোর মালায়। মাধবের চিঠির উত্তর দেয় সোনাই।

সুনাই (সোনাই) ॥ .... 'তুমি যদি হইতেরে বন্ধু আসমানের চান
রাত্র নিশা চাইয়া থাকতাম খুলিয়া নয়ান ॥
তুমি যদি হইতেরে বন্ধু ঐ সে নদীর পানি
তোমারে চাহিয়া দিতাম তাপিত পরাণি ॥
একে ত অবলা নারী ঘরে বন্দী রই
দারুণ দুঃখের জ্বালা কেমনে রইয়া সই ॥

আর কোন অবগুণ্ঠন থাকে না। এখন সোনাই - মাধব দুজনেই যেন দুজনকে কাছে পাওয়ার জন্যে আকুল। এমন সময় নারী-লোলুপ -দেওয়ান ভাবনার কানে গিয়ে পৌঁছয় সোনাইয়ের রূপ যৌবনের কথা। সে যেন মাতাল হয়ে ওঠে —

.... 'বইয়া আছে দেওয়ানভাবনা বার বাংলার ঘরে
এমন সময় বাঘরা গিয়া জানাইল তারে ॥

পরগণা মহালে আছে পরম সুন্দরী
ভাটুক বামুনের কন্যা যেমন হুর পরী ॥

একদিন নৌকো করে যেতে যেতে জলের ঘাটে সোনাইকে দেখে দেওয়ান ভাবনার লোলুপ দৃষ্টি যেন শার্দুলের মত জ্বলে ওঠে। এরপর সোনাইকে পাওয়ার জন্যে দেওয়ান ভাবনা পাগল হয়ে ওঠে। ভাবনা কাজীর কাছ থেকে দূত যায় নিকা প্রস্তাব নিয়ে সোনাইয়ের মামার কাছে।

সোনাইয়ের মামা ও মামী ষড়যন্ত্র করে আশ্রয় দানের সুযোগে ধন-দৌলতের লোভে ভাবনা কাজীর সঙ্গে সোনাইয়ের নিকা (বিয়া) দেবার উদ্যোগ নেয়। তখন সোনাই তার দূতীর মাধ্যমে মাধবকে সে খবর পাঠায়। দূতী ফিরে আসে। সোনাইয়ের মনের উৎকণ্ঠা কাটে না। সে জানে তার প্রাণবন্ধু মাধব নিশ্চয়ই আসবে তাকে এ বিপদ থেকে উদ্ধার করতে। সে জানে মাধব নিশ্চয়ই আসবে জলের ঘাটে।

..... 'এই না ভাবিয়া কন্যা যা থাকে কপালে
খাল্যা কলসী কন্যা তুলিল কাঁকালে ॥
আগে যায় সল্লা দূতী পাছেতে সোনাই
দৈবের নির্ব্বন্ধ কথা সভারে জানাই ॥
বান্ধা আছে পানসী নাও কেওয়া বনের ধারে
সোনাইরে ধরিয়া লইল দেওয়ান ভাবনা চরে ॥

কেওয়া বনের ধারে বাঁধা পানসীতে ভাবনা কাজীর লোকরা সোনাইকে জোর করে নিয়ে গিয়ে তোলে হাউলীতে। সেখান থেকে আর ফেরা হয় না সোনাইয়ের। তার কান্নায় আকাশ - বাতাস ভারী হয়ে ওঠে। কিন্তু ভাবনা কাজীর কবল থেকে তাকে উদ্ধারের জন্যে কেউ আসে না। পানসীর মধ্যে সোনাইয়ের শুধু কান্না শোনা যায়। সোনাইকে উদ্ধার করার জন্যে মাধব লোকজন নিয়ে নৌকা নিয়ে আসার সময় সে কান্না শুনে বলে ॥

মাধব ॥ 'কেবা যাওরে নদী দিয়া বাইয়া পানসী নাও
কার ঘরের যুবতী নারী ধইরা লইয়া যাও ॥
কিসের লাগ্যা কান্দ কন্যা পানসীতে বসিয়া
নৌকা হইতে মাধব তারে কয় ডাক দিয়া ॥
মাধবের ডাক যখন সুনাই শুনিল
ডাক ছাড়িয়া কন্যা তখন কান্দিতে লাগিল ॥
জলের উপর হইল রণ নিশির আমলে
কোথা রইল দাড়ী মাঝি পইরা মরে ,জলে ॥

তারপর ভাবনার কবল থেকে সোনাইকে উদ্ধার করে মাধব। ঘটা করে তাদের বিয়ের আয়োজনও হয়।

.... জল ভরে পুরনারী নদীর ঘাটে গিয়া
সুনাইর সঙ্গে হইল আইজ মাধবের বিয়া ॥...

ভাবনাকাজী এ অপমানের প্রতিশোধ নিতে সৈন্য পাঠিয়ে তুলে নিয়ে এলো মাধবের বাবাকে। বিয়ের আসনে বসে এ কথা শোনা মাত্র মাধব ছোটে ভাবনা কাজীর দেওয়ানিতে।

সেখানে ভাবনা মাধবকে পেয়ে ছেড়ে দেয় তার বাবাকে। এরপর মাধবের বাবা এসে সোনাইকে জানায় — শুধু তারই কারণে তার একমাত্র পুত্র আজ দেওয়ান ভাবনা কাজীর হাতে বন্দী। একমাত্র সেই-ই পারে তার একমাত্র পুত্রের জীবন রক্ষা করতে।

এসব শোনার পর কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় সোনাই হাজির হয় দেওয়ান ভাবনার কাছে। —

......'শুন শুন দেওয়ান ভাবনা কহি যে তোমারে
প্রাণের বন্ধু বন্দী কইরা রাখছ তোমার ঘরে ॥
আমি যে আইছিগো দেওয়ান এই যে তোমার ঘরে
এই কথা না জানাইও প্রাণের বন্ধুরে ॥......

.....'আমার বন্ধুরে আগে করিয়া খালাস
তবে যে মিটাইবাম আমি তোমার মনের আশ ॥....

সোনাইকে পেয়ে নারী লোলুপ ভাবনা কাজী মাধবকে ছেড়ে দেয়। অন্ধকার রাত্রিতে ভাবনার বার বাংলার ঘরে সোনাই বাইরে ভাবনার পাহারাদার। সেই আঁধার রাতে সোনাই তার মায়ের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানায়, পরে তার স্বামী মাধবের মুখ স্মরণ করে, তার অন্তরের সমস্ত ভক্তি উজার করে দেয় স্বামী মাধবের উদ্দেশ্যে। বারবার তার মন আচ্ছন্ন করে তার ছোটবেলা, যৌবন কালের কথা, স্বপ্ন, স্মৃতি। এক সময় সোনাই মন থেকে সবকিছু ঝেড়ে ফেলে নিজের নারীত্ব, সতীত্বের মর্যাদা রাখতে বেছে নেয় নারীত্ব রক্ষার, সতীত্ব রক্ষার অন্তিম পন্থা। এরপর —

.... 'নিশি রাইতে দেওয়ান ভাবনা আইল বাংলা ঘরে
আইসা দেখে পইড়া সুনাই পালঙ্ক উপরে ॥
বিষেতে অবশ অঙ্গ বদন হইল কালা
অঙ্গেতে হইয়াছে কন্যার গরলের জ্বালা ॥

ন। দেখলে অভাগী মাওরে আপন বন্ধুজনে
কোথায় রইল প্রাণের বন্ধু আইজ এই নিদানে ॥
কোথায় রইল শাউরী - কোথায় সল্লা দূতী
নিদান কালে কাছে নাই সে রইল প্রাণের পতি ॥
দুর্জন দুষমন ভাবনার আশা না পুরিল
প্রাণ - বন্ধুরে বাঁচাইতে সুনাই পরাণে মরিল ॥

প্রেমের মর্যাদা রক্ষার জন্য, স্বামীর জীবন ও সতীত্ব, নারীত্ব রক্ষার জন্য সোনাইয়ের এ আত্মত্যাগ মহিমান্বিত হয়ে আছে মৈমনসিংহ গীতিকা পালায়।

মলুয়া

মৈমনসিংহ গীতিকার 'মলুয়া' পালাটি সম্ভবত মহিলা কবি চন্দ্রাবতীর রচনা। আর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার পক্ষে যে কারণটি গ্রহণীয় সেটি হ'ল এই পালাটির 'বন্দনা' অংশের শেষ চরণটি উল্লেখ্য — সলাভ্য বন্দনা গীত গায় চন্দ্রাবতী।

অন্য কোন রচয়িতার সন্ধান না পাওয়া পর্যন্ত পালাটি কবি চন্দ্রাবতীর রচনা হিসাবেই

আমাদের গ্রহণ করতে হবে।

এবার আসা যাক পালার কাহিনী পর্বে।

এক সময় বন্যায়, দুর্ভিক্ষে চান্দ বিনোদ নামে এক যুবকের দেশ ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হ'ল। তখন চান্দ বিনোদের মা, তাকে মাঠে যেতে বলল। ঠিক এই পর্বটিতেই গ্রাম্য জীবনের দুঃখ দুর্দশার বারোমাস্যা বর্ণিত হয়েছে। চান্দ বিনোদ তখন তার মায়ের কাছে কুড়া পাখী শিকারে যাবার জন্যে অনুমতি চাইলো। উপবাসী সন্তানকে দেখে মায়ের মন ব্যথায় কেঁদে উঠলো।

তারপর মায়ের কাছে অনুমতি নিয়ে বিনোদ শিকারে গেলে, মা ঘরে উন্মাদিনীর মত দিন কাটাতে লাগলো। আর শিকারে বেরিয়ে, ঘুরতে ঘুরতে বিনোদ আড়ালিয়া গ্রামে এসে হাজির হল। শিকার করা কুড়াকে একটা পুকুরের পাড়ে রেখে, একটা কদম গাছের নীচে শুয়ে বিনোদ ঘুমিয়ে পড়ল। বেলা গড়িয়ে সন্ধ্যে হয়ে এলো। ঠিক সেই সময় মলুয়া নামে একটি মেয়ে পুকুরে জল নিতে এসে চান্দ বিনোদকে দেখে মুগ্ধ হ'ল। চার চোখের মিলনে দুটি যুবক-যুবতীর প্রেমিকহৃদয় বাঁধা পড়ল প্রেমডোরে।

বিনোদ তার দিদির কাছে মলুয়া আর তার প্রেমের কথা জানালো। বিনোদের দিদি তার মায়ের কাছে সব খুলে বলতে, মা তখন, মলুয়ার বাবার কাছে ঘটক পাঠালো। কিন্তু বিনোদরা গরীব বলে মলুয়ার বাবা তার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে রাজি হ'ল না। পরে বিনোদ কুড়া শিকারে গিয়ে ভাগ্যে অনেক টাকা রোজগার করে মলুয়াকে বিয়ে করল।

বিনোদ - মলুয়ার সংসার ও দম্পত্য জীবন উভয়ই বেশ সুখেই কাটছিল। একদিন দেশের কাজী হঠাৎ স্নানের ঘাটে মলুয়াকে দেখে মুগ্ধ হ'ল। তারপর মলুয়াকে পাওয়ার জন্যে কাজী ষড়যন্ত্র করে বিনোদের সব সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করল। মলুয়া তার গায়ের গহনা বিক্রি করে সংসার চালাতে লাগল। এই দুঃখ কষ্ট দেখে একদিন বিনোদ কাউকে কিছু না বলে রোজগারের চেষ্টায় বাইরে বেরিয়ে পড়ল। তখন বৃদ্ধা শ্বাশুড়িকে নিয়ে মলুয়ার দিন কাটতে লাগল অভাব অনটনের সঙ্গে পাঞ্জা ক'ষে। মলুয়ার মা সে খবর পেয়ে মেয়েকে নিয়ে আসার জন্য তার পাঁচ ভাইকে পাঠাল মলুয়ার বাড়ি। কিন্তু মলুয়া তার স্বামীর ভিটে, স্বামীর ঘর ছেড়ে কোথাও গেল না। কিছুকাল পরে বিনোদ অনেক টাকা রোজগার করে ঘরে ফিরলো। আবার সুখে দিন কাটতে লাগল দুজনের। এবার কাজী আবার চক্রান্ত করে বিনোদের ওপর পরোয়ানা জারী করল। কাজীর লোকরা এসে বিনোদকে ধরে নিয়ে গেল। মলুয়া তখন তার পোষা কুড়ার (পাখী) মারফৎ তার সব ভাইকে খবর পাঠালো। তারা বিনোদকে উদ্ধার করে বাড়ি এসে দেখলো কাজীর লোকরা মলুয়াকে ধরে নিয়ে গেছে। বিনোদ তখন বেদনাভারাক্রান্ত হৃদয়ে তার মা ও পোষা কুড়াকে নিয়ে ভিন দেশে চলে গেল।

এদিকে কাজী মলুয়াকে ভেট পাঠালো দেওয়ানের কাছে। দেওয়ান মলুয়াকে নিকা করতে চাইলে, মলুয়া তার কাছে ব্রত-প্রতিষ্ঠা করার জন্য তিন মাস সময় চাইল। তিন মাস পূর্ণ হলে দেওয়ান আবার মলুয়ার কাছে এল। মলুয়া তখন দেওয়ানকে বলে কাজীর প্রাণদণ্ডের হুকুম করাল। তারপর সে দেওয়ানকে বলল তাকে সঙ্গে নিয়ে নৌকা সাজিয়ে কুড়া শিকারে যেতে। মলুয়ার রূপে মুগ্ধ দেওয়ান তাই করল। নৌকায় করে কুড়া শিকারে বেড়িয়ে মলুয়া তার পোষা কুড়া মারফৎ তার পাঁচ ভাইকে খবর পাঠালো। খবর পেয়ে তার পাঁচ ভাই

পানসী নিয়ে তাকে দেওয়ানের কাছ থেকে উদ্ধার করে আনল। আবার মলুয়ার সঙ্গে তার স্বামীর পুনর্মিলন হ'ল।

কিন্তু মলুয়া তিন মাস মুসলমানের ঘরে ছিল বলে বিনোদের আত্মীয় স্বজনরা তাকে সমাজে নিতে আপত্তি করল। তখন আত্মীয় স্বজনদের পরামর্শে প্রায়শ্চিত্ত করে বিনোদ মলুয়াকে ত্যাগ করল। তখন মলুয়ার ভাইরা তাকে নিজেদের বাড়ি নিয়ে যেতে চাইলে, মলুয়া তার স্বামীর ভিটে ছেড়ে কোথাও যেতে রাজী হ'ল না। সে স্বামীর ঘরে ঝিয়ের (দাসী) কাজ করে পড়ে রইল। বিনোদ আবার বিয়ে করল।

একদিন বিনোদ কুড়া শিকারে বেরিয়েছে এমন সময় তাকে কামড়ালো এক কালসাপ। রাস্তার লোকেরা তার বাড়িতে সে খবর দিতে, বিনোদের বুড়ো মা কাঁদতে লাগল। মলুয়া তখন তার পাঁচ ভাইকে সঙ্গে করে স্বামীর দেহ নিয়ে নৌকায় করে গাড়রী ওঝার বাড়ি গেল।

ওঝা বিনোদের বিষ নামিয়ে তাকে বাঁচিয়ে তুলল। পুনর্জীবন নিয়ে বিনোদ ঘরে ফিরতে তখন সকলেই বলল মলুয়াকে স্ত্রী হিসাবে ঘরে স্থান দিতে। কিন্তু বিনোদের মামা, পিসে ও অন্য আত্মীয় স্বজনরা তীব্র আপত্তি জানাল। মলুয়া তখন দেখল সে বেঁচে থাকতে তার কলঙ্ক মোচন হবার সম্ভাবনা নেই। তখন স্থির করল প্রাণ বিসর্জন দেওয়ার। এরপর মলুয়া একটা ভাঙা নৌকায় উঠে বসল। নৌকাটি ভাসতে ভাসতে মাঝ দরিয়ায় গিয়ে ডোবার উপক্রম হতে, পাড়ে দাঁড়িয়ে বিনোদের মা, দিদি সকলেই মলুয়াকে ফিরে আসার জন্যে কাতর প্রার্থনা জানাতে লাগল। বিনোদও কাঁদতে লাগল। কিন্তু তাঁর মন এতটুকুও টলল না। সে গুরুজনদের প্রণাম ও অন্যদের প্রীতি জানিয়ে ভাঙা নৌকার সঙ্গে মাঝ দরিয়ায় তলিয়ে গেল।

প্রেমের জন্য মলুয়ার এ আত্ম বিসর্জনে ব্যথাতুর হয়ে উঠল আকাশ, বাতাস, নদীর উদ্দাম জল।

বন্দনাগানের অংশ বিশেষ উল্লেখ করা যাক।

'আদিতে বন্দনা গাই অনাদি ঈশ্বর।
দেবের মধ্যে বন্দনা গাই ভোলা মহেশ্বর ॥.....
তারপর বন্দিলাম শ্রীগুরু চরণ।
সবার চরণ বন্দিয়া জানাই নিবেদন ॥
চার কুনা পৃথিবী বন্দিয়া করিলাম ইতি।
সলাভ্য বন্দনা গীত গায় চন্দ্রাবতী ॥

পৌরাণিক পালার বন্দনাগীতের মতই, লোকজীবন থেকে উদ্ভূত পালাগানগুলিতেও পৌরাণিক দেব-দেবীর স্তুতি ব্যক্ত হয়েছে। পরে আখ্যানটির আরম্ভ।

.... ঘুমাইতে ঘুমাইতে বিনোদ অইল সন্ধ্যা বেলা।
ঘাটের পারে, নিদ্রা যাও কে তুমি একেলা ॥
সাত ভাইয়ের বইন মলুয়া জল ভরিতে আসে।
সন্ধ্যা বেলা নাগর শুইয়া একলা জলের ঘাটে ॥

কাঁখের কলসী ভূমিতে থইয়া মলুয়া সুন্দরী।
লামিল জলের ঘাটে অতি তরাতরি ॥
একবার লামে কন্যা আরবার যায়।
সুন্দর পুরুষ এক অদূরে ঘুমায় ॥

★

.....কোথা হইতে আইল নাগর কোথায় বাড়ি ঘর।
কুলের কুমারী আমি কেমনে পাই উত্তর ॥
'উঠ উঠ নাগর' কন্যা ডাকে মনে মনে।
কি জানি মনের ডাক সেও নাগর শুনে ॥.....

প্রথম দর্শনেই প্রেম। চাঁদ বিনোদকে প্রথম দেখেই মলুয়া প্রেমে পড়ে যায়। চাঁদ বিনোদকে এই অবেলায় কদম গাছ তলায় শুয়ে ঘুমোতে দেখে তার মন নানান চিন্তায় বিহ্বল হয়ে ওঠে। সন্ধ্যা বেলায় একা জলের ঘাটে এসে লজ্জায় সে না পারছে অচেনা অজানা যুবকের ঘুম ভাঙাতে, না পারছে ডাকতে, কথা বলতে। অথচ মন তার আকুল হয়ে উঠছে কথা বলার জন্যে। ঠিক এরকম মনের অবস্থায় মলুয়া আপন মনে গেয়ে ওঠে —

মলুয়া ॥ ..... কলসী লইয়া কন্যা জলে দিল ঢেউ
এই ঘুম ভাঙ্গিতে পারে সঙ্গে নাই মোর কেউ ॥
আইত যদি ভাইয়ের বউ সঙ্গেতে আমার
কোন মতে কাল ঘুম ভাঙ্গিতাম যে তার ॥
মাও যদি সঙ্গে আইত কি করিতাম তারে
মায়রে দিয়া কইয়া বুল্যা লইয়া যাইতাম ঘরে ॥...

এইসব ভাবতে ভাবতে মলুয়ার কথায় আঁর কলসীতে জল ভরার শব্দে চাঁদ বিনোদের ঘুম ভেঙ্গে যায়। ঘুম ভাঙ্গা চোখে মলুয়াকে দেখেই চাঁদ বিনোদ গেয়ে ওঠে —

চাঁদ বিনোদ ॥ .... এমন সুন্দর কন্যা না দেখি কখন
কার ঘরের উজ্জ্বল বাতি চুরি করল মন ॥
জাগিয়া দেখ্যাছি কিবা নিশির স্বপন
কার ঘরের সুন্দর নারী কার পরানের ধন ॥
জলের না পদ্ম ফুল শুকনায় ফুটে রইয়া
আসমানের তারা ফুটে মনেতে ভরিয়া ॥.....

বিনোদের দিকে একবার চাইতেই, চোখে চোখ পড়ে যায় আর লজ্জায় লাল হয়ে যায় মলুয়ার মুখ। ত্বরিতে মুখ ঘুরিয়ে নেয় মলুয়া। বিনোদ তা দেখে বলে —

বিনোদ ॥ .... শুন চন্দ্রমুখী কন্যা কহি যে তোমারে
একবার ফিরিয়ে চাও দেখি যে তোমারে ॥
কি ক্ষণে আইলাম আমি কুড়া না শীগারে
পরান রাখিয়া গেলাম এই না জলের ঘাটে ॥
একবার চাওলো কন্যা মুখ ফিরাইয়া
আর একবার দেখি আমি একলা ভুলিয়া ॥....

মলুয়াও চেপে রাখতে পারে না মনের কথা। সে বলে —

মলুয়া ॥ .... ভিন দেশী পুরুষ দেখি চান্দের মতন
লাজ রক্ত হইল কন্যার পরথম যৌবন ॥

তারপর ঘটনাক্রম এগিয়ে চলে। বিভিন্ন ঘটনার টানা-পোড়েনে মলুয়ার সঙ্গে চাঁন্দ বিনোদের বিয়ে হয়। বেশ সুখেই ওদের দিন কাটতে থাকে। কিন্তু সে সুখের ঘরে যেন হঠাৎ-ই বাজ পড়ে। কাজীর লোভী - নজর পড়ে মলুয়ার ওপর। সে ষড়যন্ত্র করে বিনোদ - মলুয়ার সুখের ঘর ভাঙ্গে। পরোয়ানা জারি করে কাজী বিনোদের বাড়ি, জমি দখল করে নেয়। কাজী পরোয়ানা ঘোষণা করে বলে

কাজী ॥ ..... আজি হইতে হপ্তা মধ্যে আমার বিচারে
নজর মরেবা তুমি দিবা দেওয়ানেরে ॥
নজর মরেবা যদি নাহি দেও তুমি
বাজেয়াপ্ত হইব তোমার যত বাড়ি - জমি ॥

এরপর বিনোদ-মলুয়ার দুঃখের দিন আর চোখে দেখার মত নয়। ওদের দুঃখ দুর্দশায় সকলেরই মন কেঁদে ওঠে। নিদারুণ কষ্টের মধ্যে মলুয়ার শুকনো , ভগ্ন চেহারা দেখে বিনোদ নিজেকে আর ঠিক রাখতে পারে না। একদিন কাউকে না জানিয়ে সকলের দৃষ্টির অগোচরে বাড়ি থেকে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। সেই অভাবের দিনে বেঁচে থাকার জন্যে মলুয়ার গায়ের গয়না সব একে একে বিক্রি হয়ে যায়। তবুও সে তার বড়লোক বাপের বাড়ি যায় না, স্বামীর ভিটেতে বুড়ো শ্বাশুড়ীকে নিয়ে কোন রকমে দিন গুজরান করে চলে। মলুয়ার দিন যাপনের চিত্রটি এরূপে ফুটে ওঠে —

মলুয়া ॥ ..... সূতা কাটে ধান ভানে শ্বাশুড়ীরে লইয়া
এই মতে দিন কাটে দুঃখ যে পাইয়া ॥
মাঘ ফাল্গুন গেল মলুয়ার ভাবিয়া চিন্তিয়া
চৈত্র-বৈশাখ গেল আশায় বাহিয়া ॥......
জ্যেষ্ঠ মাসে আম পাকে কাউয়ায় করে রাও
কোন বা দেশে আছে বন্ধু নাহি জানে তাও ॥....

ইতিমধ্যে বিনোদ আবার ফিরে এসেছে নিজের ঘরে। শত দুঃখের মধ্যেও মলুয়ার অন্তরে সুখ আর ধরে না।

মলুয়াকে না পেয়ে কাজী আবার ষড়যন্ত্রে নামে। একটি পেয়াদাও বরকন্দাজ পাঠিয়ে কাজী বিনোদকে গ্রেপ্তার করে বলে —

কাজী ॥ ..... হুকুম করিল কাজী পেয়াদা পশ্চানে
বিনোদেরে লইয়া যাও নিরলইক্ষার ময়দানে ॥
জেতায় রাখিয়া তারে কববরে মাটি দিও
তার ঘরের নারীরে কাড়িয়া আনিও ॥

মলুয়ার জীবনে আবার ঝড় ওঠে। কাজীর লোক বিনোদকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়। মলুয়ার খবর পেয়ে তার পাঁচ ভাই গিয়ে বিনোদকে ছাড়িয়ে আনে। কিন্তু এদিকে বাড়িতে মলুয়াকে একা পেয়ে কাজীর লোকরা মলুয়াকে জোর করে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যায়

দেওয়ানকে ভেট দেওয়ার জন্য। এদিকে বিনোদ বাড়ি ফিরে শোনে মলুয়াকে কাজীর লোকরা জোর করে তুলে নিয়ে গেছে। বিনোদ দুঃখে, হতাশায় ভেঙ্গে পড়ে।

এদিকে কাজী মলুয়াকে পাঠিয়ে দেয় দেওয়ানের হাউলীতে। মলুয়ার রূপে মুগ্ধ দেওয়ান, মলুয়াকে নিকা করতে চায়।

দেওয়ান মলুয়ার মন পাওয়ার জন্য বলে —

দেওয়ান ॥ ..... আমার মাথা খাও কন্যা আমার মাথা খাও
দুষ্মণি করিয়া আর মোরে না ভারাও ॥
.... দিল্লি হইতে আইনা দিবাম অগ্নি-পাটের সাড়ি
নাকের বেসর দিবাম তোমায় কাঞ্চা সোনায় গড়ি ॥

দেওয়ানের মনে দুর্বলতা জাগিয়ে মলুয়া কোন রকমে ব্রত উদ্‌যাপনের অছিলায় তিন মাস সময় চেয়ে নেয়। তারপর তিন মাস অতিক্রান্ত হলে সে দেওয়ানকে দিয়ে কাজীর প্রাণদণ্ডের আদেশ করিয়ে নিয়ে কাজীর ষড়যন্ত্র ও অত্যাচারের প্রতিশোধ নেয়।

এরপর মলুয়া দেওয়ানকে বলে —

মলুয়া ॥ .... এইবার দিন তুমি বারদস্তি করিয়া
কোড়া শিকারে যাইতে সাজাও ভাওয়ালিয়া ॥......

দেওয়ান মলুয়ার কথা মত নৌকা সাজায় কোড়া শিকারে যাওয়ার জন্য। দেওয়ানকে নিয়ে নৌকায় উঠে। মলুয়া তার পোষা কুড়ার মারফৎ তার পাঁচ ভাইকে খবর পাঠায়। —

.... 'পঞ্চ ভাইয়ে পত্র পাইয়া পানসী নাও করে
ছল করিয়া তারা কোড়া শিকার ধরে ॥
বিস্তার ধলাই বিল পদ্ম ফুলে ভরা
কোড়া শিকার করতে দেওয়ান যায় দুপুর বেলা ॥
সঙ্গেতে মলুয়া কন্যা পরমা সুন্দরী
পানসী লইয়া পঞ্চভাই লইলেক ঘেরী ॥
লাঠির বাড়ীতে ছিল যত দারী-মাঝি
উবুত হইয়া জলে পড়ে করে কাজি মাঝি ॥
পঞ্চ ভাইয়ের পান্‌সী খানা দেখিতে সুন্দর
লম্বা দিয়ে উঠে কন্যা তাহার উপর ॥
আষ্ট দারে মারে টান জ্ঞাতি বন্ধুজনে
পঙ্খী উড়া করে পানসী ভাইঙ্গা পদ্ম বনে ॥
সোয়ামী সহিত মলুয়া যায় বাপের বাড়ী
ছীরাম উদ্ধার করে যেন আপনার নারী ॥.....

দেওয়ানের কবল থেকে মলুয়ার পাঁচ ভাই তাকে উদ্ধার করে ফিরিয়ে দেয় স্বামীর কাছে। মলুয়া - বিনোদের মিলনে দুজনের মনে আর আনন্দ ধরে না। বাঁধ ভাঙ্গা বন্যার মত জড়িয়ে ধরে একে অপরকে। কিন্তু নিষ্ঠুর সমাজ তাদের এই মিলনকে মেনে নেয় না। মলুয়াকে ত্যাগ করতে আদেশ করে বিনোদের আত্মীয় পরিজন। তারা মলুয়ার চরিত্রের দোষ দিয়ে বলে —

.... তিন মাস রইল কন্যা দেওয়ান সাহেব ঘরে
কি দিয়া রাইখ্যাছে পরাণ কে কহিতে পারে ॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া বিনোদ কোন কাম করিল
ব্রাহ্মণের পাতি দিয়ে পরাচিত্তি করিল ॥
পরাচিত্তি করিয়া বিনোদ ত্যাজে ঘরের নারী
আন্ধারে লুকাইয়া কাঁন্দে মলুয়া সুন্দরী ॥....

মলুয়া এত অপমান, দুঃখ সহ্য করেও স্বামীর ভিটেয় পড়ে থাকে দাসীর মত। বিনোদের আত্মীয়রা আবার বিনোদের বিয়ে দেয়। তবুও —

.... 'বাইর কামুলীর কাম করে মনের সন্তোষে
সতীনেরে রাখে কন্যা মনের হরষে ॥
তথাপি মলুয়া নাহি যায় বাপের বাড়ী
যতন করিয়া সেবে সোয়ামী - শ্বাশুড়ী ॥.....

একদিন বিনোদ কুড়া শিকারে বেরুলে, পথে তাকে কাল সাপে দংশন করে। সে খবর পেয়ে পাগলিনীর মত আবার পাঁচ ভাইকে নিয়ে গাড়রী ওঝার কাছে গিয়ে বিনোদের প্রাণ বাঁচিয়ে স্বামী নিয়ে সতী মলুয়া স্বামীর ঘরে ফেরে। নগরের সকলে বেহুলা - লক্ষ্মীন্দর বলে জয়ধ্বনি দেয়। সকলেই মলুয়াকে ঘরে তুলে নেওয়ার জন্য বিনোদকে বলে। বিনোদও চায়। তাঁর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজন মামা, পিশে সকলেই তাকে জাতি চ্যুত করার হুমকি দিতে সে খানিকটা থমকে যায়।

মলুয়া দেখে তার জন্য তার স্বামীর সম্মান থাকছে না সমাজে। সে তখন একটা ভাঙ্গা নৌকায় চেপে মাঝ দরিয়ায় পাড়ি দেয় একা। ফুটো নৌকায় জল উঠতে শুরু করে। পারে দাঁড়িয়ে বিনোদের দিদি, মা সকলেই আকুল হয়ে মলুয়াকে ঘরে ফেরার জন্য ডাকতে থাকে। কিন্তু মলুয়া ফেরে না। পরিস্থিতিতে বিনোদ আকুল হয়ে বলে —

.......'বাতা বাইয়া উঠে পানি ডুবে ভাঙ্গা নাও
দোইড়া আস চান্দ বিনোদ দেখতে যদি চাও ॥
দোইড়া আইস্যা চান্দ বিনোদ নদীর পারে খাড়া
এমন কইরা জলে ডুবে আমার নয়ন তারা ॥
চান্দ সুরুজ ডুবুক আমার সংসারে কাজ নাই
জ্ঞাতি বন্ধু জনে আমি আর ত নাহি চাই ॥
তুমি যদি ডুব কন্যা আমায় সঙ্গে নেও
একটিবার মুখে চাইয়া প্রাণের বেদন কও ॥
ঘরে তুইল্যা লইবাম তোমায় সমাজে কাজ নাই
জলে না ডুবিও কন্যা ধর্ম্মের দোহাই ॥....

মলুয়া ॥ ....ডুবুক ডুবুক ডুবুক নাও আর বা কত দূর
ডুইব্যা দেখি, কতদূরে আছে পাতাল পুর ॥
পূবেতে গর্জিল দেওয়া ছুটল বিষম বাও
কইবা হোল সুন্দর কন্যা মন পবনের নাও ॥....

মলুয়ার দুঃখে যেন জলতলের পাতালপুরী কোল পেতে দেয়। ভাঙ্গা নৌকার সঙ্গে মলুয়া সুন্দরীরও সলিল সমাধি হয় মাঝ দরিয়ায়।

আকাশ, বাতাস, দরিয়ার পানি সমস্ত প্রকৃতি যেন মলুয়ার এ আত্মত্যাগে মূক হয়ে যায় স্বজন হারানোর শোক পালন করে।

কঙ্ক ও লীলা

মৈমনসিংহ গীতিকার 'কঙ্ক ও লীলা' পালাটিতে দামোদর দাস, রঘুসুত, নয়ান চাঁদ ঘোষ ও শ্রীনাথ বানিয়া প্রমুখ চারজন কবির কথা পাই।

অনেকের মতে কবি কঙ্ক এক ঐতিহাসিক ব্যক্তি। 'পীরের পাঁচালী'র ভনিতায় তাঁর নামও পাওয়া যায়। ফলে লেখাটি তাঁর বলে মেনে নিতেও অসুবিধা হয় না। 'কঙ্ক ও লীলা' পালাটি কবি কঙ্কের কাব্য রচনার কাহিনী ও তাঁর প্রেমের বিয়োগান্তক পরিণতি নিয়ে রচিত।

'কঙ্ক' এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ সন্তান। ছোটবেলায় সে হারায় তার বাবা-মাকে। তারপর এক চণ্ডাল তাকে লালন-পালন করতে থাকে। কিন্তু কঙ্কের বয়স যখন পাঁচ বছর, তখন সেই চণ্ডাল ও তার স্ত্রী মারা যায়। কঙ্ক আবার নিরাশ্রয়, একা হয়ে পড়ে। তখন গর্গ নামে ঋষিতুল্য দয়ালু ব্রাহ্মণ তাকে পথ থেকে তুলে এনে পুত্রবৎ মানুষ করতে থাকেন। ক্রমশঃ গর্গের স্ত্রী কঙ্কের জননীর স্থান গ্রহণ করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে কঙ্কের দশ বছর বয়সে তিনিও ইহলোক ত্যাগ করেন।

গর্গের একমাত্র কন্যা লীলাবতী ছিল কঙ্কের ছোট বেলার সহচরী। পরে সেই লীলাবতী ক্রমশঃ হয়ে উঠলো কঙ্কের দয়িতা। দুজনেরই অমলিন হৃদয়, মন বাঁধা পড়লো প্রেমে।

ঠিক সেই সময় এক পীর সাহেব এসে আস্তানা গাড়লো কঙ্ক - লীলাদের গ্রামে। কঙ্ক কাউকে না জানিয়ে লুকিয়ে পীর সাহেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করল। এবং তাঁর আদেশে একটি সত্যপীরের পাঁচালী রচনা করলো। আর এ কথা যখন রাষ্ট্র হ'ল, তখন শুরু হ'ল কানাকানি। ব্রাহ্মণরা কঙ্কের ওপর চটে গেলেন। শিশুকালে চণ্ডালের অন্ন খাওয়া, পরে মুসলমান পীরের শিষ্য হওয়ার কথা গর্গের কানে তুলে কঙ্কের ওপর তার মন বিষিয়ে দেবার চেষ্টায় ব্যর্থ হলে, তারা এক জোটে লীলা ও কঙ্কের প্রেমকে কেন্দ্র করে কলঙ্ক রটায়। সে রটনা গর্গের কানে পৌঁছতে তিনি রাগে উন্মাদ হয়ে লীলা ও কঙ্ককে হত্যা করার সংকল্প নেন। এবং একদিন কঙ্কের বাড়া ভাতে বিষ মিশিয়ে দেন। আড়াল থেকে লীলা তা দেখতে পেয়ে, কঙ্কের বাড়া ভাতের সামনে বসে কাঁদতে থাকে। কঙ্ক গরু চরিয়ে বাড়ি ফিরে লীলার কাছে সব জানতে পেরে, লীলাকে শান্ত করে। তাকে বাবার সেবা যত্নের দিকে নজর দিতে বলে, কঙ্ক ঘর ছাড়ে। এদিকে বিষ মাখা ভাত খেয়ে লীলাদের বাড়ির গাই গরু সুরভি মারা যায়।

সে দৃশ্য দেখে গর্গ নিজের ভুল বুঝতে পেরে, অনুতাপের আগুনে জ্বলতে থাকেন এবং পাগলের মত ঘুরতে থাকেন।

একদিন দৈববাণী শুনে গর্গ জানতে পারেন যে, তাঁর এমন আচরণের জন্যই তাঁর সংসারে ও মনে অশান্তি এবং এমন অনর্থের সৃষ্টি হয়েছে। তখন গর্গ কঙ্ককে খুঁজে আনার জন্য চারিদিকে লোক পাঠালেন। কিন্তু কঙ্কের কোন সন্ধান বা খবর পাওয়া গেল না।

এদিকে কঙ্কের বিচ্ছেদে গর্গ-কন্যা লীলা আহার নিদ্রা ত্যাগ করে অসুস্থ হয়ে শয্যা নিল। একদিন গুজব শোনা গেল যে, কঙ্ক মনের দুঃখে নদীর জলে ডুবে আত্মহত্যা করেছে। এ খবর শুনে লীলা একেবারে ভেঙ্গে পড়ল, এবং কিছুদিনের মধ্যেই শোকে, দুঃখে, হতাশায় লীলা অকালে ইহলোক ত্যাগ করলো।

আর লীলার শোকার্ত পিতা গর্গ তার দেহ শ্মশানে সৎকার করার সময় কঙ্ক এসে সেখানে হাজির হ'ল। গর্গ সবকিছু ভুলে তখন সন্তানবৎ কঙ্ককে বুকে জড়িয়ে ধরে অনুতাপের আগুন শীতল করলেন। এরপর গর্গ সংসার ত্যাগ করে কঙ্কের সঙ্গে নীলাচলে চলে গেলেন।

মৈমনসিংহ গীতিকার অন্যান্য পালাগুলির মত 'কঙ্ক ও লীলা' পালাটিও প্রেমের জন্য আত্মত্যাগের এক উজ্জ্বল উদাহরণ। এখানে প্রেমের উত্তরণ মিলনে নয় ত্যাগে, বিরহে।

এবার আসা যাক পালা পর্বের বিভিন্ন ঘটনাক্রমে, — পালার শুরুতে গুরু বন্দনার পর আসে কঙ্কের জন্ম ও বাবা-মায়ের প্রয়াণ বৃত্তান্ত বর্ণনা. হয়েছে।

(১)

বিপ্রপুরে ছিল এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ
ভিক্ষাবৃত্তি করি করে জীবন পালন ॥
গুণরাজ নাম তার ভার্য্যা বসুমতী
পতিব্রতা সেই নারী অতি ভক্তিমতী ॥.....

(২)

সাটিয়ারা দিনে তাল পাতায় লিখিয়া
কঙ্ক নাম রাখে মাতা আদর করিয়া ॥
ছয় না মাসের শিশু হইল যখন
দারুণ রোগেতে হইল মাতার মরণ ॥
ভার্য্যার লাগিয়া বিপ্র পাগল হইয়া ফিরে
কেবা রাখে শিশু পুত্রে কেবা ভিক্ষা করে ॥.....

এই জটিল অবস্থায় শিশু পুত্রকে অনাথ করে একদিন কঙ্কের বাবাও গত হ'ল। সেই সময় অনাথ শিশু কঙ্ককে দেখে স্থানীয় মুরারি নামে এক চণ্ডাল কঙ্ককে নিজের কাছে এনে ছেলের মত মানুষ করতে লাগল। দিনে দিনে মুরারির স্ত্রী কৌশল্যা কঙ্কের মায়ের স্থান নিল।

....'মুরারি নামেতে এক চণ্ডাল সুজন
শিশুরে দেখিয়া তার দুঃখী হৈল মন ॥
কোলেতে লইয়া শিশু নিজ ঘরে আনে
চণ্ডালিনী পালে তারে পরম যতনে ॥
নিজপুত্র তৈঁই স্নেহ করে দুইজনে
মুরারিরে বাপ বলি শিশু মনে জানে ॥

কৌশল্যারে ডাকে কঙ্ক জননী বলিয়া
জনক-জননী পুন পাইল ফিরিয়া ॥'......

এরপর কঙ্কর পাঁচ বছর বয়স হতে না হতেই তার পালক পিতা - মাতারও প্রয়াণ ঘটে। কঙ্ক আবার নিরাশ্রয়, অনাথ হয়ে যায়। —

.....'কেহ নাহি হাত ধরে নেয় ফিরে ঘরে
ভাত পানি দিয়া কেউ জিজ্ঞাসা না করে'॥......

একদিন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত গর্গ শিষ্য বাড়ি থেকে ফেরার সময় দেখেন শ্মশানে একটি সুন্দর ছোট্ট শিশু গড়াগড়ি খাচ্ছে আর কাঁদছে। তখন তিনি এসে সেই ছোট ছেলেটিকে তুলে গায়ের নামাবলী দিয়ে তার চোখের জল মুছিয়ে, ছেলেটিকে এনে নিজের বাড়িতে তোলেন।

.....দেখিয়া শ্মশানে শিশু যায় গড়াগড়ি
হাত ধরি উঠাইলা গিয়া তাড়াতাড়ি ॥
নামাবলী দিয়া শিশুর বয়ান মুছায়
সঙ্গেতে লইয়া কঙ্কে নিজ ঘরে যায় ॥
দেখিয়া গায়ত্রীদেবী সুখী হৈলা মনে
পুত্রহীনা পুত্র পাইল মাতা মাতৃহীনে ॥....

এরপর কঙ্ক পণ্ডিত গর্গ ও তাঁর স্ত্রী গায়ত্রী দেবীর ছেলে হয়ে সংসারের একজন হয়ে ওঠে।

....'দেখিয়া গর্গের মনে ইচ্ছা হইল ভারি
দশ না বৎসরের কালে হাতে দিলা খড়ি ॥
আদরে যতনে কঙ্কের সুখে দিন যায়
লেখা পড়া করে আর ধেনু যে চড়ায় ॥.....

এরপর একদিন গায়ত্রী দেবী বসন্ত রোগে (শীতলা রোগে) আক্রান্ত হয়ে ইহলোক ত্যাগ করেন। ইতিমধ্যে গর্গ ও গায়ত্রী দেবীর একমাত্র কন্যা লীলা, কঙ্কর ছেলেবেলার সহচরী থেকে দয়িতা হয়ে ওঠে। দুজনেই ভাসতে থাকে প্রেমের জোয়ারে।

....'ঘরে না ছাড়িয়া কঙ্ক থাকে যতক্ষণ
কঙ্কের বিরহে লীলার মন উচাটন ॥
দরদর দু নয়নে বহে জলধারা
কাজকাম ফেলি লীলা পন্থে রয় খাড়া ॥
বাথান হইতে কঙ্ক ধেণু লইয়া আইসে
আবের পাঙ্খা লইয়া লীলা বৈসে তার পাশে ॥.......

★

.....'ডালিমের ফুল যেমন বাতাসেতে উড়ে
সিন্দুর মাখিয়া কন্যার দিয়াছে অধরে ॥
তাহাতে খেলার হাসি না দেখে কোন জন

মরমে ঢাকয়ে কন্যা আপন যৌবন ॥'.....
....'মনের সুখেতে কঙ্ক আছে গর্গ পুরে
গুরুর নিকটে থাকি নানা শাস্ত্র পড়ে ॥
পুরাণ সংহিতা আদি হরেক প্রকার
শিখিয়াছে যথাবিধি শাস্ত্র অলঙ্কার ॥....

এখন কঙ্ক ও লীলার দুজনের মনে প্রেমের অশান্ত কোটালের জোয়ার। দুজনেই দুজনের কাছে প্রেমে উন্মুক্ত। লীলা অচল যেন অসম্পূর্ণ— কঙ্ককে ছাড়া সে বাঁচবে না, তার জীবন যেন কঙ্ক ছাড়া বৃথা। লীলা তাই গায় —

লীলা ॥ ... আইস আইস প্রাণের বন্ধুরে
বইস আমার কাছে।
দেখিব তোমার মুখে
কত মধু আছে ॥
তুমি হওত ঘরে বন্ধু আমি হই লতা
বেইরা রাখব যুগলচরণ ছাইড়া যাইব কোথা ॥
তোমারে শুইতে দিবরে বন্ধু অঞ্চল বিছান
মুখেতে তুলিয়া তোমায় দিব সাচীপান ॥.....

লীলা - কঙ্কের মনে যখন প্রেমের উতল হাওয়া, ঠিক সেই সময় ঐ গ্রামে এসে আস্তানা গেড়েছে এক পীর ফকির বাবা। কঙ্কর সঙ্গে তার পরিচয় হয়, পীরের কাছে শিষ্যত্ব নেয় কঙ্ক, কাউকে না জানিয়ে। পীরের সান্নিধ্যে এসে কঙ্কের পরিবর্তন ঘটে চিন্তা, চেতনায়, জীবন-দর্শনে। তার মনে এখন —

.....'আন্ধাইরে জ্বলিল মনি, নানা গুণে হৈল গুণী
উজালা করিয়া নিল কূল ॥.....
......'জুহুরী জহর চিনে বেনে চেনে সোনা
পীর পয়গম্বর চিনে সাধু কোন জনা ॥
....'ভক্তি - মুক্তি - তন্ত্র - মন্ত্র - দেহ - প্রাণ - মন
অচিরে গুরুর পদে কৈল সমর্পণ ॥.....

— গুরুর আদেশে কঙ্ক রচনা করে সত্যপীরের পাঁচালী।

.....'কঙ্ক আর রাখাল নহে, কবি কঙ্ক লোকে কহে
শুনি গর্গ ভাবে চমৎকার ॥
হিন্দু আর মোসলমানে, সত্যপীরে উভে মানে
পাঁচালীর হৈল সমাদর ॥
যেই পূজে সত্যপীরে - কঙ্কের পাঁচালী পড়ে
দেশে দেশে কঙ্কের গুণ গায় ॥

....'জানিয়া শুনিয়া কানে, ভাবে গর্গ মনে মনে

নহে কঙ্ক সামান্য মানব।
ভক্তিমান অতিধীর, গর্গ কৈলা মনে স্থির
কঙ্কে ঘরে তুলিয়া লইব ॥....

ঠিক এই অবস্থাতেই কঙ্কর বিরুদ্ধে ক্ষেপে ওঠে ব্রাহ্মণ সমাজ। তারা কঙ্কর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করে পণ্ডিত গর্গর মন বিষিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু তাতেও সফল না হয়ে তারা কঙ্ক আর লীলার সম্বন্ধে কলঙ্ক ছড়ায়।

....'আর এক কথা রটে না যায় কখন
কঙ্কেরে সঁপেছে লীলা জীবন-যৌবন ॥
সন্ধ্যামন্ত্র নাহি জানে বেদাচারণহীন
দুরন্ত দুর্জয় যারা সমাজেতে ঘুন ॥
মদ্য-মাংস খায় সদা পাষণ্ড আবার
জন্মিয়া ব্রাহ্মণ কুলে যত কুলাঙ্গার ॥
মিথ্যা বদনাম তারা দিল রটাইয়া
কলঙ্কী হইয়াছে লীলা কুল ভাঙ্গাইয়া ॥
একে ত কুমারী কন্যা অতি শুদ্ধমতী
কলঙ্ক রটাইল তার যত দুষ্ট মতি ॥....

একথা শোনার পর গর্গ রাগে, দুঃখে উন্মাদ হয়ে কঙ্ক ও লীলাকে হত্যা করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে ওঠেন। একদিন গর্গ কঙ্কের বাড়া ভাতে বিষ মিশিয়ে দেয়। লীলা আড়াল থেকে তা দেখে ভীষণ মর্মাহত হয় এবং কঙ্ক লীলার কাছে সে বৃত্তান্ত জানতে পেরে মর্মাহত হয় পালক পিতা, গুরুর এরূপ আচরণে। তারপর লীলার কাছে বিদায় নিয়ে কঙ্ক ঘর ছাড়ে।

আর কঙ্কের খোঁজ পাওয়া যায় না। কঙ্কর বিরহে লীলা পাগলিনীর মত হয়ে যায়। নাওয়া-খাওয়া-ঘুমনো সব কিছু ত্যাগ করে সে শুধু কঙ্কর চিন্তায়, বিরহে দিন দিন ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে একদিন মৃত্যু শয্যায় শায়িত হয়ে পড়ে।

লীলার অকাল প্রয়াণে গর্গর মনের পরিবর্তন হয়। শ্মশান ঘাটে একমাত্র কন্যার শব দেহ সৎকারের সময় হঠাৎ দেখা হয় কঙ্কর সঙ্গে। গর্গ সবকিছু ভুলে শেষ অবলম্বন সন্তান প্রতিম কঙ্ককে বুকে জড়িয়ে ধরে এবং শেষে সংসারে মায়া মোহ ত্যাগ করে গর্গ সন্তানসম কঙ্কর সঙ্গে নীলাচলের পথে যাত্রা করেন।

........'অনলে তাপিত হৃদি করিতে শীতল
কঙ্কের সহিত মুনি যায় নীলাচল ॥
সঙ্গে চলে অনুগত শিষ্য পঞ্চজন
সংসার তেয়াগি গেলা জন্মের মতন ॥

— বৈরাগ্য সাধনে মুক্তির পথে।

কাজলরেখা

মৈমনসিংহ গীতিকার 'কাজলরেখা' পালাটির রচয়িতা অজ্ঞাত। পালাটির রূপকথাধর্মী কাহিনী প্রবাহ এরূপ —

ভাটিয়াল মুলুকে ধনেশ্বর নামে এক বণিক সাধুর কাজল রেখা নামে এক অত্যন্ত রূপসী ও গুণবতী মেয়ে ছিল। মেয়েটির বয়স দশ আর তার রূপবান ভাই রত্নেশ্বরের বয়স চার। বেশ সুখেই কাটছিল তাদের শৈশব জীবন। তাদের বাবা সওদাগর ধনেশ্বর জুয়া খেলতে খেলতে তার সমস্ত বিষয় সম্পত্তি একদিন খুইয়ে বসল। ধনেশ্বরদের তখন দারুণ অভাব, দিন আর চলে না। এমন অভাবের দিনে একদিন এক সন্ন্যাসী এসে ধনেশ্বরকে একটি শুক পাখী এবং একটি মূল্যবান আংটী দিয়ে বললেন যে ঐ শুকপাখীর কথা মত কাজ করলে ধনেশ্বর তার হৃত সম্পত্তি আবার ফিরে পাবে।

এরপর শুক পাখীর পরামর্শ অনুযায়ী ধনেশ্বর তার মেয়ে কাজল রেখাকে একটা ডিঙ্গায় চাপিয়ে এক বনের মধ্যে নিয়ে গেল। সেখানে এক মন্দিরে এক মৃত যুবক ছিল। বাবার সঙ্গে কাজল রেখা সেই মন্দিরে ঢোকার পর মন্দিরের দরজা বন্ধ হয়ে গেল এবং ধনেশ্বর তখন কাজলকে 'ঐ মৃত যুবকই তোমার স্বামী' বলে মেয়েকে সেই মন্দিরে রেখে চলে গেল। এমন সময় এক জটাজুটধারী সন্ন্যাসী মন্দিরে ঢুকে কাজলের কাছে এসে বলল — 'এই মৃত যুবক, একজন রাজপুত্র'। কাজলের কান্না তখন-ও থামেনি। সন্ন্যাসী কাজলের কান্নাকে উপেক্ষা করে বলে চলেন — 'এর সারা গায়ে ছুঁচ। তুমি সেই ছুঁচ সব খুলে আমার দেওয়া এই গাছের পাতার রস ওর চোখে লাগিয়ে দিও। তা হলেই রাজপুত্র বেঁচে উঠবে। আর. তোমার কপালে অনেক দুঃখ আছে। আর শোন, শুক পাখী তোমার স্বামীর কাছে তোমার পরিচয় যতক্ষণ না দেয়, তুমি, তোমার আত্মপরিচয় দিও না। দিলে বিধবা হবে। এই বলে সন্ন্যাসী চলে গেল।

কাজল রেখা তখন সন্ন্যাসীর কথা মত কাজ করল। কিন্তু রাজপুত্রের চোখের 'ছুঁচ খোলার আগে সে তার দাসী কাঙ্কনের দ্বারা প্রতারিত হ'ল। কাঙ্কন রাজকুমারের চোখের ছুঁচ খুলে পাতার রস লাগিয়ে দিতেই রাজকুমার প্রাণ ফিরে পেল। পরে কুমার কাঙ্কনকে বিয়ে করতে চাইল। রাজপুত্রের কাছে কাঙ্কন কাজল রেখাকে তার দাসী বলে পরিচয় দিল।

এরপর রাজপুত্র কাঙ্কন ও কাজলকে নিয়ে তার দেশে ফিরে গেল। কিন্তু কাঙ্কনকে বিয়ে করলেও রাজপুত্র কাজল রেখার রূপে ও গুণে মুগ্ধ ও আকৃষ্ট হ'ল। এতে কাঙ্কন কাজল রেখার প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠল। এদিকে ছুঁচ-রাজপুত্রের এক বন্ধু কাজল রেখাকে বিয়ে করার জন্যে পাগল হয়ে উঠল। হাজার চেষ্টা করেও সে কাজলের নাগাল না পেয়ে কাঙ্কনের সঙ্গে চক্রান্ত করে কাজলের চারিত্রিক বদনাম দিলে, ছুঁচ - রাজপুত্র কাজলরেখাকে নির্বাসনে পাঠালো।

তারপর রাজপুত্রের বন্ধু কাজলকে মাঝ সমুদ্রে নিয়ে গিয়ে তাকে বিয়ে করার জন্য চাপ দিতে লাগল কিন্তু কাজলরেখা অবিচল। শেষে কাজলের মিনতিতে সমুদ্রে চড়া পড়ল, রাজপুত্রের সেই বন্ধু তখন সহজেই কাজলরেখাকে ফেলে রেখে যেতে বাধ্য হ'ল। এমন সময় কাজলের ভাই রত্নেশ্বর তাকে উদ্ধার করে নিজের বাড়ি নিয়ে গেল। সে চিনতেই পারলো না তার দিদি কাজলরেখাকে। ততদিনে কাজলের বাবা ধনেশ্বর গত হ'য়েছে। কাজলকে বাড়িতে এনে রত্নেশ্বর তাকে বিয়ে করতে চাইলো। তখন কাজল রেখা তাকে একটি সভা ডাকতে বলল এবং সব রাজা ও সওদাগরকে আমন্ত্রণ জানাতে অনুরোধ করল। সেই সঙ্গে আরো বলল শুক পাখীকে সেই সভায় আনতে যে পাখীটি ছুঁচ - রাজপুত্র কিনে নিজের রাজধানীতে নিয়ে গেছে।

কাজলের কথামত রত্নেশ্বর তাই-ই করল। এরপর সভায় শুক পাখী কাজলরেখার প্রকৃত পরিচয় সকলকে জানিয়ে দিল। এবং রাজপুত্র তার ভুল বুঝতে পারলো। শেষে কাজলরেখার সঙ্গে ছুঁচ - রাজপুত্রের ঘটা করে বিয়ে হ'ল এবং শুকপাখী স্বর্গে চলে গেল। পরে প্রতারক দাসী কাঙ্কনকে ভুলিয়ে গর্তে ঢুকিয়ে মাটি চাপা দিয়ে, ছুঁচ-রাজপুত্র কাজলরেখাকে নিয়ে সুখে ঘর-সংসার ও রাজত্ব করতে লাগলো।

এবার আসা যাক পালা পর্বের আখ্যানে —

(১)

.....'ভাটিয়াল মুল্লুকে আছিল এক সদাগর
কুটীয়াল আছিল আছিল সাধু নাম ধনেশ্বর ॥
এক কইন্যা এক পুত্র ছিল সাধুর ঘরে,
ধনীআদ হইল সাধু মা লক্ষ্মীর বরে' ॥

(২)

.... জুয়া খেলাইয়া সাধু হারাইল সম্বল
ধনরত্ন হাতীঘোড়া সব হইল তল ॥
সকল হারিলা সাধু পাপিষ্ঠ জুয়ায়
ফকীর হইয়া সাধু ঘুরিয়া বেড়ায়' ॥

এরপর সন্ন্যাসীর কাছে শুক পাখী আর আংটি পাওয়ার পর, শুক পাখী বলল —

শুকপাখী ॥ .... কাইন্দ না কাইন্দ না সাধু না কান্দিও আর
দুঃখের যে দিন সাধু যাইব তোমার ॥
হাতের ছিরি আঙ্গুইট সাধু রে বিকাইয়া শহরে
ভাঙ্গা ডিঙ্গা বান্ধাইতে আন কারিগরে ॥
কিছু মূলধন লইয়া বাণিজ্যেতে যাও
ধনরত্নে ভইরা লক্ষ্মী দিবাইন তোমার নাও ॥

ধনেশ্বর বণিক বাণিজ্যেতে গিয়ে প্রচুর ধন সম্পদ উপার্জন করে আবার বড়লোক হ'ল। মেয়ে কাজলরেখার বয়স দশ পেরিয়ে যাচ্ছে কিন্তু বিয়ে দিতে বিলম্ব হচ্ছে এই কথা ভেবে তার মনে শান্তি নেই। ধনেশ্বর শুকপাখীকে জিজ্ঞেস করতে সে বলে — 'মরা সোয়ামীর কাছে এই কন্যার বিয়া হইব। এই কন্যারে তোমার পুরীর মধ্যে রাখ্যো না, বনের মধ্যে নিবাস দিয়া আইস'। ....

এই কথা শুনে সাধু তখন বলে —

সাধু ॥ ......'বাপে মায়ে পালে কন্যা বিয়া দিবার আশে
আমি কেমন কইরা এমন কন্যা পাঠাই বনবাসে ॥
শিশুকালে মাও মইল কত দুঃখু করি
এমন করিয়া কন্যা পালন যে করি ॥

তবুও নিয়তি কেন বাধ্যতে । সাধু ধনেশ্বর তখন মেয়ে কাজলরেখাকে এক ডিঙ্গায় করে নিয়ে গিয়ে বনের মধ্যে একটা মন্দিরে এনে তুললো। তারপর পাখীর কথা মত মৃত রাজকুমারের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে হবে তাই কাজলরেখাকে সেখানে রেখেই নিজে

ঘরে ফিরে এলো। কাজল তখন দুঃখে গেয়ে ওঠে —

কাজলরেখা ॥ .... 'চলিতে না চলে পাও কোথায় রইল মোর মাও
কোথায় রইল গর্ভ সোদর ভাই ॥
কপালেতে ছিল দুঃখ তিয়াষেতে ফাটে বুক
এক ঢোক পানি দেও খাই ॥ .....

কিন্তু তার এ ডাকে কেউ সাড়া দিল না। তখন মৃত স্বামীর কাছে বসে কাজল কাঁদতে কাঁদতে গায় —

কাজল ॥ .. 'জাগ জাগ সুন্দর কুমার রে কত নিদ্রা যাও
আমি অভাগিনী ডাকি আঁখি মেইল্যা চাও ॥.......

★ ★ ★

... যে হও সে হও প্রভু তুমি ত সোয়ামী
যতকাল দেহ তোমার ততকাল আমি ॥....

★ ★ ★

.... 'কর্মদোষে বেইলা বাড়ী শিরেতে বসিয়া
মরা পতির কাছে বাপে দিয়া গেছে বিয়া ॥

তারপর মন্দিরের সন্ন্যাসীর কথামত রাজপুত্রের শরীর থেকে একে একে ছুঁচ খুলতে থাকে। ইতিমধ্যে কাজলের দাসী কাঙ্কন, কাজলকে এড়িয়ে রাজপুত্রের দুচোখের ছুঁচ খুলে লাগিয়ে দেয় সন্ন্যাসীর দেওয়া পাতার রস। রাজকুমার প্রাণ ফিরে পেতেই কাঙ্কন রাজকুমারকে তার প্রাণদাত্রীর পরিচয় দিয়ে তাকে বিয়ে করতে বলে এবং রাজকুমার কাঙ্কনকে বিয়ে করে কাজলকে তার দাসী হিসেবে নিজের দেশে নিয়ে আসে।

এ সত্ত্বেও কাজল শুকপাখী ও সন্ন্যাসীর কথা মত রাজকুমারের কাছে নিজের পরিচয় গোপন রাখে। কিন্তু রাজকুমার দাসী হলেও কাজলের রূপে ও গুণে মুগ্ধ হয় এবং মনে মনে তাকেই কামনা করতে থাকে। এমন সময় রাজপুত্রের বন্ধু কাজলকে পাওয়ার ও বিয়ে করার জন্য পাগল হয়ে ওঠে। কিন্তু কাঙ্কন কাজলের বিরুদ্ধে এক ষড়যন্ত্র করে কাজলের চারিত্রিক দুর্নাম রটায়। সে খবরে রাজপুত্র রুষ্ট হয়ে কাজলকে নির্বাসনে পাঠায়।

রাজপুত্রের বন্ধু কাজলকে মাঝ সমুদ্রে নিয়ে গিয়ে তাকে বিয়ে করার জন্যে চাপ সৃষ্টি করতে থাকলে, কাজল নিরুপায় হয়ে সমুদ্রকে মিনতি জানায় এবং সমুদ্রের মাঝে চড়ার সৃষ্টি হয়। তখন সেই দুর্মতি বন্ধু কাজলকে সেই চড়ায় ফেলে রেখে চলে আসে।

কাজলের ভাই রত্নেশ্বর তাকে উদ্ধার করে নিজের বাড়িতে এনে তোলে। সে চিনতেও পারে না তার আপন দিদিকে। ইতিমধ্যে কাজলের বাবা ধনেশ্বর গত হয়েছেন। একদিন রত্নেশ্বর কাজলকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিলে কাজল তাকে সব দেশের রাজা ও সদাগরদের আমন্ত্রণ জানিয়ে একটা সভা ডাকার কথা বলে এবং ছুঁচ-রাজপুত্রের কাছে বিক্রিত শুক পাখীটিকেও আনার কথা বলে। রত্নেশ্বর তার কথামত সভা ডাকে। তারপর সভায় শুকপাখি কাজলরেখার জীবনে ঘটে যাওয়া সমস্ত ঘটনা বলে তার প্রকৃত পরিচয় দেওয়ার পর, ছুঁচ-রাজপুত্রের সঙ্গে কাজলরেখার ঘটা করে বিয়ে হয় এবং কুচক্রী শঠ কাজলের দাসী কাঙ্কনকে জীবন্ত অবস্থায়

মাটিতে পুঁতে ফেলা হয়। —

.... 'উড়িতে উড়িতে পক্ষী সভার আগে কয়
আজি হইতে কন্যার বার বছর গত হয়।
ভাই হইয়া রত্নেশ্বর বিয়া করতে চায়
এই কথা কহিয়া পক্ষী শূন্যে দিল উড়া' ॥

★ ★ ★

... 'আছে কি মইরাছে কন্যা সুইচ রাজা না জানে
আবুড় হইয়া কান্দে রাজা সভার বির্দ্দমানে ॥
লজ্জা পাইয়া রত্নেশ্বর সভা ছাইড়া যায়
ভগ্নীর পায়ে পইড়া ক্ষমা রিয়াইত চায় ॥

চন্দ্রাবতী

মৈমনসিংহ গীতিকার চন্দ্রাবতী পালাটি লোককবি নয়ান চাঁদ ঘোষের লেখা।

বাংলা রামায়ণ রচয়িত্রী, মনসা মঙ্গল কাব্যের অন্যতম রচয়িতা বংশী দাসের কন্যা চন্দ্রাবতী ও জয়ানন্দের করুণ বিরহকাতর প্রেমাখ্যানকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে চন্দ্রাবতী পালাটি।

জয়ানন্দ ছিল চন্দ্রাবতীর বাল্যসখা। চন্দ্রাবতী যখন বাবার শিব পূজোর ফুল তুলতো তখন জয়ানন্দ গাছের ডাল নুইয়ে ধরে তাকে সাহায্য করতো। ক্রমশ তারা যৌবনে পা দিল। বসন্ত এসে ডাক দিয়ে গেল সেই দুটি সদ্য যৌবন প্রাপ্ত যুবক - যুবতীর মনে। চন্দ্রাবতী - জয়ানন্দের বন্ধুত্ব ক্রমশ গভীর প্রেমে পরিণত হ'ল।

একদিন জয়ানন্দ চন্দ্রাবতীকে চিঠি লিখে তার মনের গোপন কথা জানাল। সে চিঠি পড়ে চন্দ্রাবতী খুব কাঁদল এবং তার মনের কথা সে মনেই চেপে রেখে দিল। ইতিমধ্যে ঘটক এসে জয়ানন্দের সঙ্গে চন্দ্রাবতীর বিয়ের প্রস্তাব দিল চন্দ্রাবতীর বাবা বংশী দাসের কাছে। এবং তিনি সে প্রস্তাবে সম্মতি জানালে, বিয়ের তোড়জোড় শুরু হয়ে গেল।

জয়ানন্দ চন্দ্রাবতীর বিয়ের যখন সব ঠিকঠাক, দিনক্ষণ স্থির এমন সময় হঠাৎ ঝোড়ো হাওয়ায় সব ওলোট পালোট হয়ে গেল। লোকমুখে খবর ছড়িয়ে পড়ল যে, জয়ানন্দ এক মুসলমানীর রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকে বিয়ে করেছে। এ খবর শোনা মাত্র চন্দ্রাবতী পাথর হয়ে গেল লজ্জায়, দুঃখে, অভিমানে। সারাদিন সে কারো সঙ্গে কোন কথা বলল না, খেলো না, অলক্ষ্যে বিছানায় শুয়ে শুধু কাঁদলো। তখন চন্দ্রার বাবা বংশী দাস মেয়ের এমন অবস্থা দেখে, তাকে এক মনে শিব পুজো করতে আর রামায়ণ লিখতে উপদেশ দিলেন। চন্দ্রাবতী তখন তাই-ই শুরু করলো এক মনে, এক লক্ষ্যে।

এদিকে কিছুদিনের মধ্যেই জয়ানন্দের মোহভঙ্গ হ'ল, সে তার ভুল বুঝতে পেরে ভীষণভাবে অনুতপ্ত হ'ল।

একদিন সে চন্দ্রাবতীকে শেষবারের মত একটিবার দেখতে চেয়ে চিঠি লিখল। চন্দ্রা সে কথা জানাল তার বাবাকে। তখন চন্দ্রার বাবা তাকে বিচলিত হতে নিষেধ করে এক

মনে, এক লক্ষ্যে শিব পুজো করতে বললেন।

চন্দ্রাবতী তখন শিব মন্দিরের দরজা বন্ধ করে ধ্যানমগ্ন হয়ে রইল। জয়ানন্দ দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে অনেক অনুরোধ, অনেক সাধ্য-সাধনা করলো কিন্তু চন্দ্রাবতীর ধ্যান ভাঙল না। তখন নিরাশ জয়ানন্দ বিফল মনোরথে মন্দিরের দরজায় চন্দ্রাবতীর উদ্দেশ্যে কবিতা লিখে প্রায়ঃশ্চিত্তের জন্য নদীর জলে প্রাণ বিসর্জন দিল।

এরপর চন্দ্রাবতীর যখন ধ্যান ভাঙল, সে মন্দিরের বাইরে বেরিয়ে আসতেই দরজায় জয়ানন্দের সেই লেখা দেখতে পেল। জয়ানন্দ মুসলমান হয়েছিল, সুতরাং তার ছোঁয়ায় মন্দির অপবিত্র হয়েছে মনে করে চন্দ্রাবতী কাঁদতে কাঁদতে নদীতে তর্পণ করতে গেল। এবং সেখানে গিয়ে দেখলো জয়ানন্দের মৃতদেহ নদীতে ভাসছে। চন্দ্রাবতী তখন পাথরের মত স্তব্ধ হয়ে গেল। তার সে করুণ অবস্থা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

চন্দ্রাবতী জয়ানন্দের প্রেমাখ্যানটি বিরহের কাব্য হয়ে আজও বাঙালীর মনের মণি কোঠায় উজ্জ্বল হয়ে আছে। দর্শনার্থী হয়ে জয়ানন্দ বিফল মনোরথে ফিরে যাওয়ার সময় মন্দিরের বন্ধ দরজার সামনে লিখে যায় তার শেষ কথা।

জয়ানন্দ ॥ ....'শৈশবকালের সঙ্গী তুমি যৌবনকালের সাথী
অপরাধ ক্ষমা কর তুমি চন্দ্রাবতী ॥
পাপিষ্ঠ জানিয়া মোরে না হইলা সম্মত
বিদায় মাগি চন্দ্রাবতী জনমের মত ॥....

এরপর জয়ানন্দ চন্দ্রাবতীর কাছ থেকে চির বিদায় নিয়ে অনুতপ্ত হৃদয়ে নদীর জলে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণ বিসর্জন দেয়।

এবার আসা যাক পালা পর্বে —

চন্দ্রাবতী রোজ সকালে বাবার শিবপুজোর জন্যে ফুল তুলতে যায়। তার বাল্যসখা জয়ানন্দ গাছের ডাল নুইয়ে তার ফুল সংগ্রহে সাহায্য করে। জয়ানন্দের উদ্দেশ্যে চন্দ্রাবতী গায় —

চন্দ্রাবতী ॥ ...'চাইরকোনা পুষ্কুনির পাড়ে চম্পা নাগেশ্বর
ডাল ভাঙ্গ পুষ্প তুল কে তুমি নাগর ॥
আমার বাড়ি তোমার বাড়ি ঐ না নদীর পার
কি কারণে তুল কন্যা মালতীর হার ॥....

দিন যায় চন্দ্রাবতী জয়ানন্দ এখন সদ্য যৌবনে পা দিয়েছে। তাদের দুজনের মনেই আজ বসন্তের কোকিল গান শুনিয়ে প্রেমের সুর ছড়িয়ে যায়। কিন্তু কেউ কাউকে বলতে পারে না। একদিন মনের দ্বিধা দ্বন্দ্ব কাটিয়ে জয়ানন্দ লেখে প্রথম প্রেমপত্র চন্দ্রাকে।

জয়ানন্দ ॥ ....'যেদিন দেখ্যাছি কন্যা তোমার চান্দবদন
সেইদিন হইয়াছি আমি পাগল যেমন ॥
তোমার মনের কথা আমি জানতে চাই
সর্ব্বস্ব বিকাইবাম পায় তোমারে যদি পাই ॥....

চন্দ্রাবতীর উত্তর।

চন্দ্রাবতী ॥ ..... 'হাতেতে ফুলের সাজি কন্যা চন্দ্রাবতী
পুষ্প তুলিতে যায় পোয়াইয়া রাতি ॥......
হেন কালে নাগর আয়ে কোন কাম করে
পুষ্প পাতে লইয়া পত্র কন্যার গোচরে ॥......

সদ্য ফোটা প্রেমের মুকুলে দুজনেই আকুল। কিন্তু চন্দ্রাবতী বহুকষ্টে গোপন রাখে তার মনের আকুলতা। জয়ানন্দ জানতে পারে না চন্দ্রার মনের কথা।

ইতিমধ্যে ঘটক আসে চন্দ্রার বাবার কাছে জয়ানন্দের সঙ্গে চন্দ্রাবতীর বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে। বংশী দাস সে প্রস্তাবে সম্মতি জানালে, চলে বিয়ের তোড়জোড়, স্থির হয় দিনক্ষণ।

ঠিক সেই সময় জয়ানন্দ এক মুসলমানীর রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকে বিয়ে করে ধর্মান্তরিত হয়। সে খবর পেয়ে চন্দ্রাবতী লজ্জায়, দুঃখে, অপমানে পাথর হয়ে যায়। সে কারো সঙ্গে কথা বলে না, অলক্ষে বিছানায় শুয়ে শুধু কাঁদে। মেয়ের এই করুণ অবস্থা দেখে মর্মাহত পিতা তাকে বলেন এক মনে, এক লক্ষ্যে শিব পূজা করতে আর রামায়ণ রচনা করতে।

চন্দ্রার মন একাজে অনেকটা শান্ত, সংযত হয়। এদিকে জয়ানন্দের মোহ ভঙ্গ হয়েছে। সে তার ভুল বুঝতে পেরে ভীষণ অনুতপ্ত। একদিন চন্দ্রাবতী শিবমন্দিরে শিবপুজো করতে করতে ধ্যানমগ্ন হয়ে গেছে এমন সময় অনুতপ্ত জয়ানন্দ মন্দিরে এসে চন্দ্রাবতীকে শেষবারের মত দেখার জন্য অনুনয় বিনয় করে ব্যর্থ হয়ে নদীতে প্রাণ বিসর্জন করে।

পরে মর্মাহত চন্দ্রাবতী কি করণীয় চিন্তা করে —

.... 'কলসী লইয়া জলের ঘাটে করিল গমন
করিতে নদীর জলে স্নানাদি তর্পণ ॥
জলে গেল চন্দ্রাবতী চক্ষে বহে পানি
হেন কালে দেখে নদী ধরিছে উজানী ॥
একেলা জলের ঘাটে সঙ্গে নাহি কেহ
জলের উপরে ভাসে জয়ানন্দের দেহ ॥
দেখিতে সুন্দর নাগর চান্দের সমান
ঢেউয়ের উপর ভাসে পুন্নমাসীর চান ॥
আঁখিতে পলক নাহি মুখে নাই সে বাণী
পারেতে খাড়াইয়া দেখে উমেদা কামিনী ॥
স্বপ্নের হাসি স্বপ্নের কান্দন নয়ান চান্দে গায়
নিজের অন্তরের দুস্কু পরকে বুঝান দায় ॥

নাথ গীতিকা

গোপী চাঁদের পালা

নাথ গীতিকার ময়নামতী এবং গোপী চাঁদের পালা গান কিংবা মানিক চাঁদের পালা গানের বিষয়বস্তু এক। পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচিত 'রংপুর গীতিকা'-র মধ্যে এ বিষয়টির উপর সম্যক আলোকপাত হয়েছে। গোপী চাঁদের পালা গানের অনুরূপ কিছু কিছু গান শোনা যায় দিনাজপুরের নাথ সম্প্রদায়ের মধ্যে এবং সেখানে প্রথমেই দেখানো হয়েছে রাজা মানিক

চন্দ্রের রাজত্বে প্রজারা কেমন সুখে শান্তিতে বসবাস করতো, তার বর্ণনা পাওয়া যায় নিচের গানটিতে।

'কারো পুকুরির জল কাঁহো না খায়,
যিনে বান্দী পিন্দে পাটের পাছুয়া
একতন তেকতন করি রাত্র যায়
তারও দুয়ারত ঘোড়া
সোনার ভেটা দিয়ে রাইয়ে
তরা ছাওয়ালে খেলায়
হেন দুঃখিত্ কাঙাল নাই
যে ধরিয়া পালায় ॥

কিন্তু এ সুখ বেশি দিন স্থায়ী হ'ল না। দেশে অজন্মা, দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। রাজা মাণিক চন্দ্র প্রজাদের অভাব অভিযোগ দূর করার যথাসাধ্য চেষ্টা করলেন। শেষে তাঁর প্রয়াণ কালে রাণী ময়নামতীর কাছে রাজা অভিজ্ঞান মন্ত্র শেখার চেষ্টা করলেন। যে মন্ত্র রাণী তাঁর গুরু হাড়িসিদ্ধার কাছে শিখেছিলেন। স্বামীর পীড়াপীড়িতে রাণী সে মন্ত্র স্বামীকে শেখানোর সময়ই রাজার অন্তিমকাল হাজির হ'ল। রাজা তৃষ্ণা রোগে আক্রান্ত হলেন। তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যেতে লাগলো, রাজা পাটরানী ময়নামতীকে জল আনার আদেশ করলেন। কিন্তু রানী জানেন, এ সময় তিনি রাজার কাছছাড়া হলে মৃত্যুদূত এসে রাজাকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে। তাই স্বামীর প্রাণ রক্ষার জন্য রাণী জল আনতে না যাবার জন্যে অজুহাত দিতে, রাজা রাণীর চরিত্র সম্পর্কে সন্ধিহান হ'ন এবং রানীর অজুহাতে কান না দিয়ে বলেন—তোমার হাতের জল খাইলে বহুভাগ্য হয়' ॥....

—একথা শোনার পর পাটরাণী ময়নামতী অনিচ্ছাসত্ত্বেও সোনার ঝারি হাতে জল আনতে গেলেন। ঠিক সেই মুহূর্তে মৃত্যুদূত এসে রাজাকে নিয়ে গেলেন। রাজা মাণিক চন্দ্রের প্রয়াণ ঘটলো। এরপর রাণী ময়নামতী নাবালক পুত্র গোপীচন্দ্রকে (গোপী চাঁদ) সিংহাসনে বসিয়ে, তার হয়ে রাজত্ব চালাতে লাগলেন।

গোপীচন্দ্র ষোল বছরে পা দিতে না দিতেই রাণী ময়নামতী পরমাসুন্দরী রাজকন্যা অদুনার সঙ্গে ছেলের বিয়ে দিলেন। এবং গোপীচন্দ্র অদুনাকে বিয়ে করান সঙ্গে সঙ্গেই অদুনার বোন পদুনাকে ফাউ হিসাবে লাভ করলো।

দুই বউকে নিয়ে গোপী চাঁদের সুখের দিন কিন্তু বেশিদিন স্থায়ী হ'ল না। রাণী ময়নামতী কৌশলে তাকে বারো বছরের জন্যে সন্ন্যাস ধর্ম পালন করতে বাধ্য করলেন নানান অছিলায়। এই বারো বছর নাকি গোপী চাঁদের অত্যন্ত খারাপ সময়, দুষ্ট গ্রহের প্রকোপ ইত্যাদি। তবে এ দোষ কাটবে যদি গোপীচন্দ্র সন্ন্যাস ধর্ম পালন করে।

সন্ন্যাস যাত্রার কালে গোপী চন্দ্র তার দুই স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে এলে অদুনা বলে —

'যখন আছিলাম রাজা বাপ-মায়ের ঘরে
তখন কেনে ধর্মী রাজা নাই যান সন্ন্যাস লইয়ে' ॥

এ কথায় গোপী চাঁদের মন টলে যায়। সে মায়ের কাছে এসে বলে — 'সন্ন্যাস

ধর্ম করে কি হবে? এই দেহ, এই মনই তো সব। এখানেই সব পাওয়া যাবে।' সে বলে —

'হিদ্দে গয়া হিদ্দে গঙ্গা হিদ্দে বারাণসী
মুখে হইল জপতপ মস্তকে তুলসী ৷৷........

এ কথার উত্তরে রাণী ময়নামতী বলে —'মাছ চিনে গহীন গাঙরে, পঙ্খীয়ো চিনে ডাল, সে জানে ছাওয়ালের আদর যার বুকে আছে শাল।'

তখন গোপীচন্দ্র বলে ঃ 'হাড়ির খাইছ গুয়া মা, হাড়ির খাইছ পান। ভাব করিয়া শিখিয়া নিছ হাড়ির গেয়ান। হাড়ির গেয়ানে তোমার গেয়ানে একত্র করিয়া শ্যাশকালে হবে ঘর। ঐটা হাড়িক্ নিয়া'।

রাণী ছেলের ওই কটুক্তিতে কান দিলেন না। নানান যুক্তি তর্কে ছেলেকে সন্ন্যাস নিতে বাধ্য করলেন। এরপর - গোপীচন্দ্র সন্ন্যাস কালে হাড়ীর সঙ্গে দেশ - দেশান্তরে ঘুরতে ঘুরতে এক সময় বন্দী হলেন হীরা নটীর জালে। হীরা, গোপীকে প্রলুব্ধ করল তার রূপ যৌবন দিয়ে। কিন্তু গোপী চাঁদের এই সমস্যায় তাকে রক্ষা করল, তার গুরু গোরক্ষনাথের উপদেশ —

'ফুল গুটিক গুটিক দেখিয়া বাছা
ফুল না পাড়িব,
পরার বৌ মানুষ দেখিয়া,
মাও ডাকিব'। .....

তাই হীরার মোহিনী জাল গোপীচাঁদকে বন্দী করে রাখতে পারলো না। সে নটীকে বলে —

'কি তুঞিও নেহালাইস নটী..
তোর পাঞ্জায় পাঞ্জায় চুল
দুই তন দেখউ যেন আরা ধুতরার ফুল' ৷৷...

এতে নটী ক্রোধান্ধ হয়ে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্যে উঠে পড়ে লাগলো। কিন্তু কোন ফল হ'ল না। হীরার কবল থেকে মুক্ত হয়ে গোপীচন্দ্র আবার শুরু করল সন্ন্যাস জীবন। তারপর বারো বছর সন্ন্যাস জীবন শেষ করে এসে দাঁড়ালো রাজপুরীর সিংহদ্বারে। তখন প্রায় কেউই তাকে চিনতে পারলো না। কিন্তু চিনে ফেললো গোপীচন্দ্রের দুই স্ত্রী। এরপর স্বামী -স্ত্রীর মিলন হ'ল।

খবর রটে গেল রাজ্যময়। প্রজারা আনন্দে আত্মহারা। সারা রাজ্যে শুরু হ'ল আনন্দ উৎসব। গোপীচাঁদ রাজ্যভার গ্রহণ করে সিংহাসনে আরোহন করেই তার মা রাণী ময়নামতী ও তার গুরু ভাই হাড়িফাকে শাস্তি প্রদান করার পর গোপীচন্দ্রের শুরু হ'ল নতুন জীবন, সুখের জীবন।

প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা

আচার্য দীনেশ চন্দ্র সেনের পরে অনেকে ব্যক্তিগত ভাবে এই কাজে উদ্যোগী হয়েছেন। দীনেশ চন্দ্রের সংগৃহীত বিষয়বস্তুকে মুখ্য উপকরণ করে ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক মহাশয় 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা' শীর্ষনামে সাত খণ্ডে গীতিকা প্রকাশ করেন।

পূর্ব উল্লেখিত গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় তিনি উল্লেখ করেছেন — "সুপ্রাচীনকাল হইতে পূর্ববঙ্গে পল্লীকবি রচিত সত্যঘটনামূলক পালা গানের প্রচলন আছে। যাঁহারা রামলীলা বা পদকীর্তনের আসরের মত আসর করিয়া পাছ দোহার ও বাদ্যযন্ত্রাদি সহযোগে সমগ্র পালাগান করেন, তাঁহাদের 'গায়েন' বলা হয়। .... পূর্ববঙ্গে বিবাহাদি উৎসব পূজাপার্বণ ও বারোয়ারি উপলক্ষে গায়েন ডাকিয়া পালাগান দেওয়া হয়। ইহাতে গায়েনদের বেশ ভালো প্রাপ্তি হইয়া থাকে। পূর্ববঙ্গে মৈমনসিংহ, ঢাকা, নোয়াখালী ও ফরিদপুর জিলার হিন্দু মুসলমান কৃষকদের মধ্যে একটা সুদৃঢ় বিশ্বাস আছে, দেশে অনাবৃষ্টি দেখা দিলে ভালো গায়েন পালাগান গাহিয়া বৃষ্টি নামাইতে পারেন। এরূপ ক্ষেত্রে গায়েন কোন পারিশ্রমিক গ্রহণ না করিয়া 'মহুয়া', 'মলুয়া', 'কাঞ্চনমালা' প্রভৃতি পালার মত করুণ-রসাত্মক পালা প্রয়োজনমত কয়েক রাত্রি গান করেন এবং গানের সঙ্গে একটি বিশেষ ধুয়া পাছ দোহার গাহিয়া থাকে —

ও কালা মেঘরে, একবার ফিইর‍্যা চাও,
এক মুইট্ গালের ভাত গাই ।" —

(প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা — প্রথম খণ্ড; ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক ঃ ভূমিকা (।।/ন—।।থ)

আর এক শ্রেণীর গায়কদের বলা হয় 'বয়াতী'। 'বয়াতী' ও 'বাইতি' কিন্তু একই অর্থে প্রযোজ্য নয়। পূর্ববঙ্গে বরিশাল, নোয়াখালি, ঢাকা ও ফরিদপুর জেলার দক্ষিণাঞ্চলে ঢাক-ঢোল-সানাই বাদকদের 'বাইতি' বলা হয়।

বয়াতিরা বিভিন্ন পালা থেকে নিজের পছন্দমতো গান সংগ্রহ করে, সেই গান ইচ্ছামতো সুর দিয়ে পরিবেশন করত। কোন পালার সম্পূর্ণ গান বা সমস্ত গান গাইত না। অনেক বাইতি পালার সম্পূর্ণ গান জানতো না।

আবার এমনও হয়েছে যা ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিকের ভাষায় — "বয়াতীরা বিভিন্ন পালা হইতে নিজের পছন্দমত গান সংগ্রহ করিয়া সেই গান ইচ্ছামত সুর দিয়া গান করেন, কোনো পালাই সমগ্র গান করেন না। অনেকে সমগ্র পালাটিও জানেন না। ইহাদের খাতায় কোনো সম্পূর্ণাঙ্গ পালা আমি দেখি নাই। বয়াতীদের খাতায় এমন অনেক গান দেখিয়াছি যাহা বোধ হয় কোনো পালার গান নহে। এই প্রকার গানকে ঐ দেশে 'ছুটাগান' বলে।"

বয়াতীর নিজস্ব কোনো দল নেই। সমবেত জনমণ্ডলী অর্থাৎ দর্শক সাধারণ অথবা কর্মরত শ্রমিকগণ বয়াতীর গানের সুর বা লহর টানেন। বেহালা, সারিন্দা, দোতারা — এইসব বয়াতীর হাতের বাদ্যযন্ত্র'। দালান বাড়ীর ছাদ পিটানো ও হাটুরে বড় বড় ছিপ-নৌকোর পঞ্চাশ - ষাট খানা হাত বৈঠা তালরক্ষার জন্যে উপযুক্ত ভাবে নিযুক্ত হতো। এ ছাড়া বড় জোতদারের জমি নিড়ান ও পাট রোয়ার সময় শ্রমিকদের শ্রমলাঘবের জন্যে বয়াতীর গান দেবার প্রচলন ছিল।

বয়াতীর পালায় যে সব 'ছুটাগান' পাওয়া গিয়াছে সে সব ছুটাগান সংগ্রহ থেকে তিনি একাধিক গানের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তার মধ্যে একটি উদ্ধৃতি দিলে বোঝা যায় যে লোককবিরা কতটা আধুনিক ছিলেন; যা আজকের দিনের সমাজ ব্যবস্থার কাহিনীর সঙ্গে প্রায় পাশাপাশি স্থান পেতে পারে।

সংগৃহীত গানটির বিষয়বস্তু যেভাবে বর্ণিত হয়েছে তা হ'ল — বাল্যকালে দুজনের বিয়ে হয়েছে। দুজনেই কৈশোরে উপনীত। উভয়ে মিলনের জন্য ব্যাকুল। বাড়ীর অভিভাবকগণ

দুজনকেই পৃথক রাখেন। কিশোর তার প্রিয়তমাকে সঙ্কেতে মিলনের ইঙ্গিত করে। কিশোরী বধূটি তার ইচ্ছার প্রতিবন্ধকতার বিষয়টি যেভাবে বিবৃত করে তার স্বাভাবিক প্রকাশ সত্যই মুগ্ধ করে। গানটি এরূপ —

মোর পায় বা ঘুঙরা বাজে রে
মই কেম্‌নে বাইরা যাওঁ।
ঘুঙরা ঝামুর ঝুমুর বাজেরে
মুই কেম্‌নে বাইরা যাঁও ॥
ঘরে শউর বাইর‍্যা ভাসুর
হিয়রে ননদী জাগে রে
মুই কেমনে বাইর‍্যা যাওঁ ॥
কোন বা দ্যাশের রসিয়া বাইন্যা রে
মোরে ঘুঙরা বানাই দ্যাছে।
সেই না ঘুঙরার প্যাটভইরা
কালাই পুইরা দ্যাছে ॥

ঠাসিয়া ধরোম্‌ চিপিয়া ধরোম
মুই আস্তে ফ্যালাও পাও।
তভু না ঘুঙরা বাইজ্যা উঠে
মুই কেমনে বাইরা যাওঁ ॥

জলের কলসী কাক্কে কইর‍্যা রে
মুই কেম্‌নে ঘাটে যাওঁ।
পুড়া ঘুঙরা মোকে ছাইড়া
ননদীর পায় বা যাও।

ঘুঙরা ঝামুর ঝুমুর বাজে রে
মুই কেমনে বাইরা যাওঁ ॥

উক্ত সঙ্গীতের আখ্যানটিতে স্বামী-স্ত্রীর মিলনের জন্য স্ত্রী উল্লেখ করছে পায়ের ঝুমুর হয়েছে প্রতিবন্ধক। সুতরাং ঐ ঝুমুর জোড়াটি ননদীর পায়ে গেলে সকল দিক থেকেই সমস্যার সমাধান ঘটবে। কিন্তু স্বামীর সেরূপ প্রভাব না থাকায় এই সমস্যার কোন সঠিক সমাধান কার্যকর হয়নি। তাই স্ত্রীর আক্ষেপ ফুটে উঠেছে —ঘুঙরা ঝামুর ঝুমুর বাজে রে, কেমনভাবে বাইরে যাই। এই 'ঝামুর ঝুমুর' শব্দ চেতনায় জাগিয়েছে বেদনার রূপ।

মুড়াই সুরের গান শোনা যায় ত্রিপুরা ও চট্টগ্রাম জেলার পার্বত্য অঞ্চলে। ঐ অঞ্চলের পাহাড়কে মুড়া বলে। কণ্ঠস্বর যথেষ্ট উচ্চগ্রামে না হলে মুড়াই সুর সম্ভব নয়।

সাইগরী বা সাওরী সাধারণত দক্ষিণাঞ্চলের নৌকার মাঝিদের গানের সুর।

সেকালে এইসব পালাগানের কবি বোধহয় কল্পনা করতে পারেননি যে এককালে তাঁদের রচিত পল্লীগাঁথা মুদ্রাযন্ত্রে ছাপা হবে। তাদের কাছে এ ব্যাপারটি অলীক ছিল যে শিক্ষিতজন তাদের রচনাতে আগ্রহী হবেন। তাঁদের রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য থাকতো নিরক্ষর জনসাধারণ। সেজন্য গায়েন, বয়াতীদের গাইবার উপযোগী ভাষাতে তাদের পালা রচনা করতেন।

পূর্ববঙ্গের এই প্রাচীন পালাগুলি অধিকাংশই সত্য ঘটনা অবলম্বনে রচিত হয়েছিল। এ যুগে যেমন mass media সংবাদপত্র — পূর্ববঙ্গে এ পালাগুলি সেরকম সংবাদপত্রের কাজ করেছে। লোককবি রিপোর্টারের মত তার পালাতে প্রকৃত ঘটনার বর্ণনা করেছেন। আচার্য দীনেশচন্দ্র লিখেছেন —

'চাষীরা রাজারাজড়াদের সম্বন্ধে যে সকল গান রচনা করিয়াছে তাহাতে স্থানে স্থানে উদ্ভট কল্পনা ও অতিরঞ্জনের বিকৃতি সহজেই প্রবেশ করিয়াছে। কিন্তু তথাপি সেগুলি অন্ধকার যুগের ঐতিসাহিক রহস্যের অনেকটা সমাধান করিবার উপকরণ বহন করিতেছে।'

প্রচলিত ইতিহাস গ্রন্থে রাজারাজড়াদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ব্যয় বহুলতা এবং ঐশ্বর্যপূর্ণ পরিবেশ নিয়ে লেখা হয়েছে। সুতরাং তা বিখ্যাত ব্যক্তিদের উত্থান-পতন ও জৌলুষের কাহিনী। দেশের প্রজাসাধারণের আর্থিক, সামাজিক ও নাগরিক অধিকার সম্পর্কে বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে এইসব পল্লীকবির লেখায় দেশের জনসাধারণের অবস্থার যে বর্ণনা পাওয়া যায় তা একান্তই বাস্তব। কারণ পল্লীকবি অন্যান্য পল্লীবাসীর মতোই জীবনযাপন করেছেন এবং পল্লীজীবনের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনায় তিনি কখনও বিহ্বল কখনও বিমর্ষ কখনও আনন্দোৎসাহিত। রাজানুগ্রহ বা নামযশের আকাঙ্খায় তারা ছিলেন না। সুতরাং তাদের রচনাপ্রভাব সাধারণের বলে ধরে নেওয়া যায়। মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যের বেশীর ভাগ শিক্ষিত কবিই রাজানুগ্রহলাভে অত্যুৎসাহী ছিলেন। আর এরা তা বর্জন করেছিলেন বলেই প্রকৃত অবস্থাকে বর্ণনা করতে কোথাও ক্লান্তিবোধ বা পরিমিতিবোধ করেন নি।

বাংলাদেশে মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার পর, শাসন ব্যবস্থায় শাসকগোষ্ঠীতে প্রধান স্বরূপ নবাব বা বাদশাহ কিরূপ ছিল এবং তা শাসনযন্ত্রে কিরূপ প্রভাব বিস্তার করতো এবং জনসাধারণের ধন-প্রাণ, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, আর্থিক-সামাজিক অবস্থান বা সম্পর্ক বা ধর্মীয় সত্তা রক্ষার কিরূপ ব্যবস্থা ছিল যা রাজবংশানুক্রমিক সাধারণ ইতিহাসে পাওয়া যায় না কিন্তু এগুলির মধ্যে তার প্রভুত উপকরণ আছে। সে যুগে হিন্দু সমাজে অস্পৃশ্যতা, জাতিভেদ প্রথার কঠোরতা, শিশুকন্যার বিবাহ, সতীদাহ, নর-নারীর প্রণয় সম্পর্কিত কঠোরতা প্রভৃতি বিষয়গুলি এই পালাগুলিতে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছে।

এই পালাগুলিতে আর একটি ঐতিহাসিক তথ্য জানা যায় যে প্রাক্ ব্রিটিশ যুগে বাংলা দেশের হিন্দু ও মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে কোন সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছিল না। ধর্মের দিক থেকে পরমত সহিষ্ণুতা এ অঞ্চলে ছিল। কবি, গায়েন ও বয়াতিগণ উভয় সম্প্রদায়ের দেব-দেবতা, পীর-পয়গম্বর তীর্থস্থানের বন্দনা করে গান রচনা করে আপামর জনসাধারণের কাছে তা গেয়েছেন।

ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক পূর্ববঙ্গের মৈমনসিংহ, ঢাকা, ফরিদপুর, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরা — এই ছয়টি জেলা থেকে প্রাচীন পালাগান সংগ্রহ করেন। সেন মহাশয়ের সংগ্রাহকগণের অনুসন্ধানও ঐ ছয়টি জেলার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এ জেলাগুলির পল্লী অঞ্চলে

বহু গায়েন ও বয়াতীর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ঘটেছিল যাতে গায়েন ও বয়াতীদের লিখিত খাতাপত্র দেখে তিনি লিখে নেবার সুযোগ পেয়েছিলেন এবং কোথায় কার কাছে কি আছে তার সন্ধানও বয়াতি ও গাঁয়েনরা তাঁকে দিতেন।

আচার্য দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয়ের মৈমনসিংহ গীতকা ও পূর্ববঙ্গ গীতিকার কাহিনীর কাঠামো মোটামুটি বজায় রেখে তিনি সাত খণ্ডে প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা প্রকাশ করেছেন। কিন্তু আচার্য দীনেশ চন্দ্রের সঙ্গে এই গীতিকার শিরোনাম সব এক নয় বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই পার্থক্য আছে। তার তালিকা পরে যুক্ত করা হলো।

রংপুর গীতিকা

রংপুর পূর্ব-বাংলার একটি অঞ্চল। এই অঞ্চলের বিশেষ লোক সঙ্গীত গাথা রংপুর গীতিকা। যা একসময় বহুল প্রচলিত ছিল বর্তমানে তাঁর অনেকখানিই হারিয়ে গিয়েছে। 'মহুয়া পালা'র মতনই এগুলি কাহিনী অবলম্বনে রচিত যাতে। আরবী, পারসী, কিস্‌সা কাহিনীর প্রভাব পড়েছে। তবে রংপুর গীতিকা একটু স্বতন্ত্র ধরণের। তাই একে গীতিকা না বলে আখ্যান কাব্য বলাই ভাল। রংপুর গীতিকায় আটটি পালা এ পর্য্যন্ত উদ্ধার করা হয়েছে যথা (১) কইন্যা আনোয়ারের কলি (২) জসমত খাঁ (৩) কলি রাজা (৪) মানিক পাল রাজা (৫) জয়পুর বাদশা (৬) হলুদ বাদশা (৭) অওশন কন্যা (৮) জেলকদ বাদশা।

পালাগানের প্রথম সংগ্রাহক স্যার জর্জ এব্রাহাম্ গ্রীয়ারসন সাহেব যিনি ১৮৭৩ সাল থেকে ১৮৭৭ সাল পর্যন্ত সময় কালে রংপুরের প্রশাসক ছিলেন। তাঁর প্রচেষ্টায় মাণিক চন্দ্রের গান, গোরক্ষনাথের গান প্রভৃতি পালাগুলি সাধারণ জনসমাজের কাছে পৌছায়। পূর্বে এই পালাগানগুলি জনসাধারণের মধ্যে মুখে মুখেই ফিরতো। লিখিত কোন তথ্য পূর্বে ছিল না। ১৯৭৭ সালে বদিউদ্দাজামানের সম্পাদনায় বাংলা একাডেমী - ঢাকা ৮টি পালাগান সম্বলিত "রংপুর গীতিকা" নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেছে।

গীতিকাগুলি গাওয়ার রীতিনীতি সম্বন্ধেও তিনি বলেছেন যে চার জনে মিলে গাওয়া হতো। সমবেতভাবে কখনোই গাওয়া হোত না। একজনে এক অংশ গাওয়ার পর অন্য জনে তার পরের অংশ গাইতেন। এইভাবে ক্রম অনুসারে পালাটি গতিময় হয়ে উঠতো। ধুয়ার প্রচলন থাকতো যেমন - হে রাজা, হে ময়না, হে জমে, আরে ওহে, আরে হায় ইত্যাদি অর্থাৎ বক্তা কথাটি শেষ করার পর সেই কথার সঙ্গে উপরের শব্দগুলি যুক্ত হয়ে ধুয়া ধরা হোত।

রংপুর গীতিকা ঃ

গীতিকা সংগ্রহের প্রথম কৃতিত্ব স্যার জর্জ এব্রাহাম গ্রীয়ারসন সাহেবের। তিনি 'মাণিক চন্দ্রের গান' —'The Song of Manik Chandra' একজন সাধারণ কৃষকের নিকট থেকে সংগ্রহ করেন এবং মোট ৭৩৩১ লাইনের গীতিকাটি দেবনাগরী অক্ষরে মূল বাংলাপাঠের সঙ্গে সহজ ও প্রাঞ্জল ইংরেজী অনুবাদ সহ ১৮৭৮ -এর 'জার্নাল অব এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল' পত্রিকায় [JASB, XLVII (1878), pp. 135-228] প্রকাশ করেন। ভাবতে অবাক লাগে ১৮৭৩ সালেই গ্রীয়ারসন ইংরেজী ষ্টাফ নোটেশনের মাধ্যমে গানটি কিভাবে গাওয়া হত তার বিজ্ঞান সম্মত বিবরণও রাখেন। আরও অবাক হতে হয় পরে ভিন্ন সূত্র

থেকে আবিষ্কার করে, অনুরূপ আখ্যান কাহিনীর তিনি মূল পাঠ আবার লিখিয়ে নেন। গীতিকাটি কি ভাবে গাওয়া হত সে সম্বন্ধে তিনি বলছেন ঃ "'The song is usually sung by four men, and in parts, not in union. This is sung chant-like, so as to go once to each line but leaving the three last notes without words "He Raja, He Mayana" or "He Jame" or "some such apostrophe which depends on the person whose adventure are being immediately narrated are sung to a short burden." [Ibid, p. 147]' গ্রীয়ারসন সাহেব পরবর্তীকালে বিহারের ভোজপুরী, গয়ার নিকটবর্তী মাগহি এবং বিহারের এক বাজার থেকে আরও একটি পাঠান্তর সংগ্রহ করেন ["Two Versions of the songs of Gopi Chand" ibid., LIX (1885) pp. 35-55]; আমাদের মনে রাখতে হবে গ্রীয়ারসনের সংগ্রহগুলি প্রকাশিত হওয়ার পরেই লোক-গীতিকা, বিশেষ করে লোক সাহিত্যের উপরে এদেশীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। পরবর্তীকালে ময়নামতী এবং তৎপুত্র গোপীচন্দ্রের কাহিনী নিয়ে বহু গ্রন্থাদি সম্পাদিত ও প্রকাশিত হয়েছে। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঃ আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদ, গোরক্ষ বিজয় (সাহিত্য পরিষদ, কলিকাতা ১৩২৪, ১৯১৭); আশুতোষ ভট্টাচার্য, গোপীচন্দ্রের গান (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৯) গুপিচন্দ্রের সন্ন্যাস, আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া (বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৪); প্রভৃতি। গ্রীয়ারসন সম্পাদিত Linguistic Survey of India, Vol.V (1903), খণ্ডের (pp. 186-194) বিভিন্ন পর্যায়ে রংপুর অঞ্চলের বহুগান যা পরবর্তীকালে আব্বাস উদ্দীন কর্তৃক গীত এবং তার সংগ্রহেও (আব্বাস উদ্দীনের গান, ঢাকা, ১৯৬১) পাওয়া গেছে, সেগুলি রংপুরের বহু বিচিত্র লোক ঐতিহ্যের পরিচায়ক। প্রখ্যাত লোকসংস্কৃতিবিদ Dr. Ashraf Siddiqui, তাঁর 'Bengali Folklore and Sir George Grierson', Bangla Academy, Journal, 1973; pp. 44-48; ibid, Folkloric Bangladesh, Dacca, 1977]; এ থেকে জানা যায় রংপুরের বিচিত্র লৌকিক ঐতিহ্যের আরও স্পষ্ট চিত্রের পরিমাপ সম্ভব হবে ১৮৬৭ থেকে রংপুরের আরও একজন ইংরেজ প্রশাসক জি. এইচ. ড্যামেন্টের (G. H. Dament) অপূর্ব সংগ্রহগুলি থেকে [Tales from Bangladesh, Callected by a Britisher, ed. by Dr. Ashraf Siddiqui, Dacca, 1976]; টম্পসন ও রবার্টস এবং বেলিসের ইন্‌ডেক্সের মাধ্যমে [Thompson - Roberts, Types of Indic Oral Tales FFC. No. 180 (Helsinki, 1960); Thompson - Balys The Oral Tales of India (Bloomington, 1958)] রংপুরের লোক ঐতিহ্য, যা আজ আন্তর্জাতিক পর্যায়ে স্বীকৃত। একথা আজ স্বীকার করতেই হবে যে বাংলার গীতিকা এবং লোক সংস্কৃতির গুরুত্বের উপর এদেশীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন বিদেশীয় সিভিলিয়ান, মিশনারী এবং নৃতত্ত্ববিদগণ (Tales from Bangladesh, Dr. Ashraf Siddiqui; ed.) ভূমিকা, pp. I-XXII এবং Folkloric Bangladesh, pp. 60-80 দ্রষ্টব্য); ডক্টর দীনেশ চন্দ্র সেন সম্পাদিত মৈমনসিংহ ও পূর্ববঙ্গ গীতিকা, বিশেষভাবে পরিচিত। বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত হওয়ার ফলে এসব গীতিকা এখন বিশ্ব পরিচিতির গৌরব অর্জন করেছে। আমাদের মনে রাখতে হবে ১৮৭৩ -এ গ্রীয়ারসন সংগৃহীত রংপুরের লোকগীতি এবং আব্বাসউদ্দীন গীত এক নয়। ভিন্নতার কারণ সময়।

গ্রীয়ারসন দেখা পেয়েছিলেন চলমান স্রেতোস্বতীর। আব্বাস উদ্দীন-এর সময় সে স্রোতধারা স্তিমিত, কিছুটা বিস্মৃত, সম্ভবতঃ অবহেলিতও। লোক সাহিত্যে গীতিকা রচনার একটা যুগ ছিল যাতে 'ট্রাডিশন্যাল' বা 'ফোক ব্যালাড' রচিত হত। এখন সে পরিবেশ আর নেই।

রংপুর অঞ্চলের সংগৃহীত 'গোপীচাঁদের গান' ছাড়া অন্যান্য সংগৃহীত পালার অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয় উল্লেখ করা হলো।

কইন্যা আনোয়ার কলি

কইন্যা আনোয়ার কলির অপরূপ রূপে মুগ্ধ হলেন বইরাট নগরের শাহ্য এমরান। তিনি গৃহত্যাগী হলে ইরাণের রাজকন্যা জাদু বলে তাকে কদম ফুলে পরিণত করে। কদম ফুলটি কন্যার খোপা থেকে দাঁড় কাকে নিয়ে যায়।

রাজা সেই দাঁড় কাকটিকে মারবার অনেক চেষ্টা করেন। কিন্তু ব্যর্থ হলেন। অবশেষে দাঁড় কাক আনোয়ারের দেশে চলে যায়। অনেক দুঃখ কষ্টের সাথে লড়াই করে আনোয়ারের সাথে প্রেমার্থী এমরানের মিলন হয়।

পালাগানটি রংপুরের হরিপুর ডাকঘরের এলাকাধীন কেল্লাবাড়ী গ্রামে মোহম্মদ আছুর উদ্দীনের কাছ থেকে সংগ্রহ করা হয়।

'কইন্যা আনোয়ারের কলি' পালাটিতে কিস্সার সুদূর প্রভাব মিশ্রিত। বাংলা দেশের লোক ঐতিহ্যের নিজস্ব ধারাও এই পালাগানের মধ্যে উল্লিখিত।

এমরান ও কলির মিলনও যেন সুস্থির নয়। দুজনে, দুজনকে দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর কাছে পেয়ে যেন দুজনেই আত্মহারা। দুটি শরীর যেন মিলনাকাঙ্খায় আকুল। তা দেখেই দাসী বাঁদীরা চলে যায় আড়ালে। পালার বর্ণনায়

'যতো আছিল দাসী বান্দি
তপাত হয়া গ্যালো
হুস হয়া দোনো জেনে
গাও গোচোল দিল রে।
(হায় হায় দারুণ বিধি আরে হায়)
হাতাহাতি চাইর জেন
নিজ পুরিতে গ্যালোরে
(হায় হায় দারুণ বিধি আরে হায়)
তকতো বসিলো এমরান
আনারসীর হইলো আলী
দেওয়া লোক আইজ্জো দিয়া এমরান
থাকে ভেতোর বাড়ীত রে ॥'
(হায় হায় দারুণ বিধি আরে হায়)

জসমত খাঁ

রাজা জসমত খাঁর হঠাৎ ইচ্ছে হল বিয়ে করবেন। দেওয়ানকে আদেশ করেন তাঁর জন্য চারজন রূপসী কন্যার সন্ধান করতে।

তখন বৃদ্ধ রাজার বাসনা পূরণ করতে দেওয়ান বহু অর্থ ব্যয়ে দেশ দেশান্তরে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। পথিমধ্যে এক উন্মাদের দেখা পেলেন। তাঁর কণ্ঠে পাঁচ রাজার ধন। সুতরাং সে রাজার মতোই বিত্তশালী। দেওয়ান তার সঙ্গে আলাপ করে জানতে পারল সাতজন যুবতী তাঁরও প্রয়োজন। তখন তারা দুজনে একই গন্তব্যে যাত্রা করল। তারা দুজনেই এক অরণ্যবাসী কন্যার কাছে গেল। দুজনের এগারোজন কন্যার প্রয়োজন। হঠাৎ সেখানে এগারো জন পরীর আবির্ভাব হল। এগারোটি কন্যা নিয়ে ফেরার পথে কন্যারা অদৃশ্য হয়ে গেল।

তখন আর পাগল কন্যা খুঁজতে পাতাল নগরে চলে গেল এবং সেখানকার খয়বর রাজার পাঁচ কন্যা ও তিন দাসীকে নিয়ে আগের পরিত্যক্ত স্থানে ফিরে আসলে এক দেওয়ের সঙ্গে এক মুনি ও এই দুই পাগলের যুদ্ধ হল। দেওকে হত্যা করে মুনি 'মেহের চাঁর' কন্যাকে উদ্ধার করে। কন্যার রূপ লাবণ্যে মুনির বিভ্রম হল। সেই কন্যাকে নিয়ে প্রতিযোগিতা শুরু হল। পালাগানটিতে গান ও ছড়ার সমন্বয়, কয়েকটি উপমা রূপক অত্যন্ত স্পর্শগ্রাহী।

জসমত খাঁ পালাটি রংপুরের শোভাগঞ্জ নিবাসী মামুদের পুত্র আবদুল শেখের কাছ থেকে সংগৃহীত। পালাটির প্রথম অংশ আবদুল শেখের সংগৃহীত এবং দ্বিতীয় অংশ একই গ্রামের ময়েন উদ্দীনের মৃত পুত্র নওশের আলীর কাছ থেকে সংগৃহীত।

পালাপর্বে রাজকুমার এজমালের সঙ্গে রূপসী মেহের চাঁদের দেখা ও প্রেম পরিণয়ে পরিণত। তারপর দাম্পত্য জীবন। মেহের চাঁদের পুত্রসন্তান লাভ। সতীন রাবেয়া সেই সদ্যজাত শিশুকে মেহের চাঁদের অচৈতন্য অবস্থার সুযোগে তার দাসীর সাহায্যে নদীচরে ফেলে দিয়ে আসে। এরপর নদীর চর থেকে পরীরা নিয়ে যায় সেই চাঁদের মত শিশুকে। তারপর—

পলোকে চলিয়া গ্যালো
পরীস্থান শওরে,
হাজেরা পরীর মাওয়ে
পাইলো দ্যাকিবারে
(আরে ওহে)
এ্যাকে তো পরীরো অইন্যা
বড়ো দয়াবান
পাইলবার লাগিলে বাচাক
জানেরো সোমান ॥

কলি রাজা

শাকরামপুর শহরের রাজা কলি তার পুত্র জাফরকে জলন্ত কাহাপের এক কন্যা 'রমিছার সঙ্গে বিয়ে দিল। খোয়াজপীর ভক্ত রমিছা স্বামীর বিছানা ছেড়ে চুপি চুপি প্রতি রাতে খোয়াজের কাছে প্রার্থনা করতে বসতো। একদিন কলি রাজা রমিছাকে মৃত দেহের মাংস খেতে দেখে অভিশাপ দিল—বারো বছরের জন্য রমিছাকে স্বর্গমর্তের মাঝখানে ত্রিশঙ্কু অবস্থায় কালযাপন করতে হবে।

রমিছাকে হারিয়ে মনের দুঃখে জাফর পত্নীর খোঁজে দেশান্তরী হল। পুত্রের পিতাও

বের হল পুত্রের অনুসন্ধানে। কলিরাজা অবশেষে দানব রাজ্যে গিয়ে পৌঁছাল। দানব রাজ কলিরাজাকে জিভে লোহার শৃঙ্খল পরিয়ে গাছের ডালে ঝুলিয়ে রাখে বারো বছরের শাস্তিতে। অভিশাপের দিন শেষ হলে রমিছা ও জাফরের মিলন হল। কলিরাজাও মুক্তি পেয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করল।

'কলি রাজা' পালাগানটি রংপুর হরিপুর ডাকঘরের এলাকাধীন কেল্লাবাড়ী গ্রামের হেদায়েত উল্লার মৃত পুত্র মোহাম্মদ আছুর উদ্দিনের সংগৃহীত।

কলিরাজার ছেলে জাফর তার স্ত্রী রমিছাকে তন্ন তন্ন করে খুঁজতে খুঁজতে এসে দাঁড়াল এক জঙ্গল ঘেরা পাহাড়ে। সেখানেই জাফর রমিছার মিলন হয়

দিনে আইতে চলে শুন্নে
আরে ওহে
আরাম নাই যে করে
কতো দিন হাটিয়া গ্যালো
আরে ওহে
জাপোর আজা যে পাহাড়ে।
ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে।

ঘিরাও করিয়া নিলো পাহাড়ে
আরে ওহে
ধনু সইগ্ গইরে হাতে
মইছো জংগোলে স্মায়া মগলে
আরে ওহে
জ্যাপোর আজাক দ্যাকে।
(ও মোর বিদাতা
এই করিলু বিদি আরে ওহে)।

মানিকপাল রাজা

উজানী নগরের মানিক পাল রাজার সুকন্যা বুকে আজোলের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে যৌবন উচ্ছল হয়ে উঠতে পিতা মানিক পাল ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। কন্যাকে পাত্রস্থ করতে রাজা রাজ্যের যুবকবৃন্দকে ডেকে কন্যার সমুখে হাজির করেন। কিন্তু কন্যার একজনকেও মনপসন্দ হয় না। সেসময় পোষা ময়না পাখি বলে, নিছানী নগরের চিলভর রাজা এ-কন্যার স্বামী হবে। তখন ময়না পাখির গলায় কন্যার ছবি ঝুলিয়ে নিছানী শহরের দিকে পাঠানো হল। চিলভরের রাজা সে ছবি দেখেই মুগ্ধ হয়ে কন্যার খোঁজে বেরিয়ে পড়লেন। রাজা দিশাহারা। তাই দেওয়ানের হাতে রাজ্যের দায়িত্ব দিয়ে তিনি মুক্ত বিহঙ্গের মত ঘুরতে থাকেন।

পথে পরীর প্রেমকুঞ্জে পরীকে বিয়ে করে দিন কাটাচ্ছিলেন। একদা নিশীথে বুকে আজোলের স্বপ্ন দেখে আবার তার জন্য প্রস্তুত হয়ে স্বদেশে ফিরে আসেন। ফেরার পথে

একটি আম গাছ দেখে আম খাবার ইচ্ছায় নব পরিণীতা বধূ স্বামীকে কাতর আবদার করে। অন্যের গাছ থেকে আম নেয়া উচিত হবে না বিচার করেই স্ত্রীর অনুরোধ তিনি রাখেননি।

জীবনের প্রথম অনুরোধ ব্যর্থ হলে কন্যা ভীষণ কষ্ট পায় মনে মনে। অভিমান হল প্রচণ্ড। বহুকাল ধরে ওদের মান ভঞ্জনের পালা চলে। অবশেষ সে পর্ব শেষে ওদের জীবনে সুখ আবার ফিরে আসে।

কুড়ি গ্রামের কাশিম বাজার গ্রাম নিবাসী মোশরফ গীতালের কাছ থেকে এই পালা গান সংগৃহীত।

নিছানী নগরের রাজা চিলভর ও তার স্ত্রী মাণিক পাল রাজার কন্যা আজোলের মান অভিমানের সংঘাতে স্ত্রীর মানভঞ্জনে রাজা চিলভরের প্রেম উদভাসিত। গানটিতে স্বামী-স্ত্রীর চিরাকাঙ্খিত প্রেম মূর্ত হয়েছে।

'এই কতা শুনিয়া রে কইন্যা
হাসিয়া উঠিয়া কয়
ভাতার হয়া অই মুকোত ক্যান
এ্যাদান কতা কয় ৷৷

এই কতা শুনিয়া রে আজা
আকুল ভালা হইলো
গাল মুকোত চুমা রে দিয়া
কইন্যাক কোলোত তুলিয়া নিলো।
ওরেদাসী দাসী বুলিয়া আজা
ডাক্‌পার যে লাগিলো
এই দন্‌ডোতে খাবার তোমরা
জোগার করিয়া আনো ৷৷'

জয়নুব বাদশা

জয়নুব বাদশা শিকার করতে ভালবাসেন। এক গভীর অরণ্যে শিকার করতে গিয়ে খুব পিপাসার্ত হয়ে পড়েন। তখন নিরুপায় হয়ে উনি নিজেই পিপাসা মেটাতে জল আনতে যান। সেসময় এক দৈত্যের হাতে পড়ে তার অবস্থা ভয়াবহ হয়ে দাঁড়ায়। তখন উনি নিজে বাঁচার জন্য পুত্র জয়কুদ্দিকে তার হাতে সঁপে দিলেন দৈত্যের খাবার হিসাবে। ঠিক তখন আড়াল থেকে বাদশার পুত্রবধূ সব শুনতে পান। স্বামীকে নিয়ে সে সেই মুহূর্তে পালিয়ে গিয়েও পথে সেই দৈত্যের হাতেই ধরা পড়ে। জয়কুদ্দি আস্ত্রাঘাতে দৈত্যের হাত পা বিচ্ছিন্ন করে ফেলল। ফলে সমস্ত দৈত্য এসে তাকে বন্দী করল এবং মানবে দানবে ভীষণ রকম লড়াই চলল। সেই যুদ্ধে দানবরা মানুষের কাছে হেরে গেল।

এই পালাগানটি বেলকা গ্রামের আজিমউদ্দীন শেখের পুত্র হেলাল উদ্দিন শেখের কাছ থেকে সংগ্রহ করা হয়।

জয়নুর বাদশা অনেক ঘাত প্রতিঘাতের পর তার ছেলে জয়কুদ্দি, ছেলের বউ ও

নাতিকে ফিরে পেল। গানটিতে বাদশার পুত্র, পুত্রবধু, ও পৌত্র ফিরে পাওয়ার উদ্দাম আনন্দ বর্ণিত হয়েছে এরূপে —

'দেইক্‌তে দেইকতে দ্যাকো পরী
পত্‌রো দিয়া আইলো
ওরে পত্‌রো পায়া জয়নুর বাদশা
খুশিতে ভরিলো ॥

হায়রে সৈন্য সেনা নিয়া জয়নুর
ব্যাটাক আইনবার গ্যালো
ব্যাটা বউ আর নাতী পায়া
নাইচ্‌পার লাগিলো ॥
এইদ্যান ভাবে কতপা দিন
গুজরিয়া গ্যালো
মল্লিক বাহাদুরোক আজা করিয়া
তক্‌ তোতে বসাইলো' ॥

হলুদ বাদশা

হল্লব শহরের হলুদ বাদশার কন্যা নওবাহারের বাগানে কন্যার ভাই নওরোজ ফুলপরীর একখানি কাপড় চুরি করে। হাতের আংটি দিয়ে ফুলপরী তা ফিরিয়ে আনে।

ফুলপরী জানতে পারল একজন তরুণ এই কাপড় চুরি করেছে। ফুলপরী তার জন্য খুবই মর্মাহত হয়। এজন্য আর কোন মানুষকে সে স্বামীরূপে পেতে পারে না।

তবু সে একদিন কোকিলের ডাকে প্রেম নিবেদনে কাতর হয়ে নওরোজের কাছে বিয়ের পয়গাম পাঠাল। ডাকিনীরা এদিকে নওরোজকে ধরে রাখল। এক দানবকে নওরোজের রূপে রূপান্তরিত করে ফুলপরীর কাছে পাঠাল। আর সেই দানবের সাথে ফুলপরীর মহাসমারোহে বিয়ে হয়ে গেল।

ইতিমধ্যে প্রকৃত নওরোজ ফিরে এলে ফুলপরী তাকে প্রথমে দানব ভেবে দুর্ব্যবহার করতে লাগল। অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষায়ও কিছুতেই তা বিশ্বাস দূর হচ্ছিল না। অবশেষে নওরোজ স্বর্গপুরে গিয়ে গুলুকজানীকে বিয়ে করল। তারপর ফুলপরীর মনের ভ্রান্তি দূর হয় অনেক চেষ্টা করে। তখন সে নওরোজকে মর্ত্যে নিয়ে এসে সেই দানবকে হত্যা করে নিজেরা আবার বিয়ে করে সুখী জীবনে প্রতিষ্ঠিত হল।

কুড়িগ্রামের বজরা ডাকঘরের এলাকাধীন চরচরিতা বাড়ী গ্রাম নিবাসী মোহাম্মদ রিয়াজুল হকের কাছ থেকে এই পালাটি সংগৃহীত হয়।

বিপদের সময় প্রজারা, রাজ্য ও রাজাকে ছেড়ে চলে গেছিলো। নাখেরাজ ফুলপরীর চেষ্টায় রাজ্যে যখন স্বর্গ নেমে এলো, প্রজারাও তখন হলুদ বাদশার রাজ্যে ফিরে এলো। সবাই ধন্যধন্য করতে লাগলো। পালার শেষ গানটিতে যেন তারই আভাস।

'শওরে শওরে দিলো,
ঢোলাই করিয়া

বিপোদ কালে যত পোজ্জা
গেইরলেনে ছাড়িয়া ॥

নাখেরাজ করিয়া দিলো
খজনা পাইট তার
সগ্‌গই চলিয়া আইলো
বক্সোবের মাজার' ॥

অওশন কইন্যা

পশ্চিম দেশের এক রাজ্যের মালিক অওশন কইন্যা। খুব সুন্দরী বটে। তবে বিয়ে করতে ভীষণ আপত্তি। কেউ যদি বিয়ের প্রস্তাব পাঠায় তাকেই তিনি হত্যা করেন। জালাল সাধু অওশন কইন্যার রূপে মুগ্ধ হয়ে বিয়ে করার জন্য উন্মত্ত হল। ফলে, তাকে বহু বিপদের মুখে পড়তে হয়। একবার এক জংলী মেয়ের খপ্পরে পড়ে অনেক কষ্টে উদ্ধার পেয়ে জীন রাজ্যের সাত কন্যার হাতে পড়ল সে। তাদের সাথে বাধ্যতামূলক ভাবে প্রেমলীলা করতে হল নইলে প্রাণ বাঁচে না। একদা সেখান থেকে মুক্তি পেয়ে সেই দেশেরই এক কন্যা গোল মেহেরীকে বিয়ে করল। কিন্তু প্রথম জীবনের প্রেম সে ভুলতে পারে না। সুতরাং ও বাঁধন ছিন্ন করার জন্য প্রস্তুত হলে গোলমেহেরী নিজেই স্বামীর জন্য অওশন কইন্যাকে খোঁজ করে এনে স্বামীর সঙ্গে মিলনের ব্যবস্থা করল।

রংপুরের বেলকা গ্রামের অপরউদ্দীন শেখের পুত্র গফুর উদ্দীন শেখের কাছ থেকে পালাগানটি সংগৃহীত হয়েছে।

পালাগানের দ্বিতীয় অংশ কেল্লাবাড়ী গ্রামের হেদায়েত শেখের পুত্র আছুর উদ্দীনের কাছ থেকে সংগৃহীত হয়।

প্রথম দুটি গানে গোলমেহেরির সঙ্গে জালাল সাধুর বিয়ে প্রসঙ্গ। কিন্তু জালাল অওশন ছাড়া যেন কাউকেই চেনেনা, জানেনা, ভাবে না। সেই যেন একমাত্র হৃদয়েশ্বরী জালালের। দুঃখে হতোদ্যম হয়ে যায় গোলমেহেরি।

শেষ গানে স্বামীর সুখের জন্যে গোলমেহেরির আত্মত্যাগ উদ্ভাসিত।

১

'এই কতা শুনি গোলমেহেরি
কান্দে জারে জারে
আহারে দারুণ বিদি
বিদি মোর এই আচিল কপালে ॥

২

আহা বাপ মোর তকতের আজা
হয়া ক্যানে নিদয়া
ক্যানে দিলেন বিয়া
এ্যাকদিনের সোয়ামীর হাতে রে' ॥

(শেষ)
'জালাল সাদুর মায়াভারী
দুই জোনের কতা গেইচে ভুলি
দিনে আইতে খ্যালায় খ্যালা
অওশোনোক নিয়াবে' ॥
(হায় হায় রে)

জেলকদ বাদশা

জাবেল শহরের জেলকদ বাদশা ধর্মভীরু লোক। কন্যাকে ঠিক সময় বিয়ে না দেওয়াতে আল্লার দরবারে প্রার্থনা করেন। সে প্রার্থনা মঞ্জুর হল না। পুণ্য অর্জনের পরিবর্তে তার সঞ্চয় হল পাপ। এক জিন একদা কন্যাকে চুরি করল। বাদশা ফরমান জারি করল যে, কন্যাকে খুঁজে বার করে দিতে পারবে তার সাথেই তার কন্যার বিয়ে দেবেন। ফরমান পেয়ে আবুসামা কন্যার খোঁজ [illegible] হল। সেখানে এক মুনির অভিশাপে আবুসামা কাছিম হল। জিন কন্যা পারুল আবুসামাকে এ চক্র থেকে মুক্তি দিল। তার দুঃখে কাতর হয়ে জাবেল মুল্লুকে কন্যার কাছে এনে আবু সামার সঙ্গে মিলন করে দিল।

মিলনের পর আবার বিরহ দেখা দিল। নিতান্তই নিয়তি হিসাবে তাদের মধ্যে এক যুবরাজ সদাগরের আবির্ভাব হল। দুই কন্যাকে নিয়ে যুবরাজ নিজের বাড়ীতে গেলেন। বহুদিন পর তিন কন্যার সঙ্গে আবার আবুসামার মিলন হল।

বেলকার আজিমউদ্দীনের পুত্র হেনান উদ্দীনের কাছ থেকে এই পালাগান সংগৃহীত। পালাগানটি মধ্যযুগের বাংলা রোমানটিক কাব্য মূল পারসী কিস্‌সার অনুসরণে রচনা।

এই গানদুটির মূল উপজীব্য বিষয় প্রেম। প্রেম এখানে এক স্বর্গীয় সুষমায় উদ্ভাসিত। পালাটির শেষ গানেও যেন 'প্রেম' মহিমান্বিত হয়ে ওঠে। অনেক কষ্ট স্বীকারকরে সামা ফিরে পায় তার প্রেম ও প্রেমিকাকে —

'খোদার নাম নিয়া রে সামার
মউগে ফাম্ পাশরিয়া
নিজের দ্যাশের দিকি যায়
ঘোড়াতে চড়িয়া ॥
(ও জায়রে ঘোড়াতে চড়িয়া)

তিন কইন্যা নিয়ারে শামার
বিদায় ভালা হইলো
কতোদিন বাদে দ্যাকো আম্‌রা
নিজের মুল্লুকোত্ গ্যালো' ॥
(ও হায় রে মুল্লুকোতে গ্যালো)

একাদশ পরিচ্ছেদ

জীবনী

দাশরথি রায় (১৮০৬—৫৭)

বর্ধমান জেলার কাটোয়ার অন্তর্গত বাঁধমুড়া গ্রামে ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে (১২১২ বঙ্গাব্দ) দাশরথি রায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবার নাম দেবী প্রসাদ ও মায়ের নাম শ্রীমতী দেবী। দাশরথিরা চার ভাই। বড় ভগবান, মেজ দাশরথি, সেজো তিনকড়ি ও ছোট রামধন।

ছোটবেলায় মামার বাড়িতে কিছু ইংরাজী পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা পড়ার মধ্য দিয়ে কাটে দাশরথির বাল্যশিক্ষা। সেই বয়সেই পদ্য বা ছড়া লেখার প্রতিভা তার প্রকাশ পায়। কবিতা রচনার সঙ্গে সঙ্গেই দাশরথির প্রবল ঝোঁক বা আসক্তি ছিল সঙ্গীতের প্রতি। একটু বড় হতেই গোপনে তিনি যোগ দেন কবির দলে। পরে এসব জানতে পেরে বাবা, আত্মীয়-স্বজন তাঁকে বাধা দেন। কিন্তু দাশরথি সে বাধা তুচ্ছ করে কবির দলের সঙ্গে আরো নিবিড়ভাবে জড়িয়ে পড়েন এবং কবির আসরের পাদ প্রদীপের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠেন। সেই সময় তাঁর মামা রামজীবন সাহেবদের নীলকুঠিতে চাকরী করে দিলেও কবিগান বা কবির দল ছাড়াতে পারলেন না ভাগ্নেকে।

ঘটনাচক্রে একদিন কবির আসরে দাশরথির প্রতিপক্ষ কবিওয়ালা নিধিরাম শুঁড়ি, দাশরথির বংশ তুলে আক্রমণ করলে, অপমানে, লজ্জায় দাশরথি কবির দলত্যাগ করেন। তারপর ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে দাশরথি পাঁচালীর আঁখড়া গড়েন।

অনুপ্রাসাদি যুক্ত কথার গাঁথুনি, মন মাতানো সঙ্গীত ও কবির দলের জনপ্রিয় ছড়ার সংমিশ্রণে নতুন ধরণের পাঁচালী গানের মধ্য দিয়ে দাশরথি জন সাধারণকে আকৃষ্ট করেন। এই নতুন ধারার পাঁচালী রচনা ও গাহনা করে একই সঙ্গে তিনি নবদ্বীপের পণ্ডিত সমাজ ও অশিক্ষিত সাধারণ মানুষের মন জয় করেন।

পাঁচালী গান গেয়ে তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। এই সময়েই তাঁর বিয়ে হয়। স্ত্রীর নাম প্রসন্নময়ী দেবী। দাশরথির একটি মাত্র কন্যা সন্তান ছিল। বাড়িতে তিনি দোল, দূর্গোৎসব ইত্যাদি অনুষ্ঠান করতেন।

এই বিরল পাঁচালীকারের, পাঁচালী রচনার সময়কাল মাত্র বাইশ বছর।

পৌরাণিক বিষয় ছাড়াও লৌকিক ও সমসাময়িক বিষয় নিয়েও তিনি পালা (পাঁচালী) রচনা করেন। চারটি অতি স্থূল আদি রসাত্মক পালা বাদ দিলে দাশরথি রচিত পালার সংখ্যা ৬৪টি। তারমধ্যে ১২টি মৌলিক। দাশরথির গানের মধ্যে ভক্তি সঙ্গীতের একটি স্বতন্ত্র মূল্য স্বীকৃত।

পাঁচালী, গ্রন্থাকারে প্রকাশের পথিকৃৎ হলেন দাশরথি রায়।

প্রথমে অরুণোদয় প্রেসে, পরে বটতলায় খণ্ডে খণ্ডে দাশরথি রায়ের পাঁচালী প্রকাশিত হয়। আগে পরে বঙ্গবাসীর শ্রীহরিমোহন মুখোপাধ্যায় দাশরথির পাঁচালীর পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ প্রকাশ করেন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬২ সলে ডঃ হরিপদ চক্রবর্তীর সম্পাদনায় দাশরথি রায়ের পাঁচালী প্রকাশিত হয়।

১৮৫৭ সনে দাশরথি রায়ের মহাপ্রয়াণ ঘটে।

এণ্টনী ফিরিঙ্গী

প্রাচীন কবিওয়ালাদের মধ্যে একজন মাত্র ফিরিঙ্গী কবিওয়ালার পরিচয় পাওয়া যায়। এঁর নাম হেন্সমান এণ্টুনি, জাতিতে ফিরিঙ্গী। এঁর ভায়ের নাম কোলি সাহেব। ইনি একজন সঙ্গতি সম্পন্ন ধনী ব্যক্তি ছিলেন। ব্যবসা উপলক্ষে হুগলী জেলার চন্দননগরে ইনি প্রথম বসবাস আরম্ভ করেন। প্রথম যৌবনে গাঁজিয়ালদের সংসর্গে পড়ে এণ্টনী অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল হয়ে ওঠেন। পরে তিনি এক হিন্দু ব্রাহ্মণ বিধবা যুবতীকে নিয়ে গরীটির (গেরুটী) কাছে বসবাস শুরু করেন। এই বিধবা ব্রাহ্মণ কন্যার সংস্পর্শে এসে এণ্টনী প্রায় হিন্দু ভাবাপন্ন হয়ে পড়েন এবং ইউরোপীয় পোষাক পরিচ্ছদ ত্যাগ করে ধুতি ও চাদর পরে থাকতে ভালোবাসতেন। এই ব্রাহ্মণ কন্যার ইচ্ছায় দুর্গাপুজোর সময় তিনি বাড়িতে কবির দলকে নিমন্ত্রণ করে আনতেন। এই কবি গানে এণ্টনীর বিশেষ শ্রদ্ধা ও কৌতুহল জন্মায়। পরে তিনি কবিগান শেখার জন্য সে সময়ের বিখ্যাত কবিওয়ালাদের সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁদের কাছে শিক্ষানবীশ থেকে কবিগান রপ্ত করতে থাকেন। এই শিক্ষানবীশ থাকাকালীনই তিনি কয়েকজন অভিজ্ঞলোককে নিয়ে সখের কবির দল গড়েন। এণ্টনীর সেই সখের দলের কবিগানের বাঁধনদার ছিলেন গোরক্ষনাথ নামে একজন খ্যাতনামা গায়ক।

ক্রমশ তিনি সখের কবিদলে মেতে ওঠেন। তাঁর ব্যবসায় মন্দা দেখা দেয়, এবং সখের দল চালাতে গিয়ে এণ্টনী অর্থহীন হয়ে অভাব-অনটনের মধ্যে পড়েন।

এই সংকট কাটিয়ে উঠতে তিনি, তাঁর সখের কবি দলকে পেশাদারী দলে পরিণত করেন। পেশাদারী কবির দলে এণ্টনীর যথেষ্ট আয় বাড়তে লাগলো ; একসময় তিনি, তাঁর ব্যবসা বন্ধ করে কবির দলের ওপরই নির্ভরশীল হয়ে পড়লেন।

একবার দুর্গাপুজোর সময় চুঁচুড়ার জনৈক ধনী তাঁর বাড়িতে এণ্টনীর দলকে কবি গান করার জন্য বায়না করেন, সে সময় এণ্টনীর হাত কপর্দক শূন্য। তাঁর বাধঁনদার গোরক্ষনাথের তিনমাসের বেতন পাওনা। গাওনার দিন গোরক্ষনাথ বেঁকে বসলো, তিনমাসের টাকা না পেলে সে এণ্টনীর জন্য গান বাঁধতে পারবে না।

এণ্টনী সেদিন গোরক্ষনাথের পাওনা টাকা শোধ করতে পারলেন না বটে কিন্তু গোরক্ষনাথকে বাদ দিয়েই, এণ্টনী নিজেই গান রচনা করে প্রতিপক্ষ ভোলাময়রাকে শোনালেন। সেই শুরু হল এণ্টনী কবিয়ালের গান।

ভোলা ময়রা

হুগলী জেলার গুপ্তি-পাড়ায় ভোলা ময়রা জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবার নাম কৃপারাম ময়রা, মায়ের নাম গঙ্গামণি ও সহোদর ভাইয়ের নাম হৃদয়নাথ।

অনেক গানেই তিনি, নিজেকে ময়রা ও বাগবাজার নিবাসী বলে অভিহিত করেছেন। যেমন আমি ময়রা ভোলা / ভিঁয়াই খোলা / বাগবাজারেই।। তিনি বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী ছিলেন এবং জাতিভেদ সম্বন্ধে তাঁর কোন গোঁড়ামী ছিল না। একথাও তাঁর গানে পাওয়া যায়। যেমন "আমি ময়রা ভোলা ভিঁয়াই খোলা / ময়রাই বারমাস / জাতপাতি নাহি মানি ওগো কৃষ্ণপদে আশ।।..."

কলকাতার বাগবাজারে ভোলার বাবা মিষ্টির দোকান করে কালাতিপাত করতেন। গ্রাম্য পাঠশালায় ভোলার শিক্ষা যৎসামান্যই হয়েছিল। কলকাতায় কথকদের কাছে রামায়ণ, মহাভারত ও পৌরাণিক কাহিনী শুনে, কীর্ত্তনের দলে ভিড়ে ভোলা নিজের জ্ঞানস্পৃহা মেটান। পরিবর্তীকালে তিনি কবিওয়ালারূপে প্রসিদ্ধিলাভ করেন। ভোলা ময়রা হুগলী জেলার মগরা থানার অন্তর্গত ত্রিবেণীতে বিবাহ করেন। তাঁর কৈলাসী নামে একমাত্র কন্যা ছিল।

মনসা মঙ্গলের কবি পরিচিতি

(১) কানা হরিদত্ত ঃ মনসা মঙ্গলের কোন কোন কবি কানা-হরিদত্তের উল্লেখ করেছেন। বোধহয় ইনিই সর্বপ্রথম মনসা কাহিনীকে পাঁচালী-ব্রতকথার স্তর থেকে সাহিত্যে উন্নীত করেন। মনসা মঙ্গলের সর্বাধিক পরিচিত কবি বিজয়গুপ্তের মতে কানা হরি দত্তের বিশেষ বিদ্যাবুদ্ধি না থাকায় তাঁহার রচিত কাব্যে অনেক ভুল ভ্রান্তি দেখা যায়। ফলে দেবী মনসা এ কাব্যে সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। সে যাই হোক, দু'চার ছত্রের নমুনা ছাড়া কানা হরিদত্তের কোন কাজ আবিস্কৃত হয় নি এবং সে নমুনাও আসল কানা হরি দত্তের কিনা তাতেও যথেষ্ট সন্দেহ আছে। অন্যান্য কবির কাব্যে হরিদত্তের দু'চারটি ভণিতা থাকলেও, তাঁর কাব্য সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু জানা যায় না। মনে হয় তিনি মনসা মঙ্গলের আদি কবি—এর বেশি আর কিছুই জানা যায়নি। অর্থাৎ কানাহরি দত্তই মনসা মঙ্গলের আদি কবি এটাই মেনে নিতে হয়।

(২) বিজয় গুপ্ত ঃ মনসা মঙ্গলের সর্বাধিক পরিচিত ও জনপ্রিয় কবি বিজয় গুপ্ত। ইনি বরিশাল জেলার ফুল্লশ্রী গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। অত্যন্ত জনপ্রিয়তার জন্য এঁর কাব্যের ভাষা নানা স্থানে বদলে গেছে। তাই তাঁর মুদ্রিত কাব্যে এবং পুঁথিতে পুরনো ভাষা চিহ্ন বড় একটা পাওয়া যায় না। ছাপা গ্রন্থের সঙ্গে পুঁথির পাঠেরও অনেক ফারাক লক্ষ্য করা যায়। গ্রন্থটির রচনা কাল নিয়েও বহু দ্বিমত আছে। নানা পুঁথিতে যে শকাব্দের নির্দেশ আছে, তাতে ১৪৭৮, ১৪৮৪, ১৪৯৪ মোট এ কয়টি খ্রীষ্টাব্দ পাওয়া যায়। কোন কোন পুঁথিতে উল্লেখ আছে—'নৃপতি হুসেন সাহ'—। হুসেন সাহ ১৪৯৩-৯৪ খ্রীঃ বাংলার মসনদ অধিকার করেন। সুতরাং প্রায় এই সময়েই বিজয় গুপ্তের মনসা মঙ্গল কাব্যটি রচিত বলে মনে হয়।

ফুল্লশ্রী নামে যে গ্রামে বিজয় গুপ্ত বাস করতেন, এখনও সে গ্রাম আছে, কবির প্রতিষ্ঠিত মনসা মূর্ত্তি নাকি এখনও আছে। তাঁর বাবার নাম সনাতন ও মায়ের নাম রুক্মিনী। কবি বিজয় গুপ্তের লৌকিক পরিচয় বলতে এটুকুই জানা যায়, এর বেশি কিছু না।

(৩) **বিপ্রদাস পিপলাই ঃ** অপেক্ষাকৃত অপরিচিত কবি হলেন বিপ্রদাস। যদিও উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগেই তাঁর কথা প্রাচীন সাহিত্যানুরাগী সমাজ জানতেন। তিনি ২৪ পরগণা জেলার নাদুড়্যা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। অনেকে মনে করেন বর্তমানের বাদুড়িয়া গ্রামই সাবেক নাদুড়্যা গ্রাম।

কলকাতার কাছাকাছি অঞ্চল থেকে বিপ্রদাসেব কয়েকটি পুঁথি পাওয়া গেছে, পুরো পুঁথি কোথাও পাওয়া যায়নি। যে সমস্ত খণ্ডিত পুঁথি পাওয়া গেছে, তার বর্ণনার বিন্যাস এমন বিশৃঙ্খল এবং মূল কাহিনীর এত অল্প অংশ উদ্ধার করা গেছে যে, কবি সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানিবার অবকাশ নাই। তবুও অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁর কাব্যের চাঁচা ছোলা ভাষা একালের স্বাদগন্ধ বিশিষ্ট। বর্ণনাতেও আধুনিকতার ছোঁয়া। তাঁর কাব্যের চাঁদ সদাগরের নৌকা বাণিজ্যের পথে হুগলী, ভাটপাড়া, কাঁকিনাড়া, মূলাজোড়, পাইকপাড়া, ভদ্রেশ্বর, ইছাপুর, শ্রীপাট খড়দহ, রিষড়া, কোন্নগর, কোতরং, কামারহাটী, ঘুঘুড়ি, চিৎপুর, কলকাতা, বেতড় ও সালিখার উল্লেখ পাওয়া যায়। শ্রীপাট খড়দহ ও নিমাইতীর্থের উল্লেখে অনুমিতহয় যে, বিপ্রদাস পিপলাইয়ের মনসা মঙ্গল কাব্যটি পঞ্চদশ শতাব্দীর রচনা নয়, তার এক বা দু শতাব্দী পরের রচনা।

(৪) **নারায়ণ দেব :** মনসা মঙ্গল কাব্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি নারায়ণ দেবের পুরো নাম 'সুকবি বল্লভ' নারায়ণ দেব। শুধু বাংলা দেশেই নয়, আসামেও তাঁর কাব্য সুপ্রচলিত। ফলে অনেকে তাঁকে অসমীয়া কবি বলেও দাবি করেছেন। তাঁর দু-চারটি প্রাচীন পুঁথির সন্ধান পাওয়া গেছে। তাঁর প্রায় প্রত্যেক পুঁথির শুরুতেই সংক্ষেপে তাঁর নিজের পরিচয় দেওয়া আছে। তা থেকেই মনে হয় তিনি কায়স্থ বংশীয় ; ব্রহ্মপুত্রের তীরে মৈমনসিংহ জেলার অন্তর্গত বোরগ্রামে তাঁর জন্ম। কেউ কেউ মনে করেন মৈমনসিংহ নয়, শ্রীহট্টেই তাঁর আদি নিবাস। বিষয়টি নিয়ে এক সময় পণ্ডিত সমাজে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছিল। কবিকে আসাম, মৈমনসিংহ ও শ্রীহট্ট—তিন অঞ্চলই দাবি করে তাঁদের কবি হিসাবে, সন্তান হিসাবে।

আসামে এখনও নারায়ণ দেবের পদ্ম পুরাণ মুদ্রিত ও প্রচারিত। তবুও নারাণদেব রচিত সমস্ত রচনা ও পুঁথি দেখে পণ্ডিত ও বিদ্বজন মনে করেন যে, নারায়ণ দেব নামে একই কবি বর্তমান ছিলেন এবং তিনি বোর গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। কিন্তু তিনি বা তাঁরা আদিতে ছিলেন রাঢ় বাসী। কোন কারণবশত। কবির কোন পূর্বপুরুষ রাঢ় ত্যাগ করে সুদূর মৈমনসিংহে ঘর বেঁধেছিলেন। তাঁর কাব্য ঠিক কোন সময়ে রচিত তা বলা কঠিন। অবশ্য তাঁর পুঁথির ভাষা অন্য মনসা মঙ্গল কবিদের থেকে প্রাচীনতর। তাই অনুমান করা হয় যে, তিনি সম্ভবতঃ ১৫শ শতাব্দীর শেষে কিংবা ১৬শ শতাব্দীর প্রথমে এই কাব্য রচনা করে থাকবেন।

(৫) **কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ ঃ** মনসামঙ্গলের আর এক কবি হলেন কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ। পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার কাঁদড়া গ্রামের এক কায়স্থ পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন সপ্তদশ শতকের কেন একসময়ে।

মনসার আর এক নাম 'কেতকা'। তাই কবি ক্ষেমানন্দ তাঁর কাব্যে মা মনসাকে 'কেতকাসুন্দরী' বলে প্রণাম নিবেদন করেছেন। এবং স্বয়ং উপাধি গ্রহণ করেছেন 'কেতকাদাস'। তাঁর হাতে বেহুলা চরিত্রের দীপ্তি বৃদ্ধি পেলেও চন্দ্রধরের চরিত্র মহিমা কিছুটা নিষ্প্রভ হয়েছে। করুণ ও হাস্যরস সৃষ্টিতে তিনি সমান দক্ষতা দেখিয়েছেন তাঁর কাব্যে।

তাঁর কাব্যে কবিত্বের চেয়ে পাণ্ডিত্যের উচ্চারণ বেশি হওয়ায় কাব্য সুষমা কোথাও কোথাও পাণ্ডিত্যের ভারে ব্যহত ও ম্লান হয়েছে। তাঁর কাব্য কৃত্তিবাস ও মুকুন্দরামের প্রভাবে-ও কিঞ্চিৎ প্রভাবিত।

(৬) জগজ্জীবন ঘোষাল ঃ জগজ্জীবন ঘোষাল-ও উত্তরবঙ্গের কবি, সম্ভবতঃ তন্ত্রবিভূতির কিছু পরে মনসামঙ্গল রচনা করেন। কবি তাঁর কাব্যের মধ্য দিয়ে নিজের সম্বন্ধে কিছু তথ্য দিয়েছেন। তা থেকে দেখা যায়, দিনাজপুরের কুচিয়ামোড়া গ্রামে (এখন পূর্ণিয়া জেলার অন্তর্ভূক্ত) ঘোষাল বংশে কবি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর কাব্যের মধ্যে তাঁর স্ত্রীর নাম পদ্মমুখী বলিয়া উল্লেখ আছে কিন্তু কবে তাহা রচিত হয়েছিল তার কোন উল্লেখ নাই। তবে ক্ষেমানন্দরে পরেই অর্থাৎ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে তাঁর কাব্য রচিত হয় বলে অনুমান করা হয়। তাঁর কাব্যও যথারীতি দেবখণ্ড ও বাণিয়াখণ্ডে বিভক্ত। কিন্তু তিনি বাণিয়াখণ্ডে তন্ত্র বিভূতিকে পদে পদে অনুসরণ করেছেন। তাঁর কাব্যের প্রারম্ভেও ধর্মমঙ্গল কাব্যের মতো সৃষ্টিতত্ত্বের বর্ণনা আছে। তাঁর বেহুলার কাহিনী নতুন ধরনের, উত্তরবঙ্গের গ্রামীন বৈশিষ্ট্য পুরোপুরি রক্ষিত হয়েছে। চরিত্র ও স্বাভাবিক বর্ণনায় তিনি মোটামুটি প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু আদিরসের বর্ণনাগুলি অতিশয় ঘৃণ্য—এদিক দিয়ে কবির রুচি নিন্দার যোগ্য। তবে স্মরণীয় মনসামঙ্গল ধারার বৈশিষ্ট্যের জন্য তাঁর কাব্য বিশেষ প্রশংসার দাবী রাখে।

চণ্ডীমঙ্গলের কবি পরিচিতি

মাণিক দত্ত ঃ চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের প্রাচীনতম কবি মানিক দত্ত। তাঁহার রচিত মাত্র দুখানি পুঁথি পাওয়া গেছে। কবি মুকুন্দরামও চণ্ডীমঙ্গলের সর্বপ্রাচীন কবি মানিক দত্তকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। কিন্তু তাঁর অর্বাচীন পুঁথি অবলম্বনে যে গ্রন্থ ছাপা হয়েছে তার ভাষা তত প্রাচীন নয়, তাছাড়া বইটিতে শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁর অনুচরদের বর্ণনা আছে। কাজেই গ্রন্থটি কতদূর পুরানো এবং কবি কত প্রাচীন, তা নিয়েও যথেষ্ট সংশয় দেখা যায়। এবং অনুমিত হয় কবি প্রাচীনকালের হলেও বারবার গায়েনদের হস্তক্ষেপের ফলে ইহার পুরনো বা প্রাচীন ভাষা কিছুটা আধুনিক হয়ে বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করেছে। মানিক দত্তের পুঁথিতে যে সমস্ত নদী ও জনপদের উল্লেখ আছে, তা থেকে মনে হয় তিনি মালদহের অধিবাসী ছিলেন। তিনি দোহারদের সঙ্গে নিজের কাব্য গান করে বেড়াতেন। এতে প্রচ্ছন্নভাবে ধর্মঠাকুরের কিছুটা প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। কবির সৃষ্টিতত্ত্ব পালা এবং আরো দু-একটি পালা মোটামুটি রসোত্তীর্ণ বলা চলে। কিন্তু মুকুন্দরাম কথিত মানিক দত্ত এবং প্রাপ্ত-পুঁথির মানিক দত্ত একই কবি কিনা, সে সম্পর্কে এখনও নিঃসংশয় হওয়া যায় নি।

(২) **দ্বিজমাধব ঃ** দ্বিজ মাধবের চণ্ডীমঙ্গলও নানা সমস্যার সৃষ্টি করেছে। তাঁর কাব্য ও ভনিতা যুক্ত মঙ্গল চণ্ডীর ব্রতকথা জাতীয় ছোট ছোট পুঁথি উত্তরবঙ্গ ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে পাওয়া যায়। মনে হয় মঙ্গলচণ্ডীর গীত ও ব্রতকথা একই কবির রচনা। অবশ্য তাঁর কাব্যের আসল নাম মঙ্গলচণ্ডীর গীত নয়, পুঁথিতে 'সারদা মঙ্গল' এবং 'সারদা চরিত' এই নাম দুটিই পাওয়া যায়। তাঁর পুঁথিতে যে রচনাকাল পাওয়া যায় তাতে মনে হয় ১৫৭৯ খ্রীষ্টাব্দেই রচিত হয়েছিল কাব্য দুটি। গ্রন্থারম্ভে কবির আত্মকথায় জানা যায় যে, তিনি হুগলী জেলার ত্রিবেণীর কাছে সপ্তগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবার নাম পরাশর। চট্টগ্রামে তাঁর কাব্যের সর্বাধিক প্রচলনের কারণে কেউ কেউ মনে করেন যে, কবি সপ্তগ্রামে জন্মগ্রহণ করলেও, পরবর্তীকালে তিনি চট্টগ্রামে বসবাস করেন। তা না হলে পশ্চিমবঙ্গেব কবির কাব্য সুদূর চট্টগ্রামে এতটা প্রচার লাভ করবে কেন? তবে আর এক মাধবাচার্য্য 'শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল' কাব্য রচনা করেন। এই দুই মাধবাচার্য্য এক ব্যক্তি না পৃথক ব্যক্তি, এ নিয়েও সংশয় সৃষ্টি হয়েছে। চণ্ডীমঙ্গলের মাধবাচার্য্য বা দ্বিজমাধব, মুকুন্দরামের মতো অতটা জনপ্রিয়তা লাভ করতে না পারলেও পাঠক সমাজে বেশ পরিচিত ছিলেন। কারণ তাঁর কাব্যটি ছিল সরল ও সংক্ষিপ্ত।

(৩) **কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ঃ** কবি কঙ্কন মুকুন্দরাম শুধু মধ্যযুগে নয়, শিল্প প্রতিভার বিচারে তিনি আধুনিক যুগেও অতিশয় গৌরব অর্জন করবেন। কাহিনী বিন্যাস, চরিত্রসৃষ্টি, সহানুভূতি সহ জীবনের করুণ বেদনা, সরস কৌতুকের এমন চমৎকার দৃষ্টান্ত মধ্যযুগীয় কোন কবির মধ্যে পাওয়া যাবে না। তিনি চার'শ বছরের পূর্ববর্তী কবি হলেও তাঁকে যেন সমকালের কবি বা লেখক বলে মনে হয়। তাঁর রচনাটি আখ্যান কাব্য এবং দেবীর পূজা প্রচার বিষয়ক হলেও বাস্তব নরনারীর সুখ দুঃখের কাহিনীর প্রতি তাঁর ছিল সজাগ দৃষ্টি। অনেকটা একালের ঔপন্যাসিকদের মত তাঁর দৃষ্টি বাস্তবানুগামী।

তাঁর গ্রন্থের সূচনায় কবি সংক্ষেপে তাঁর আত্মজীবনী বর্ণনা করেছেন। তাতে মুঘল পাঠানের সংঘর্ষের সময়ে বাংলার গ্রাম্যজীবনের ও সমাজের জীবন্ত চিত্র বর্ণিত। কবি সেই অরাজকতার সময়ে অত্যন্ত দুঃখ কষ্টের মধ্যে পুত্র পরিবারের হাত ধরে পথে নেমেছিলেন। সেই মর্মন্তুদ কাহিনী যেন মনে হয় এই সেদিনের ঘটনা।

সাত পুরুষের বাস্তুভিটা বর্ধমান জেলার দামিন্যা (আজকের দামুন্যা) গ্রামে ব্রাহ্মণ কবি চাষবাসের কাজে জীবিকা নির্বাহ করতেন। মুঘল-পাঠানের রাজ্য দখলের লড়াইয়ে পাঠানরা পিছু হটলে, মুঘলরা বাংলা দখল করে। এ সময়ে মুঘলদের অত্যাচারে দেশবাসী একেবারে দিশেহারা। বন্ধুদের উপদেশে মুকুন্দরাম সপরিবারে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে গ্রাম ছেড়ে চললেন অন্যত্র। এ সময়ে অত্যন্ত দুঃখ কষ্টের মধ্যে একদিন ডাকাতরা তাঁর সঞ্চিত সামান্য টাকাকড়িও কেড়ে নেয় এবং মুকুন্দরাম সপরিবারে অসহায় অবস্থায় ঘুরতে থাকেন। এ সময় কেউ কেউ এই অসহায় ব্রাহ্মণের প্রতি যৎ কিঞ্চিৎ করুণা প্রকাশ করে। অনাহারে অনিদ্রায় কবি পথ চলেছেন। নিজেরা কোন রকমে জঠর জ্বালা ভুলে থাকেন, কিন্তু কোলের শিশুকে জঠর জ্বালা ভোলাতে পারেন না। সে ভাতের জন্যে কাঁদতে থাকে। —'শিশু কান্দে ওদনের তরে'। কবি পরিবার অভুক্ত অবস্থায় কখনো শালুক ডাঁটা পোড়া খেয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি করে আবার পথ

চলেন। একদিন শ্রান্তি ও ক্ষুধায় এক পুকুর পাড়ে কবি ঘুমিয়ে পড়েছেন। তখন দেবী চণ্ডীকা কবিকে স্বপ্নে প্রত্যাদেশ দিলেন—তাঁর মহিমা বিষয়ক কাব্য লিখতে হবে। তারপর কবি মেদিনীপুরের এক ব্রাহ্মণ জমিদার বাঁকুড়া রায়ের কাছে আশ্রয় পেলেন এবং জমিদারের বালকপুত্র রঘুনাথ রায়ের গৃহ শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হলেন। মোটামুটি নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য আশ্রয় মিলন কবির। বাঁকুড়া রায়ের মৃত্যুর পর কবির ছাত্র রঘুনাথ রায় রাজা হলেন। তাঁর অনুরোধে এবং কবির নিজের অন্তরের প্রেরণায় মুকুন্দরাম 'অভয়া মঙ্গল' অথবা 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্য রচনা করলেন। *মুকুন্দরামের দু-একখানি পুঁথিতে এবং মুদ্রিত গ্রন্থে কাব্যরচনা সম্বন্ধে দুই ছত্রের পয়ার পাওয়া গেছে। তা থেকে দুটি খ্রীষ্টাব্দ পাওয়া যায় ১৫৪৪ এবং ১৫৭৭। মুকুন্দরাম কোন সময়ে কাব্য রচনা করেছিলেন ? তাঁর আত্ম পরিচয়ের এক জায়গায় মান সিংহের উল্লেখ আছে ('ধন্য রাজা মানসিংহ')। মান সিংহ বাংলার প্রধান হয়েছিলেন ১৫৯৪—১৬০৫ খ্রীঃ পর্যন্ত। তা হলে এ কাব্য কি ১৬শ শতাব্দীর একেবারে শেষভাগে বা ১৭শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রচিত? সে যাই হোক, কাব্যটি মুকুন্দরামের ছাত্র রঘুনাথ রায় রাজা হওয়ার পরই রচিত হয়। রঘুনাথ রায় ১৫৭৩—১৬০৪ খ্রীঃ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। সুতরাং এই সময়ের মধ্যেই মুকুন্দরামের কাব্য রচিত হয়ে থাকবে।

মুকুন্দরাম চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনী নিজে সৃষ্টি করেন নি। তিনি তাঁর পূর্ববর্তী অনেক কবির মতই মানিক দত্তের কাহিনীকে কেন্দ্র করে নানান বৈচিত্র্য, ঘাত-প্রতিঘাত ইত্যাদির মধ্য দিয়ে কাহিনী বিন্যাসে পূর্ণতা আনার চেষ্টা করেছেন। এক্ষেত্রে চণ্ডীমঙ্গলের সমস্ত চরিত্রগুলির চরিত্রায়ণে এবং শ্রেণী বিভক্ত সমাজের যে বাস্তব চিত্র কবি এঁকেছেন—তা আজকের মননশীল লেখকের ঈর্ষার বস্তু।

(৪) দ্বিজরামদেব : চণ্ডীমঙ্গলের আর এক শক্তিশালী কবি দ্বিজরামদেবের অভয়ামঙ্গল ডক্টর আশুতোষ দাস আবিষ্কার করেছেন, তাঁরই সম্পাদনায় এটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়েছে। কাব্যের পুঁথি নোয়াখালি জেলা থেকে পাওয়া গেছে। কিন্তু রামদেব চট্টগ্রামের অধিবাসী ছিলেন বলে মনে হয়। কারণ তাঁর কাব্যে প্রচুর চট্টগ্রামের শব্দ পাওয়া গেছে। কিন্তু গ্রন্থের মধ্যে কবি বিশেষ কোন আত্মপরিচয় দেননি। তাঁর নাম রামদেব, ব্রাহ্মণ বংশে তাঁর জন্ম। পিতার নাম কবিচন্দ্র—এর বেশি আর কোন পরিচয় তার লেখা থেকে পাওয়া যায় না।

কবি মাধবাচার্য্য রামদেবের ওপর যে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিসেন তাতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু কাব্য প্রতিভায় তিনি মাধবাচার্যকেও অনেক দূরে ছাড়িয়ে গেছেন। মাঝে মাঝে তিনি মুকুন্দরামেরও সমকক্ষ হয়ে উঠেছেন।

কবি শাক্ত মঙ্গলকাব্য লিখলেও তাঁর অন্তরটি ছিল বৈষ্ণব ভক্তিরসে ভরপুর। কাব্যের মধ্যে তিনি গুটি কয়েক বিষ্ণুপদ সংযোজিত করেছেন যা শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবপদাবলী রূপেই গননীয়। রচনাশক্তির দিক থেকে রামদেবের কোন কোন অংশ মুকুন্দরামেরও ঈর্ষা উদ্রেক করতে পারে। হাস্যরসে তাঁর বিশেষ প্রবণতা ছিল না। ফলে যে গুণে মুকুন্দরাম সমগ্র বাঙ্গালী পাঠকের প্রীতি লাভ করেছেন। দ্বিজরামদেব সে গুণের অভাবের জন্য তা পারেননি। তবু চণ্ডীমঙ্গল

কাব্যে মুকুন্দরামের পরেই যদি কোন কবিকে স্থান দিতে হয়, তবে নির্দ্বিধায় দ্বিজরামদেবকে সেই স্থান দেওয়া যেতে পারে। এই প্রসঙ্গে দ্বিজ জনার্দনের ব্রতকথা হাজায় চণ্ডীমঙ্গল কাব্যটির উল্লেখ করা যেতে পারে। কাব্য হিসাবে এটি অকিঞ্চিৎকর তবে কিছু পুরাতন মনে হয়।

(৫) ভারতচন্দ্র ঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ কবি রায়গুনাকর ভারতচন্দ্র সমগ্র বাংলা সাহিত্যের একজন প্রথম শ্রেণীর মার্জিতরুচি ও বিদগ্ধ সারস্বত সাধক। তিনি অবশ্য মধ্যযুগীয় ধারা অনুসরণ করে মঙ্গল কাব্যেরই অনুবর্তন করেছেন, তবু তার মধ্যে প্রাচীন স্থূলতার চেয়ে নাগরিক সূক্ষ্মতার অধিক পরিচয় মেলে—যা অনেকটা আধুনিক যুগলক্ষণাক্রান্ত। তিনি সজ্ঞানে সচেতনভাবে আধুনিকতার সূত্রপাত করেন নি, তবু তাঁর থেকেই আধুনিক বাংলা সাহিত্যের আভাস—ইঙ্গিত ফুটে উঠতে আরম্ভ করে।

হাওড়া-হুগলী জেলার অন্তর্গত ভুরশুট পরগণার অন্তর্ভুক্ত পেঁড়ো গ্রামের জমিদার বংশে ভারতচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু তাহার পিতা বর্ধমানরাজের দ্বারা সর্বসান্ত হলে বালক কবি বাধ্য হয়ে মাতুলালয়ে লালিত-পালিত হতে থাকেন। পিতা ও স্বজনদের অনুমতির অপেক্ষা না করে নিজ-মনোনীত পাত্রীকে বিবাহ করাতে প্রায় সকলের দ্বারা পরিত্যক্ত হন। তাঁর-এমন দুর্ভাগ্য যে, অগ্রজের কথামতো বর্ধমানরাজের কাছে আর্জি নিয়ে গেলে বিনাদোষে তিনি কারারুদ্ধ হন। সেখান থেকে পালিয়ে সন্ন্যাসীর বেশে পুরীধামে উপস্থিত হন এবং বৈষ্ণবদের মধ্যে বাস করতে থাকেন। পরে গৃহে প্রত্যাবর্তন ও কৃষ্ণনগরের মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি নিযুক্ত হন।

প্রথম জীবনে, তিনি সত্যপীরের মাহাত্ম্য-বিষয়ক দুখানি অতি ক্ষুদ্র পাঁচালী রচনা করে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় পাঠ করেন। তাঁরএই রচনার কিছু কৌশল ভিন্ন আর কোন উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য নেই। সত্য কথা বলতে কি ভারতচন্দ্র ছোট ছোট কবিতার দ্বারা মধ্যযুগীয় সংস্কার পরিত্যাগ করে আধুনিকতার দ্বারপ্রান্তে হাঁজির হয়েছেন। মধ্যযুগে দেবদেবী ছাড়া কাব্য হত না। মানুষের কথা ছিল বটে, কিন্তু সে মানুষ বাস্তবের সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়—তারাও শাপভ্রষ্ট দেবকুমার-কুমারী অথবা দেবকৃপাধীন ভক্ত। তিনি হিন্দি-ফরাসী মিশ্রিত ভাষায় দু একটি কবিতা লিখেছিলেন। ভারতচন্দ্র অমর হয়েছেন তাঁর "অন্নদামঙ্গল কাব্যের গুণে। "ভারত ভারতখ্যাত আপনার গুনে"—সে গুণ হল অন্নদামঙ্গলের অন্তর্ভুক্ত পরস্পর সম্পর্কযুক্ত তিন খানি কাব্য—(১) অন্নদামঙ্গল, (২) অন্নপূর্ণমঙ্গল বা মানসিংহ এবং (৩) কালিকামঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দর।

ভারতচন্দ্র চরিত্র-পরিকল্পনায় কোন মহৎ বৃহৎ আদর্শ সৃষ্টি করতে না পরলেও দেবতাকে মানব করে যে আভিনব আদর্শের সূচনা করেন তাই হচ্ছে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের শুভসূচনা—যদিও এ ব্যাপারটি তাঁর অজ্ঞাতসারেই ঘটে গিয়েছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর মুসলিম প্রভাবিত অবক্ষয়ী বাঙালী সমাজের অধঃপতনের দিনে এরকম ঘটাই স্বাভাবিক।

দ্বিতীয় আখ্যান কালিকামঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দর। এতেও তাঁর বিশেষ মৌলিকতা নেই। তাঁর পূর্বে অনেক কবি বিদ্যাসুন্দর সংক্রান্ত এবং কলিকার মাহাত্ম্য বিষয়ক মঙ্গসকাব্য লিখেছিলেন। তীব্র আদিরস ও অখণ্ড বাস্তব চিত্রের জন্য কালিকামঙ্গল সাধারণতঃ 'বিদ্যাসুন্দর' নামেই পরিচিত হয়েছে।

অন্নদামঙ্গলের শেষ অংশ 'মানসিংহ' বা অন্নপূর্ণামঙ্গল। তিনটি খণ্ডের মধ্যে শেষোক্ত খণ্ডটি সবদিক থেকে নিকৃষ্ট। এতে ইতিহাস ও উদ্ভট ব্যাপার একসঙ্গে মিশে গিয়ে জগাখিচুড়িতে পরিণত হয়েছে।

অষ্টাদশ শতাব্দী ও সংস্কৃতির প্রতীকপুরুষ ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে কোন মন্তব্য করতে যাওয়া কিছু বিপজ্জনক বটে। তাঁর রচনার motif বা উপাদান ও মনোভঙ্গী আদৌ 'সীরিয়স' বা গভীর ভাবোদ্যোতক ছিল না। তিনি কখনই বিশাল কিছু সৃষ্টি করতে চাননি, সে সামর্থ্যও ছিল না। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি বহু দুঃখ-কষ্ট ও অভাব-অনটনের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন। তখন দেবদেবীর প্রতি অচলাভক্তি উচ্চ সমাজ ও জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করেছিল, ঐশ্বর্যের সমারোহ অলস-বিলাসজর্জর নাগরিক উচ্চ বর্ণদের অবকাশ অপহরণ করে নিয়েছিল। ফারসী ভাষা হিন্দু সমাজেও রুজি রোজগারের বাহন হয়ে উঠেছিল। আর ফারসী আদিরসের কিস্‌সা-কাহিনী ধনি সমাজে অক্লান্ত মুখরোচক আস্বাদ সৃষ্টি করেছিল। কাজেই রঙ্গব্যঙ্গ, হাস্য পরিহাসে তাঁর লেখনী ক্ষুরধার হয়েছে, বাকচাতুরী তাঁর স্বভাবধর্মকে তীক্ষ্ণ ও উজ্জ্বল করে তুলেছে। জীবনের বেদনা, করুনা, গভীরতা প্রভৃতি সদগুণের চেয়ে তার লঘু দিকটি তাঁকে অধিকতর আকর্ষণ করেছিল। সাধারণ শব্দ পরম্পরাকে মণিখচিত স্বর্নাভরনের মতো সহস্র দ্যুতি দিয়েছেন, গ্রামীন ও আবেগবহুল বাংলা ভাষাকে নাগরিক ও মনঃপ্রধান করে তুলেছেন, ভাবাবেগে আদ্র উচ্ছাসের স্থলে হাস্য পরিহাসের উজ্জ্বল ও আতপ্ত অনুভূতি এনে দিয়েছেন। ফারসী, সংস্কৃত ও হিন্দী শব্দভাণ্ডার থেকে যথেচ্ছ শব্দ আহরণ করে বাংলা ভাষার প্রকাশ ক্ষমতা বাড়িয়ে দিয়েছেন। এইজন্য তিনি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে চিরদিন স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। এই বাক্যগুলির চমৎকারিত্ব ও বুদ্ধির দীপ্তি কী অসাধারণ। —'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন', 'খুন হয়েছিনু বাছা চুন চেয়ে চেয়ে', 'বাঘের বিক্রম সম মাঘের হিমানী'।

অন্নদামঙ্গল ছাড়াও তাঁর 'রসমঞ্জরী' পুস্তিকায় প্রচিন শাস্ত্রের নজির সরসভাবে নায়ক-নায়িকার সংজ্ঞা ও বর্ণনা খুবই বুদ্ধিদীপ্ত হয়েছে। বিশ শতকে ভারতচন্দ্রের প্রতিভাকে নতুন করে ভেবে দেখবার ও বিচার-করবার চেষ্টা চলেছে। অনেক-গবেষক শুচিবাতিক ছেড়ে দিয়ে শুধু সৌন্দর্যবোধের ও রসের দ্বারা ভারতচন্দ্রকে বুঝে নেবার চেষ্টা করেছেন। বাংলা সাহিত্য ও ভারতচন্দ্রকে বুঝবার পক্ষে এ একটা সুলক্ষন সন্দেহ নেই।

ধর্মমঙ্গলের কবি পরিচিতি

(১) ধর্মমঙ্গল কাব্যের আদি কবি ময়ুরভট্ট। তাঁর উত্তরসূরীরা সকলেই তাঁকে সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করেছেন লাউসেন কাহিনীর প্রথম স্রষ্টা রূপে। 'ময়ূরভট্টে বন্দিব সঙ্গীতে আদ্য কবি'। ঘনারাম চক্রবর্তী। ময়ূরভট্টের কোন গ্রন্থ পাওয়া যায় নি। কাজেই তাঁর সম্বন্ধে আমাদের সমস্ত জ্ঞানই অনুমান নির্ভর। সম্ভবতঃ তিনি চতুর্দশ শতকের কবি এবং জাতিতে ব্রাহ্মণ। তাঁর কাব্যের নাম ছিল সম্ভবতঃ 'হাকন্দ পুরাণ'।

(২) ধর্মমঙ্গল কাব্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি রূপরাম চক্রবর্তী। তাঁরও আবির্ভাব কাল অজ্ঞাত। তবে অনুমান করা যায় যে, তাঁর কাব্য ষোড়শ শতকের শেষ পর্বে রচিত হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের

নানা স্থানে তাঁর কাব্য আবিষ্কৃত হয়। সাবলীল ভাষা ও সহজ ভঙ্গি তাঁর কাব্যকে জনপ্রিয় করে তোলে। মঙ্গলকাব্যগুলিতে অলৌকিক দৈবী প্রকাশের ছড়াছড়ি। কিন্তু রূপ রাম দেবতার গুনগান করতে বসেও মানুষের কথা ভুলে যাননি। তিনি মানুষের সুখ-দুঃখ ও আশা-আকাঙ্খার সংবেদনশীল রূপকার। ব্যক্তিগত সংবেদনশীলতার স্পর্শে তাঁর আত্মবিবরণটি যেমন জীবন রসে রঞ্জিত তেমনি চিত্তাকর্ষকও। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের মধ্যে রূপরামের কাব্য তার বাস্তবতার জন্য অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করতে পারে।

(৩) ধর্মমঙ্গলের আর এক শ্রেষ্ঠ কবি ঘনারাম চক্রবর্তী। বর্ধমান জেলার কৃষ্ণপুর গ্রামের এক ব্রাহ্মণ পরিবারে তাঁর জন্ম। তাঁর বাবার নাম গৌরীকান্ত, মা-সীতা দেবী। গ্রামের চতুষ্পাঠীতেই তাঁর পড়াশুনা। শিক্ষাগুরুই তাঁকে 'কবিরত্ন' উপাধিতে ভূষিত করেন। তাঁর কাব্য রচনার কাল সম্ভবত অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগ। কবি ছিলেন বর্ধমানের মহারাজা কীর্তিচন্দ্রের দাক্ষিণ্য পুষ্ট। পাণ্ডিত্য ও কবিত্বের সুষম সমাহারে এবং উপমা। অনুপ্রাসের নিপুণ প্রয়োগে তাঁর কাব্য একটা নিটোল রসমূর্ত্তি পরিগ্রহ করেছে। যে উন্নত রুচিবোধ গ্রাম্যতা-দোষে দুষ্ট, সেকালের একটি লৌকিক কাহিনীকে তিনি শিল্প সম্মত বাণীরূপ দান করেছেন। তা সে যুগের বিচারে দুর্লভ দৃষ্টান্তস্বরূপ এবং বিস্ময়কর। তাঁর শব্দ বিন্যাস ও বাক্য যোজনার চমৎকারিত্ব সম্ভবতঃ তাঁর উত্তরসূরী ভারতচন্দ্রকেও প্রভাবিত করেছিল। কবির কাব্যের চরিত্রচিত্রণের নৈপুন্য, বলিষ্ঠ জীবন দর্শন ও স্বদেশ চিন্তা আজকের সাহিত্য সমালোচকেরও বিস্ময় উৎপাদন করে। তাঁর—'রাজার মঙ্গল চিন্তি দেশের কল্যাণ'। —চরণটি বাংলা সাহিত্যে স্বদেশ চিন্তার প্রথম দৃষ্টান্ত।

গ্রন্থপঞ্জী

ঠাকুর অবনীন্দ্রনাথ—বাংলার ব্রতকথা।
দেবী অন্নপূর্ণা—মেয়েদের ব্রতকথা।
সুর ডঃ অতুল—বাঙালী জীবনের নৃ-তাত্ত্বিকরূপ।
বন্দ্যোপাধ্যায় ডঃ অসিত—হাওড়া জেলার ইতিবৃত্ত।
পাল ডঃ অনিমেষ কান্তি—লোক সংস্কৃতি।
ভট্টাচার্য্য ডঃ আশুতোষ—বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস।
মুখোপাাায় আশুতোষ—ছেলে ভুলানো ছড়া।
মহম্মদ জলিল আব্দুল—লোক সাহিত্যের নানা দিক।
মহবুব ইলিয়াস—আলকাপ গান।
হক্ ডঃ এনামুল—বঙ্গে সুফী প্রভাব।
ওসমান, বুলবুল—সংস্কৃতি ও সংস্কৃতি তত্ত্ব।
মৌলিক ক্ষিতিশ চন্দ্র—প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা।
রায় ক্ষিতীশ—আসামের লোকসংস্কৃতি (অনুবাদ)।
সেন গোপীনাথ—পশ্চিমবঙ্গের লোকসংস্কৃতি ও সাহিত্য প্রসঙ্গে।
দত্ত গুরুসদয়—পটুয়া সঙ্গীত।
দেব চিত্তরঞ্জন—ছড়া ও প্রবচনে পূর্ববঙ্গ।
দেব চিত্তরঞ্জন—পল্লীগীতি ও পূর্ববঙ্গ।
বদিউজ্জামান—(সম্পাদিত)—রঙপুরগীতিকা।
জসিমউদ্দীন—মুর্শিদা ও জারীগান।
চৌধুরী ডঃ দুলাল—চাকমা প্রবাদ।
চৌধুরী ডঃ দুলাল—বাংলা লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতি।
সেন ডঃ দীনেশ—মৈমন সিংহ গীতিকা।
সেন ডঃ দীনেশ—পূর্ববঙ্গ গীতিকা।
ভৌমিক ডঃ নির্মলেন্দু—প্রান্ত উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত।
চক্রবর্ত্তী নিরঞ্জন—উনবিংশ শতাব্দীর কবিয়ালা ও কবিগান।
চৌধুরী ডঃ নারায়ণ—বাংলার সংস্কৃতি।
বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রী পাঁচকড়ি—বাঙালীর সমাজ।
গুপ্ত পবিত্র—উত্তরবঙ্গে টো-টো উপজাতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ।
মাহাতো (ডঃ) পশুপতি প্রসাদ—ঝাড়খণ্ডী জনপদীয় সাহিত্য।
দাস ডঃ প্রফুল্ল চন্দ্র—প্রচিন কবিওয়ালার গান।
ভট্টাচার্য্য শ্রী ব্রজেন্দ্র চন্দ্র—বাংলা সাহিত্যের নানা প্রসঙ্গ।
বন্দ্যোপাধ্যায় বীরেশ্বর—বাংলা দেশের সঙ্ প্রসঙ্গে।

ভট্টাচার্য্য শ্রীবিজনবিহারী—চণ্ডীমঙ্গল।
রায়চৌধুরী ডঃ মনোরঞ্জন—মঙ্গলকাব্যে সাঙ্গীতিক প্রভাব।
বর্ধন শ্রী মণি—বাংলার লোকনৃত্য ও গীতি বৈচিত্র্য।
চৌধুরী মোমেন, হক্ খোন্দকার রিয়াজুল (সম্পাদিত)—বাংলাদেশের মরমী সঙ্গীত।
ভট্টাচার্য্য মুকুন্দ দাস—বরাক উপত্যকার গ্রামীণ নৃত্যকলা।
চৌধুরী রামশংকর—লোকসংঙ্গীত প্রসঙ্গে।
মজুমদার ডঃ শিশির—উত্তরবঙ্গের লোকনাট্য।
সেন ডঃ সুকুমার—প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী।
ভট্টাচার্য্য শ্রীসুধীভূষণ (সম্পাদিত)—মঙ্গল চণ্ডীর গীত।
দেববর্মণ সুরেন—ত্রিপুরার আধিবাসী জীবন ও সংস্কৃতি।
চক্রবর্তী ডঃ হরিপদ—দাশরথী রায় ও পাঁচালী।
বিশ্বাস হেমাঙ্গ—লোকসঙ্গীত সমীক্ষা।
ভট্টাচার্য্য ডঃ হংসনারায়ণ—হিন্দুদের দেবদেবী।
পালিত হরিদাস—আদ্যের গম্ভীরা।
দেববর্মা নরেন্দ্র—প্রাচীন ত্রিপুরী লোকসঙ্গীত সংকলন।

পত্রিকা

- জনজীবন শারদীয়া প্রবন্ধ সংখ্যা—১৪০৩
- ছত্রাক—মানভূম সাংস্কৃতিক মুখপত্র—সম্পাদক শ্রীসুবোধ বসু রায়।
- হাওড়া জেলার লোক উৎসব—সম্পাদক—শ্রীতপন কুমার সেন।
- পট ও পটুয়া—অরুণাভ দত্ত।
- আবর্ত—সম্পাদক—অর্ধেন্দু চক্রবর্তী।
- দেশ পত্রিকা—
- পরিচয়—সম্পাদক—অমিতাভ দাশগুপ্ত।

বাংলা একাডেমী—ঢাকা
গ্রন্থপঞ্জী

চৌধুরী মোমেন সম্পাদনা—লোকসাহিত্য সংকলন—২৯
খান আনোয়ার হোসেন সম্পাদনা—লোকসাহিত্য সংকলন—৩২
ইসলাম সামীয়ূল সম্পাদনা—লোকসাহিত্য সংকলন—৩২
ইসলাম সামীয়ূল সম্পাদনা—লোকসাহিত্য—পঞ্চদশ খণ্ড।
ডঃ মুহম্মদ আবদুল জলিল—লোক সাহিত্যের নানা দিক।

সংগ্রহ সূত্র

যাঁদের সাহায্যে ও সক্রিয় সহযোগিতায় গ্রন্থটি প্রণয়নে, বিভিন্ন তথ্যাদি সংগৃহীত হয়েছে তাঁদের নাম, ঠিকানা নীচে উদ্ধৃত করা হ'ল।

এঁদের নিরলস প্রয়াস নিঃসন্দেহে অভিনন্দন যোগ্য। তাই এঁদের প্রত্যেককে উষ্ণ-আন্তরিক কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করলাম।

হাওড়া

শ্রীমতী মীরা গঙ্গোপাধ্যায়। সন্তোষবাটী ; মাজু, হাওড়া
শ্রী শক্তিপদ গঙ্গোপাধ্যায়। সন্তোষবাটী ; মাজু, হাওড়া
ডঃ রবীন্দ্রনাথ গুপ্ত। শিবপুর রোড, হাওড়া
শ্রী অরুণ পাল। কদমতলা, হাওড়া
শ্রী শংকর চক্রবর্ত্তী। শিবপুর, হাওড়া
শ্রী উত্তম চট্টোপাধ্যায়। শিবপুর, হাওড়া
শ্রীমতী জ্যোতি দাস। শিবপুর, হাওড়া
শ্রী জয়ন্ত দাস। মাজু, হাওড়া
শ্রীতপন কুমার সেন। মহেশ্বরপুর, বীরশিবপুর, উলুবেড়িয়া, হাওড়া
শ্রীকালিপদ অধিকারী। আমতা, হাওড়া।
শ্রী প্রকাশ দত্ত। বরদা রোড, হাওড়া।
শ্রী শিবনাথ অধিকারী। কোনা, হাওড়া।
শ্রী হারাধন খাঁ। মাড়ঘুরালী, হাওড়া।
শ্রী অমরেন্দ্র নাথ মণ্ডল। পানপুর, হাওড়া।
শ্রীমতি দীপ্তি ব্যানার্জী। পঞ্চাননতলা রোড, হাওড়া।
শ্রী মোহন চন্দ্র মালিক। মালিপুকুর, হাওড়া।

হুগলী

শ্রীমতী সান্ত্বনা চ্যাটার্জি। জয়পুর প্রফেসর পাড়া, মগরা, হুগলী।
শ্রী শচীন ঘোষ। দেবানন্দপুর, হুগলী।
শ্রী বিনয় রায়। চুঁচুড়া, হুগলী।
শ্রী সুনীল দাস। জিয়ারা, তারকেশ্বর, হুগলী।
শ্রী রাবণ দাস হেমব্রম। কোলা, মগরা, হুগলী।
শ্রী কুমার হেমব্রম। কোলা, মগরা, হুগলী।

বর্ধমান

শ্রী হরিসাধন দাস। বেলগ্রাম, গোবর্দ্ধনপুর, বর্ধমান।
শ্রী বারিদবরণ গুপ্ত। আসানসোল, বর্ধমান।

বীরভূম

শ্রী সুবীর ব্যানার্জি। নিউ জঙ্গলপাড়া, সিউড়ী, বীরভূম।
শ্রী সুকুমার চট্টোপাধ্যায়। সিউড়ী, বীরভূম।
শ্রী দোলগোবিন্দ ব্যানার্জি। সিউড়ী, বীরভূম।
শ্রী মানস চক্রবর্ত্তী। সিউড়ী, বীরভূম।
শ্রী গঙ্গাধর হাজরা। দামকল গ্রাম, বীরভূম।
শ্রী বিজয় দাস। নলহাটী, বীরভূম।
মির্জামহঃসাদেক। নলহাটী, বীরভূম।
অধ্যাঃ তরুণ কুমার সর। শান্তিনিকেতন, বীরভূম।
ডঃ মাধবী ঘোষ। উকিলপটী, বোলপুর, বীরভূম।

বাঁকুড়া

শ্রী ভজন কৃষ্ণ গাঙ্গুলী। সোনামুখী, বাঁকুড়া।
শ্রী মঙ্গলময় মুখার্জি। কামারপুকুর, বাঁকুড়া।
শ্রী চিত্ত দাশগুপ্ত। ছাতনা, বাঁকুড়া।
শ্রী সন্তোষ কুমার সিংহ। বেলেতোড়, বাঁকুড়া।
শ্রী প্রদ্যোষ কান্তি মুখার্জি। তেলিবেড়িয়া, বাঁকুড়া।
শ্রী বাবলু সাঁতরা। মুড়াকাটা, বাঁকুড়া।
শ্রী নবকুমার পাত্র। তালডেংড়া, বাঁকুড়া।

মেদিনীপুর

ডঃ অনিমেষ কান্তি পাল। ৩৬৬, মাইকেল মধুসূদন নগর, মেদিনীপুর।
শ্রী কার্ত্তিক চন্দ্র মণ্ডল। পানিপারুল, মেদিনীপুর।
শ্রী সোমনাথ রায়। বরদা, মেদিনীপুর।
শ্রী ললিত মোহন মাহাতো। ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর।
শ্রী নীলকণ্ঠ রাউল। হাঁসাড়িয়া, জুমকী, মেদিনীপুর।

পুরুলিয়া

শ্রী সুবোধ বসুরায়। 'বনামী', নডিহা, পুরুলিয়া।

শ্রী সঙ্গীত সরকার। নীলকুঠিডাঙ্গা, পুরুলিয়া।
শ্রীগান্ধীরাম মাহাতো। পুরুলিয়া।
শ্রী সুকুমার নাগ। চেলিয়ামা, পুরুলিয়া।
শ্রী তরুণ দে। রঘুনাথপুর, পুরুলিয়া।
শ্রী সুনীল সাহা। ঝাল্দা, পুরুলিয়া।
শ্রী মনোজ চন্দ্র। কাশীপুর, পুরুলিয়া।

কলকাতা

ডঃ মৃগাঙ্ক শেখর চক্রবর্ত্তী। বেহালা, কলকাতা-৩৪
শ্রী বুদ্ধদেব রায়। কাঁকুড়গাছি, কলকাতা—
শ্রী শংকর প্রসাদ দে। বৌবাজার, কলকাতা-১২
শ্রী রাসবিহারী মিত্র। বেহালা, কলকাতা-৩৪
শ্রী অনিল বরণ কর। তিলজলা, কলকাতা—
শ্রী নির্ম্মল সরকার। দমদম, কলকাতা—
শ্রী অশোক বন্দোপাধ্যায়। লেকটাউন, কলকাতা—
শ্রী পবিত্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৩১
শ্রী বটু পাল। কলকাতা—২৯
শ্রী শান্তিনাথ গাঙ্গুলী। গড়িয়া, কলকাতা—
ডঃ রীণা দত্ত। সল্টলেক, কলকাতা-৬৪
শ্রী বিষ্ণুপদ দাস। পর্ণশ্রী, বেহালা, কলকাতা—৩৪

নদীয়া

শ্রী মোহিত রায়। কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
শ্রী সৌরেশ প্রামাণিক। বানপুর, নদীয়া।
শ্রী সরোজ দত্ত। রাণাঘাট, নদীয়া।

মালদহ

শ্রী গুরুপ্রসন্ন বারুরী। কালীতলা, মালদহ।
মহঃ ইউনুস খাঁ। পীরোজপুর, মালদহ।

মুর্শিদাবাদ

শ্রী স্বপন চক্রবর্ত্তী। চালতিয়া, মুর্শিদাবাদ।
শ্রী পুলকেন্দু সিংহ। পাঁচথুবী, মুর্শিদাবাদ।

শ্রী দিবাকব চক্রবর্ত্তী। রায়গ্রাম, মুর্শিদাবাদ।
শ্রীউদয় শংকর দাস। ফারাক্কা, মুর্শিদাবাদ।
শ্রী শ্যামসুন্দর দাস। ধুলিয়ান, মুর্শিদাবাদ।
শ্রী কার্ত্তিক চন্দ্র দাস। পলইঘাটা, বেলডাঙ্গা, মুর্শিদাবাদ।
শ্রী যাদব চন্দ্র মণ্ডল। কান্দী, মুর্শিদাবাদ।

জলপাইগুড়ি

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। ফালাকাটা, জলপাইগুডি।
শ্রী পরিমল কুমার দাস। ফালাকাটা, জলপাইগুড়ি।
শ্রীমতী রীণা চক্রবর্ত্তী। আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি।
শ্রী পরিমল দে। আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি।
শ্রী হরিকান্ত রায়। জলপাইগুড়ি।

দার্জিলিং

শ্রী মিহির সান্যাল। দেশবন্ধুপাড়া, শিলিগুড়ি, দার্জিলিং।
শ্রী শিবকুমার লোহার। রসিকগ্রাম, শিলিগুড়ি, দার্জিলিং।

কোচবিহার

শ্রী হীরেন দাস (নেপু)। কোচবিহার।
শ্রীমতী চৈতালী বসু। দেশবন্ধুপাড়া, কোচবিহার।

আসাম

শ্রী কমলাক্ষ্য মিশ্র। কালাপাহাড়, গৌহাটী, আসাম।
শ্রী তারকনাথ ভট্টাচার্য্য। মালিগাঁও, গৌহাটী, আসাম।
শ্রী বেনু বিনোদ দাস। শিলচর-৬, আসাম
শ্রী ধীরেন্দ্র লাল নাথ। শিলচর, আসাম।
শ্রী যুগল বরণ আচার্য। নতুনপাড়া, বনগাঁইগাঁও, আসাম।
শ্রী শান্তি ভট্টাচার্য্য। শিলচর, আসাম।

ত্রিপুরা

শ্রী সন্তোষ সূত্রধর। ধর্মনগর, ত্রিপুরা।
শ্রী সঞ্জয় চক্রবর্ত্তী। তেলিয়াপাড়া, ত্রিপুরা।

শ্রী উদয়শংকর ভট্টাচার্য্য। আগরতলা, ত্রিপুরা।

শ্রী উমাশংকর চক্রবর্ত্তী। আগরতলা, ত্রিপুরা।

বিহার

শ্রী সুজন পণ্ডিত। রাঁচি, বিহার।

উড়িষ্যা

শ্রীপ্রিয়লাল মজুমদার। রাউরকেল্লা, উড়িষ্যা।

চব্বিশ পরগণা

শ্রী মদন মোহন ঘোষ। বিরপাপুর, দঃ ২৪ পরগণা।

শ্রী আনন্দ গোপাল হাইত। জয়নগর, দঃ ২৪ পরগণা।

অরুণাচল প্রদেশ

মিঃ টি. ব্যানার্জী। ইটানগর, অরুণাচল প্রদেশ।

নাগাল্যাণ্ড

শ্রীমতি সাবিত্রী ভট্টাচার্য্য। ডিমাপুর, নাগাল্যাণ্ড।

মধ্যপ্রদেশ

শ্রী জগদীন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ভূপাল, মধ্যপ্রদেশ।

স্বরলিপি—১

বারমাস্যাগান ঃ আইসো সাধু বৈসো খাও—পৃষ্ঠা—২৬

স্থায়ী

‖	পা	া	পা	ধা	।	ণা	০	ধা	পা	।	পা	পা	পা	ধা	।	পা া মা া ।
	আ	০	ই	সো		সা	০	ধু	০		ব	ই	সো	০		খা ০ ও ০
।	পা	পা	ধা	ধা	।	ধা	া	া	া	।	পা	ধপা	মা	গা	।	গা া সা রা ।
	ম	ন্‌	দি	০		রে	০	০	০		ম	০০	ন্‌	দি		রে ০ ০ ০
।	গা	গা	রা	া	।	সা	া	সা	সা	।	সা	া	রা	া	।	রা া পা া ।
	ম	ন্‌	দি	০		রে	০	আ	হা		পা	০	ষা	০		ণ ০ বা ইন্‌
।	মা	া	গা	া	।	সা	া	রা	া	।	গমা	গা	রা	সা	।	সা া া া ‖
	ধা	০	ছো	০		সা	০	ধু	০		বো০	ই	দে	০		শে ০ ০ ০

অন্তরা

‖	মা	মা	পা	পা	।	না	া	না	া	।	র্সা	া	র্সা	া	।	র্সা া া র্সা ।
	জ্যৈ	০	ষ্ঠ	০		মা	০	সে	০		মি	০	ষ্ট	০		ফ ০ ০ ল
।	পা	া	ধা	ধা	।	ণা	া	ধা	া	।	পা	পা	পা	পা	।	পণা ধণা পধা পা ।
	আ	০	ষা	ঢ়		মা	০	সে	০		বা	ই	স্যা,	র		জ০ ০০ ০০ ল
।	মা	া	মা	ধা	।	ধা	া	া	ধা	।	পা	পা	া	ধা	।	পা া মা মা ।
	শ্রা	০	ব	ণ		মা	০	০	স		গে	ল	০	গো		না ০ রী র
।	পা	া	পধা	া	।	ধা	া	া	া	।	পা	া	া	মা	।	গা া সা রা ।
	সা	০	য়	০		রে	০	০	০		সা	০	০	য়		রে ০ ০ ০
।	গমা	গা	রা	া	।	সা	া	া	া	‖						
	সা	০	য়	০		রে	০	০	০							

[বাকি কলির সুর অন্তরার মতন]

স্বরলিপি—২

বারমাস্যাগান ঃ বার মাসের কথা শুন হে প্রাণেশ্বর—পৃষ্ঠা—৩১

II সা । গা । মা পা । । মা । গা । রা সা । I (পয়ার)
বা র ০ মা সে র ক থা ০ শু ন ০

I গা । রা । সা । ন্‌া । সা । । । সা । । II
হে ০ প্রা ণে ০ শ্ব র ০ ০ ০ ০ ০

ঝাঁপতাল

II গা পা । ধা র্সা র্সা । না না । ধা পা । I
বৈ শা খ ০ মা স রে কা ন্‌ ত
আ ষা ঢ় ০ মা স রে কা ন্‌ ত
ভা দ্র মা ০ সে পা কা তা ০ ল
কা র্ত্তি ক ০ মা স রে ঘ রে ০
মা ঘ শী ০ ত সে যে বা ০ ঘ
ফা গু ন ০ মা স রে কা ন্‌ ত

I গা পা । র্সা র্সা । । র্সা । । র্সা ; । I
চ ড়া খ ০ রা লা গে ০ ০ ০
ঝ রে জ ০ ল ধা রা ০ ০ ০
তা সং গ ০ রে পি ঠা ০ ০ ০
না হি ভা ০ ত ভু জা ০ ০ ০
তু মে পা শ র না হি ০ ০ ০
কো কি ল ০ ব স ন্‌ ত ০ ০

I র্সা র্রা । র্সা । না । ধা পা । ধা পা । I
কান্‌ ত বি ০ নে কা সং প ০ রে
তু ম বি ০ নু মো আঁ খি ০ রু
মু ক রি ০ লে কে খা ই ০ ব
কে আ নি ০ ব কু হ প্র ভু ০
কা সং গে ০ ক রি বি গে ই ল
এ দে হ ০ দে বি বা কা কু ০

স্বরলিপি

I ধা পা |	ধা মা ধা |	পা া |	পা া া II
এ ই	ক ০ থা	জা গে	০ ০ ০
যে ব	হি ০ র	ধা রা	০ ০ ০
সে কা	ক ০ রা	পি ঠা	০ ০ ০
মে লা	রু ০ সে	খ জা	০ ০ ০
ম ন	উ ০ ছ্	ল ই	০ ০ ০
দে হ্	র ০ ব	স ন্	ত ০ ০

খেমটা

II যা া া |	রা া া |	গা া া |	মা া া I
জ্যৈ ই ষ্ঠ	মা সে ০	জ ল ০	হী ন ০
শ্রা ব ০	ন মা ০	স রে ০	আ গো ০
আ শ্বি ০	ন মা ০	স রে ০	স্বা মী ০
ম গ ০	সি র ০	মা স রে	না থ ০
পু ষ ০	মা স র	ম নে ই	পি ঠা ০
চৈ ত্র ০	মা সে ০	পা কে ০	বে ল ০

I ধা া া |	পা মা া |	র্সা গা রা |	রা মা া I
গ ড়ি ০	য়া পু ০	খু রী ০	০ ০ ০
স বু ০	জ ল ০	থে ই ০	০ ০ ০
তু মে ০	না হি ০	ঘ র ০	০ ০ ০
ল ০ ক্ষী	ঘ রে ০	অ ছি ০	০ ০ ০
কে ব ০	সি খা ০	ই ব ০	০ ০ ০
বে ল ০	প না ০	ক রি ০	০ ০ ০

I সা া রা |	সা া া |	গা া রা |	সা া া I
ম ন ০	ব ড় ০	এ কা ০	এ কা ০
তু ম ০	বি ন ০	প্রা ণ ০	কা ন্ ত
কা সং ০	গ রে ০	জি বি ০	মু হি ০
কি ক ০	রি পু ০	জি বি ০	কা ন্ত ০
কা ন্ ত	আ সি ০	পা শে ০	ব সি ০
কা কু ০	দে খি ০	কু হ ০	কা ন্ ত

I	পা । ।	মা গা রা	র্সা । ।	র্সা । ।	II
	কা সং ০	গ ০ রে	আ ড়ি ০	০ ০ ০	
	ম নে ০	ন ০ র	হি ব ০	খে ই ০	
	মে লা ০	ঘু রি ০	বা র ০	০ ০ ০	
	পা নি ০	ফ ল ০	দে ই ০	০ ০ ০	
	কে ক ০	থা ক ০	হি ব ০	০ ০ ০	
	ম ন ০	ঘ রি ০	ত ড়ী ০	০ ০ ০	

(শেষ পংক্তী)

II	পা । ধা	পা । ।	গা । রা	গা পা ।	I
	আ সি ০	ব মা ০	স র ০	ম ধ্যে ০	
I	পা র্সা র্সা	না ধা ।	পা । ধা	পা ধা ।	I
	র খি ০	ব ম ০	ন র ০	০ ০ ০	
I	পা । ।	ধা না ।	ধা । ।	পা ধা ।	I
	ফে রি ০	আ স ০	মো কো ০	তি কু ০	
I	র্সা না ধা	পা মা গা	সা । ।	সা । ।	II
	মা স ০	শে ষ ০	ঘ র ০	০ ০ ০	

স্বরলিপি—৩

গম্ভিনী গানঃ—লল রাজার পূজা হয়—পৃষ্ঠা—৩২

II	সা । রা	সা । ।	পা মা গা	সা । ।	I
	ল ল ০	রা জা র	পূ জা ০	হ ০ য়	
	ল ল পু	তা হ য়	পু ক র	জ ০ ন্য	
	সে ই জ	ল র ০	ল ল ০	পু জা ০	
	দু প র	বে লে ০	গু ল্ ০	ঘ ন্ ট	
I	পা । ।	পা মা ।	পা । ।	পা । ।	I
	এ ই তো	লু য়া ০	ক থা ০	০ ০ ০	
	ঈ শা ন	ক ন র	ধা রে ০	০ ০ ০	
	ল ০ ক্ষী	পু জা ০	ক রি ০	০ ০ ০	
	বি শে ষ	ত র ০	কা রী ০	০ ০ ০	

I পা ধা না । না । । । না র্সা র্রা । না । । I
ব ন ০ উ ষু দ পু ক ০ মা রে ০
চ ড়ে ই ব সি ০ পু ক ০ খা ০ য়
ম ঙ্গ ল কা জ র ব্য ভা র ক রে ০
গ র্ভি নী স ং ০ ক্রা ন্তি র এ ই ০

I গা মা পা । গা মা ধা । পা । । । পা । । I
এ ই টা আ স ল ক থা ০ ০ ০ ০
জ মি র চা রি ০ ধা র র ০ ০ ০
তে রো ০ পা র্ব ন ক রি ০ ০ ০ ০
হে লা ০ বি ধি ০ ধি রি ০ ০ ০ ০

I পা ধা র্সা । র্রা র্গা । । র্গা । র্রা । র্গা । । I
চা উ ল উ ল ০ অ ন সু রু ষা ০
ডা ক্ জ ল হ য় গ ং গা জ ল ০
ল ল মা র তে ০ বি ল কু যা য় ০
বা র ০ মা স র তে রো ০ পা ব ন

I র্সা না ধা । পা মা গা । না । । । । । । I
ঝোট্কা ঠী কা কু ড়ী লা ড়ি ০ ০ ০ ০
আঁ ধা র রা ত রু ধ রি ০ ০ ০ ০
গ্রা ম য় ম হা ০ দে ব র দো হা ই
গ্রা স য় দি গ র হ ০ ০ ০ ০ য়

I র্সা । । । না ধা । । পা । । । সা গা । II
এ ই কে ই টী য়া পু ক র য ম ০
ধ রি ০ আ নে ০ ঘ র র ব উ ঊী
ঘা স ০ আ নে ০ অ ড়ে ই হে লা ০
আ ন ন্ দ র ০ দি ন ০ কা টে ০

I গা মা পা । গা মা পা । সা । । । সা । । II
আ গে ০ দি ন র বু লি ০ ০ ০ ০
পি ত ল ঘ টী ০ ভ রি ০ ০ ০ ০
গ রু র খা ও য়ার লে ই ০ ০ ০ ০
ব ছ র বে লে ০ ঘু রি ০ ০ ০ ০

স্বরলিপি—৪

ব্রতের গান ঃ—হিল্ হিলাচ্ছে কমরটা মোর—পৃষ্ঠা—৩৭

II পা -া পা | পা পা -া | পা পা -া | পা পা -া I
হি ল হি লা ছে ০ ক ম র্ টা মো র্

I পা -া পা | পা পা -া | রা -া রা | -া -া -া I
শি র্ শি রা ছে ০ গা ০ ও ০ ০ ০

I রা -া রা | রা রা -া | রা -া রা | গা গা -া I
কো ন্ ঠে কে না ০ গে ই লে এ লা ০

I গা -া গা | রা -া রা | সা -া সা | -া -া -া I
হু দ্ মা দে ০ খা পা ০ ওঁ ০ ০ ০

I পা পা -া | পা পা -া | পা পা পা | পা গা -পা I
পা টা নি খা ন্ ০ প ড়ে ছে খ সি ০

I পা -া -া | া া া | পা ধা ধা | ধা পা া I
য়া ০ ০ ০ ০ ০ হু দু মা দে খা ০

I গা গা পা | পা গা পা | পা া া | া া া I
দে ও গে আ সি ০ য়া ০ ০ ০ ০ ০

I পা া পা | পা া পা | গা গা গা | রা রা সা I
আ ই স ক্ রে ওঁ হু দ মা দেও য়া ০

I রা -া রা | গা গা -া | গা গা -া | রা রা সা II
তো র্ প দে মু ই আ ছে ০ ব সি য়া

স্বরলিপি—৫

ব্রতের গান ঃ ।। ম্যাঘ রাণীর কূলো নানান গান।।

হ্যাঁ দে লো বুন ম্যাঘারাণী—পৃষ্ঠা—৩৭

II -া -া সা | সা সা রা | রা গা -া | গা মগা রা II
০ ০ হ্যা দে লো বুন্ ম্যা ঘা ০ রা ণী ০

I -া া রা | রা রা মা | মা মা গা | রা সা া I
০ ০ হাত্ পাও ধুই য়া ফ্যা লা ও পা নি ০

I -া -া ধা | সা সা সা | সা সা সা | সা রা া I
০ ০ ছো ট ভুঁই তে চি ন্ চি না নি ০

I -া া রা | পা পা ধা | পা মা া | গা রা সা I
০ ০ ব ড় ভুঁই তে হাঁ টু ০ পা নি ০

I রা রা -া | গা গা -া | -া -া - | -া -া -া II
ম্যা ঘা ০ রা নী ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

II -া -া গা | পা পা পা | পা -া পা | পা ধা া I
০ ০ ম্যা ঘা রা নীর্ ঘ ০ র খা নি ০

I র্সা র্সা না | ধা পা -া | ধা - ণধা | পা -া া I
পা থ ০ রে র ০ মা ০ ০ ঝে ০ ০

I গা পা পা | পা -া ধা | ধা র্সা না | ধপা -া -া I
হে ই বৃ ষ্টি ০ ০ না ০ ম লো ০ ০

I ধা -া ণা | ধা পা -া | পা া া | -া -া া I
ঝাঁ ০ কে ০ ঝাঁ ০ কে ০ ০ ০ ০ ০

I -া -া সা | সা সা রা | রা গা -া | মগা রা া I
০ ০ ম্যা ঘা রা নী ম্যা ঘা ০ রা নী ০

I -া -া রা | রা ০রা মা | গা -া রা | সা -া া I
০ ০ তু মি শুন্ ছ নী ০ ০ ০ ০ ০

I -া -া ধ্া | সা সা সা | সা -া সা | সা -া রা I
০ ০ গো লায় আ ছে বী ০ জ ধা ০ ন্

I -া া রা | পা পা ধা | পা -া মা | গা রা সা I
০ ০ বুন্ তে পা রি নি ০ ০ ম্যা ঘা ০

I রা গা -া | -া -া া II
রা নী ০ ০ ০ ০

স্বরলিপি—৬

ভাদুগান : আমার ভাদুমণি সোনার খনি—পৃষ্ঠা—৪১

স্থায়ী

													রা	জ্ঞা		
													আ	মার		
II	রা	সজ্ঞা	রসা	I	গা্	গা্	সা	I	সা	সা	সা	I	রা	রগা	মা	I
	ভা	দু	০		ম	ণি	০		সো	না	ব		খ	নি০	০	
I	পা	মা	মা	I	গা	রা	জ্ঞা	I	বা	জ্ঞরা	সা	I	ı	মা	'মা	I
	যা	বে	ক্		শ	শু	র		বা	ড়ী০	০		০	ত	রা	
I	মা	পা	পা	I	পা	পা	ı	I	মা	মা	পা	I	মপা	ধণা	ধা	I
	আ	ছি	স্		কে	রে	০		দে	০	রে		জু০	ই০	ড়ে	
I	পা	মা	মা	I	গা	রা	জ্ঞা	I	রা	জ্ঞরা	সা	I	সা	রা	জ্ঞা	II
	ত্ব	রা	০		জু	ড়ি	০		গা	ড়ি০	০		০	আ	মার	

অন্তরা

II	ı	ı	পা	I	ধা	মা	পা	I	ধা	র্সা	ı	I	র্সা	র্সা	র্সা	I
	০	০	প		লাশ্	ব	নের		মা	ঠে	র		ফাঁ	কে	০	
I	ı	ı	র্রা	I	র্সা	ণা	ধা	I	মা	মা	মা	I	পা	ধা	ণা	I
	০	০	যে		থা	কে	ন্দো		বা	ঘ	টো		থা	কে	০	
I	ধা	পা	ı	I	ı	ı	ı	I	মা	পা	পা	I	পা	পা	পা	I
	গো	০	০		০	০	০		ভা	দু	র		বা	পে	ক্	
I	মা	মা	পা	I	মপা	ধণা	ধপা	I	পা	মা	মা	I	গা	রা	জ্ঞা	I
	দে	০	প		ঠা০	০০	য়ে০		কাঁ	ড়ে	০		তী	র	টো	
I	রা	জ্ঞা	রা	I	সা	ı	ı	II								
	জু	ড়ি	০		০	০	০									

● বাকি কলিগুলি অন্তরার মতন।

স্বরলিপি—৬ (ক)

নীলের গান—ঢোল বাজে কাড়া বাজে বিহ্য করতে শিব চল্যাছে পৃষ্ঠা—৪৩

II সা সা সা রা | গা মা পা পা | পা ধা ণা ধা | পধা পা মা গা I
ঢো ল বা জে   কা ড়া বা জে   বি হ্য কর তে   শিব চ ল্যা ছে

I রা রা রা গা | মা পা ধা পা | পা মা গা রা | রা সা সা -া I
দে ব সে না   দৈ ত্য সে না   তা র সা থে   মি ল্যা ছে ০

II পা পা ধা া | র্সা র্সা না ধনা | পা পা ধা র্সা | র্সা র্রা র্সা -া I
বাঘ ছাল পই্ র‍্যা   কৈল্কা লই যা০   দাম্ ড়ার উ পর   চই ড়্যা ছে ০

I পা ধা র্সা না | ধনা ধা পা পা | ধা -া ণধা পা | ধা -া ণধা -পা I
সা পের মা লা   গ০ লায় দি য়া   ব র্ সাই জ্যা   ছে ০ রে০০

I ধপা মা গা রা | সা -া -া -া II
বর্ সা ই জ্যা   ছে ০ ০ ০

I পা ধা র্সা না | ধনা ধা পা পা | ধা -া পধা পা | ধা -া ণধা পা I
কেউজা নে না   জা০ মাই এ যে   শ মন্ কে০জয়   কই র‍্যা ছে০০

I ধা পা মা গা | রা রা সা -া IIII
শ মন্ কে জয়   কই র‍্যা ছে ০

স্বরলিপি—৭

ব্রতেরগান—ঐ ঐ দেখা যায় বড় বড় বাড়ী.....পৃষ্ঠা—৪৩

II র্সা -া র্সা -া | র্সা না ধা পা | র্সা র্সা র্সা না | ধা পা -া -া I
ও ই ও ই   দে খা যা য়   ব ড় ব ড়   বা ড়ী ০ ০

I গা -া গা মা | পা -া মা পা | মা গা রসা -া | সা সা -া -া I
ও ই দে খা   যা য় বু ঝি   সু য্যি গো০০   বা ড়ী ০ ০

I গা গা গা সা | রা রা সা -া | গা গা মা পা | মাগা -া -া -া I
কি ক র গো   সু র্য্যি ব উ   বই স্যা দু য়া   রে০০ ০ ০

I ধা ধা ণা ধা | পা পা মা পা | মা গা রসা -া | সা -া -া -া I
তো মার সু র্য্যি   আ ই বে ন   ঘো ড়ায় সো০য়া   রে ০ ০ ০

I র্সা -া র্সা র্সা | র্সা -না ধা পা | র্সা র্সা না ধা | পা পা -া -া I
আ ই লে ন   সু ০ র্যি ০   ব ই লে ন   খা টে ০ ০

I গা -া গা মা | পা -া মা পা | মা গা রসা -া | সা সা -া -া I
না ই লে ন   ধু ই লে ন   গ ং গা০ র   ঘা টে ০ ০

I গা গা গা সা | রা -া সা -া | গা গা মা পা | মা গা -া -া I
খা ই লে ন   সু ০ র্যি ০   সু বর নে র   থা লে ০ ০

I ধা ধা ণা ধা | পা পা মা পা | মঃ গা রসা -া | সা সা -া -া II
আ চাই লে ন   পি চাই লে ন   গা ০ ড়ু০ র   না লে ০ ০

স্বরলিপি—৭(ক)

মেয়েলী ছড়া গানঃ ও শ্বাশুড়ী পায়ে পড়ি দিওনা আর গঞ্জনা..... পৃষ্ঠা—৫৭

স্থায়ী

II া পা পা | পা পা -া | পা দা ণদা | পা মা -া |
০ ও শ্বা   শু ড়ী ০   পা য়ে ০   প ড়ি ০

| মা মা মা | মা মা -া | জ্ঞা মজ্ঞা মা | মা -া -া |
দি ও ০   না আ র   গ ণ্ জ   না ০ ০

| -া মা জ্ঞা | ঋা সা সা | সা -া সা | সা -া -া |
০ দি ও   না আ র   গ ন্ জ   না ০ ০

| া ণ্া সা | জ্ঞা জ্ঞা -া | জ্ঞা -জ্ঞা -া | মা -মা -া |
ও শ্বা   শু ড়ী ০   পা য়ে ০   প ড়ি ০

| -া মা জ্ঞা | ঋা সা সা | ণ্া -া সা | সা -া -া |
০ দি ও   না আ র   গ ন্ জ   না ০ ০

| -া পা পা | পা -া -া | দা দা দা | পা মা -া |
০ আ মি   যে ০ ০   কৃ লে র   ব ধু ০

| জ্ঞা জ্ঞা মা | পা -া মা | জ্ঞা -া -ঋা | সা -া -া |
কৃ ল ম   জা ০ তে   পা ০ রি   না ০ ০

স্বরলিপি

। -া পা পা । পা -া -া । দা দা -দা । দা দা -া ।
০ আ মি যে ০ ০ কূ লে র ব ধূ ০

। পা -পা দা । ণা -া পা । পা -া পা । পা -া -া ।
কূ ল ম জা ০ তে পা ০ রি না ০ ০

। -া পা পা । পা -া -া । দা দা দা । পা মা -া ।
০ আ মি যে ০ ০ কূ লে র ব ধূ ০

। জ্ঞা জ্ঞা মা । পা -া মা । জ্ঞা -া ঋা । সা -া -া ।
কূ ল ম জা ০ তে পা ০ রি না ০ ০

। া ণ্‌া সা । জ্ঞা -জ্ঞা -া । জ্ঞা জ্ঞা -া । মা মা -া ॥
০ ও শ্বা শু ড়ী ০ পা য়ে ০ প ড়ি ০

অন্তরা

॥ পা পা পা । পা পা পা । পা পা দা । পা মা মা ।
স্বা মী ০ টি মো র বো ম ভো লা না থ

। মা -া মা । মা মা -া । জ্ঞা জ্ঞা মা । মা মা -া ।
স ং সা রে তে ০ নে ই কো ম ন ০

। -া জ্ঞা মা । দা পা -া । মা মা জ্ঞা । ঋা সা -া ।
০ ন ন দি নী ০ কা ল না গি নী ০

। জ্ঞা -মা মা । জ্ঞা ঋা ঋা । সা -া সা । সা সা সসা ।
বি ষে র জ্বা লা য় জ্বা ০ লা ত ন আমি

। ণ্‌া ণ্‌া ণ্‌া । সা সা সা । সা জ্ঞা -া । রা জ্ঞা জ্ঞা ।
দি ন র জ নী ০ খে টে ০ ম লা ম

। জ্ঞা জ্ঞা মা । জ্ঞা ঋা ঋা । সা সা সা । সা -া -া ॥
ম ন্‌ তো তো মা র পে লা ম না ০ ০

"দেওর ভাসুর নেই..... কেউ তো বোঝে না"—অন্তরার মত হবে।

স্বরলিপি—৮

গাজন গান ঃ বাবা তারকনাথের চরণে সেবা লাগে

মহাদেব—

ভাঙ্গর ভোলা শিব তোমার একি মোহন বেশ ; পৃষ্ঠা—১১২

র্সা র্সা ণা র্সা র্সা র্সা র্সা ণর্সা র্সা র্সা ণর্সা র্সা র্সা
বা বা তা র ক না থের চর ণে সে বা লা গে
সা সা র্সা র্সা

II সা -া মা । মা মা -পা I মা -া জ্ঞা । রা সা -া I
ভা ঙ্গ র ভো লা ০ শি ০ ব তো মা র

I সা রা -া । ণ্া ণ্া সা I সা -া -া । -া -া I
এ কি ০ মো হ ন বে ০ ০ শ ০ ০

I মা -া পা । পা পা ণা I ণা -া ণা । ধা পা -া I
মা ০ থা তে প ই রে ০ ছ মু কু ট

I পা ধা পা । মা মা -া I জ্ঞমা জ্ঞা -া । রা -া রা II
নে ই কো ভো লা ০ জ টা র লে ০ শ

II মা -া পা । -া না া I না -া র্সা । র্সা র্সা -া I
বা ঘ ছা ল কু ০ থা ০ য় গে ই ল
রা জা র মেই য়ে ০ ক র লে বি য়ে ০
শু ন ০ ব লি ০ উ গো ০ ঠা কু র

I র্রা র্রা র্জ্ঞা । র্রা র্সা -া I ণর্সা ণা -া । ধা পা -া I
কু থা য় গে ই ল হা ড়ে র মা লা ০
হই লে ০ শি ব ০ রা জা র জা মা ই
পে ন্ না ম ছি ০ চ ০ র গে তে ০

I পা পা র্সা । র্সা র্সা র্রা I র্সা ণা -া । ধা পা -া I
মা থা র সা প কি ব নে ০ গেই ল ০
ঘ রে ০ আ ছে ০ গ ঙ্ গা মাই ০ ০
গ ঙ্ গা মাই য়ে ০ মা থা য় রেই খো ০

I পা -া ধা | মা মা পা | পা -া -া | -া -া -া II
হ ই য়ে ঝা লা ০ পা লা ০ ০ ০ ০
তু ০ ল না তাঁ র না ই ০ ০ ০ ০
গৌ ০ রী কে হৃ ০ দ য়ে ০ ০ ০ ০

মাথাতে পইরেছ্..........

স্বরলিপি—৯

গাজন গান ঃ ও শিব নাচেরে নবীন কীর্ত্তনের মাঝে—পৃষ্ঠা ১১৪

স্থায়ী

সা রা া
ও শি ব

II পা পা া | মা গা া | রা রা রা | গা মা মা I
না চে ০ রে ০ ০ ন ০ বী ন কী র

I রা গা গা | রা া া | সা া া | সা রা রা I
র্ত নে র মা ০ ০ ঝে ০ ০ (ও শি ব)

I মা মা মা | মা মা মা | পা পা পা | পা পা ধা I
ন ন্ দী ভি রি ঙ্গী আ দি ০ শ ং খ

I র্সা র্সা র্সা | ণা ধা া | পা মা া | গা রা রা II
মৃ দ ং গ বা ০ জি ল ০ রে (শি -ব)

অন্তরা

II মা মা গা | গা মা মা | পা পা া | পা পা া I
শি ০ ব ০ পা র ব তী ০ না চে ০

I পা পা ধা | ণা ধা া | পা পা া | মা মা মা I
আ ০ র না চে ০ ভূ তে ০ ও ভা ই

I মা মা মা | ধা ধা ধা | ধা ধা র্সা | ণা ধা ধা I
বৃ ০ ষে ০ উ ন্ ম ০ ত্ত হ ই য়া

I পা পা ধা | পা পা মা | পা মা া | গা রা রা II
পু ০ চ্ছ তু ই ল্যা না চে ০ রে (শি -ব)

[অবশিষ্ট কলির সুর অন্তরার মতন]

স্বরলিপি—১০

ত্রিনাথের গান ঃ আইলরে ত্রিনাথ ঠাকুর জগতে পৃষ্ঠা—১২৯

স্থায়ী

গমা । গা গা ।
আই ল রে ০

॥ গা মা মা । মা মা মা । গা -া রা । সা -া -া ।
ত্রি না থ ঠা কু র জ ০ গ তে ০ ০

। ণ্া ণ্া ণ্া । ণ্া ণ্া -া । ণ্া সা -া । সসা ণ্া ধ্া ।
আ জ বু ঝি তা ০ মা শা ০ হই ল ০

। ণ্া -া সা । গা -া -া । -া -া গগ । গা গা -া ।
ক ০ লি তে ০ ০ s ০ আই ল রে ০

। গা মা মা । মা মা মা । গা -া রা । সা -া -া ॥
ত্রি না থ ঠা কু র জ ০ গ তে ০ ০

অন্তরা

সা । সা সা সা ।
ক লি তে ০

॥ ণ্া সা -া । গা গা -া । মা -া মা । মা গা -া ।
ব্র হ্মা ০ বি ষ্ণু ০ শি ০ ব তা রা ০

। রা রা গা । মা গা গা । রা সা -া । -া গা সা ।
তি ন জ নে এ ক০ পী র ০ ০ তা রা

গা গা মা । পা ণা ণধা । পা পা পপা । মা মা মপা
তি ন জ নে এ ক না ম ধই রা ছে ০০

। মা মা মা । মা মা মা । গা রা রা । সা -া -া ।
ক লি র জী বে ০ ত রা ই তে ০ ০

। ণ্া ণ্া ণ্া । ণ্া ণ্া ণ্া । ণ্া সা -া । সসা ণ্া সা ।
আ জ বু ঝি তা ০ মা শা ০ হই ল ০

। ণ্া -া সা । সা -া -া । -া -া গগা । গা গা -া ॥
ক ০ লি তে ০ ০ ০ ০ আই ল রে ০

অন্তরা অংশের মতন—
"কলিতে হরি সর্বময়.....মাধব রথেতে"
"আছেন রাজরাজেশ্বরী......কলিকাতায় জয়কালী"

স্বরলিপি—১০ (ক)

ত্রি-নাথের গান ঃ গাঞ্জার চিরল চিরল পাত

I -া মা মা I
০ গান্ জার

II পা পা ধা | মা মা -া | রা -া মা | রা সা সা I
চি র ল চি র ল পা ০ ০ ০ ০ ত্

I রা -া মা | মা -া মা | মা -া পা | ধা ণা ধা I
গা ন্ জা খা ই য়া ম গ্ ন হ ই য়া

I পা ধা -া | -া -া -া | পা ধা -া | পা মা -া I
না চে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ভো লা ০

I মা -া -া | -া -া -া | -া -া -া | -া -া -া I
না ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ থ

I ধা ধা -া | ধা পা -া | ধা -া র্সা | র্সা র্সা া I
না চে ০ ভো লা ০ না থ গো ভো লা ০

I ধা পা ধা | পা মা -া | মা -া -া | -া মা মা II
না চে ০ ভো লা ০ না ০ থ ০ গান্ জার

II ধা -া ধা | -া পা -া | ধা ধা র্সা | র্সা -া -া I
আ ন ০ ন্ দ ০ গ গ ০ নে ০ ০

I ধা -া ধা | -া পা -া | মা গা -া | মা -া -া I
না ০ চে ০ ম ০ গ ০ ০ নে ০ ০

I ধা -া ধা | -া পা -া | ধা র্সা র্সা | র্সা র্সা -া I
তি ন্ না থ্ তি ন্ না ০ থ বই লে ০

I ধা পা -া | ধা পা -া | মা -া -া | মা মা -া I
মা রো ০ এ ক্ ০ টা ০ ন্ সি দ্ধি ০

I পা পা ধা | পা মা -া | রা মা পা | রা সা -া I
মা রো ০ এ ক ০ টা ০ ০ ০ ০ ন

I রা -া মা | মা -া মা | মা -া পা | ধা ণা ধা I
গা ন্ জা খা ই য়া ম গ্ ন হ ই য়া

I	পা	ধা	-া	|	-া	-া	-া	|	পা	ধা	-া	|	পা	মা	-া	I	
	না	চে	০		০	০	০		০	০	০		ভো	লা	০		
I	মা	-া	-া	|	-া	-া	-া	|	-া	-া	-া	|	-া	মা	মা	II	II
	না	০	০		০	০	০		০	০	থ		০	গান্	জার		

স্বরলিপি—১১

মনসামঙ্গল—ওকি হায়রে নৃত্য করে বেহুলা সুন্দরী। পৃষ্ঠা—১৩৬

স্থায়ী

														জ্ঞা	মা	I
														ও	কি	
	০				+				০				+			
II	পা	পা	-া	|	দা	পা	দা	|	পা	-া	মা	|	পা	-দা	-া	I
	হা	য়	০		রে	০	০		নৃ	০	ত্য		ক	রে	০	
I	পা	মা	-া	|	জ্ঞা	-জ্ঞা	জ্ঞা	|	মা	মা	-া	|	-া	জ্ঞা	মা	I
	বে	হু	০		লা	সু	ন্		দ	রী	০		০	ও	কি	

অন্তরা

II	মা	মা	-া	|	পা	ণা	-া	|	ণা	ণা	-া	|	দা	পা	-া	I
	পা	য়ে	০		তে	নূ	০		পু	র	০		প	রি	০	
I	মা	মা	-া	|	পা	দা	-া	|	পা	মা	মা	|	জ্ঞা	জ্ঞা	-া	I
	তা	লে	০		ল	য়ে	০		ভ	০	র		ক	রি	০	
I	জ্ঞা	-া	জ্ঞা	|	জ্ঞা	-মা	-া	|	পা	দা	-া	|	পা	মা	মা	I
	নৃ	০	ত্য		ক	রে	০		বে	হু	০		লা	সু	ন্	
I	মা	মা	-া	|	-া	-া	-া	|	পা	-পা	-া	|	ণা	ণা	-া	I
	দ	রী	০			০	০		য	ত	০		দে	ব	০	
I	র্সা	র্সা	-া	|	র্সা	র্সা	-া	|	ণা	র্সা	-া	|	ণা	পা	-া	I
	চা	রি	০		ভি	তে	০		ব	সি	০		দে	খে	০	
I	ণা	দা	-া	|	পা	মা	-া	|	জ্ঞা	জ্ঞা	-া	|	জ্ঞা	মা	-া	I
	হ	র	০		ষি	তে	০		ক	টা	০		ক্ষে	মো	০	

পা	-পা	দা	I	পা	মা	-া	I	মা	মা	-া	I	-া	-া	-া	I
হি	ল	০		সু	র	০		পু	রী	০		০	০	০	

-া	-া	-া	I	-া	জ্ঞা	মা	II
০	০	০		০	ও	কি	

"খঞ্জন গমনে পায়........উলটে সকটে তান ভয়ে"
"তাহার নাচন দেখি.......স্বামী দেহ দান"
"প্রথম বয়সে মোর .... করুণ বচনে চন্দ্রাননী"
"নয়নে শ্রবয়ে নীর .... প্রভূ লয়ে দেশে চলে যাই"   অন্তরার মত হবে।
"তাহা দেখি দেবগনে .... আকুল ছাওয়াল"
"শিব বলে বিষহরি .... নায়েতে হারায়ে কার্য্য নাই"
"শঙ্করের শুনি কথা .... বংশী বদন দ্বিজে গীত গায়"

স্বরলিপি—১২

ভোলা বেশ ভাল তো মজা—পৃষ্ঠা ১৪০

II	-া	-া	পা	I	পা	পা	সা	I	ণ্া	ণ্া	সা	I	সা	রা	-া	I
	০	০	ভো		লা	বে	শ		ভা	ল	তো		ম	জা	০	
I	-া	-া	মা	I	মা	মা	গা	I	সা	-া	-া	I	রা	গা	-া	I
	০	০	এ		কে	ম	ন		তো	০	০		মা	০	র	
I	রা	গা	-া	I	রসা	-া	-া	I	-া	-া	-া	I	-া	-া	-া	I
	পু	০	০		জা	০	০		০	০	০		০	০	০	
I	রা	মা	মা	I	মা	মা	-া	I	মা	মা	-া	I	পা	মা	-া	I
	ক	র	লি		ভ্যা	কু	ম্		এ	কি	০		র	ক	ম	
I	গা	গা	মা	I	গা	সরা	রা	I	সা	স	-া	I	সা	রা	-া	I
	ঠি	ক্	যে		ন	ভ্যা	ক্		ভ্যাক	কু	ম্		রা	জা	০	
I	-া	-া	মা	I	মা	গা	-া	I	সা	-া	-া	I	রা	গা	গা	I
	০	০	এ		কে	ম	ন		তো	০	০		মা	০	র	
I	রা	গা	মগা	I	রসা	-া	-া	I	-া	-া	-া	I	-া	-া	-া	II
	পূ	০	০০		জা০	০	০		০	০	০		০	০	০	
II	-া	-া	মা	I	মা	মা	-া	I	মা	মা	-া	I	পা	-া	-া	I
	০	০	মু		লু	কা	০		সা	০	০		নে	০	০	

I -া -া ণা | ণা -া -া | ধা ণধা -া | পা -া -া I
০ ০ আ ছ্ আ ০ সা ০০ ০ নে ০ ০

I -া -া ণা | ণা ণা -া | ধা -া ণধা | পা -া -া I
০ ০ শ্ম শা নে ০ হ্ ০ ০০ য়া ০ ০

I মা মা -া | গপা সা -া | রা -া -া | পা পা -া I
ম শা ০ নের রা ০ জা ০ ০ ভো লা ০

I -া -া সা | রা -া মা | মা -া মা | মা মা মা I
০ ০ আ বা ০ র প ই র‍্যা ক প নি

I মা মা -া | মা পমা -া | গা -া মা | গা রা -া I
আ ছ্ ০ আ প০ নি ঢু ই ল্যা ঢু ই ল্যা

I সা -া সা | সা রা -া II
খা ০ চ্ছ্ গাঁ জা ০

II -া -া মা | মা মা -া | মা -া -া | পা -া -া I
০ ০ ব স ন ০ বা ০ ঘ ছা ০ ল

I -া -া পা | গা ণণা ধাধা | পণ ধণা ধান | পা -া -া I
০ ০ ম ০ রাব খাপ টা০ ০০ ০ ০ ০ ০

I -া -া ণা | ণা ণা -া | ধা - ণধা | পা গা -া I
০ ০ ০ ভূ ষ ণ আ ০ ০০ লো ০ দ

I মা মা -া | গা রা সা | রা -া -া | মগা রসা -া I
গ হ ০ মা ভ্যা প টা ০ ০ শি ব০ ০

I -া -া -া | সা রা -া | মা মা সা | মা সা -া I
০ ০ ০ দেখ্ দেখ্ ০ বাই দা র ব্যা টা ০

I মা মা মা | মা মা -া | গা গা মা | গা রা রা I
গণ্ শা র বাপ্ টা ০ ঠি ক্ -যে ন কো ন্

I সা সা -া | সা রা -া II
গু নী ০ রো ঝা ০

স্বরলিপি—১৪

পীরের গান : মুস্‌কিল আসান করো দয়াল মানিক পীর। পৃষ্ঠা—১৬৪

স্থায়ী

II	মা	পা	পপা মা	।	পা	পা	দা	পা	।	মা	মমা পা	দদা	।	পা	-া	-া	পা	I
	মু	স্	কিল্‌আ		সা	ন	ক	রো		দ	য়াল মা•	নিক		পী	s	s	র	
	মা	মা	মা	দা	।	পা	মা	মা	রা	।	মা	মা	মা	পা	।	মা	-া	-া	-া	II
	ঘ	রে	ঘ	রে		গ	রু	ম	রে		চ	ক্ষে	ব	হে		নী	s	s	র	

"সত্যপীর বলে ...... গরু বাঁচাইতে চাই"

"দম্ দম্ বলিয়া .... দাঁতে কাটে ঘাস"

"দম্ দম্ বলিয়া ...... হেঁটে চলে বাড়ি"

"উত্তর দক্ষিণ ...... চারি পয়সা দিয়া"

"গরুর মাথায় ...... পালা হইল শেষ"

স্থায়ীর মত হবে।

স্বরলিপি—১৪ (ক)

দাশরথী রায়ের গান—আর কি সময় নাহি রসময়—পৃষ্ঠা—১৬৬

II	গমা	ধপা	মগা	।	রগা	সা	ন্‌া	।	সা	গা	মগা	।	পা	পা	পা	I
	আ০	০র	কি০		স০	ম	য়		না	হি	র০		স	ম	য়	
I	গা	গা	মা	।	পা	ধনর্সা	না	।	র্সা	া	র্সা	।	া	া	া	I
	বা	জা	তে		মো	হ০০ন			বাঁ	০	শী		০	০	০	
I	না	না	না	।	না	না	না	।	না	র্সা	না	।	র্সা	র্সা	র্সা	I
	তো	মা	রে		হে	রি	তে		কা	ন	নে		আ	সি	তে	
I	র্সা	নর্সর্রা	র্সর্রা	।	ণা	ধপ	া	।	মপা	পধা	পা	।	মগা	রগা	রসা	II
	নি	র০ন্	ত০		র	০০	০		অ০	ভি০	লা		ষী০	০০	০০	
II	মা	মা	মা	।	ণা	ধা	ধনা	।	না	র্সা	র্সা	।	না	র্সা	া	I
	স	দা	গু		রু	জ	ন০		নি	ক	টে		তে	র	ই	
I	পা	না	না	।	র্সা	না	র্সা	।	র্সা	নর্সর্রা	র্সা	।	ণা	ধা	া	I
	বাঁ	শী	শু		নে	প্রা	ণে		ব্যা	কু০০	লি		ত	হ	ই	

I র্সা র্গা র্গর্মা | র্পা র্মা র্গা | র্রা র্গর্রা র্সা | না র্সা া I
ক ত আ০ র ব ল যা ০০ ত না স ই

I র্সা নর্সর্রা র্সর্রা | ণা ধপা া | মপা পধা পা | মগা রগা রসা II
প্র তি০০ বা০ দী ০০ ০ প্র০ তি০ বা সী০ ০০ ০০

II সরা রপা মা | গা রা া | রা রা রা | রা রা া I
কে০ ব০ লে স র ল্ বাঁ শী তো মা রি ০

I রা মা মা | মা মা গা | রা গা গমা | রগা সা সা I
ত বে কে ন ল য়্ | ম ন প্রা০ ণ০ হ রি

I রা মা মা | পা পা পা | পা ধা ধা | ধা র্সণা ধপা I
ছা ড় না ছ ল না ক প ট শ্রী হ০ রি০

I পা ধা পা | মা গা রগা | মা পা পা | া া া I
শ্রী ম তী তো মা রি০ দা ০ সী ০ ০ ০

I মা মা মণা | ধা ধা না | না র্সা না | র্সা র্সা র্সা I
না জা নি০ ০ বাঁ শী কি বা গু ণ ধ রে

I পা না না | না র্সা র্সা | র্সা নর্সর্রা র্সা | ণা ধা ধা I
বা রে ক বা জা য়ে ম ন০০প্রা ণ হ রে

I র্সা র্গা া | র্গর্মর্পা র্মা র্গা | র্রা র্গা র্গর্রা | র্সনা র্সা র্সা I
না দে য়্ আ০০ মা রে থা কি তে০ যে০ ঘ রে

I র্সা নর্সর্সা র্রর্রা | ণা ধা পা | মধা পধা মগা | রগা রগা সা II
ক রি০০ লে০ স দা উ দা০ ০০ ০সী ০০ ০০ ০

স্বরলিপি—১৫

কবিগান—ভজন পূজন জানিনে মা, জেতেতে ফিরিঙ্গী—পৃষ্ঠা—১৭৯

II -া -া র্সা | না ধা পা | পা ধা -া | ধা ধা -া I
০ ০ ভ জন্ পু জন্ জা নি ০ নে মা ০

I -া -া ধা | ণা ধা পা | মা পা -া | -া রা রা I
০ ০ জে তে তে ফি রি ং গী ০ য দি

স্বরলিপি

I মা মা -া | মা মা -া | গা মা পা | ধা ণা ধা I
দ য়া ০ ক রে ০ তা ০ ০ রো ০ ০

I -া -া পা | ধা পা মা | গা মা গা | রা -া -া II
০ ০ এ ভ বে মা ত ং গী ০ ০ ০

ভোলা

II -া -া -া | -া পা পা | সা -া গা | গা গা -া I
০ ০ ০ ০ তু ই জা ত ফি রিং গী ০

I রা গা গা | গা গা -া | রা গা গা | গা গা -া I
জ ব র জং গী ০ পা র বে না কো ০

I গা গা -া | গা -া -া | -া -া -া | পা পা -া I
ত রা ০ তে ০ ০ ০ ০ ০ তো রে ০

I রা গা গা | গা গা -া | গা গা -া | গা -া -া I
পা র বে না কো ০ ত রা ০ তে ০ ০

I পা -া পা | হ্মা পা -া | হ্মা -া পা | হ্মা পা -া I
শো ন রে ভ্র ষ্ট ০ ব ল ছি স্প ষ্ট ০

I ধা ণা -া | ধা পা -া | হ্মা পা -া | মা গা -া I
তুই ০ রে ন ষ্ট ০ ম হা ০ দু ষ্ট ০

I পা -া পা | হ্মা পা -া | হ্মা -া পা | হ্মা পা -া I
তো র কি কা লী ০ কৃ ষ্ ট ই ষ্ট ০

I ধা ধা পা | ধা পা -া | পা পা -া | হ্মা গা -া I
ভ জ গে যা তু ই খি শু ০ খৃ ষ্ ট

I রা গা -া | গা রা -া | সা -া ন্া | সা -া -া II
শ্রী রা ম পু রে র গী র জা তে ০ ০

এন্টনী

II -া -া র্সা | না ধা পা | পা ধা -া | ধা ধা -া I
০ ০ স ত্য ব টে আ মি ০ হ চ্ছি ০

I -া -া ধা | ণা ধা পা́ | মপা -া -া | পা পা -া I
০ ০ জা তি তে ফি রি ং গী ০ ০ ০

I -া -া মা | মা মা মা | গা -া মা | পা ধা ণধা I
০ ০ ঐ হি কে লোক ভিন্ ন ০ ভিন্ ন ০০

I পা পা ধা | পা মা মা | গা গা মা | রা -া -া II
অ ন্ তি মে স ব এ কা ং গী ০ ০

স্বরলিপি—১৬

মৈমন সিংহ গীতিকার গান ঃজল ভর সুন্দরী কইন্যা পৃষ্ঠা—৩৪২

স্থায়ী

II সা রা সা রা | মা া মা া | মা পা পা পা | ধা র্সা র্সা ণা I
জ ০ ০ ল ভ ০ র ০ কা ন্ চ ন্ ক ন্ না ০

I ধা পা পা ধা | ধা ণা ধা ণধা | পা ধা পা া | া া পা া I
০ ০ জ লে ০ দি ছ ০০ ঢে ০ ০ ০ ০ ০ উ ০

I া া পা ধা | র্সা র্সা র্সা র্সা | র্সা র্রা র্রা র্সা | ণা া ধা া I
০ ০ হা সি ০ মু খে ০ ক ও ০ না ক ০ থা ০

I পা ধা ধা া | া া া া | পা ধা পা ণা | ধা পা মা পা I
স ং গে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ না ই মো র

I গা মা মা গা | রা সা সা রা | গা া া রা | রমা গমা রগা রসা I
কে ০ উ ০ রে ০ প্রা ণ যা ০ ০ য় যা০ ০য় ০০ ০০

I সা া া া | া া া া II
রে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

II া া সা রা | মা মা মা মা | মা পা পা পা | ধা র্সা র্সা ণা I
০ ০ না হি ০ আ মা র মা ০ তা ০ পি ০ তা ০

I ধা পা পা ধা | ধা ণা ধা ণা | পা ধা পা া | া া া া I
০ ০ গ র্ভ সু ০ দ র ভা ০ ই ০ ০ ০ ০ ০

I । । পা ধা । র্সা র্সা র্সা র্সা । র্সা র্রা র্রা র্সা । ণা । ধা । I
০ ০ সু তে র হে ও ০ লা ০ ০ ০ অ ই য়া ০

I পা ধা ধা । । । । । । পা ধা পা ণা । ধা পা মা পা I
ভা ই স্যা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ বে

I গা মা মা গা । রা সা সা ররা। গা । । রা । রমা গমা রগা রসা I
ড়া ০ ০ ০ ই ০ না গর যা ০ ০ য় যা০ ০০ ০০ ০য়

I সা । । । । । । । । II
রে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

[অবশিষ্ট কলির সুর অন্তরার অনুরূপ।]

স্বরলিপি—১৭

রঙ্গরসের গান : রঙ্গিলা ভাসুর গো—পৃষ্ঠা—৩২৩

স্থায়ী

II । । গা । রা সা । । গা গা মা । পা মা গা I
০ ০ র ঙ্গি লা ০ ভা সু র গো ০ ০

I গা মা । । পা পা ধপা । মা গা গা । রা রা সা I
তু মি ০ কে ন ০০ দে ও র হ ই ল্যা

I সা । । । । । । II
না ০ ০ ০ ০ ০

অন্তরা

II মা পা । । না না । । ননা র্সা র্সা । র্সা র্রর্সা না I
তু মি ০ য দি ০ হই তা রে দে ও র

I না . না না । র্সা র্সা র্রা । না র্সা । । র্সা । র্সর্সা I
খা ই তা বা টা র পা ০ ০ ন্ ০ আর

I পা র্সা র্সা । র্সা র্সা র্রা । র্সর্সা র্সা না । ধা পা । I
র ং গ র সে ০ কই তা ম্ ক থা ০

I পা ধা । । ণা ধা । । পা গা মা । গা রা সা II
জু ড়া ০ ত প ০ রা ন্ (র ঙ্গি লা ০)

বাকী কলির সুর অন্তরার মতন]

স্বরলিপি—১৮

ধান কাটার গানঃ ধান কাটি কাটি ধান—পৃষ্ঠা—৩২৫

স্থায়ী

II ধ্ সা সা সা । সা সা রা গা । রসা সা সা সা । সা রা পা া I
ধা ন্ কা টি কা টি ধা ন্ ধা ন্ কা টি কা টি রে ০

I মা মা গা গা । রা রা সা সা । রা রা সা সা । া া পা পা II
ধা ন্ কা টি কা টি ধা ন্ ধা ন্ কা টি ০ ০ হেঁ ০

অন্তরা

II া া মা মা । া গা গা মা । পা া পা া । পা পা পা া I
০ ০ সা রি ০ ব্যা ই ন্ধা ক্ষে ০ তে ০ যা ই য়া ০

I া া মা ধা । ধা া ধা ধা । পা া পা ধা । পা পা মা া I
০ ০ কা ০ টি ০ ধা ন্ গা ০ ন ০ গা ই য়া ০

I া া মা মা । ধা ধা া ধা । পা া পা ধা । পা পা মা া I
০ ০ মা ঝে ০ মা ০ ঝে দে ০ খি ০ চা ই য়া ০

I া া ণা ণা । া ধা পা া । মা া গা া । রসা রে গা া I
০ ০ সো না ০ মা খা ০ ধা ০ ন্ ০ রে০০ ০ ০

I া া গা গা । া রা া র্গা । রে সা া া । া া া মা II
০ ০ সো না ০ মা ০ খাঁ ধা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ন্

[বাকি অংশগুলি অন্তরার মতন]

স্বরলিপি—১৯

ছাদ পেটানোর গানঃ দালান দিলি মহল দিলি—পৃষ্ঠা—৩২৬

II গা গা -া । গা সরা -া । গা গা -া । গা সরা -া I
দা লা ন দি লি ০ ম হ ল দি লি০ ০

I গা গা মগা । রা সা -া । ধ্া ধ্া ণ্া । ধ্া প্া -া I
বা ড়ী র০ নী চে ০ পু ষ্ ক রি নী ০

I প্া -া ধ্া । সা সা -া । রা রা জ্ঞা । রা সা -া I
এ ০ ক খা না ০ পা ন সী দি তে ০

I সা সা -া | সা -া -া | -া -া -া | -া -া -া I
পা র ০ নি ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I -া -া গা | গা সা রা | গা গা -া | গা সরা -া I
০ ০ বাঁ ধা জ ল কাঁ চা ০ পা নি০ ০

I গা গা মগা | রা সা -া | ধ্া ণ্া ধ্া | প্া -া -া I
শু ন ০০ হে মি ০ স্ত্রী ০ ০০ ০ ০ ০

I প্া -া ধ্া | সা -া -া | রা রা জ্ঞা | রা সা -া I
এ ০ ক টু ০ ০ ল ব ন্ দি তে ০

I সা সা -া | সা -া -া | -া -া -া | -া -া -া II
পা র ০ নি ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

II গা -া পা | পা পা -া | ধা -া র্সা | ধা ধা -া I
চা ০ ল পে লা ম ডা ০ ল পে লা ম

I সা রা জ্ঞা | রা সা -া | সা সা -া | -া -া -া I
না পে ০ লা জা ০ লা নী ০ ০ ০ ০

I গা -া পা | পা পা -া | ধা ধা -া | ধা ধা -া I
ত ০ র কা রি ০ স বই ০ হ লো ০

| সা রা জ্ঞা | রা সা সা | সা -া -া | -া -া -া I
পা ০ ই নি সু ক্ তা নী ০ ০ ০ ০

I গা -া গা | গা সা রা | গা গা -া | গা গা সরা I
ভা ০ ত হ লো ০ ডা ০ ল হ ল ০

I গা গা মগা | রা সা -া | ধ্া -া ণ্া | ধ্া প্া -া I
খে লা ম না আ ০ মা ০ ০ নি ০ ০

I প্া ধ্া ধ্া | সা সা -া | রা রা জ্ঞা | রা সা -া I
দী ঘি র ধা রে ০ বা গা ন হ লো ০

I গা গা মগা | রা সা -া | সা -া -া | -া -া -া I
না হ ০০ ল মা ০ লি নী ০ ০ ০ ০

I গা গা -া | গা সরা -া | গা গা -া | গা সরা -া I
ব ড় ০ ব ড় ০ বা বু ০ আ ছে০ ০

I গা গা মগা | রা সা -া | ধ্া -া ণ্া | ধা পা -া I
দু নি ০০ য়া ভি ০ ত ০ ০ র ০ ০

পা্ ধা্ -া । সা সা -া । রা -া জ্ঞা । রা সা -া I
এ ম ন   মা লি ক   চ ০ ক্কে   তে দে ০

সা সা -া । -া -া -া II II
খি নি ০   ০ ০ ০

স্বরলিপি—২০

ছাদপেটার গান ঃ তালই পালঙ্খে ঘুমাইছে—পৃষ্ঠা—৩২৮

স্থায়ী

II সা সা সা । গা গা া । গা গা মা । ধা ধা ধা I
তা ০ ল   ঐ পা ০   ল ং খে   ঘু মা ই

I পধা া া । ণা ধা পা । পা পা পা । পামা মা া I
ছে ০ ০   ০ ০ ০   সু না ০   মাও ঐ ০

I গা া া । া া া । পা পা পা । পা মা া I
গো ০ ০   ০ ০ ০   তা ০ ল   ঐ পা ০

I মা মা গা । সরা সা সা্ । সা া া । া া া II
ল ং খে   ঘু মা ই   ছে ০ ০   ০ ০ ০

অন্তরা

II সা া সা । গা া গা । মা পা া । মা গা গা I
ঘু ০ ম্   ঘু ০ ম্   ক রে ০   তা ল ঐ

I সা গা গা । মা পা পা । মা গা া । া া া I
ঘু ০ ম্   না ই যে   ছা ড়ে ০   ০ ০ ০

I সা সা সা । গা গা া । গা মা া । গা রা রা I
চো খ মে   লি য়া ০   চা ও ০   তা ল ঐ

I গা০ মা া । ধা ধা ধা । পা ধা া । ণা ধা পা II
মাও ঐ ০   যা ই তা   ব নে ০   ০ ০ ০

[অবশিষ্ট কলিগুলির সুর অন্তরার অনুরূপ।]

স্বরলিপি—২১

ভুঁই নিড়াবার গান ঃ আয় লো আয় লো তোরা—পৃষ্ঠা—৩৩০

II ন্া ন্া ন্া । -া ন্া ন্া । সা া -া । রগা সরা -া I
আ য় লো ০ আ য় লো ০ ০ তো রা ০

I রা রা পা । পা পা ধা । মা রা গা । রা -া রা I
ভুঁ ই নি ড়া ই তে যা ০ ০ ০ ০ ই

I রা রা পা । পা পা ধা । মা মা া । গা রা -া I
ভুঁ ই এ র দৌ ০ ল তে ০ মো রা ০

I ন্া ন্া ন্া । ন্া ন্া ন্া । সা -া -া । সা -া া II
সো না র ফ স ল পা ০ ০ ই ০ ০

II রা রা রা । মা মা -া । পা পা -া । ধা ণা ধা I
ভুঁ ই আ মা গো ০ মা তা ০ পি তা ০

I পা পা ধা । মা মা -া । পা -া -া । -া -া -া I
ভুঁ ই আ মা গো ০ পু ০ ০ ০ ০ ত

I মা -া ধা । ধা ধা া । পা -া ধা । পা মা -া I
ভুঁ ০ য়ে র দৌ ০ ল ০ তে মো র ০

I মা পা া । ধা পা া । মা -া গা । রা -া সা II
আ শী ০ কো ঠা ০ সু ০ ০ ০ ০ খ

[বাকি কলির সুর একই রকম।]

স্বরলিপি—২২

ধানভানার গান ঃ নব ঢেঁকিয়ারে সামলে কুটো ধান কুটো ধান। পৃষ্ঠা—৩৩০

স্থায়ী

সা সা
ন ব

০ + ০ +
II ন্া সা -া ।। রা জ্ঞা -া । রা -া -া । -া -া সা I
ঢেঁ কি ০ য়া ০ ০ রে ০ ০ ০ ০ ০

I পা পা মা । মা গা -া । রা -া জ্ঞা । রা সা -া I
সা ম লে কু টো ০ ধা ০ ন কু টো ০

I সা -া সা । -া -া -া । -া -া -া । সা সা -া II
ধা ০ ন ০ ০ ০ ০ ০ ০ ন ব ০

অন্তরা

০ + ০ +
II মা মা -া । গা -া মা । পা পা -া । ধা ণা -া I
ঢেঁ কি ০ টা ০ য় ব লে ০ আ মি ০

I পা ধা -া । মা মা পা । পা পা -া । ধা ণা ণা I
না র ০ দে ০ র না তি ০ রে ভা ই

I পা ধা -া । মা পা -া । পা পা -া । -া -া -া I
না র ০ দে র ০ না তি ০ ০ ০ ০

I র্সা র্সা র্সা । র্সা র্রা -া । র্সা ণা ণা । ধা -া পা I
অ স্ টা ঙ্গ থা ০ কি তে ০ মো ০ র

I পা ধা -া । পা মা মা । গা রা রা । সা সা -া II
ল্যা জে ০ মা রে ০ লা থি ০ ন ব ০

"আক শোলাটায় ...... চিৎ পটাং কাত্"
"ঢুলসিটায় বলে ...... চাঁদ পানা মুখ"
"পায়া দুটো বলে ...... গীত গাই"
"ঝাঁটাটায় বলে ...... জড় করি"
"কুলাটায় বলে আমি ...... লিকাই পাছুড়ি"
অন্তরার মত হবে।

স্বরলিপি—২৩

চিঁড়া কুটি চিঁড়া কুটি—পৃষ্ঠা—৩৩১

II গা গা গা মা । মা পা পা পা । না নর্সা ণধা পপা । পা ধা ধপা মগা I
চিঁ ড়া কু টি চিঁ ড়া কু টি ব ইল গা০ ছের ত লে তে০০০

I গা পা পা মপা । গা গা রসা রা । গা মা পা ধা । পা া া া II
ও ০ দি দি০ কু টু ০ম্ আই সা ছে বা ড়ী তে ০ ০ ০

অন্তরা

II	গগা গা	গা	গমা	I	মা	পপা পপা	পা	I	না	নর্সা না	ধপা	I	পণা ধণা	পধা	পমগা	I
	আগ্‌দু	য়া	রে০		কু	টুম্‌ আই	সা		পা	নের বা	টা০		চা০ ০০	০০	০০য়	
I	গা	গপা পণা	গা	I	ধা	পা	পপা মগা	I	গা	পপা পপা	মা	I	গমা মগ	রসা	সা	II
	পি	চ্দু	য়া০ রে		ব	ড়	বই নে০		ঘো	ম্‌টা দেয়	মা		থা০ ০য়	গো০০		

অবশিষ্ট কলির সুর অন্তরার মতন।

স্বরলিপি—২৩(ক)

হাত পুতুল নাচের গান

"ভালো নাচাব খেদা" সুরাট—ভাল নাচাব কানন রসের বিনোদা ছকেহ মিলবে। পৃষ্ঠা—

								সা	রা	II	ণ্সা	সা	সা	I	সা	রা	-া	I
								ভা	লো		না০	চ্‌	বি		খেঁ	দী	০	
I	মা	মা	মা	I	গা	রা	-া	I	সা	-া	-া	I	সা	সা	রা	I		
	র	সে	র		বি	নো	০		দী	০	০		(ভা	লো	০			
I	মা	মা	মা	I	গা	মা	-া	I	পা	পা	-া	I	পা	পা	-া	I		
	কি	০	০		রেঁ	ধে	০		ছি	স্‌	০		খেঁ	দী	০			
I	পা	-া	ধা	I	গা	ধা	পা	I	পা	-া	-া	I	রা	রা	রা	I		
	পা	০	ট্‌		শা	কে	র		ঝো	০	০		ল্‌	আ	র			
I	মা	মা	মা	I	পা	পা	পা	I	পা	পা	পা	I	ধা	পা	-া	I		
	খাঁ	দা	০		না	কে	র		গ	ড়	গ		ড়া	নি	০			
I	মা	পা	পা	I	ধা	ধা	পা	I	মা	গা	-া	I	রা	সা	-া	II		
	পা	ড়া	য়		গ	ন্‌	ডো		গো	ল	০		(ভা	লো	০)			

স্বরলিপি—২৪

মকরী গীতিঃ পৃষ্ঠা—৩৩৫

মাছ শিকার করার জন্য সমুদ্রে মাছ ধরতে যায় ধীবর বা (জেলে) ভাট (পূর্ববঙ্গে)। মাছ যেন বেশী ধরতে পারে তাই মকরী দেবীর পূজা করে পৌষ মাসের শেষ দিনে। ওকে মকর সংক্রান্তি বলে। মকরী দেবীর কাছে মানত করে বেশী মাছ ধরে যেন লাভবান হয় তাই।

মকরী গান

মকরী গো মকরী তোর পাদরে রহু মন। মাছ্ যেনে পড়ে মাগো অলাড়িয়া (বেশী) জিন (মতন) থল নাই অথল (বেশী) জল তার সাথর (সঙ্গে) কর্ম মোর ছাড়ি দেইচি তো গোড়রে (পা) ব্যবসা যিম্তি হয় ঘোর।। শঁকা, পাটিয়া, তাউরী, তাঁপড়ী চিংড়ী মট্কা ঢেকরা। রুলী পামরা এই সবু মাছ পড়ে যিম্তি বুরা বুরা (বেশী)। তল নাই মা সাগর পানী (জল) তাই জানি সবু দেনি। (দিলাম) লা জাল মোর ভলই করি তোর পাদর দেনি।।

II সা । । । রা গা । । সা । । । সা । । I
ম ক রী গো ০ ০ ম ক ০ রী ০ ০
শঁ কা পা টী ০ য়া তা উ রী তাঁ প ড়ী

I সা । । । গা মা । । ধা । । । ধা । । I
তো র পা দ রে ০ র হু ০ ম ন ০
চি ং ড়ী ম ট কা ঢে ক্ রা ০ ০ ০

I পা । না । র্সা র্রা । । র্গা । । । র্রা র্গা । I
মা ছ্ ০ যে নে ০ প ড়ে ০ মা গো ০
রু লী ০ পা ম রা এ ই সবু মা ছ্ ০

I র্গা । র্রা । র্সা না র্রা । র্সা । । । । । । II
অ লা ড়ি য়া ০ ০ জি ন ০ ০ ০ ০
প ড়ে ০ যি ম্ তি বু রা ০ বু রা ০

II পা । ধা । মা পা । । র্সা । । । র্সা । । I
থ ল ০ না ই ০ অ থ ল জ ল ০
ত ল না ই মা ০ অ ত ল পা নী ০

I পা । ধা । র্সা পা ধা । মা গা রা । পা । । I
তা র সা থ র ০ ক র ম মো র ০
তা ই ০ জা নি ০ স বু ০ দে নি ০

I সা । রা । সা । । । পা । ধা । পা । । I
ছা ড়ি ০ দে ই চি তো ০ গো ড় রে ০
লা ০ জা ল মো র ভ ল ই ক রি ০

I পা ধা না । র্সা র্রা র্গা । র্গা । র্রা । র্সা । । II
ব্য ব সা যি ম্ তি হ ০ য় ঘো র ০
তো র পা দ র ০ দে নি ০ ০ ০ ০

স্বরলিপি—২৫

ধান্য রোপন গীতিঃ পৃষ্ঠা—৩৩৫

প্রথম যেদিন মাঠে ধান বোনা হয় পাঁজি দেখে মহেন্দ্র ক্ষণ বুঝে। চাষী সকালে স্নান করে সিন্দুর, খত্, গুয়া (সুপারী) আমপাতা, কোদাল ও ধান নিয়ে মাঠে যায়। জমির ঈশান কোণে বিশ ঘা কোদাল কুপিয়ে খত্ মিশিয়ে মাটী তৈরি করে। সিন্দুর গুলে গুয়া উপর দিয়ে ঈশান কোণে বসিযে প্রণাম কোরে ধান বুনে গান গায়।

তুতো মা বিনন্দ মাউসী ধান ফলাইবু বিশি বিশি (বেশী বেশী)। বুদ্ধি নাইমা তোর করিত (কাছে) তুতো আছু (আছিস্) মোর ঘর। দয়া দেই বঁচাই লবু মোর ছুয়াকু কোল দবু তো গোড়রে কটী নয় সবু দোষ মোর ক্ষম।

II সা । রা । গা । মা । । গা । রা । সা । । । I
তু ০ তো মা ০ ০ ০ বি ন্‌ন দ মা উ সী ০
দ য়া ০ দে ০ ই ০ বঁ চা ই ল ০ বু ০

I পা । ধা । পা । মা । । গা । রা । সা । । । I
ধা ন ০ ফ লা ই বু বি শি ০ বি ০ শি ০
মো ০ র্ ছু য়া কু ০ কো ল ০ দ ০ বু ০

I পা । না । র্সা । র্রা । । র্গা । র্রা । র্রা । । । I
বু ০ দ্ধি না ই মা ০ তো র ক র ০ ত ০
তো র ০ গো ড় রে ০ কো টী ০ ন ০ য় ০

I র্সা না ধা । গা মা পা । । গা । রা । সা । । । II
তু ০ তো অ ০ ছু ০ মো ০ র্ ঘ ০ র ০
স বু ০ দো ০ ষ ০ মো র ০ ক্ষ ০ ম ০

স্বরলিপি—২৬

চরকার গানঃ সজনী, আরে এত রাইতে—পৃষ্ঠা—৩৩৪

II । । সা । রসা ন্‌া -া । সা গা -া । মা পা মা I
০ ০ স জ নী ০ আ রে ০ এ ত ০

I মা পা মা । গা -া -া । গা গা গা । গা গা মা I
রা ই ০ তে ০ ০ চ র কার্ ঘেব্ ঘে রা

I পা -া -া । -া -া -া II
নি ০ ০ ০ ০ ০

II পা পা ধা | ণা ধা ধা | পা পা -া | পা পা -া I
চ র কা   আ মা র   লা তি ০   পু তি ০

I গা গা পা | পা পা ধা | ধা র্সা া | -া -া -া I
চ র কা   আ মা র   হি য়া ০   ০ ০ ০

I র্সা র্সা র্রা | র্রা র্রা র্গা | র্রা র্সা -া | না ধপা পা I
চ র কা   র দৌ ০   ল তে ০   আ মা র

I ধা না -া | না ধা না | ধা পা -া | -া -া া I
সা ড়ে ০   তিন গণ ডা   বি য়া ০   ০ ০ ০

স্বরলিপি—২৭

মাছ ধরার গান ঃ প্যুষ মাইস্যা শীতর কাল আতুরি বাইয়া চেইয়া গ্রাম...পৃষ্ঠা—৩৩৪

+   ০   +   ০

II সা া া া | সা া া া II সা া া া | রা া া া I
প্যু ০ ০ ষ   মা ই স্যা ০   শী ০ ত র   কা ০ ০ ল

I সা া া া | সা া রা া II সা া া া | প্া া া া I
আ তু রি ০   বা ই য়া ০   চে ই য়া ০   গ্রা ০ ০ ম

I রা া া া | রা া া া II রা া া া | গা া া া I
ক ০ র ম্   খা ০ লি-র   দ ০ ক্ষি ণ   দি ০ ০ ০

I রা া রা া | রা া গা া II সা া রা া | সা া া া I
রা ০ ছা ই   আ ই লা ম   বি ০ হ ন্   দি ০ আ বে

I প্া া সা া | সা া া া II সা া া া | সা া রা া I
জা ০ লা ০   ০ তৃ বা s   জি ০ ল ০   ই ০ ঢা ০

I মা মা মা মা | মা া পা া | মা া মা া | মা া মা া I
রে ০ ০ ০   ০ ০ আ রে   জা ০ লা ০   ০ তৃ বা ০

I মা া মা া | গা া রা সা II রা গা া গা | গা গা রা সা I
জি ০ ল ০   ০ই ০ ঢা রে   বা ই লা ০   ০ ০ কো ০

I রা মা গা মা | রা গা রা সা II রা মা গা মা | রা গা সা সা I
ড়া ০ ০ ল্   বো ০ হা ল্   কো ০ ড়া ল্   বো ০ হা ল

I রা মা গা মা | রা গা রা র্সা II সা া া া | সা া া া I
কো ০ ড়া ল   বো ০ হা ল   রে ০ ০ ০   ০ ০ ০ ০

স্বরলিপি

প্রথম অন্তরা

I পা া া া | ধা া র্সা া ‖ র্সা া া া | র্সা া া া I

বে ০ ই ল জা ল্ ব্যা ০ চা ই লা ম রা ই খ্যে ০

I র্রা া া া | র্সা া া া ‖ না া া া | ধা া পা া I

দে ০ রী ০ হ ই ল ০ খা ই তে ০ দা ই তে ০

I মা া া া | মা া া া ‖ পা া া া | ধা া া া I

ধা ০ ন্ চি ব ০ ন্যা ০ আ ০ স্তা ০ চা ০ ০ ০র

I পা া া া | পা া ধা া ‖ পা ধা পা ধা | মা া া া I

হে ০ ই জা ০ গা ত্ মা ০ ছ্ র ঘ ০ ০ র

I না া না া | না া ধা া ‖ ধা া পা া | মা া গা া I

ক ০ ত ০ র ই ল ০ ক ০ ত ০ গ্যা ০ ই ল

I রা া া া | া া পা া ‖ পা া মা া | গা া রা া I

রে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ক ০ ত ০ক দি ০ লা ম্

I সা া া া | া া া া II

ফা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ল্

দ্বিতীয় অন্তরা

II পা া া া | ধা া র্সা া ‖ র্সা া া া | র্সা া া া I

সো ০ না ০ দি ০ য়া র উ ০ ত্ত র বাঁ ০ কে ০

I র্রা া া া | র্সা া া া ‖ না া া া | ধা া পা া I

তা ই ল্যা ০ কা ই স্যা ০ জ গ দী ০ থা ০ কে ০

I মা া া া | মা া া া ‖ পা া া া | ধা া না া I

আ ০ ০ র থা ০ কে ০ ব ০ ড় ০ ব ০ ড় ০

I ধা া পা া | পা া র্সা া ‖ না া ধা া | পা া া া I

ঝু ০ ড়ি ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I মা া া া | মা া া া ‖ পা া া া | ধা া না া I

আ ০ ০ র আ ০ ছে ০ মা ০ ছ্ র হু ০ ড়া ০

I ধা া পা া | পা া র্সা া ‖ না া ধা া | পা া া া I

হু ০ ড়ি ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I	না	৷	৷	৷	|	না	৷	ধা	৷	‖	ধা	৷	পা	৷	|	মা	৷	গা	৷	I
	মা	০	হ্	০		ক	০	রে	০		টা	০	না	০		টা	০	নি	০	
I	রা	৷	৷	৷	|	রা	৷	পা	৷	‖	পা	৷	মা	৷	|	গা	৷	রা	৷	I
	রে	০	০	০		০	০	০	০		ফা	০	ড়ি	০		ফে	০	লা	য়	
I	সা	৷	৷	৷	|	৷	৷	৷	৷	II										
	জা	০	০	ল্		০	০	০	০											

(তৃতীয় অন্তরা প্রথম অন্তরার অনুরূপ)

স্বরলিপি—২৭(ক)

জল ভরার গান

আমি ভইরে আইলাম

শীতল গঙ্গার জল : পৃষ্ঠা—২৬৮

					দ	৷	|	পা	দপা	I
					আ	০		আ	মি০	
II(	মা	পা	৷	|	মজ্ঞা	৷	|	রা	সা	|
	ভ	ই	০		রে০	০		০	০	
I	রা	৷	৷	|	সা	৷	|	ণ্া	সা	I
	আ	ই	০		লা	০		০	ম	
I	গা	গা	মা	|	পা	৷	|	মা	মা	I
	শী	ত	ল		গ	ং		গা	র	
I	পা	৷	৷	|	দা	৷	|	পমা	৷	I
	জ	০	ল		আ	০		মি০	০	
							|	গা	মা	
								কা	লার	
I	পা	পা	র্সা	|	র্সা	৷	|	র্সা	র্রা	I
	রূ	প	নে		হা	০		রি	০	
I	র্সা	৷	ণা	|	ধা	৷	|	পা	৷	I
	প্রা	ণ	স		জ	০		নী	র	

স্বরলিপি

I	পা	‌া	মা	।	গা	‌া	।	গমা	মা	I
	ম	ন	কর		ছে	০		উ০	০	
I	পা	‌া	‌া	।	দা	‌া	।	পমা	‌া	I
	ত	০	ল		আ	০		মি০	০	

অন্তরা

II	গা	গা	‌া	।	গ	‌া	।	গা	মা	I
	ন	ন্দে	র		বে	০		টা	০	
I	মা	পা	‌া	।	পা	‌া	।	ধপা	মা	I
	চি	ক	ন		কা	০		লা০	০	
I	মা	মা	ধা	।	পা	‌া	।	পা	ধা	I
	জা	নে	০		ক	০		ত	০	
I	মা	পা	মা	।	গা	‌া	।	গা	মা	I
	ছ্	০	০		০	ল		সে	যে	
I	পা	‌া	র্সা	।	র্সা	‌া	।	র্সা	র্রা	I
	জ	ল	ঢা		লি	০		যা	০	
I	র্সা	‌া	ণা	।	ধা	‌া	।	পা	‌া	I
	প্রা	ণ	স		জ	০		নী	র	
I	পা	‌া	দা	।	পা	‌া	।	মা	০	I
	ঘা	ট	কর		ছে	০		পি	০	
I	পা	‌া	‌া	।	দা	‌া	।	পমা	‌া	I
	ছ্	০	ল		আ	০		মি০	০	

[পরের অংশের সুর অন্তরার মতন]

স্বরলিপি—২৭(খ)

ধামাইল ঃ আমি রবনা রবনা গৃহে—পৃষ্ঠা—২৮৬

II	পা	-া	মা	।	-া	ধা	-া	।	পা	-া	মা	।	গা	রা	গা	I
	র	০	ব		০	না	০		র	০	ব		না	গৃ	হে	
I	সা	সা	গা	।	গা	মা	মা	।	পা	-া	পা	।	মা	মা	ধা	I
	ব	ন্	ধু		বি	নে	০		প্রা	০	ণ		বাঁ	চে	০	

I পা -া া । -া -া া । না না র্সা । র্সা র্সা র্সা I
না ০ ০ ০ ০ ০ -ব ন্ ধু বি নে ০

I র্সা -া না । ধা র্সা না । ধপা া -া । -া -া ০ I
প্রা ০ ণ বাঁ চে ০ না ০ ০ ০ ০ ০

I পা া া । মা -া া । গা -া -া । রা গা া I
না ০ ০ না ০ ০ না ০ ০ গো ০ ০

II মা -া গা । গা মা মা । পা পা া । পা পা া I
এ ০ ম ন সু ন্ দ র ০ পা খি ০

I না -া র্সা । র্সা র্সা না । ধা ধা র্সা । না না ধা I
হৃ ০ দ য়ে হৃ ০ দ য়ে ০ রা খি ০

I ধা -া া । -া -া -া । -া -া -া । -া া া I
গো ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I সা গা গা । গা গা মা । পা পা -া । মা ধা া I
ছু ট্ লে পা খি ০ ধ রা ০ দি বে ০

I পা -া -া । -া -া -া । না না র্সা । র্সা র্সা া I
না ০ ০ ০ ০ ০ ছু ট্ লে পা খি ০

I র্সা র্সা না । ধা র্সা না । ধপা া া । -া -া -া I
ধ রা ০ দি বে ০ না ০ ০ ০ ০ ০

I পা -া -া । মা -া া । গা -া -া । রা গা া II
না ০ ০ না ০ ০ না ০ ০ গো ০ ০

বন্ধু বিনে প্রাণ বাঁচে না

[পরের অন্তরাগুলি ১ম অন্তরার অনুরূপ]

স্বরলিপি—

বিয়ের গানঃ আয় সব সখীগণ, চল যাই শ্রীবৃন্দাবন

II গা রা গা রা । সা -া সা -া । ধ্া ধ্া সা সা । ধ্া ধ্া প্া -া I
আ য় স ব স খী গ ণ চ ল যাই শ্রী বৃন দা ব ন

I প্া ধ্া সা সা । সা রা গা রা । মা -া -া -া । গা রা গা রা I
এ কা কু ঞ্জে রা ধা শ্যাম সা জা ০ ০ ই এ কা কু ঞ্জে

I সা সা ধ্‌ রা । সা -া -া -া II
রা ধা শ্যাম সা জা ০ ০ ০ই

II গা গা পা -া । পা পা পা গা । গা গা পা -া । ধা ধা ধা -া I
তু ল সী ০ সা জি য়ে ০ চন্ দন টি ০ ঘ সি য়ে ০

I পা ধা পা ধা । গা গা গা রা । মা -া -া গ । গা রা গা রা I
রা ধা কৃষ ণের পাদ প দ্ম সা জা ০ ০ ই রা ধা কৃষ্ ণের

I সা সা ধ্‌ রা । সা -া -া -া I
পাদ প দ্ম সা জা ০ ০ ই

II গা গা পা -া । -পাপা -া গা । গা গা পা -া । ধা ধা ধা -া I
ফু ল টি ০ তু লি য়ে ০ মা লা টি ০ গাঁ থি য়ে ০

I পা ধা পা পা । গা গা গা রা । মা -া -া মা । গা রা গা রা I
রা ধা কৃ ষ্ণের গ লে তে প রা ০ ০ ই রা ধা কৃ ষ্ণের

I সা সা ধ্‌ রা । সা -া -া সা II
গ লে তে প রা ০ ০ ই

স্বরলিপি—২৭ (গ)

বিয়ের গান ঃ উঠিলা সুয়ারী বসিলা নাই—পৃষ্ঠা—২৮০

II গা পা পা া । মা গা রা া । রা গা গা া । রা সা া া I
উ ঠি লা ০ সু য়া রী ০ ব সি লা ০ না ই ০ ০

I সা রা রা া । রা পা পা া । গা মা গা া । রা সা া া I
ঘু রি চাঁ ০ হি বা কু ০ দি শি লা ০ না হি ০ ০

I গা পা পা া । মা গা রা া । রা গা গা া । রা সা া া I
গু য়া গ ০ ড়ি গ লা ০ থা লি ত ০ ল কু ০ ০

I সা রা রা া । রা গা গা া । গা মা গা া । রা সা া া I
ম তে ঠে ০ লি দে ল ০ প র ঘ ০ র কু ০ ০

I গা পা পা া । মা গা রা া । রা গা গা া । রা সা া া I
কে তে ক ০ থা থি লা ০ মো ০ ম ০ ন র ০ ০

I সা রা রা া । রা গা গা া । গা মা গা া । রা সা া া I
স বু ০ ০ হ ই লা ০ মো হ র ০ প র ০ ০

I গা পা পা া | মা গা রা া | রা গা া া | রা সা া া I
মু হি চ ০ লি গ লি ০ জ ন ম ০ পাঁ ই ০ ০

I সা রা রা া | রা গা গা া | গা মা গা া | রা সা া া II
ঘ রে তো ০ র হি লা ০ ক টি য়া ০ ভা ই ০ ০

স্বরলিপি—২৭ (ঘ)

বিয়ের গানঃ তরল বাঁশ গুহাল তড়া—পৃষ্ঠা—২৮০

II ণ্া সা সা া | সা া সা া | সা া সা া | রা গা া া I
ত র ল বাঁ ০ শ ০ গু হা ল ০ ত ড়া ০ ০

I গা পা পা া | মা গা রা া | রা গা গা া | রা সা া া I
দ ব ত ০ ক ই চ ০ পঁ ডু য়া ০ ছ ড়া ০ ০

I গা পা পা া | পা া পা া | পা ধা া া | পা মা া া I
ল ড়ি য়া ০ গ ছ টী ০ বা ট কু ০ ছা ই ০ ০

I গা া গা া | রা সা রা া | রা গা গা া | সা া া া I
মা স গ লে দে খা ০ ০ ক রি ব ০ যা ই ০ ০

I ণ্া সা সা া | সা া সা া | সা া সা া | রা গা া া I
ক দি ল ০ গ ছ র ০ লা গি লা ০ মু শা ০ ০

I গা পা পা া | মা গা রা া | রা গা গা া | রা সা া া II
ভা ই বা ০ ঘ র কু ০ র হি লা ০ আ সা ০ ০

স্বরলিপি—২৭ (ঙ)

বৌ-নাচের গান

সোহাগ চাঁদ বদনী ধনী নাচত দেখি......পৃষ্ঠা—২৮৭

II -া -া -া | সা রা -া | গা -া -া | গা -া গা | গা গা -া | মা গা -া I
০ ০ ০ সোহা গ চাঁ ০ ০ দ্ ০ ব দ নী ০ ধ নি ০

I রা -রা -া | গা সা -া | রা -া -া | -া -া -া | গা গা -া | পা পা -া I
না চ ০ ত দে ০ খি ০ ০ ০ ০ ০ না চ ০ ত দে ০

I ধা -া -া | র্সা না -া | পা ধপা-া | মা মা -া | গা -া -া | মা গা -া I
খি ০ ০ বা লা ০ না চ০ ০ ত দে ০ খি ০ ০ বা লা ০

I রা রা -া | গা সা -া | রা -া -া | -া -া -া II
না চ ০ ত দে ০ খি ০ ০ ০ ০ ০

II পা পা -া | পা পা ধা | র্সা -া র্সা | না ধা -া | পা পা -া | ধা ধা না I
না চে ন ভা ল ০ সু ন্ দ রী গো০ বাঁ ধে ন ভা ল ০

I পা ধা -া | -া -া ধা | ধা ধা -া | না র্সা -া | র্সা র্রা র্সা | র্সা না -া I
চু ০ ০ ০ ০ ল না চে ন ভা ল ০ সু ন্ দ রী গো০

I পা পা -া | ধা ধা না | পা ধা -া | -া -া ধা | পা -া ধা | র্সা না -া I
বাঁ ধে ন ভা ল ০ চু ০ ০ ০ ০ ল হে ০ লি য়া দু ০

I ধ পা -া | মা গা -া | রা -া রা | গা সা -া | রা -া -া | -া -া রা II
লি য়া ০ প ড়ে০ না গ কে শ রে র ফু ০ ০ ০ ০ ল

II ন্া -া ন্া | -া ন্া -া | সা সা -া | রা গা -া | সা রা -া | পা মা -া I
রু ম্ ঝু ম্ নু ০ পু র ০ বা জে০ ঠু মু ক্ ঠু মু ক্

I গা -া -া | -া -া রসা | -া -া পা | পা পা -া | পা -া -া | মা গা রা -া I
তা ০ ০ ০ ০ লে০ ০ ০ ন য় নে০ ন ০ ০ য় ০ নে ০

I -া -া মা | মা মা -া | রা গা -া -া | ন্া সা -া | -া -া প্া | ন্া ন্া ন্া I
০ ০ মি শা ই য়া শ ০ ০ ০ র মে ০ ০ ০ র ঙ লা ০

I সা -া -া | রা -া -া | গা -া -া | রা সা -া -া II
গে ০ ০ গা ০ ০ লে০ ০ ০ ০ ০ ০

II পা পা -া | পা পা ধা | র্সা র্সা -া | না ধা -া | পা পা -া | ধা ধা না I
যে ম্ নি না চে ০ না গ র কা না ই তে ম্ নি না চে ০

I পা ধা ধা | -া -া ধা | ধা ধা -া | না র্সা -া | র্সা র্রা র্সা | র্সা না -া I
রা ০ ০ ০ ০ ই যে ম নি না চে ০ না গ র কা না ই

I পা পা -া | ধা ধা না | পা ধা -া | -া -া ধা | পা া ধা | র্সা -া না I
তে ম্ নি না চে ০ রা ০ ০ ০ ০ ই না ০ চি য়া ভু ০

I ধা পা -া | মা গা -া | রা গা -া | গা সা -া | রা -া -া | -া -া রা II
লা ও ত দে খি ০ না গ ০ র কা ০ না ০ ০ ০ ০ ই

স্বরলিপি—২৮

আগমনী গান

গিরি গণেশ আমার শুভকারী—পৃষ্ঠা—২৯৬

০ ৩
গা মা II{ মা মা মা । পা ধা পা I
গি রি গ ণেশ্ আ মার্ শু ভ

১´ ২
I মা মপা -ধপা। -মগাগা মা । পা না না । ধা পা ধা I
কা রী ০০ ০০ গি রি গ ণেশ্ আ মার্ শু ভ

I মা পা -া ।-া (গা মা) }I ।I পা ধনা র্সা । র্সা র্সা র্সা I
কা রী ০ ০ গি রি পু জে০ গ ণ প তি

I র্সা র্রা র্সা । না র্সনা ধপা । পা র্সা র্সা । না না র্সা I
পে লাম্ হে ম ব০ তী০ চাঁ দের মা । লা যে ন

I ধা না না । ধা পা পা II
চাঁ দ সা রি সা রি

-া -া II{ মা পা পা । মা গা মা I
০ ০ বি ল্ব বৃ ক্ষ মূ লে

I মা পা পা । পা পা -া । ধর্সা র্সা র্সা । না না র্সা I
পা তি য়া বো ধ ন্ গ০ ণে শের্ ক ল্যা ণে

I ধা না না । ধা পা -া} । ধর্সা র্সা র্সা । র্সা র্সা র্সা I
গৌ রীর আ গ ম ন্ ঘ০ রে আন্ ব চ ণ্ডী

I র্সা র্রা র্গর্রা । র্সা না নর্সা । ধা র্সা র্সা । না না র্সা I
শুন্ ব ক০ র্ণে চ ণ্ডী০ আস্ বে ক ত দ ণ্ডী

I ধা না না । ধা পা পা II
যো গী জ টা ধা রী

-া -া II{ মা পা পা । মা গা মা I
০ ০ মে য়ের্ কো লে মে য়ে

I মা পা পা । পা পা -া । ধর্সা র্সা র্সা । না না র্সা I
দু ই টি রূ প সী ল০ ক্ষ্মী স র স্ব তী

ধা না না । ধা পা পা }I ধর্সা র্সা র্সা । র্সা র্সা -া I
শ র তে র শ শী সু০ রে শ কু মা র্

র্সা র্রা র্গর্রা । র্সা না নর্সা । ধা র্সা র্সা । না না র্সা I
গ ণে শ০ আ মা ০র্ তা দের্ না হে রি লে

ধা না না । ধা পা পা II II
ঝ রে ন য়ন্ বা রি

স্বরলিপি—৮৭

বিজয়ার গান—এসো মা এসো মা উমা—পৃষ্ঠা—৩০২

স্থায়ী

II া া সজ্ঞা। সা দ্‌া ণ্‌া । সা সরা জ্ঞা । রা জ্ঞা া I
০ ০ এ০ সো মা এ সো মা ০ উ মা ০

I া া সা । জ্ঞা মদা মা । জ্ঞঋা া ঋ । সা া সা I
০ ০ ব লো না০ মা যা০ ০ ই যা ০ ই

I া া পা । পা পা পা । পা পণা ধণা । ধা পা মজ্ঞা I
০ ০ মা য়ের্ কা ছে হৈ ম০ ০০ ব তী ০০

I া া জ্ঞা । জ্ঞা মা মা । জ্ঞা জ্ঞা মা । ঋা সা সা II
০ ০ ও ক থা যে ব ল্ তে না ০ ই

অন্তরা

II া া জ্ঞা- । মা- ণদা ণা । ণা র্সা র্সা । র্ঋা র্সা া I
০ ০ বৎ । সরা ন্ তে আ সি স আ বা ০

I র্সা া ণা । ণা- র্সা র্সা । র্সা ণর্ঋা র্সণা । দা পা I
র ০ ভু লিস্ নে মা উ মা০ ০০ আ মা র

I া া র্সা- । র্সা র্ঋা র্সা । ধা ণা া । দা পা া I
০ ০ চন্ দ্রা ন নে যে ন ০ আ বা র

I া া জ্ঞা । পা- পা পা- । পা পা দা । পমা দপা মজ্ঞা II
০ ০ ম ধুর মা বোল্ শু ন তে পা০ ০০ ই০

সঞ্চারী

II া া সা । সা সা রা । জ্ঞা মা জ্ঞা । পা মা া I
০ ০ এ সো স বে পু র বা সি নী ০

I । । জ্ঞা । জ্ঞা রা জ্ঞা- । মা জ্ঞরা জ্ঞা । ঋা সা । I
০ ০ আ নন্ দে দাও উ লু০ ০ ধ্ব নি ০

I । । পা । পা পা পা । পা পণা ধণা । দা পা । I
০ ০ উ মা যে অ মৃ ল্য০ ০০ ম ণি ০

I । । জ্ঞা । জ্ঞজ্ঞামমা মামা । জ্ঞা মা ঋা । সা । । II
০ ০ এ মন্ ধন্ যার ঘ রে না ই ০ ০

স্বরলিপি—৩০

গোঠের গান ঃ গোপী বাহির হইয়া চায়—পৃষ্ঠা—৩০৬

I । । সরা সন্া I
০ ০ গোঃপীঃ

II{ সা সা গা মা । গা । । । গা মপা পা মপা । গপা মগা রসা সা I
বা হির হই য়া চা ০ য় রং গীঃ য়া রাঃ খাঃ ঃল মাঃ ঠে

I সা । সরা সন্া }II
যা য় গোঃপীঃ

অন্তরা

II পা ধা ণা ধণা । পা পা ধা ণধা । পা পা পা মপা । গপা মগা রসা সা I
আম রা তো প০ রে র না রী চি ত্তে না ধ রাই তে০পা০ রি

I । সগা গা গা । মা মপা পা॰ ·মপা । মপা মগা রসা সা II
০ কিদি য়া ধ রাই ব০ তা ০র মা০ ০য় গো০পী

গোবর্ধন পর্বতে যায়.......অভাগিনী মায়।
ধবলী কবলী গাই ...... দুটি রাঙা পায়।
এই কলি দুটি অন্তরা অংশেরই মতন।

স্বরলিপি—৩১

প্রভাতী গান ঃ একবার নাচিয়া নাচিয়া বেণু বাজাইয়া—পৃষ্ঠা—৩১১

স্থায়ী

ররা জ্ঞজ্ঞা
এক্ বার

রা সা সা । ণ্া ণ্া সা । সা সা সা । রা জ্ঞা রসা I
না চি য়া না চি য়া বে ণু বা জা ই য়া০

রা পা মা । গা রা জ্ঞা । রা সা সা । সা । । I
এ সো গো র ত ন ম ০ ণি ০ ০ ০

I মা পা ধণা | পধা পা পা | ধা র্সা ণা | ধধা পধা পমা I
বে লা পা০ নে০ চা ও উ ঠে মা খন্ খা০ ও০

I মা পা মা | গা রা জ্ঞজ্ঞা | জ্ঞরা সরা সা | া ররা জ্ঞজ্ঞা II
বেঁ ধে দি ব মা থার বে০ ০০ ণী ০ এক্ বার

অন্তরা

II মা পা মা | জ্ঞা রা রা | ণ্া রা রা | রা জ্ঞা রা I
শি ব আ রা ধ নে ম ধু বৃন্ দা ব নে

I সা সা রজ্ঞা | সরা ণ্া সা | সা া সা | া া া I
পে য়ে ছি ০ নী ল ম ০ ণি ০ ০ ০

I মা পা ধণা | পধা পা পা | ধ র্সা ণা | ধা পধা পমা I
শি ব আ০ রা০ ধ নে ম ধু বৃন্ দা ব০ নে০

I মা পা মা | গা রা জ্ঞা | জ্ঞারা সারা সা | া ররা জ্ঞজ্ঞা II
পে য়ে ছি ০ নী ল ম০ ০০ ণি ০ এক্ বার

স্বরলিপি—৩২

প্রভাতী গান

শুকসারি বলে উঠল কিশোরী—পৃষ্ঠা—৩১১

স্থায়ী

সরা সন্া
শু০ ক০

II সা গা া | া গা মা | মা পা পা | ধপা মা পা I
সা রি ০ ০ ব লে উ ঠ ল কি০ শো রী

I মজ্ঞা মজ্ঞা রা | সা সরা সন্া | সা া া | া া সা I
যা ০ মি নী অ০ ব০ সা ০ ০ ০ ০ ন

I পা র্সা র্সা | র্সা র্সা র্রর্সা | না না ধপা | না না না I
কো কি লা য় ঘ ন০ ঘ ন কু হু র বে

I না র্সা র্সা | না ধা পা | পা পা মগা | গমা পধা পা II
ম ধু ক রে ম ধু ক ০ রে০ পা০ ০০ ন

অন্তরা

II মা পা পা | না না না | না র্সা র্সা | র্সা না র্সা I
র তি র স র ঙ্গে র স রা জ স ঙ্গে

I	পা	র্সা	র্সা	|	র্সা	র্রা	র্সা	|	না	না	ধপা	|	না	া	না	I
	নি	শি	গো		হা	ই	লে		প্রে	ম	ত০		র	০	ঙ্গে	
I	র্সা	র্গা	র্রা	|	র্সা	না	ধনা	|	র্সা	া	া	|	া	া	র্সা	I
	এ	ই	তো		০	স	মা০		ধা	০	০		০	০	ন	
I	পা	র্সা	র্সা	|	র্সা	র্সা	র্রর্সা	|	না	না	ধপা	|	না	না	না	I
	ঘ	রে	গু		রু	কু	ল০		জা	গি	ল০		স	ক	ল	
I	র্সা	র্সা	না	|	ধা	পা	পা	|	পা	মগা	গা	|	গমা	পধা	পা	II
	মা	০	ধ		ব	ক	র		ল	০০	প		য়া	০	ন	

[অবশিষ্ট কলির সুর অন্তরার মতনই]

স্বরলিপি—৩৩

প্রভাতী গান ঃ প্রভাত সময়ে শচীর আঙ্গিনার মাঝে—পৃষ্ঠা—৩১৫

স্থায়ী

II	গা	গা	-া	গা	|	রা	রা	সা	-া	|	ণ্	সা	সা	সা	|	ণ্	সা	দ্	ণ্	I
	প্র	ভা	০	ত		স	ম	য়ে	০		শ	চী	র	আ		ঙ্গি	নার	মা	ঝে	
I	সা	মা	মা	মা	|	মা	পা	পা	মা	|	গা	-া	সা	রা	|	মা	-া	-া	া	II
	গৌ	র	চাঁ	ন্দ্		না	চি	য়া	বে		ড়া	০	০	য়		রে	০	০	০	

অন্তরা

II	সা	মা	মা	মা	|	মা	মা	মা	মা	|	মা	পা	পপা	পা	|	মা	পা	মা	গা	I
	জা	গো	নি	গো		শ	চী	মা	তা		গৌ	র	আই	ল		প্রে	ম	দা	তা	
I	মা	ধা	ধা	না	|	র্সা	র্সা	র্সা	র্সা	|	র্সা	র্গা	র্রর্রা	র্সা	|	না	না	র্সা	র্সা	I
	জা	গো	নি	গো		শ	চী	মা	তা		গৌ	র	আই	ল		প্রে	ম	দা	তা	
I	না	না	ধা	ধা	|	পা	পা	মা	মা	|	মা	পা	পপা	পা	|	মা	পা	মা	গা	I
	জা	গো	নি	গো		শ	চী	মা	তা		গৌ	র	আই	ল		প্রে	ম	দা	তা	
I	মা	মা	ধা	ধা	|	পা	পপা	মমা	মা	|	গা	-া	সা	রা	|	মা	-া	-া	-া	II
	ঘ	রে	ঘ	রে		হ	রির	নাম	বি		লা	০	০	য়		রে	০	০	০	

"রাতুল চরণে সোনার.....রুনু ঝুনু বাজেরে"।। অন্তরার মত হবে।

স্বরলিপি—৩৪

নিমাই সন্ন্যাসের গান ঃ সোনার চাঁদ, চাঁন্দরে—পৃষ্ঠা—৩১৯

সা ররা I
সো নার

II গা । । গা । মা মা গা রা । । পা পা মা । গগা ররা গা রা I
চাঁ ০ ০ দ্ চাঁ ন্দ রে ০ ০ চাঁ ন্দ হা রাই লাম ন দী

I সা । । । । । । সা ররা । গা । । গা । । । । । I
তে ০ ০ ০ ০ ০ সো নার চাঁ ০ ০ দ্ ০ ০ ০ ০

II সা সা সা রা । ররা গা গা রা । সা সা সা রা । রা গা । । I
দু ধ মি ঠা দই ও মি ঠা আ রো মি ঠা ন নী ০ ০

I । । । । । । । । পপা । পপা পপা ধা গা । ধা পা গা ধা I
০ ০ ০ ০ ০ ০. ০ আর তার চাই তে অ ধি ক মি ঠা

I পা । । । । । । গপা পা । পধা পধার্সা ধা পা । মা গরা সা ররা II
রে ০ ০ ০ ০ ০ বা ছা মা ০০০ ও জ ন নী০ সো নার
চাঁদ্ চাঁন্দ রে.......

[অবশিষ্ট কলির সুর অন্তরার মতন]